দাম : ৭০ টাকা

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা - ১৪২৬
২৩ সেপ্টেম্বর - ২০১৯

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭২ বর্ষ ৫ সংখ্যা,
৫ আশ্বিন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২৩ সেপ্টেম্বর - ২০১৯
যুগাব্দ - ৫১২১
Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত
সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়
রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)
সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫
সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
দাম : ৭০ টাকা

Postal Registration No.-
KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

দেবী প্রসঙ্গ

বিদ্বদ্‌নয়নে দুর্গাতত্ত্বান্বেষণ
স্বামী ত্যাগিবরানন্দ — ১৯

দুর্গাভাবনা : বেদ থেকে বর্তমান
জয়ন্ত কুশারী — ২৩

উপন্যাস

মহিষাসুর নির্ণাশী

প্রবাল চক্রবর্তী ৭০

অভ্রকণা, অশ্রুকণাগুলি

রন্তিদেব সেনগুপ্ত ১৪৪

চিহ্নায়ন

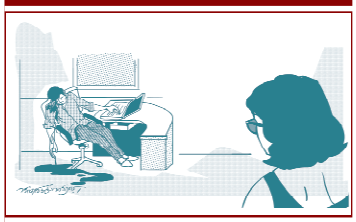

শেখর সেনগুপ্ত ২০২

লিপা

জিষ্ণু বসু ২৬০

গল্প

ধুলো

সন্দীপ চক্রবর্তী ২২৩

আমার বন্ধু পার্থ

রমানাথ রায় ৪৭

সমাপ্তি

এষা দে ৫৫

সন্ধ্যাবেলার কাব্য

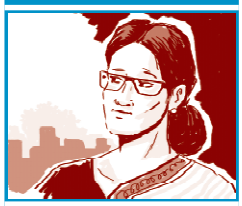

মালিনী চট্টোপাধ্যায় ১৯১

অমরত্ব

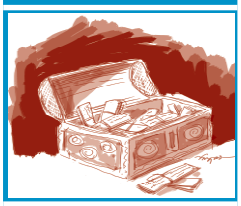

সিদ্ধার্থ সিংহ ২৮৯

তৃতীয় পানিপথ

গোপাল চক্রবর্তী ৩০৩

প্রবন্ধ

সর্বসমাবেশক হিন্দুত্ব
শ্রীরঙ্গাহরি ২৭

কালজয়ী বিদ্যাসাগর
অভিজিৎ দাশগুপ্ত ৩১

হরিহরের পথ ও পাঁচালী
অচিন্ত্য বিশ্বাস ৩৯

বনবাসী সংস্কৃতিতে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ
ড. সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৭

উনিশ শতকের কলকাতায় মগ মন্দির ও তার দেউলিয়া পুরোহিত
অরিন্দম মুখোপাধ্যায় ১৯৫

হিন্দু জাতীয়তাবাদের আখ্যান
জয়ন্ত ঘোষাল ২১৯

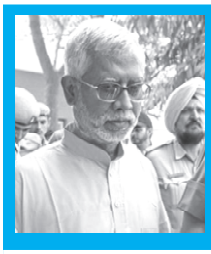

এক যোদ্ধা সন্ন্যাসী
বিজয় আঢ্য ২৩৭

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এক জাতি এক দল এক নেতা
সুজিত রায় ২৪৯

সনাতন হিন্দুধর্ম ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ২৫৫

রসরাজ রাজশেখর
সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭৭

চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারতের অবদান
কল্যাণ চৌবে ২৮৫

ভ্রমণ কাহিনি

বোহেমিয়া-বাভারিয়ার ভূখণ্ডে
কুণাল চট্টোপাধ্যায় ১৩১

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রেখাঙ্কন ও শিরোমিতিবিদ্যার প্রয়োগ ও প্রভাব
অর্ণব নাগ ২৯৫

জাতীয়তাবাদী বঙ্কিমচন্দ্র ও দুই জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক
সুদীপ বসু ২৯৯

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana (NR) ®
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

A True Nationalist by Heart and Follower of Shyamaprasad Mukherjee

Late Shri Harswarup Gupta

Founder & Ex Chairman : Keshav Madhav Saraswati Vidhya Mandir, Kakor,
Dist. - Bulandshahr, P.O. - Gautam Budh Nagar, UP
Ex Chairman of AMD INDUSTRIES LTD.
18th Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi - 110 005

Present Chairman : Shri Ashok Gupta
S/o. Late Shri Harswarup Gupta
Res. : 6, Central Drive, DLF Chattarpur Farms
Chattarpur, New Delhi - 110 074
Ph. +91 11 46830202, Email : agupta@amdindustries.com

বিদ্বদ্ নয়নে দুর্গাতত্ত্বান্বেষণ

স্বামী ত্যাগিবরানন্দ

স্বকল্পিত বিধানদাতা স্বার্থান্বেষী পুরোহিতকুল, মৌলতন্ত্র ও পোপতন্ত্রের অজ্ঞানাঞ্জন লিপ্ত নয়নে দুর্গাতিত্ত্বান্বেষণ নয়, এই অন্বেষণ বিদ্বদ্ নয়নে নব যুগের অভিধান চয়ন করে। পৌরাণিক যুগে পৌরোহিত্যের অস্পৃশ্যতারূপ অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতেই একদিন লক্ষ লক্ষ দরিদ্র অসহায় হিন্দু জনগণ মুসলমানদের দরগায় যেতে বাধ্য হয়েছে। আর সেই সুযোগেই তারা ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হয়। এই নির্মম পুরোহিত তন্ত্রের

প্রভাবেই ভারতীয় সভ্যতা ও সমাজ দুশো বছর পিছনে পড়ে গিয়েছে। বিবেকানন্দই একমাত্র পুরোহিততন্ত্র ও মৌলতন্ত্রের নিষ্ঠুর বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। সুতরাং, দুর্গাপূজার তত্ত্বান্বেষণ পুরোহিত নয়নে নয়, এ অন্বেষণ যুক্তিবাদী বিদ্বদ্ নয়নে।

বিবেকানন্দের কথায়, 'কারো মতে মত দিয়ে বিশ লক্ষ দেবতার বিশ্বাস করা অপেক্ষা যুক্তির অনুসরণ করে নাস্তিক হওয়া ভালো।' শতপথ ব্রাহ্মণেও বলা হয়েছে— 'যঃ অন্যং দেবতাম্ উপাসত্যেন স বেদ যথা পশুরেব স দেবানাম্'— অর্থাৎ কল্পিত দেবতার উপাসনাকে পশুতুল্য বলা হয়েছে। কারণ, পরমাত্মা ও তাঁর মূর্তপ্রকাশ সর্বজীবকে ভুলে প্রতিমা পূজা নিরর্থক। শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৯।২১-২৫) : অরূপকে রূপের কল্পনার খাঁচায় বন্দি করে তাঁর অনির্বচনীয়তাকে খণ্ডন করার জন্য মহর্ষি বেদব্যাসও পুরাণ লিখে অনুতপ্ত হয়েছিলেন। সাধক রামপ্রসাদ গেয়েছিলেন— 'মায়ের মূর্তি গড়তে চাই মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে। মা বেটি কী মাটির মেয়ে, মিছে খাটি মাটি দিয়ে।' সুতরাং, এই সকল উক্তি এটাই প্রমাণ করে যে, প্রতিমা পূজা মূলত তত্ত্বেরই পূজা, সমাজ সচেতনতারই পূজা। সেই তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত না হলে প্রতিমা পূজা নিরর্থক। সুতরাং, পূজার তত্ত্ব না জেনে কেবল পুরোহিতের বিধান অনুসারে যে পূজা করা হয়, তা প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞানপূর্বক পূজা। তাই পূজাতত্ত্বটির যথার্থ অন্বেষণ সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

মহাবিশ্বে বিস্ফোরণের ফলে যে প্রচণ্ড পরিমাণে শব্দ ও বিপুল পরিমাণে শক্তি বিচ্ছুরিত হয়েছিল, ঋগ্বেদে সেই শক্তিকেই 'বিশ্বেদেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা অদিতির্জাতমদিতিজনিত্বম্', অর্থাৎ 'অদিতি' বলা হয়েছে। সেই অদিতিই চৈতন্যদায়িনী দুর্গারূপা মহেশ্বরী আজ শারোদোৎসবে দেবীমাতৃকারূপে মৃন্ময়ী প্রতিমায়, বিল্ববৃক্ষে ও নবপত্রিকায় (উদ্ভিদ জগতের বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত মোট নয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য ও ভেষজ গুণসম্পন্ন উদ্ভিদের সমাহার) আবিভূতা ও আরাধিতা হচ্ছেন। সেই শক্তিই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের আদি 'অক্ষর-ব্রহ্ম' বা 'শব্দ-ব্রহ্ম' হিসাবে ওঁ-কার শুঁঙ্গরূপী গণেশের মধ্য দিয়ে আরাধিতা হচ্ছেন। বিস্ফোরণের পর যে প্রচণ্ড শব্দের সৃষ্টি হয়েছিল, তারই চিহ্ন হিসাবে শিবের হাতের ডমরু যুক্তিবাদী নয়নে প্রতিভাত হচ্ছে বিরাটের প্রতীকরূপে। শয়নার্থক 'শী' ধাতু থেকেই 'শিব' শব্দটির উৎপত্তি। যেখানে সকলে শয়ন করেন— অর্থাৎ সকলের যিনি আধার তিনিই শিব। আবার যিনি অশুভের নাশ করে মঙ্গল বিধান করেন, যিনি মঙ্গলময়, সুখ ও আনন্দ স্বরূপ তিনিই শিব। ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শঙ্কা, জুগুপ্সা, কুল, শীল এবং জাতি— এই আটটিকে অষ্টপাশ থেকে যিনি মুক্ত তিনিই শিব। যে সমষ্টি অধিষ্ঠানচৈতন্যে অষ্টশক্তি প্রকাশিত হয় তিনিই শিব। আবার যে আধারে প্রলয় হয় সেই আধারই মহেশ্বর। সেই মহেশ্বরই সর্বগুণাধার। তাই, সাবজেক্টরূপী (আধার) শিব আঁকা থাকে অবজেক্টরূপী (আধেয়) দুর্গাপ্রতিমার পিছনে। তাই, শিব অজ্ঞানরূপী নয়নের অগোচরে অর্থাৎ প্রতিমার পশ্চাতে।

দুর্গাপূজায় লিঙ্গপূজা আবশ্যক। 'লিঙ্গ' অর্থে যে পরম সত্তার মধ্যে জগৎ লীন হয় এবং যাঁর থেকে জগতের আবার উৎপত্তি হয়, সেই পরম কারণকেই বলা হয় লিঙ্গ। শিবের প্রতীক চিহ্ন বলে তাকে শিবলিঙ্গ। শাস্ত্রকাররা বলেছেন, লিঙ্গপূজা না করে অন্য দেবতার পূজা করলে সেই পূজা বিফল হবে এবং যিনি পূজা করবেন তাঁর নরকে গতি হবে। লিঙ্গার্চন তন্ত্রে আছে, 'লিঙ্গপূজাং বিনা দেবি! অন্য পূজাং করোতি যঃ। বিফলা তস্য পূজাস্যাদন্তে নরকম্ আপ্নুয়াৎ।' লিঙ্গ কোনো অঙ্গবিশেষ নয়, তা হল সাক্ষাৎ মহেশ্বরের জ্যোতির্ময় রূপের প্রকাশ এবং গৌরীপট্ট হলো জগন্ময়ী মা পার্বতীর চিন্ময়ী রূপ। লিঙ্গপূজার আগে আচমন করা বিধি। কারণ, মোক্ষের পথে যেতে গেলে আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনার্থে সর্বাগ্রে আচমনমন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ করার বিধি। আমরা কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে বিষয়ভোগ করতে গিয়ে ওই সকল ইন্দ্রিয় অশুদ্ধি করে ফেলি। তাই সর্বাগ্রে আচমনের মধ্য দিয়ে শুদ্ধি করা প্রয়োজন। চক্ষু যেমন রূপজ মোহে আসক্ত, কর্ণ তেমনি শব্দজ মোহ, জিহ্বা লোভ, নাসিকা সুগন্ধে, মন নানা বিষয় মোহে আকৃষ্ট হয়ে আত্মার শুদ্ধস্বরূপতা ভুলে গিয়ে অশুদ্ধপ্রাপ্ত হয়। তাই, এই সংস্কাররূপ উচ্ছিষ্টগুলি প্রথমেই (আচমন তারই প্রতীকী) ধুতে হয়। আচমনের পর ন্যাস করা হয়।

সেই 'ন্যাস' মানে ত্যাগ বা স্থাপন। আমাদের প্রতিটি অঙ্গে যে 'আমি ও আমার' বোধ আছে, সেটি ত্যাগ করলেই ভগবৎ সমীপে গমন করা সম্ভব। ন্যাসের সময়ে 'আং', 'ঈং' প্রভৃতি মাতৃকা মন্ত্র উচ্চারণ করার কারণ হলো যে— সাধক ক্রমে মাতৃকাময় হয়ে উঠবেন, অর্থাৎ সকল জড়ত্ব (তামস, মহিষের প্রতীক) থেকে মুক্ত হয়ে কক্রে রজ (সিংহ) এবং অবশেষে শুদ্ধসত্ত্বগুণা সম্পন্না দণ্ডায়মান মা। জীবের চেতনভাবটি এইরূপ চিন্তার ফলে উদ্ভাসিত হয়। তাই পূজক ব্যাপকন্যাস, মাতৃকান্যাস, করন্যাস, অঙ্গন্যাস প্রভৃতির মধ্য দিয়ে নিজেকে শুদ্ধ হওয়ার ভাবনায় ভাবিত হওয়া চেষ্টা করেন। কারণ, শুদ্ধমনেরই ঈশ্বরের দর্শন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলেছেন— 'ঈশ্বর শুদ্ধ মনের গোচার।' এটিই ন্যাসতত্ত্বের মূল তাৎপর্য।

মহালয়া থেকেই দুর্গাপূজা অর্থাৎ দেবীপক্ষের সূচনা হয়। মহালয়া তত্ত্বটি হলো মহান আলয় অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। অথবা, মহতের পরমস্থান যেখানে। 'মহা' 'লয়' অন্য অর্থে জীবগণ পরমলীন হয় যেখানে। আবার মহতাদির লয় হয় যেখানে অর্থাৎ পরমাত্মায় বা পরব্রহ্মে। এই মহালয়ে তর্পণাদি অনুষ্ঠানটিও তাৎপর্যপূর্ণ। তর্পণ হলো— দেবতা, ঋষি ও পূর্বপুরুষের তৃপ্তিবিধানের উদ্দেশে জলের অঞ্জলি নিবেদন। এই অঞ্জলি

প্রদান্যের মধ্য দিয়ে পরিবার, দেশ, জাতি ও সমাজে এক সংহতি স্থাপিত হয়। জলশুদ্ধি বা তীর্থ আবাহন সময়ে অঞ্জলি প্রদানকালে বলা হয় ঃ 'ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণি চ। তীর্থ্যানি এতানি পুণ্যানি তর্পণ-কালে ভবন্ত্বিহ।' 'ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্মদে সিন্ধু-কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।' হে যুক্তিবাদী পাঠক! সনাতন হিন্দুধর্মে তর্পণের মধ্য দিয়ে কীভাবে সংহতিবোধের বার্তা যাচ্ছে তা ভাবলে অবাক হতে হয় না কী? সুতরাং সনাতন হিন্দু ধর্মই সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের কাছে আদর্শ ও পথপ্রদর্শক।

এরপর দেবীর বোধনপর্ব। বোধন মানে বোধ শক্তির উন্মেষ। এই বোধ সম্পর্কেই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন— 'তোমাদের চৈতন্য হোক'। চরম লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায়স্বরূপ আত্মশক্তির (চৈতন্যর) উদ্বোধন হওয়াই বোধন। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে বিল্ববৃক্ষকে দেখানো হয়েছে সূর্যের প্রতীক হিসাবে— 'বিল্বং জ্যোতিরিতি আচক্ষতে'। তাই সূর্যকে সর্বশক্তির আধার মনে করে তাঁর নিকট মহাশক্তির আবাহন করা হয়।

বোধনের পরই দেবীর মহাস্নান। এই মহাস্নানের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে সমাজের পূর্ণাঙ্গ ছবি। যেখানে দেবীকে পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চকাষায়, দুগ্ধ-দধি, বিভিন্ন নদ-নদীর জল, পতিতালয়ের গৃহ মৃত্তিকা দিয়ে দেবীর মহাস্নান করানো হয়। এর মধ্যে দিয়ে সমাজের কৃষিসম্পদ, খনিজসম্পদ, বনজসম্পদ, গোরক্ষা, নদী সংযোগ প্রভৃতি সার্বিক সমাজ কল্যাণ চিন্তা ফুটে ওঠে। দেবী দুর্গার আর এক নাম শাকম্ভরী। সর্বজীবের প্রাণরক্ষার উপযোগী শাকের দ্বারা পৃথিবীকে পালন করেন বলেই দেবী শাকম্ভরী নামে পরিচিতা। কারণ দেবী পূজার সঙ্গে সমাজ-কল্যাণ চিন্তাও অনুসৃত থাকে। সেইজন্য নবপত্রিকার পূজা মূলত একবীজ ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ, দুর্বল ও সবল কাণ্ডযুক্ত একাধিক ঔষধি গুণসম্পন্ন উদ্ভিদের সমাহারে সম্পন্ন বনজ সম্পদের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও মানব স্বীকৃতির উজ্জলতম দৃষ্টান্ত। তাই, নবপত্রিকার আরাধনা।

এরপর মঙ্গলঘট স্থাপন করা হয়। এই একটি গভীর তত্ত্ব। আমরা জানি যে, মানুষের যেমন প্রথম আবির্ভাব ঘটে মাতৃগর্ভে অর্থাৎ প্লাসেন্টায়। সেইরূপ দেবতাদেরও প্রথম আবাহন করা হয় মঙ্গলঘটে। ঘট মঙ্গল হওয়া কারণ, এই (দেহরূপ) ঘট দিয়েই মানুষ আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে। তাই, সেই ঘটটি স্থাপন করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। সুতরাং, ঘট বা কলস দেবশক্তিরই প্রতীক। শিশু মাতৃভূমি স্পর্শ করার আগে যেমন সেই স্থানটিকে ডেটল, ফিনাইল প্রভৃতি ছিটিয়ে পরিশুদ্ধ রাখা হয়, সেইরূপ ঘট স্থাপনের পূর্বে বেদিটিকেও শোধন করা হয়। ঘটটি জলপূর্ণ করতে হয়। জলই জীবন বা প্রাণ। জলে তাই প্রাণশক্তির প্রতিষ্ঠা। মৃত্তিকার উপর পঞ্চশস্যাদি দিয়ে তদুপরি জলঘটটি স্থাপনা করা হয়। ঘটে পঞ্চরত্ন বা নবরত্ন অবশ্য দেয়, ঘটের মুখে পঞ্চপল্লব। তাই, তত্ত্বগুলোকে সূক্ষ্মদেহকে বিশেষভাবে ধরার জন্যই তদনুকল্পরূপে ঘটস্থাপন শাস্ত্রে বিহিত হয়েছে। এই পরিদৃশ্যমান স্থূলদেহ সূক্ষ্মদেহেরই ঘনীভূত বিকাশ বা অভিব্যক্তি। স্থূলশরীর সূক্ষ্মে লীন হয়, সূক্ষ্ম শরীর আবার কারণশরীরে লীন হয়। তখন কারণাতীত ক্ষেত্রের দিকে অর্থাৎ শুদ্ধ আত্মার দিকে নিপতিত হয়। এইভাবেই জীব আত্মস্বরূপের সন্ধান পায়। ঘটের গায়ে সিন্দুরমূর্তি সূক্ষ্ম দেহেরই প্রতিরূপ। দেবপূজায় সূক্ষ্মদেহের অনুভবই বিশেষ প্রয়োজনীয়। হৃদয় থেকেই দেবশক্তির আবির্ভাব হয়। যতক্ষণ দেবতার উদ্দেশে অর্পিত পত্র পুষ্প প্রভৃতি উপচার স্বকীয় হৃদয়স্পর্শের অনুভূতিকে প্রকাশ করতে না পারে, ততক্ষণ বুঝতে হবে, যথার্থরূপে ঘটস্থাপন হয়নি। আত্মশ্রদ্ধা সহ পরমদেবতাকে স্থূলে এনে প্রাণ ও জ্ঞানশক্তির সাহায্যে মনকে সূক্ষ্মতত্ত্বে নিবদ্ধ রেখে ক্রমে স্থূল থেকে সূক্ষ্ম শরীরে, সূক্ষ্ম থেকে কারণশরীরে এবং কারণ থেকে কারণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াই মঙ্গলঘট স্থাপনের সার্থকতা। বেদে আছে — 'যজ্ঞো বৈ মহিমা'— 'মহিমা' বা মঙ্গলঘট আসলে সূর্যেরই প্রতীক। বৈদিক যজ্ঞে যে তিনটি ঘটের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহলো একই সূর্যের তিনটি বিবর্তিত অবস্থামাত্র। সূর্যের তিন বিবর্তিত রূপ হলো প্রাতঃসূর্য, যার দেবী সরস্বতী, মধ্যাহ্ন সূর্য যার দেবী দুর্গা এবং সায়ং সূর্য যার দেবী লক্ষ্মী। অর্থাৎ প্রত্যেক জীবাত্মাকেই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় বা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বা জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। যা পরবর্তীকালে ত্রিরত্ন বা ত্রিশক্তির প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। তারই প্রতিরূপ ঘটত্রয়। এই ত্রিশক্তিই মাতৃকারূপে পূজিতা হন মঙ্গলঘটে। যে কোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে তাই আমরা এই তিনটি ঘটের সহাবস্থান দেখতে পাই। প্রবেশদ্বারের দু'পাশে দুটো এবং মূল অনুষ্ঠানকেন্দ্রে পূজকের সামনে একটা। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের প্রতীক ঘট বা পুণ্যকলস সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী মাতৃকারূপে পূজিতা হন। ঘটের উপরে ডাব বা নারিকেল দেওয়ার কারণ আমাদের বুদ্ধি বা জ্ঞানশক্তির স্থান যেহেতু মাথা। যেহেতু, মাতার প্রতীক হিসাবে 'ডাব' ঘটের উপরে থাকাই স্বাভাবিক। ঘটের গায়ে স্বস্তিক আঁকা থাকার কারণ স্বস্তিক চিহ্ন মূলত সূর্য বা বিষ্ণুর চক্রের প্রতীক হিসাবেই পূজিত হয়। নিয়ত পরিবর্তনশীল জগতের কেন্দ্রস্থলে ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং অবস্থান করে সংসারী জীবকুলকে সকল অশুভ শক্তির হাত থেকে নিয়ত রক্ষা করেন বলেই স্বস্তিক মঙ্গলের প্রতীক।

ঘট স্থাপন ও নবপত্রিকা স্নানের পরই শুরু হয় দর্পণ প্রতিবিম্বে দেবীর মহাস্নানপর্ব। এই মহাস্নান-তত্ত্বটি বিদ্বদ্ নয়নে বিশ্বরূপ দর্শনের সমতুল্য। সামাজিক বা রাজনৈতিক দৃষ্টিতেও এই মহাস্নানের মধ্য দিয়ে প্রস্ফুটিত হয় সমাজের এক পূর্ণাঙ্গ সংহতির

ছবি। এই মহাস্নানে দেবীকে পঞ্চশস্য— (ধান, গম, যব, ভুট্টা, ডাল), পঞ্চরত্ন (সোনা, রুপা, তামা, ব্রোঞ্জ, হিরা), পঞ্চকাষায়— (জাম, বকুল, কুল, বেড়ালা ও শিমুল), পঞ্চগব্য— (দুধ, দই, ঘি, গোমূত্র, গোময়), শিশির, বৃষ্টির জল থেকে শুরু করে সপ্তনদী ও সপ্ত সাগরের জল, নদী মৃত্তিকা, পতিতালয়ের গৃহ মৃত্তিকা প্রভৃতি নানা উপাচার দিয়ে দেবীর মহাস্নান করানো হয়। এইসকল ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সমাজের কৃষি-সম্পদ, খনিজ-সম্পদ, বনজ-সম্পদ, জল-সম্পদ, গোরক্ষা প্রভৃতি সার্বিক সমাজ কল্যাণ চিন্তা ফুটে ওঠে। নৈতিকতা স্থাপনে সর্বভূতজননী ওই দেবীরই অধিষ্ঠান স্বরূপ পতিতোদ্ধারের ভাবটিও ফুটে ওঠে। চাষাভুসা, মুচি-মেথর থেকে শুরু করে ব্রাহ্মণ, মালী, কুম্ভকার, তন্তুবায়, নরসুন্দর, ঋষি, দাস সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ বিশ্ব সংহতি ও বিশ্বের কাছে এক অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়ের সমন্বয়-বার্তা প্রেরণ করে। এইরূপ এক সঙ্ঘবদ্ধ জাতিগঠন ও রাষ্ট্রভাবনা আমাদের মনে সংহতির মানচিত্র অঙ্কিত করে।

বিদ্বদ্ মননে গণপতি তত্ত্বটিও অপূর্ব। তাঁর পূজা প্রথম হওয়ার কারণ বিশ্বসৃষ্টির প্রথমেই যে শব্দটি উদ্‌গিরিত হয়েছিল সেটি হলো ওঁ-কার। গণেশের ওঁ-কার সদৃশ্য শুন্ড সেটিরই নির্দেশ দেওয়ার তাঁর পূজা সর্বাগ্রে করা হয়। দ্বিতীয় কারণ, তিনি জনগণের অধিপতি, তাই তিনি 'গণপতি'। আবার তিনি 'গণানাম্ ঈশ্বরঃ'— 'গণেশ' অর্থাৎ জনগণের ঈশ্বর বা প্রভু। তৃতীয়ত, তিনি ব্যাসদেবের (ব্যাস-'জ্ঞানী' অর্থে) দক্ষ স্টেনোগ্রাফার। তাই তিনি লিপিকার গণেশ। এছাড়া যিনি ক্ষুদ্রের সঙ্গে বৃহতের, অভিজাতের সঙ্গে অবনতের মিলন ঘটিয়ে স্বকীয় গ্রীবাদেশে যুক্ত করেছেন, ধনী, অভিজাত, প্রজ্ঞাবান, পণ্ডিত, শক্তিমান নাগরিকদের প্রতীক হিসেবে বৃহৎ শক্তিশালী গাম্ভীর্যপূর্ণ হাতির মাথাখানি, তিনিই আবার দরিদ্র, অবহেলিত, মূর্খ, দুর্বল, পরিশ্রমী, উপেক্ষিত ব্যক্তিদের প্রতীক হিসেবে বাহন করেছেন অতি ক্ষুদ্র, ধৈর্যশীল, মূষিকপ্রবরকে অর্থাৎ যিনি ছোট বা বড়ো কাউকেই উপেক্ষা না করে ঐক্য ও সমন্বয়ের এক বিশ্বজনীন মূর্তি গড়ে তুলতে চান তাঁর আরাধনাই তো সর্বাগ্রে হওয়াই যুক্তিযুক্ত। এলিস গেটির মতে, গণেশের বড়ো দাঁত লাঙ্গলের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় তাঁকে কৃষির দেবতাও বলা হয়। বিষ্ণুর মতো গণেশেরও হাতে শঙ্খ-চক্র গদা ও পদ্ম। শব্দের প্রতীক শঙ্খ বা ডমরু, কালের (সময়ের) প্রতীক হিসাবে চক্র, সকল স্থূলবস্তুর প্রতীক হিসেবে গদা, সকল কার্যের উৎপত্তিস্থলের আধারের প্রতীক হিসেবে পদ্ম (এই পদ্মই সনাতন হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রতীক)। সুতরাং, সৃষ্টির আদিরূপ গণেশ। তার পূজাই সর্বাগ্রে হওয়া অভিপ্রেত। ভগবান বিষ্ণু হলেন সকল জীবের পালন ও রক্ষাকর্তা। গণেশও তাই। ঐতিহাসিক এলিস গেটির মতে, গণেশের গ্রীবা দেশে হাতির মাথা ও পাদদেশে বাহন মুষিক পশু-সংস্কৃতিকে স্মরণ করায়। আবার লাঙ্গলের মতো তাঁর একদন্ত কৃষির দেবতা বলেই অনুমিত হয়। তাঁর বাহনটি হলো অতি ক্ষুদ্র ও উপেক্ষিত প্রাণী মূষিক। মূষিক খুবই পরিশ্রমী। তাঁর দুটি তীক্ষ্ণ দাঁত বিবেক ও বৈরাগ্য। এই দুটি থাকলেই তাকে মান্-হুঁস বলা যায়। অতএব, গণেশ তত্ত্বটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

আরও দুটি মূলতত্ত্ব হলো— কুমারীপূজা ও সন্ধিপূজা। সমাজে শুদ্ধ মাতৃভাব প্রতিষ্ঠার্থেই দুর্গাপূজায় কুমারীকে 'জ্যান্ত দুর্গারূপে' প্রতিমার পাশে রেখে আরাধনার ব্যবস্থা। কারণ, শুদ্ধ, সাত্ত্বিকভাবে অন্তর পূর্ণ হলে তবেই বিশ্ব কলুষমুক্ত হতে পারে। সন্ধিপূজা হলো কুমারী পূজার সমাপন্তে অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণের ৪৮ মিনিটের সন্ধিপূজার অনুষ্ঠানও এক মহাযজ্ঞ স্বরূপ। মহাশক্তি মহামায়া এখানে রণচণ্ডিকামূর্তিতে দণ্ডায়মান। তাই, তাঁর শ্রীচরণে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করাই এই পূজার মূল উদ্দেশ্য। আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষণই সন্ধিপূজার সমতুল্য। কারণ, সব সন্ধিক্ষণেই বিরাজ করে মৃত্যুর অভিসার! উপায় হলো মহৎ ক্ষণটিকে ধরা।

পূজার অন্তিম দিনে ভক্তগণ পরমানন্দে সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন। সিঁদুর (লাল রঙ) যা অনুরাগের প্রতীক। পরমাত্মার প্রতি অনুরাগ বশতই এক জীবাত্মা অপর জীবাত্মার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই আকর্ষণই অনুরাগরূপ সিঁদুর। জীবত্ব নাশ ও শিবত্বপ্রাপ্তিই দুর্গাতত্ত্বের মূল তাৎপর্য।

(লেখক সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, কৈলাসহর, ত্রিপুরা)

TRADE CENTRE (INDIA)

37, Lenin Sarani
Kolkata - 700 013
e-mail : t.c.india@vsnl.net
Fax : 91-33-2249, 8706
Ph. : 2249-8722

দুর্গা ভাবনা : বেদ থেকে বর্তমান

অধ্যাপক জয়ন্ত কুশারী

নিজের নাম প্রসঙ্গে স্বয়ং দেবী দুর্গা (শ্রীশ্রী চণ্ডীতে) বলেছেন— সেই সময় (শাকম্ভরী রূপে) আমি যখন 'দুর্গম' নামের মহাসুর বধ করব তখনই আমি 'দুর্গাদেবী' নামে খ্যাত হব।

তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্।
দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি।। ১১।৫০

দ্ + উ + র্ + গ্ + আ এই বর্ণগুলিকে পাওয়া যায় দুর্গা শব্দটি বিশ্লেষণ করলে। তাঁর স্বরূপের ব্যাখ্যা রয়েছে প্রতিটি বর্ণের মধ্যেই।

অর্থাৎ দ-কার দৈত্য বিনাশের, উ-কার বিঘ্ননাশের, র-কার সর্বরোগের বিনাশের, গ-কার পাপনাশের এবং আ-কার শোক দুঃখাদি জগৎ ও সর্বশত্রু বিনাশের সূচনা করে।

দৈত্যনাশার্থ বচনো দকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ
উকারো বিঘ্ননাশস্য বাচকো বেদসম্মতঃ।
রেফো রোগঘ্ন বচনোগশ্চপাপঘ্নবাচকঃ
ভবশত্রুঘ্নবচনশ্চকারঃ পরিকীর্ত্তিত।।

আবার ব্যাকরণগত ব্যাখ্যায় তিনি—

দুঃখেন গম্যতে যা, যা দুর্ উপসার্গৎ গম্ ধাতোরচ্ স্ত্রিয়াম্ আপ্ বা ঈপ্ ইতি দুর্গা বা দুর্গি শব্দ ব্যুৎপত্তিঃ।

যাঁকে দুঃখের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া বা জানা যায়, তিনিই দুর্গা। এই হলো দুর্গা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। এখন দুর্গা শব্দ সচরাচর শোনা যায়, কিন্তু দুর্গি শব্দের প্রয়োগ কোথায়? কিন্তু না, তাও পাওয়া যায় তৈত্তিরীয় আরণ্যকের যাজ্ঞিকা উপনিষদে দুর্গার গায়ত্রীতে 'কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারীং ধীমহী, তন্নো দুর্গি প্রচোদয়াৎ।' বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য্যের মতে দুর্গা ও দুর্গি অভেদ।

এখন প্রশ্ন হলো এই দুর্গা কে?

আদ্যা প্রকৃতির নামই দুর্গা। শক্তি নিরাকার, কর্মদ্বারা শক্তি অভিব্যক্ত হয়। আমাদের জ্ঞানে বিশ্বব্রাহ্মাণ্ড সেই কর্ম। অতএব দুর্গা বিশ্বরূপা। জড় ও শক্তি একই পদার্থ, এটা আধুনিক ভূতবিদ্যাবেত্তা পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করেছেন। কল্পনার দ্বারা অগ্নি ও এর দাহিকা শক্তি পৃথক ভাবতে পারি। কিন্তু বস্তুত পৃথক করতে পারি না।

আধ্যাত্মিক অর্থে দুর্গা বিশ্বরূপা মহাশক্তি। আধিভৌতিক অর্থে পঞ্চভূতের মধ্যে দুর্গা অগ্নিরূপা। আধিদৈবিক অর্থে দুর্গা রুদ্রদেবের শক্তি। রুদ্রদেবের শক্তি; রুদ্রযজ্ঞীয়াগ্নি। যে অগ্নি নানারূপে খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০০ অব্দ হতে পূজিত হয়ে আসছে।

যে প্রত্যহ প্রভাতে 'দুর্গা দুর্গা' এই অক্ষরদ্বয় বিশিষ্ট দুর্গানাম স্মরণ করে, সূর্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় তার সকল বিপদ নষ্ট হয়।

প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ম্।
আপদস্তস্য নশ্যান্তি তমঃ সূর্য্যোদয়েযথা।।

চঞ্চলচিত্তে অধিকক্ষণ সমাধি (সবিকল্প) স্থায়ী হয় না। ছাদ হতে যেমন নিম্ন সোপানে অবতরণ হয়, ঠিক তেমন ব্রহ্ম ভাবনা হতে সংসারে অবতরণ হয়। তখন প্রথমত বিপদ-আপদের কথা মনে আসে। বিপদ-আপদ ঘটলে তো ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ কিছুই সিদ্ধ হয় না, সেজন্য দুর্গার স্মরণ। দুর্গা ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি সেই ভগবতী সংসার অর্থাৎ সৃষ্টির আদি কর্ত্রী ও অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সুতরাং প্রথমেই তাঁর স্মরণ। শাস্ত্রে দুর্গানাম স্মরণের কথা বলা হয়েছে। তাঁর রূপ তো দেখবার বা ভাববার শক্তি নাই, নাম করতে করতে এই একান্ত ভক্তির উদয় হলে তিনিই তাঁর রূপ দেখান।

বৈদিক যুগেও দেবীর এই রূপ সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাওয়া যায়— কেনোপনিষদের ঋষির চোখে বহু পূর্বে সুরলোকে দেবাসুর সংগ্রামে গর্বিত দেবতাদের সম্মুখে 'উমা', 'হৈমবতী' রূপে তাঁর প্রথম প্রকাশ। শক্তি সচেতন বায়ু, অগ্নি প্রমুখ দেবগণ ব্রহ্মপুরুষের সামনে শক্তিপ্রদানে যখন ব্যর্থ, তখনই হঠাৎ নীল আকাশের বুকে বিদ্যুৎবর্ণা উমার আবির্ভাব—

স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম
বহু শোভমানাম্ উমাম্ হৈমবতীম্।।

এই দেবী (বাক্‌নাম্নী দেবী) ব্রহ্মকে স্বীয় আত্মারূপে অনুভব করে ঋক্ মন্ত্রে আত্মপরিচয় ঘোষণা করেন।

'অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহম্...'।

দুর্গাসপ্তশতী বা দেবীমাহাত্ম্য মূলত বেদ্‌ভিত্তিক। এর তিনটি চরিত্রের প্রথমটি ঋগ্বেদস্বরূপা, মধ্যম চরিত্রটি যজুর্বেদস্বরূপা, উত্তর চরিত্রটি সামবেদ স্বরূপা।

বাল্মীকি রামায়ণে শারদীয়া দুর্গাপূজার কথা উল্লেখ না থাকলেও কৃত্তিবাস তাঁর বাংলা রামায়ণে দেবী দুর্গার আবাহনের ঘটনাটি কারণ সহ তুলে ধরেছেন। কিন্তু না, রামচন্দ্র রাবণ বধের জন্য দেবীর অকালবোধন করেন, তা কৃত্তিবাসের কপোল কল্পিত নয়। কারণ, এই ঘটনাটির পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন দেবীর বোধন পূজায় এই মন্ত্রটি।

'ওঁ ঐঁ রাবণস্য বধার্থায়, রামস্যানুগ্রহায়চ..।'

বৃহন্নারদীয় পুরাণে সেই দেবী উমা, শক্তি, লক্ষ্মী ইত্যাদি নামে উক্ত হয়েছেন— 'উমেতি কেচিদাহুস্তাম্, শক্তি লক্ষ্মীংতথাপরে..।'

ইতিহাসও দুর্গা সম্বন্ধে বাঙ্ময় ছিল। মহাভারতে একাধিকবার দুর্গা স্মরণের উল্লেখ আছে। অজ্ঞাতবাসের সাফল্যের জন্য বিরাটপর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির দেবী দুর্গার স্বরচিত স্তব পাঠ করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রারম্ভে যুদ্ধজয়ের জন্য শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুন (স্বরচিত) দুর্গার স্তোত্র পাঠ করেন। বৌদ্ধধর্মের মারীচি দেবীও দশভুজা।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, ব্রজবালারা ব্রজের অধিষ্ঠাত্রী কাত্যায়নী দুর্গার কাছে তাঁদের কাতর প্রার্থনা জানিয়েছেন, নন্দগোপসুত শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়া জন্য।

'...নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ।'

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মেধা ঋষির স্তুতিতে ইনি—

'দেবী, আপনি সর্ব কার্য ও কারণ স্বরূপিণী, সর্বেশ্বরী, সর্বশক্তিময়ী দুর্জ্ঞেয়। সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তি সমন্বিতে...'। ইনি (দেবী) সর্বজ্ঞা ও সর্বস্থিতা (She is omniscient and omnipresent)। দেবতাদের স্তুতিতে এই চিচ্ছক্তি, চেতনা বুদ্ধি-নিদ্রা-ক্ষুধা-ছায়া-শক্তি-তৃষ্ণা-ক্ষান্তি--জাতি-লজ্জা-শান্তি-শ্রদ্ধা-কান্তি-লক্ষ্মী-বৃত্তি-স্মৃতি-দয়া-মাতা-তুষ্টি-ভ্রান্তিরূপে

সর্বজীবে বিরাজমানা।

'যা দেবী সর্বভূতেষু...।'

বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণের মতে প্রাকৃতিক নয়টি ভেষজে ব্রহ্মাণী প্রমুখ নয়টি দেবীর অবস্থান। সম্মিলিত রূপে যিনি নবপত্রিকা (কলা বউ) বাসিনী নবদুর্গারূপে খ্যাতা। আবার দেবীর ধ্যানে (জটাজুট সমাযুক্তাং..)-র একেবারে শেষভাগে বলা হয়েছে— উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা প্রমুখ অষ্টশক্তিগণে যিনি সর্বদা পরিবেষ্টিতা সেই ধর্ম-অর্থ-কাম -মোক্ষদাত্রী জগতের ধাত্রী সর্বদা চিন্তনীয়া। এই অষ্টশক্তি পরিবৃতা ভগবতী নবদুর্গারূপে প্রকাশমানা।

প্রসঙ্গত বলা যায়, বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ বলে সেটিই এখানে ঘটেছে। অর্থাৎ দেবী দুর্গার শক্তি এই অষ্টশক্তির মধ্যে বিকেন্দ্রীকৃত।

এখন দেখা যাক তন্ত্রের দৃষ্টিতে ইনি কেমন। বিশ্বসারোদ্ধার তন্ত্রে দেবী প্রকৃত অর্থেই ত্রাণকর্ত্রী, এখানে বলেছে, 'তুমি (দেবী) নিরাশ্রয়, দীন, তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধার্ত, ভীত ও বদ্ধজীবের একমাত্র গতি ও নিস্তারকারিণী। মুণ্ডমালা তন্ত্রে দেবীর পরস্পরবিরোধী চরিত্র তথা রূপগুলি দেখা যায়। এখানে তিনি সাকারা আবার নিরাকারাও, অব্যক্তা আবার ব্যক্তরূপাও।

ভগবান শঙ্করই (শিব) যাঁর একমাত্র আরাধ্য দেবতা সেই শিবগত প্রাণ আচার্য শঙ্কর (শঙ্করাচার্য) তাঁর দেব্যপরাধক্ষমপণ স্তোত্র দেবীর উদ্দেশে বলছেন, '... এখনও যদি আমার প্রতি দয়া না কর হে লম্বোদর জননী। নিরাশ্রয় আমি আর কার শরণ নেব?'

'... নিরালম্বো লম্বোদর জননি কং যামি শরণম্।'

নির্বিঘ্নে গ্রন্থসমাপ্তির জন্য মহাকবি কালিদাস এই দেবীর (তিনি অবশ্য শিব শিবানীর) শরমাগত— 'জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী পরমেশ্বরৌ।।' রঘুবংশ ১/১।।

সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন দেবীকে দেখেছিলেন বাঙ্গালি ঘরের একেবারে আটপৌরে কন্যার চোখে। তাঁর আগমনী গানে লিখলেন— 'এবার উমা এলে আর উমাকে পাঠাব না...।'

একইভাবে বিদ্রোহী কবি নজরুলও গাইলেন 'এবার নবীন মন্ত্রে হবে, জননী তোর উদ্বোধন। নিত্যা হয়ে রইব ঘরে, হবে না তোর বিসর্জন...'।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র দেশমাতৃকাতে বিশ্বমাতৃকার (দশপ্রহণধারিণী দুর্গার) রূপ আরোপ করেছেন— 'বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি। তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।। 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী'। ঋষি অরবিন্দ দেশের ঘোর সঙ্কটকালে দেবীকে প্রার্থনা জানালেন কাতরভাবে 'মাতঃ দুর্গে! স্বার্থে ভয়ে ক্ষুদ্রাশয়তায় ম্রিয়মান ভারত। আমাদের মহৎ কর, মহৎ প্রয়াসী কর, উদারচেতা কর, সত্যসঙ্কল্প কর। আর অপ্লাশী, নিশ্চেষ্ট, অলস, ভয়ভীত যেন না হই।'

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ভাবনায়ও জগন্মাতা ও দেশমাতা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছেন। তাই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হলো 'ও আমার দেশের মাটি তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা। তোমাতে বিশ্বময়ী, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা...'।

আবার প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তা চেতনায় জগদম্বা, গর্ভধারিণী তথা সমগ্র মাতৃজাতির (তাঁর জাগতিক নারী কল্যাণমূলক কাজই নিদর্শন স্বরূপ) মধ্যেই অন্তর্লীনা।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বিদ্যাসাগর মহাশয়ই হলেন এই চিন্ময়ী শক্তির প্রকৃত সাধক। ঋষি বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, সাধক রামপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের মাতৃবন্দনাকে বিজ্ঞানের কথায় Transformation of power বা শক্তির রূপান্তর বা রূপান্তরিত শক্তির সাধনা বলা যায়।

সংস্কৃত কবি মাঘ তাঁর 'শিশুপাল বধম্' মহাকাব্যে নারদের স্বর্গ থেকে অবতরণের দৃশ্যটি একটি শ্লোকের মাধ্যমে অবতারণা করেন— 'চয়স্তিষামিত্যবধারিতং পুরা...'। সমগ্র শ্লোকটির অর্থ— শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে 'তেজপুঞ্জ' বলে নিশ্চয় করলেন পরে আকৃতি দেখে 'শরীরধারী' বলে মনে করলেন তারপরে পৃথক পৃথক ভাবে মুখ হাত-পা প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শ্মশ্রু-গুম্ফ (গোঁফ-দাড়ি) দেখে পুরুষ বলে স্থির করলেন ক্রমে ওই ব্যক্তিকে 'নারদ' বলে জানতে পারলেন।

ঠিক একইভাবে বলা যেতে পারে, 'দুর্গাভাবনা : বেদ থেকে বর্তমান প্রসঙ্গে, যে দেবী প্রথমে নীলবর্ণ আকাশের বুকে বিদ্যুৎবর্ণা (তেজঃ পুঞ্জ নিজেকে প্রকট করেছিলেন মাত্র। ক্রমে ক্রমে পুরাণ তন্ত্রে যাঁর মুখ-হাত-পা (ক্রিয়াকলাপ) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল প্রকাশ পেল বর্তমান কবি-সাহিত্যিক সাধকগণের লেখনিতে (ভাবনায়) তিনিই আমাদের একান্ত আপন উমারূপী কন্যা। ক্রমে তাঁর পূর্ণতা ঘটল বঙ্কিম-কলমে দেশমাতৃকারূপিণী সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী 'দেবী দুর্গা।'

হে ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতিরূপা সনাতনি দেবী! হে মা দুর্গে! তোমার শ্রীচরণে নিখিল বিশ্বজনগণের সমবেত প্রার্থনা হোক গুরুদেবের (রবীন্দ্রনাথের) ভাষায়—

'বরিষ ধরার মাঝে শান্তির বাণী
কেন এ হিংসাদ্বেষ? কেন এ ছদ্মবেশ?
কেন এ মান-অভিমান?
বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি...।'

दुर्गा पूजा के पावन पर्व पर मंगलमय शुभ कामनाये
विश्व स्तर के पी. टी. एफ. ई. इन्सुलेटेड वायर,
केबल व नलिका, के निर्माता।

इस पुनीत राष्ट्रीय पर्व पर संकल्प लें कि हम भारत राष्ट्र
को सशक्त, संगठित और सक्षम बनाने में सहयोग करें।

गर्ग एसोसिएट्स
प्राइवेट लिमिटेड

M/s. Garg Associates Private Limited

Regd. Office : D-6, Meerut Road Industrial Area - 3
Ghaziabad - 201 003 (U.P.) INDIA

e-mail : sales@gargasso.com

Phone : 0120-2712128/2712039

সর্বসমাবেশক হিন্দুত্ব

শ্রী রঙ্গাহরি

হিন্দুত্বের উন্মেষ

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন আধুনিককালের প্রথম সন্ন্যাসী, যিনি বিদেশযাত্রা করেছিলেন ম্লেচ্ছ-সংসর্গ সংক্রান্ত সমস্ত স্থানীয় কুসংস্কারকে অগ্রাহ্য করে। আমেরিকা, ইয়োরোপ ইত্যাদি দেশে হিন্দু ধর্মের দর্শন ব্যাখ্যা করে দেশে ফিরে স্বামীজী শ্রীলঙ্কা থেকে আলমোড়া (হিমালয়) পর্যন্ত ঘুরলেন এবং এক শাশ্বত সত্য উপলব্ধি করলেন।

স্বামীজী বললেন— 'মনে রাখবে, প্রতিটি জাতির নিজস্ব ভবিতব্য থাকে, যা তাকে পূর্ণ করতে হয়; বিশ্বকে দেবার মতো নিজস্ব কোনো বার্তা থাকে, যা তাকে প্রচার করতে হয়। সব জাতিরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য, পরিচয় এবং সত্তা থাকে।' স্বামীজীর যুক্তি ছিল এই যে, আমাদের কাজ হওয়া দরকার আমাদের জাতির নিজস্ব মূল বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে বের করা। তাঁর এই চিন্তাধারা হিন্দুত্ব দর্শনের বীজ রোপণ করে।

এরপর লোকমান্য তিলক, ঋষি অরবিন্দ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, শ্রীগোলওয়ালকর এঁরা সবাই এই চিন্তাধারাকেই এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ঋষি অরবিন্দ তাঁর 'দি ফাউন্ডেশন অব ইন্ডিয়ান কালচার' গ্রন্থে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, আমাদের এই সুপ্রাচীন জাতি বহুকাল ধরে বহু অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে পরিক্রমা করার ফলে তাতে এক বিশেষ জীবনশৈলী ও দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছে, যা আমাদের গৌরবময় এক সম্পদ। কয়েক শতাব্দী ধরেই এই সম্পদ আমাদের পরিচয়ের স্মারক। এই পরিচয়েরই অন্বেষণ করতে বলেছেন স্বামীজী এবং ত্রিশ বছর ধরে শ্রীগুরুজী এই চিন্তার পুনরাবৃত্তি করে গেছেন।

জাতীয় পরিচয়

আমাদের জাতীয় পরিচয়ের নাম হিন্দুত্ব। ইংরেজিতে একে হিন্দুনেস বলা যায়। ভারতের যেমন হিন্দুত্ব, তেমনই ইংলন্ডের ইংরেজত্ব, জার্মানির জার্মানত্ব, ফ্রান্সের ফরাসিত্ব ইত্যাদি। এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। হিন্দুত্ব শব্দটা অতি সহজ সরল শব্দ। কিন্তু তবুও কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে, হিন্দুত্ব কেন? ভারতীয়ত্ব নয় কেন?

হতেই পারে। 'ভারতীয়' শব্দটা নিয়ে কোনো আপত্তি নেই আমাদের। দুটো শব্দেই একই ভাবের দ্যোতনা রয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রার্থনায় 'হিন্দুভূমি' শব্দটা রয়েছে। আবার শেষে 'ভারত' শব্দটাও রয়েছে। সঙ্ঘের মতে, দুটো শব্দই গ্রহণযোগ্য ও প্রণম্য। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টা দেখতে হলে আমাদের আরও বেশি বিশ্লেষণী মনোভাবাপন্ন ও ত্রুটিমুক্ত হতে হবে।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। রসায়নশাস্ত্রের একজন অধ্যাপক রাঁধুনিকে লবণ আনতে বললে সে রান্নার নুন (রসায়নে যার নাম সোডিয়াম ক্লোরাইড) নিয়ে আসবে। কিন্তু অধ্যাপকমশাই যদি ল্যাবরেটরির কোনো সহায়ককে লবণ আনতে বলতেন, অমনি সে উল্টে জিজ্ঞাসা করত, 'কোন লবণটা স্যার? ক্লোরাইড, ফসফেট সালফেট?' অর্থাৎ 'লবণ' একটি সাধারণ নাম, কিন্তু 'সোডিয়াম ক্লোরাইড' নামটি একটি নির্দিষ্ট নাম।

ঠিক এই রকমের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে 'হিন্দুত্ব' ও 'ভারতীয়ত্ব'— এই দুটো শব্দকেই বিশ্লেষণ করতে হবে। আজকের জগতে 'হিন্দু' শব্দটা একটা সামাজিক মাত্রার ইঙ্গিত করে; কিন্তু 'ভারতীয়' শব্দটাতে রয়েছে একটা ভৌগোলিক মাত্রা। কাজে কাজেই হিন্দুত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গেলে যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন, সেটি হচ্ছে এই—

কোন দেশে হিন্দুত্ব নির্মাণ হয়েছে? কোন সমাজ হিন্দুত্ব নির্মাণ করেছে?

প্রথম প্রশ্নটির উত্তর : ভারত। দ্বিতীয়টির উত্তর : হিন্দু সমাজ। দুটি উত্তরই যথাক্রমে ভৌগোলিক এবং সামাজিক অর্থে সঠিক, কিন্তু প্রথমটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পরিষ্কার

বাল গঙ্গাধর তিলক

নয়। উপনিষদ গ্রন্থাবলীকে 'আরণ্যক' বলা হয়, যদিও জঙ্গল এদের রচনা করেনি, সব রচনা করেছিলেন মহাঋষিগণ। যাঁরা জঙ্গলে বাস করতেন। ঠিক একইভাবে বলা যায়, অপরিহার্য মূল্যবোধগুলো ভৌগোলিক ভারতে সৃষ্ট হয়েছিল বটে, কিন্তু তাদের সৃষ্টি করেছিল 'হিন্দু' নামক এক সমাজ।

কাজে কাজেই 'হিন্দুত্ব' শব্দের আলোচনায় 'ভারতীয়' শব্দটি হচ্ছে 'লবণ' শব্দটির মতোই সাধারণ একটি শব্দ। বৈজ্ঞানিক নির্দিষ্টতা বা স্পষ্টতা এই 'ভারতীয়ত্ব' শব্দটিতে নেই, যা আছে 'হিন্দুত্ব' শব্দটিতে।

আরও প্রাঞ্জল করে বোঝানো যাক। ভগবান রামচন্দ্রের পত্নীর তিনটি নাম আছে— মৈথিলী, জানকী, সীতা। তাঁর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশে একদল সাংবাদিক মিথিলায় গিয়ে শহরের দ্বারপালকে শুধোলো : 'ভাই, আমরা বহু দূর থেকে এসেছি, দ্বারকা থেকে, মৈথিলীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। মৈথিলীর বাড়ি কোনটা?' দ্বারপাল বললে : 'ভাইসব, মিথিলার সব মেয়েই মৈথিলী, কোনজনকে চাও তোমরা?' তখন সাংবাদিকদের একজন বললে : 'জানকী', আর অমনি দ্বারপাল হাত জোড় করে শ্রদ্ধাভরে বললে : 'ওঃ, রাজকুমারীর কথা বলছেন আপনারা! জনক রাজার মেয়ে। আপনারা ওইদিকে রাজপ্রাসাদে চলে যান।' রাজপ্রাসাদে গিয়ে জানকীর খোঁজ করতেই প্রহরীরা বলল : 'জনক রাজার চার মেয়ে। আপনাদের কাকে চাই?' সাংবাদিকরা বললে : 'চার মেয়ে? তাঁদের নাম কী?' তখন প্রহরী বললে : ঊর্মিলা, শ্রুতকীর্তি, মাণ্ডবী আর সীতা।' শুনেই সাংবাদিকরা সমস্বরে বলে উঠল : 'সীতা! সীতা!' এরপর কিন্তু প্রাসাদে ঢোকার পর আর কেউ জিজ্ঞাসা করল না কোন সীতা? কারণ 'সীতা' শব্দটি সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট।

এর অর্থ হচ্ছে, সাধারণ অস্পষ্টতা থেকে নির্দিষ্ট স্পষ্টতায় পৌঁছলে তবেই সত্যে উপনীত হওয়া যায়। সেই সত্যের আর কোনো নড়চড় হয় না। ঠিক একই ভাবে, 'ভারতীয়ত্ব' কথাটি ভুল না হলেও নির্দিষ্টভাবে এবং সঠিকতর উত্তর হচ্ছে 'হিন্দুত্ব'।

হিন্দুত্বের স্বরূপ এবং প্রকাশ

আমাদের সামাজিক ও জাতীয় জীবনে হিন্দুত্ব অতি সহজ ও সাধারণভাবে প্রকট হয়। এই প্রকাশ এতই সাবলীল ও অনায়াস যে, একে অবদমন করতে গেলেই বরং সক্রিয় প্রচেষ্টা করতে হয়। এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের কয়েকটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে।

১) ভারত স্বাধীন হবার পর আমাদের জাতীয় নেতারা একটা স্লোগান বা ওই ধরনের কোনো অর্থবহ বাক্যাংশ খুঁজতে উপনিষদের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। 'সত্যমেব জয়তে', 'যোগক্ষেম বহাম্যহম্', 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' ইত্যাদি বাক্যাংশগুলো তাঁদের নজরে এল। এগুলো অনায়াসে গ্রহণযোগ্য হয়ে গেল এবং আজ আমরা এই কথাগুলো অহরহ ব্যবহার করি।

২) অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া ১৯৫৭ সালে কেরলে ক্ষমতায় আসার পর তার মুখ্যমন্ত্রী ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ নিমন্ত্রিত হয়ে চীনে গেলেন। তিনি চীনের চেয়ারম্যান মাও-সে-তুং-এর জন্য উপহার নিয়ে গেলেন নটরাজের একটা মূর্তি। কেন? কারণ, তাঁর মনের কোনো এক অজানা কোণে ভারতীয়ত্বের গর্বের সঙ্গে ভেসে উঠেছিল হিন্দুত্ব।

৩) স্বাধীনতার পর ভারত গণতান্ত্রিক হিসেবে ঘোষিত হবার পর 'পরমবীর চক্র' দেওয়া শুরু হলো। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেই চক্রটির নকশা করেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক শ্রী বিক্রম খানোলকারের স্ত্রী সাবিত্রী দেবী। সাবিত্রীর বাবা ছিলেন হাঙ্গেরীয়, আর মা ছিলেন রুশ। সাবিত্রী কিন্তু নিজে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় সমাজে মিশে গিয়ে ভগিনী নিবেদিতার মতোই ভারতকন্যা হয়ে গিয়েছিলেন। পরমবীর চক্র দেওয়া হয় অসাধারণ শৌর্যের সম্মান ও স্বীকৃতি হিসাবে। উপহার ফলক এই চক্রের একদিকে থাকে দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র।

৪) আর একটি অসাধারণ উদাহরণ। আমাদের গণতন্ত্রের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ভারত সরকার একটা ডাকটিকিট বের করেছিল। তাতে একটি সংস্কৃত শ্লোক ছিল, যেটি সংসদ ভবনের গম্বুজের ভিতর দিকে খোদিত রয়েছে। বলা যায়, ওই শ্লোকটি সংসদের মৌলিক নীতি। সংসদের সদস্যদের আচরণবিধি বেঁধে দেওয়া

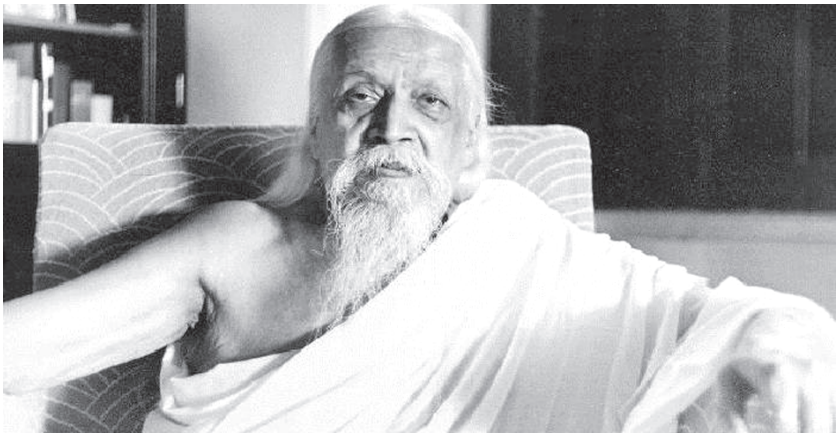

ঋষি অরবিন্দ

হয়েছে এই শ্লোকে। বলা হয়েছে, সাংসদরা সংসদ কক্ষে ঢুকবেন কিনা সেটা তাঁরই বিবেচ্য, কিন্তু যদি তিনি ঢোকেন, তবে তাঁকে সত্য কথা বলতে হবে। যদি তিনি মিথ্যা বলেন বা সদস্যদের কোনো আলোচনায় সত্য গোপনের উদ্দেশ্যে চুপ করে থাকেন, তবে তিনি পাপকার্য করবেন এবং সংশ্লিষ্ট সদস্যরাও পাপী হবেন। শ্লোকটি নিম্নরূপ—

সভাং বা ন প্রবেষ্টব্যং বা ন সমঞ্জসম্।
অব্রুবন বিব্রুবন বাহপি নরো ভবতি কিল্বিষী।।
(মনু. ৮.১৩)

শ্লোকটি লিখেছিলেন মনু। এতে কি কোনো সম্প্রদায়, কোনো আচার-উপাচার বা কোনো দেবতা ইত্যাদির উল্লেখ আছে? আসলে এতে রয়েছে নিখাদ জনস্বার্থে আত্মশাসনের আদেশ। এমনকী একজন নাস্তিকের জন্যও এই আদেশ সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য।

ঠিক এই কথাই তাঁর আত্মজীবনীতে (১৭শ অধ্যায়) লিখেছিলেন পণ্ডিত নেহরু : হিন্দুত্ব তার সন্তানদের আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে রাখে, তা তারা যেমনই হোক না কেন।

হিন্দুত্ব একমুখী নয়

হিন্দুত্ব সম্পর্কে এই চিন্তাধারা ক্রমাগত বহমান, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ঐতিহাসিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে সমাজে বয়ে চলেছে। হিন্দুত্বের উপলব্ধি নানা অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ এবং এর নানান দিক রয়েছে। জীবন নিজেই যেমন সময়ের প্রবাহে বিবর্তিত হয়ে অসংখ্য প্রকারের রূপ ধারণ করতে পারে, ঠিক তেমনই হিন্দুত্বের বর্ণালীরও হাজারও রূপ, যার অনুভব হতে পারে ব্যক্তিগত স্তরে, কিংবা সমাজ বা জাতীয় ভাবধারার স্তরে। যত দীর্ঘকাল বহমান থাকবে এই ভাবধারা, ততই এর পরিবর্তন, পরিমার্জন হতে থাকবে। আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে হিন্দুত্বের এই বহুমুখিতার একটিমাত্র দিকের উল্লেখ করব আমি, সেই দিকটি হলো : হিন্দুত্ব ও বিনোদন।

সাপ-লুডো খেলা সারা ভারতে প্রচলিত। এখন তো এর বোর্ড ক্রীড়া সামগ্রীর দোকানেও পাওয়া যায়। এই খেলাটি বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন নামে চলে। কেরলে এর নাম 'বৈকুণ্ঠ', তামিলনাড়ুতে এর নাম 'মুক্তিপট্টম', অন্ধ্রে 'পরমপদপটম্' ইত্যাদি। জম্মুতে প্রবাস করার সময় আমি এই খেলাটা খুঁজেছিলাম। পেয়ে গেলাম ডোগরা আর্ট মিউজিয়ামে। লক্ষণীয় এই যে, ওই খেলার ইংরেজি বোর্ডে সাপের মুখে পড়লে নীচে তার লেজে নেমে আসতে হয়, আর মই ধরতে পারলে ওপরে উঠে যাওয়া। কখন কোথায় পড়তে হবে তা পুরোপুরিই ভাগ্যের হাতে। ভারতীয় বোর্ডগুলো কিন্তু তেমন সাদামাটা নয়। এখানে সাপের মুখে বিশদ করে লেখা থাকে কিছু অন্যায় বা খারাপ কাজের উদাহরণ (যেমন : চুরি, অপহরণ ইত্যাদি), আর মই বা সিঁড়ির গোড়ায় লেখা থাকে কোনো গুণের বর্ণনা (যেমন : দয়া, অন্নদান ইত্যাদি)। বার্তাটি পরিষ্কার—গুণের পুরস্কারে তুমি উচ্চমার্গে আরোহণ করবে, আর দোষ বা অন্যায়ের প্রতিফলস্বরূপ তোমার পতন হবে। খেলার শেষ ধাপে পৌঁছতে পারলে নির্বাণ অর্থাৎ তুমি মুক্ত। ভারতীয় এই খেলায় বিনোদনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের গতিপথ ও পথপার্শ্বস্থ সুবিধা বা অসুবিধা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যেতে থাকে। খেলতে খেলতে তুমি একটা চিরন্তন সত্য বুঝে যাও যে, কেবলমাত্র ভাগ্যই নয়, তোমার জীবন নির্ধারিত হবে তোমার কৃতকর্মের দ্বারাও।

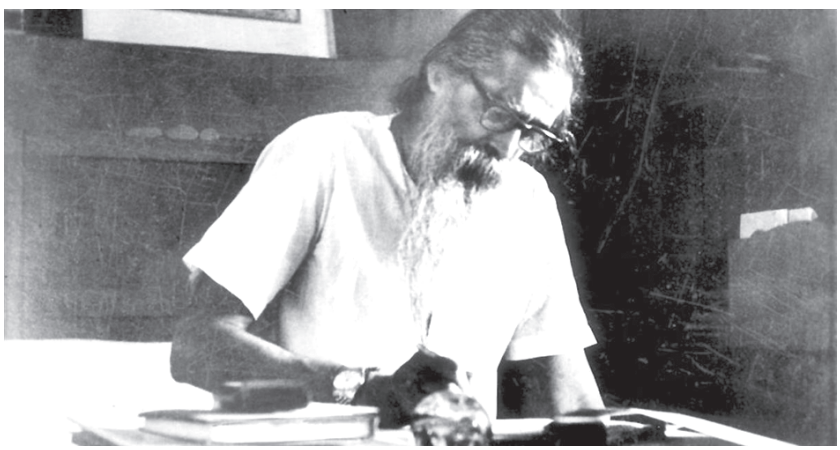

শ্রীগুরুজী

আধুনিক গতিময় জীবনে হিন্দুত্বের প্রাসঙ্গিকতা

আধুনিক জগতে কোনো দর্শনই একটি পরিসরে আবদ্ধ থাকতে পারে না। তাই হিন্দুত্বও শুধুমাত্র ভারতেই সীমাবদ্ধ নয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুত্বও অগ্রসরমান। প্রশ্ন হচ্ছে, হিন্দুত্ব কি আধুনিক জগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে? যদি না পারে, তবে সে কালের নিয়মেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তবে আমি নিশ্চিত, এরকম কিছু ঘটবে না, কেননা ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করছে।

ক) মানবাধিকার বিষয়টা ধরা যাক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে, ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮ সাল। জাতিসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশন মানবাধিকারের বিষয়ে একটা ঘোষণাপত্র প্রকাশ করল। সেটা মানবজাতির ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দলিল বলে গণ্য করা হয়। এর ১৪ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে— 'নিপীড়ন থেকে সুরক্ষা এবং সেই উদ্দেশে যে কোনো রাষ্ট্রে আশ্রয় নেওয়া মানুষের অধিকার।' এবার ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা কী দেখি? ৬৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ইহুদিরা রোমানদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে কোথায় আশ্রয় পেয়েছিল?

৪র্থ শতাব্দীতে ক্যানিনীয় খ্রিস্টানদের কে সুরক্ষার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল? ৮ম শতাব্দীতে মুসলমানদের হাতে অত্যাচারিত পারসিদের কে রক্ষা করেছিল? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমাদের সবার জানা। তখন কোথায় ছিল ১৯৪৮ সালের মানবাধিকারের ওই মহামূল্যবান দলিল? মানবাধিকারের অনুভব হিন্দুত্বের অন্তরে বহুকাল আগে থেকেই ফল্গুধারার মতো প্রবহমান ছিল, যার ফলে মহানারায়ায়ণোপনিষদে লেখা হয়েছিল---'यत्र विश्वं भवत्येकनीडं'

এর অর্থ হচ্ছে, এই ধরিত্রী একটি বৃহৎ নীড়, যাতে সমস্ত প্রাণী একসঙ্গে থাকতে পারে। এই মহৎ চিন্তাধারা হিন্দুত্বের অবদান এবং হিন্দুত্বের প্রয়োগ। হিন্দুত্বের চোখে এই পৃথিবী বৈশ্বিক গ্রাম নয়, এক বৈশ্বিক পরিবার। 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' হচ্ছে ঐ বৈশ্বিক পরিবারের ঘোষণা, বসুধৈব গ্রামকম্ নয়; বৈশ্বিক গ্রাম শুধু একটি ভৌগোলিক ধারণা মাত্র। গ্রামের ধারণা আসে ভূগোল থেকে, কিন্তু পরিবারের অনুভব আসে হৃদয় থেকে।

খ) পরিবেশ বিষয়েও ওপরের কথাগুলো সত্যি। 'প্রকৃতি মানুষের উপভোগের জন্য' এই আত্মসর্বস্ব ভোগবাদী জীবনযাত্রার বিষময় ফল দেখে সন্ত্রস্ত পশ্চিমের দেশগুলো আজ 'পরিবেশ-বান্ধব' 'পরিবেশ-বান্ধব' বলে চিৎকার করছে। হিন্দুত্ব প্রকৃতির সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্কে সহাবস্থান করে। দার্শনিক কবি ভর্তৃহরি প্রকৃতির পাঁচটি অঙ্গকে পারিবারিক সম্পর্কে বন্দনা করেছেন:

माता मेदिनि तात मारुत, सखे तेजः सुबन्धोजल।
भ्रातर्व्योम निबद्ध एव भवतामन्त्यः प्रणामांजलिः।।
(वैराग्यशतक – १००)

এর অর্থ হচ্ছে— 'হে মাতা মেদিনী, পিতা মরুৎ, সখা অগ্নি, কুটুম্ব জল এবং ভ্রাতা আকাশ— তোমাদের সকলকে প্রণাম। তোমাদের সৎসঙ্গের ফলেই আমার সমস্ত সাফল্য।'

সংক্ষেপে বলতে গেলে, আধুনিক জগতে হিন্দুত্ব অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গতিশীল; নিজ ভারে চলৎশক্তিহীন বা গোঁড়ামিতে আবদ্ধ নয়। তার নিজস্ব গুণই এই যে, সে সর্বদা নতুন চিন্তাধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, যা বহুবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে। হিন্দুত্বের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনো বিরোধ নেই। ভৌতিক বা আধ্যাত্মিক কোনো স্তরেই সে কখনো সত্যের অন্বেষণে বাধা সৃষ্টি করেনি। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ভিত্তিক নতুন অভিজ্ঞতা সর্বদাই এতে গৃহীত হয়েছে। আদি শঙ্করাচার্য তো বলেই ছিলেন, 'শত উপনিষদ যদি বলে আগুন আসলে ঠাণ্ডা এবং তাতে আলো নেই, তবে আমি ওইসব শাস্ত্র ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার করে সত্য জেনে নেবো।' অন্যের অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞান নয়, সর্বদা নিজস্ব অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেওয়া জ্ঞানের অগ্রাধিকারই দেওয়া হয়েছে এতে। কোনো সময়ে এমনটি ভাবা হয়নি যে, সর্বজ্ঞানের চূড়ান্ত আধার হিন্দুত্ব এবং নতুন কিছুই এতে যোগ করার নেই। বরং আমরা মনে করি যে, মানবপ্রজ্ঞা বিরামহীন একটি প্রক্রিয়া; আকাশে উড্ডীন পাখীর বা জলে সন্তরণরত মাছের যেমন কোনো বন্ধন নেই, তেমনই এরও কোনো প্রতিবন্ধক নেই, নেই কোনো পুনরাবৃত্তি বা পরিসমাপ্তি।

(शकुनीनामिवाकाशे, मत्स्यानामिव सागरे, यथा पदं न दृश्येत तथा वेदविदां गतिः)

এর ফলে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী হিন্দুত্বের দাবিদার নয়; সত্যের অন্বেষণে নিয়োজিত যে কোনো মানুষই একে নিজের বলে গ্রহণ করতে পারে। হিন্দুত্বের একটি মৌলিক তত্ত্ব এই যে, মানবজাতি যতদিন থাকবে, ততদিন এর বহুধা রূপ, প্রকরণ, প্রকৃতি ইত্যাদির বিবর্তন হতেই থাকবে, কেননা তা হিন্দুত্ব সদা গতিশীল ঃ 'চরৈবেতি, চরৈবেতি'।

সমাজ হচ্ছে কৃষ্টির প্রেরণা এবং পাথেয়। তাই সমাজের কাছে জরুরি কাজ হচ্ছে প্রতিকূল সমস্ত পিছুটান থেকে মুক্ত হয়ে তার নিজস্ব ভবিতব্য পূর্ণ করার কাজে নিজেকে নিয়োগ করা, যে কাজের আয়ুধ হচ্ছে হিন্দুত্বের পূর্ণ উপলব্ধি।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক।
অনুবাদক - ডা:উচ্ছল কুমার ভদ্র, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ)

কালজয়ী বিদ্যাসাগর

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

এবছর থেকে শুরু হয়েছে বাঙ্গালির অহংকার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত-জন্মোৎসব। তারই প্রাক্কালে এই প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্বের উদ্দেশে আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

কলেজের ছেলেরা রীতিমতো উত্তেজিত। আজ একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। রোজ এসব চলতে পারে না। ঝোলায় ভরে, পকেটে করে ইটপাটকেল নিয়ে আসছে তারা। জমা করছে সংস্কৃত কলেজের ছাদের বিভিন্ন কোনায়। হিন্দু স্কুলের ছেলেদের এ বার আর ছেড়ে দেওয়া যাবে না। সংস্কৃত কলেজের গা ঘেঁষে একমাত্র ওদেরই বাড়ি। আর স্কুলে যেতে গেলে ঢুকতে হবে সংস্কৃত কলেজের গেট দিয়েই। এবার যাবি কোথায় বাছাধন! কথা নেই বার্তা নেই কলেজের দাদাদের অপমান! যা মুখে আসে ছোঁড়াগুলো তাই বলছে। কীসের এত গুমর?

দেখতে দেখতে লেগে গেল যুদ্ধ। ছাদের পাঁচিলের বিভিন্ন পয়েন্টে পজিশন নিয়েছিল সংস্কৃত কলেজের ছেলেরা। হিন্দু স্কুলের ছাত্ররা গেট পেরিয়ে কলেজ চত্বরে ঢুকতেই উড়ে আসতে লাগল ক্ষেপণাস্ত্র। ছোট বড় মাঝারি নানা মাপের ইটপাটকেল। নিশানা একেবারে মোক্ষম। কারও গায়ে লাগছে, কারও হাতে লাগছে, কারও বা সোজা মাথায়। ছেলেরা ছুটে পালাচ্ছে, কেউ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ছে, কেউ আবার ঢিলগুলো কুড়িয়ে নিয়ে প্রাণপণে ছুঁড়ছে তিনতলায় ছাদের দিকে।

কলেজের স্যারেরা অনেকক্ষণ ঢুকে গেছেন টিচার্স রুমে। প্রিন্সিপাল বিদ্যাসাগর মশাই কলেজে এসেছেন তারও আগে। সুতরাং স্যারেদের আহত হবার আশঙ্কা নেই। মনের সুখে জমিয়ে রাখা ইটপাটকেলের সদ্ব্যবহার করতে লাগল সংস্কৃত কলেজের ছেলেরা। মারামারি চলতে লাগল পুরোদমে।

বিদ্যাসাগর মশাই নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। এসে দাঁড়ালেন দরজা ঘেঁষে। সামনে লম্বা বারান্দা, সারি সারি থাম আর রোদবৃষ্টি ঠেকানোর ঝরোখা। ওপরে ছাদ থেকে ইটবৃষ্টি হচ্ছে। নিচ থেকে জবাব আসছে দুটো-চারটে। সঙ্গে চিৎকার আর গালাগালি। বিদ্যাসাগর মশাই একবার ওপরে তাকাচ্ছেন। একবার নিচে উঁকি মেরে দেখছেন। ইতিমধ্যে দেওয়াল ঘেঁষে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের ঘরের পাশে এসে জড়ো হয়েছেন অন্য শিক্ষকরা। সকলেই উদ্বিগ্ন—এই মারামারি যে কতদূর গড়াবে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কমার তো কোনও লক্ষণই নেই! শুধু প্রিন্সিপাল সাহেবের ভাবান্তর নেই। তিনি কেবল লক্ষ্য রাখছেন দু-দল ছাত্রের মধ্যে কারা জেতে, কারা হারে।

এমন মারামারি প্রায়ই বাঁধত সেকালের সংস্কৃত কলেজে। অবস্থা এক একদিন এমন গুরুতর হত যে বাধ্য হয়ে পুলিশ ডেকে আনতে হত। পুলিশ এসে লাঠি উঁচিয়ে নিয়ন্ত্রণে না আনলে মাথা বাঁচিয়ে বাড়ি ফিরতেই পারত না সাতে-পাঁচে না থাকা নির্বিরোধী ছাত্রের দল।

২

বিদ্যাসাগর মশাই যখন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল, সেই সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ বা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন ছিল না। এখন যেখানে কলেজ স্ট্রিট কফিহাউস, সেই অ্যালবার্ট হলের দোতলায় বসত প্রেসিডেন্সির ক্লাস। নীচের তলায় দু-তিনটে ঘরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসতেন অধ্যাপকরা। বিদ্যাচর্চার স্থানাভাব এত বেশি ছিল যে, শোনা যায় পরপর বেশ কয়েক বছর গড়ের মাঠে তাঁবু খাটিয়ে ছাত্রদের এন্ট্রান্স পরীক্ষা নিতে হয়। পড়াশোনার উপযুক্ত ভবন বলতে তখন ছিল শুধু সংস্কৃত কলেজ বিল্ডিং। আর তার গা-ঘেঁষা হিন্দু স্কুল। তবে সেকালের কলকাতা শহরে জ্ঞানচর্চার সঙ্গে জড়িত মানুষের কোনও অভাব ছিল না। বিদ্যাসাগর তো ছিলেনই। তাঁর পাশাপাশি ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ— এমন আরও অনেকে। সেকালের নির্মীয়মাণ বাংলা সাহিত্যে এঁরা সকলেই ছিলেন দিকপাল বলে গণ্য হবার যোগ্য। কিন্তু কী এমন ঘটল যাতে এতজন প্রতিভাবান বাঙ্গালি বহু যোজন পিছনে পড়ে রইলেন। আর একার দাপটে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন খেটো ধুতি আর ফতুয়া পরা খর্বাকৃতি একটি মানুষ, যাঁর নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর? কী ছিল এই জেদি একগুঁয়ে ব্রাহ্মণপুত্রের মধ্যে, যা অন্য কারোর মধ্যে ছিল না? কোথায় তাঁর অনন্যতা যার জোরে তিনি এভাবে আলাদা হয়ে উঠেছিলেন জ্ঞানচর্চা আর সমাজ সংস্কারের সেই জটিল সময়ে?

বিদ্যাসাগরের যে ভাবমূর্তিটি প্রায় দুশো বছর পরেও বাঙ্গালির চিন্তায় চেতনায় একই রকমভাবে বাসা বেঁধে আছে— সেটা তাঁর দ্বৈত রূপ। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর ভাষায়, একদিকে ভয়ানক কঠোর বীর্যের একটি মূর্তি, বিরাট এবং সুদৃঢ়; অন্যদিকে বেদনার অশ্রুব্যাকুল মন্দাকিনী।

আর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যেমন দেখেছেন— ''এই দেশে এই জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মতো একটা কঠোর কঙ্কালবিশিষ্ট মানুষের কীরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। সেই উগ্র পুরুষকার.. সেই উন্নত মস্তক.. সেই উগ্র বেগবতী ইচ্ছা, যাহা সর্ববিধ কপটাচার হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিল, তাহার বঙ্গদেশে আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে সন্দেহ নাই।''

সেই উগ্র পুরুষকার এবং উন্নত মস্তকের অধিকারী মানুষটি যখন শহরের এক বিখ্যাত কলেজের অধ্যক্ষ, তখন সেই ভূমিকাতেও তিনি যে অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে উঠবেন — এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর ছিলেন ভয়ানক গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। তাঁর মনের গভীরে কৌতুক, রসিকতা আর সহানুভূতির যে টলটলে দিঘি ছিল, যার প্রমাণ জীবনভর বারেবারেই পাওয়া গেছে, কলেজ কম্পাউন্ডে পা দেওয়ামাত্র সেই স্নিগ্ধ উজ্জ্বল পরিচয়টিকে তিনি চৌকাঠের বাইরে রেখে আসতেন। বদলে পরে নিতেন ভয় ধরানো গাম্ভীর্যের এমন এক বর্ম যে, তাঁর দিকে তাকানো মাত্র ছাত্রদের বুক শুকিয়ে যেত। আটপৌরে পোশাক পরা খর্বাকৃতি মানুষটি কোনও বেচাল সহ্য করবেন না—এটা বুঝতে খুব বেশি বুদ্ধির দরকার হতো না। তাঁর বলিষ্ঠ হাঁটাচলা, থমথমে মুখ আর কড়া শাসকের দেহভঙ্গি কাজ করত প্রায় ম্যাজিকের মতো। দুটো পিরিয়ডের মাঝখানে, অধ্যাপক বা পণ্ডিত মশাইরা যখন ক্লাসে নেই, ছাত্ররা স্বভাববশেই একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করায় কলেজজুড়ে একটা গোলমাল ছড়িয়ে পড়ত। বিরক্ত বিদ্যাসাগর বারান্দায় বেরিয়ে

চিৎকার করে বলে উঠতেন 'আস্তে'।

ব্যস, মুহূর্তে পুরো কলেজ নিস্তব্ধ।

৩

যদি তাঁর কানে যেত ক্লাসের দুটো ছেলে পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া-মারামারি করছে, দুজনকেই ডেকে পাঠিয়ে সতর্ক করে দিতেন বিদ্যাসাগর। এতেও কাজ না হলে ফের দুজনকে ডেকে বহিষ্কারের কাগজ ধরিয়ে দিতেন। প্রশাসন চালাতে বিন্দুমাত্র দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিতেন না তিনি। প্রশাসক হিসাবে এতটাই কঠোর আর নিরপেক্ষ ছিলেন যে, সহপাঠীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের দায়ে নিজের ছেলেকেও কলেজ থেকে তাড়িয়ে দিতে দ্বিধা করেননি। সংস্কৃত কলেজেরই এক অধ্যাপক নাকি বলেছিলেন, বিদ্যাসাগর আমার ছাত্র ছিল ঠিকই, কিন্তু ওকে আমার বড় ভয়। কথা বলতে সুবিধে লাগে না। কে জানে বাবা কখন ধমকে ওঠে!

পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক। দেখতে ভারী সুন্দর, তার ওপর সুরসিক। রঘুবংশম্ পড়ানো শেষ হলে তিনি নিজে থেকেই ছেলেদের মেঘদূত পড়ানো শুরু করলেন।

মেঘদূত পড়ানোর গুণেই কিনা কে জানে, ওই সময়ে এক কাণ্ড ঘটল। সংস্কৃত কলেজের উত্তরদিকে এক গৃহস্থ বাড়ির কর্তা একদিন সটান এসে দেখা করলেন বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সঙ্গে। বললেন, স্যার, বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি, যদি কিছু ব্যবস্থা করেন।

বিদ্যাসাগর বললেন, কী হয়েছে বলুন।

— স্যার, আপনার কলেজের ছাত্রদের জন্য আমার বাড়ির মেয়েদের ছাদে ওঠা বন্ধ হয়ে গেছে।

— সে কি, কেন?

— কী আর বলব, আপনার কলেজের ছাত্ররা সারাক্ষণ হাঁ করে বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে, কখন মেয়েরা ছাদে গেল, কখন ছাদ থেকে নামল। বলুন তো কী লজ্জার কথা!

— হুম্। এ তো ভারী অন্যায়। ঠিক আছে, আপনি যান, আমি দেখছি।

৪

ভদ্রলোক চলে যাবার পর ঘুরতে ঘুরতে টিচার্স রুমে এলেন বিদ্যাসাগর। পণ্ডিত মদনমোহন চেয়ারে বসে আছেন। বিদ্যাসাগর তাঁকে ডেকে বললেন, উত্তরদিকে দোতলার ক্লাসরুমেই তো তুমি পড়াও। ওদিকের বাড়ির ভদ্রলোক এসেছিলেন। অভিযোগ করে গেলেন ছেলেরা নাকি হাঁ করে ওঁর বাড়ির মেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকে। তুমি ছেলেদের বারণ করে দিও ওদিকে যেন না তাকায়।

মদনমোহন হেসে বললেন, দেখো বিদ্যাসাগর, বসন্তকাল পড়েছে। ছেলেরা ক্লাসে মেঘদূত পড়ছে। আর তাদের পড়াচ্ছেন কে? না স্বয়ং মদন। মন চঞ্চল না হয়ে উপায় আছে? হো-হো করে হেসে বিদ্যাসাগর বললেন, সত্যি মদন, তোমায় নিয়ে আর পারা যায় না।

হাসতে হাসতে সেদিন ফিরে গেলেন বটে, কিন্তু বিষয়টা মাথায় রেখে দিলেন। ক'দিন পরে ছুতোর মিস্ত্রি ডেকে ওদিকের জানলার খড়খড়িগুলো স্ক্রু দিয়ে এমনভাবে সেঁটে দিলেন যে ছেলেরা হাজার চেষ্টাতেও আর খুলতে পারেনি।

এমনই ছিলেন প্রশাসক বিদ্যাসাগর। আগে ডিসিপ্লিন। পরে অন্য সবকিছু।

(দুই)

শিক্ষাজগতে বিপুলভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে নিজেকে কীভাবে তৈরি করেছিলেন এই একগুঁয়ে, খর্বাকৃতি ব্রাহ্মণ? সেই কাহিনিও চমকপ্রদ। ১৮৪১ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে দারুণ রেজাল্ট নিয়ে পাশ করে বিদ্যাসাগর উপাধি পেলেন ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পরেই ডাক এল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে। পদটি কলেজের প্রধান পণ্ডিতের। ওই কলেজের ছাত্ররা বেশিরভাগই সিভিলিয়ন। তাঁদের পড়াতে হবে ইংরেজিতে, বোঝাতে হবে ইংরেজিতে। অবসর সময়ে বাড়িতে বসে নিজে নিজেই ইংরেজি শিখতে লাগলেন বিদ্যাসাগর। ক্ষুরধার মস্তিষ্ক তাঁর, অধ্যবসায়ও অসীম। অল্পদিনেই বলা ও লেখায় এতটা পারদর্শী হয়ে উঠলেন যে, বন্ধুবান্ধব-সতীর্থদের কাছে রীতিমতো ঈর্ষার ব্যাপার। এর কিছুকাল পরে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের দুরন্ত অধিকারের কথা শুনে প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছুটিছাটায় তাঁর কাছে সংস্কৃত পড়তে চলে আসতেন। রাজকৃষ্ণবাবু বয়স্ক লোক। তাঁকে পড়াতে গিয়ে বিদ্যাসাগর অনুভব করলেন, তাঁরা নিজেরা যে পদ্ধতিতে

সংস্কৃত শিখেছেন — সে পদ্ধতি এখানে চলবে না। অনর্থক বহু সময় চলে যাবে। ভেবেচিন্তে নতুন এক পদ্ধতি বার করলেন তরুণ বিদ্যাসাগর। পরবর্তীকালে তার ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছিল সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা বা ব্যাকরণ কৌমুদীর মতো বই। যুগযুগ ধরে সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের কাছে যা অবশ্যপাঠ্য হয়ে আছে।

৫

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হওয়ার পর নিছক প্রশাসকের ভূমিকায় নিজেকে বেঁধে রাখতে চাননি বিদ্যাসাগর। প্রবল উৎসাহে নেমে পড়েছেন সংস্কারের কাজে।

প্রথম কাজ, প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ এবং পুঁথির রক্ষণাবেক্ষণ ও মুদ্রণ।

দ্বিতীয়, এতদিন ধরে সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ আর বৈদ্য ছাড়া অন্য কোনও বংশের ছাত্রদের প্রবেশাধিকার ছিল না। বিদ্যাসাগর এসে সংকীর্ণ ভেদাভেদ প্রথা তুলে দিয়ে মেধাকেই ভর্তির একমাত্র মাপকাঠি ঘোষণা করলেন। এতে সমালোচনা হয়েছিল বিস্তর। কিন্তু কোনোকিছুই তিনি গায়ে মাখেননি।

তৃতীয়, এর আগে কলেজে ভর্তি হলে সারা বছর কোনও টাকাপয়সা লাগত না ছাত্রদের। উল্টে তারাই কিছু কিছু করে টাকা পেত। বিদ্যাসাগর এসে এই রীতিটাই তুলে দিলেন। ঘোষণা করলেন, এবার থেকে কলেজে পড়তে গেলে টাকা লাগবে। সোজা কথায়, টিউশন ফি দিতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার যে অন্যরকম একটা সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে, পড়ুয়ার অভিভাবকদের সেটা বোঝানো দরকার, ভেবেছিলেন অধ্যক্ষ। বলাবাহুল্য, ঠিকই ভেবেছিলেন।

চতুর্থ, ছাত্রদের সংস্কৃত শিক্ষার ভিত মজবুত করতে, ব্যাকরণের জ্ঞান আরও নিখুঁত করে তুলতে নিজেই নেমে পড়লেন বই লেখায়। তৈরি হল উপক্রমণিকা, ঋজুপাঠের মতো বই।

পঞ্চম, দারুণ গ্রীষ্মের দিনগুলোয় কলেজ ছুটি দিয়ে বাড়িতেই ছেলেদের পড়াশোনা করার রীতি চালু করলেন বিদ্যাসাগর। অহেতুক শরীরকে কষ্ট না দিয়ে বাড়িতে বসে নিজেদের তৈরি করার এই যে রীতি তিনি চালু করেন, আজ দেড়শো বছরের বেশি সময় বাংলার শিক্ষাজগতে তা চালু রয়েছে।

ষষ্ঠ, শিক্ষা মানে যে কূপমণ্ডুকতার গণ্ডি ছেড়ে নিজের মনকে জগতের আরও অনেক কিছুর মধ্যে প্রসারিত করে দেওয়া— সে কথা বোঝাতে সংস্কৃতের পাশাপাশি কলেজে প্রচলন করলেন ইংরেজি শিক্ষার।

কথাগুলো লিখে ফেলা যত সহজ, কার্যক্ষেত্রে কিন্তু মোটেও তত সহজ ছিল না। বিদ্যাসাগরকে এই সময়ে দেখা যাচ্ছে, একদিকে তিনি নির্ভীক প্রশাসক, অন্যদিকে ছাত্রদরদি শিক্ষা-সংস্কারক। ছাত্ররা যে শিখতে এসেছে, জানতে এসেছে, তারা পড়বে কী? ঠিকমতো বই-ই তো নেই। সারাদিন কলেজ করে বাড়ি ফিরে বই লেখা শুরু করলেন বিদ্যাসাগর। ক্লান্তি নেই, বিশ্রামও নেই কোনও। একে একে প্রকাশিত হল বেতাল পঞ্চবিংশতি, বাঙ্গালার ইতিহাস, জীবনচরিত, বোধোদয়, উপক্রমণিকা, শকুন্তলা, সীতার বনবাস। লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল বিদ্যাসাগরের নাম। বাংলার সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতির সেই আলো-আঁধারি সময়ে একার চেষ্টায় গোটা জাতিকে যেভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন বিদ্যাসাগর, এদেশে তো বটেই, বিদেশেও তার তুলনা মেলা ভার।

৬

যেখানে দরকার, গাম্ভীর্যের থমথমে মুখোশটা সেখানে পরে থাকলেও ভিতরে ভিতরে তিনি যে কতখানি রসিক ছিলেন, তার অজস্র কাহিনি ছড়িয়ে আছে বাংলার ঘরে ঘরে। আমরা এখানে শুধু একটা নমুনা রাখছি, যে কাহিনি তুলনায় কম প্রচলিত।

তখন বিধবা বিবাহ নিয়ে সমাজে তোলপাড় চলছে। উঠতে-বসতে বিদ্যাসাগরকে গালাগালি করছে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ। আর আপামর সাধারণের চোখে তিনি ততদিনে দেবতা। এমনই একদিন জরুরি কাজ সেরে বিদ্যাসাগর হাজির হয়েছেন পাণ্ডুয়া স্টেশনে। কিন্তু কপাল মন্দ, একটু আগেই বেরিয়ে গেছে ট্রেন। তখনকার দিনে আজকের মতো এত ঘনঘন ট্রেন পাওয়া যেত না। একটা মিস করলে ঠায় বসে থাকতে হত তিন-চার ঘণ্টা। কী আর করেন, স্টেশন থেকে বেরিয়ে বিদ্যাসাগর এদিক-ওদিক দেখতে লাগলেন যদি কোথাও একটু বসার জায়গা মেলে। স্টেশনের বাইরে এক মুদির দোকান। তিনি এসে বসতে চাইতেই দোকানি খাতির করে টুল এনে দিল। তামাক খান জেনে তাড়াতাড়ি তামাকও সেজে আনল। একটু পরে দোকানে হাজির হলেন মুদির পরিচিত এক ব্রাহ্মণ। মুদি তাকেও বলল, আসেন দাদাঠাকুর, টুলে বসে একটু জিরিয়ে নিন। দুজনে পাশাপাশি বসে তামাক খাচ্ছেন, টুকটাক কথাবার্তা চলছে মুদির সঙ্গে। মুদি হঠাৎ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা দা'ঠাকুর, এই যে শুনছি আজকাল রাঁড়ের (তখনকার দিনে বিধবাকে রাঁড় বলা হতো) বিয়ে হচ্ছে, ব্যাপারখানা কী? ব্রাহ্মণ শুনেই একেবারে গরম। মুখে যা এল তাই বলে গালাগালি করতে লাগলেন। 'ছ্যা ছ্যা, ভদ্দরলোকের মেয়ের দু'বার বিয়ে হয়? এ কী অনাছিষ্টি বলতো দিকিনি।

মুদি বলল, শুনেছি তিনি নাকি মস্ত পণ্ডিত। রাঁড়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন? আরও রেগে গেলেন ব্রাহ্মণ। বললেন, কার কথা বলছ? বিদ্যেসাগর? সে ব্যাটা আবার পণ্ডিত হলো কবে? টাকা খাইয়ে, গোটা কতক ফিরিঙ্গিকে হাত করে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বলে-ক'য়ে বিধবা বিবাহের আইন পাশ করিয়েছে।

সে ব্যাটা যদি পণ্ডিত হয়, তবে মুর্খ কে? মুদি নাছোড়বান্দা। বললে, দা'ঠাকুর, আমি শুনেছি বিদ্যেসাগর নাকি বামুন পণ্ডিতের ছেলে, নিজেও বামুন পণ্ডিত—।

--- কী! বামুন পণ্ডিত? মাথায় টুপি জামা ইজের বুটজুতো পরে মুখে চুরুট গুঁজে ঘাড় বেঁকিয়ে হাঁটে। তাকে বামুন পণ্ডিত বলে নাকি?

বিদ্যাসাগর টুলে বসে এতক্ষণ সবই শুনছিলেন আর মনে মনে হাসছিলেন। এবার তিনি মুখ খুললেন।

—আচ্ছা, আপনি বিদ্যাসাগরকে দেখেছেন?

—দেখিনি? দু'বেলা আমার বাদুড়বাগানের বাসার সুমুখ দিয়ে যাতায়াত করে, তাকে দেখিনি? কলকাতায় ওই ব্যাটাকে কে না দেখেছে। ব্যাটা হিঁদু না ফিরিঙ্গি বোঝা যায় না। ইয়া লম্বা গোঁফ, চোখে চশমা।

৭

এরপর মুদির সেই দা'ঠাকুর যে ভাষায় বলতে শুরু করলেন, তাকে এক কথায় ইতর গালাগালি ছাড়া কিছুই বলা যায় না। সেই তোড় একটু স্তিমিত হলে বিদ্যাসাগর বললেনঞ্চ তা, মহাশয়ের নামটা জানতে পারি? থাকা হয় কোথায়? ব্রাহ্মণ নিজের নাম জানিয়ে জবাব দিলেন, পাণ্ডুয়ারই কাছাকাছি এক গ্রামে তাঁর নিবাস। এবার পাল্টা প্রশ্নঞ্চ তা আপনার নামটা কী?

—আজ্ঞে, অধমের নাম শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

—কী বললেন? বিদ্যাসাগর! দাদাঠাকুর একেবারে থ।

—আর নিবাস?

—আজ্ঞে বাদুড়বাগান।

—আপনি, আপনি কোন বিদ্যেসাগর?

বিদ্যাসাগর হেসে উত্তর দিলেন, যে বিদ্যাসাগর রাঁড়ের বিয়ের ব্যবস্থা করে, আমিই সেই বিদ্যাসাগর। তবে আপনি যে বিদ্যাসাগরের কথা বললেন, বুটজুতো পরে দিনরাত চুরুট খায়, লম্বা গোঁফ, আমি সেই বিদ্যাসাগর নই, সে বোধহয় আর কেউ হবে। আমি তো জীবনে কখনও বুটজুতো পরিনে, চুরুটও খাইনে, আর গোঁফ যে নেই তা তো দেখতেই পাচ্ছেন।

ব্রাহ্মণ কোনমতে সেখান থেকে উঠে একেবারে চোঁ চোঁ দৌড়।

—ও মশাই শুনে যান শুনে যান—ডাকছেন বিদ্যাসাগর।

ডাকটিকিট

আর কী কেউ দাঁড়ায়!

(তিন)

সবাই হয়তো জানে না, বিদ্যাসাগর মশাই একটু তোতলা ছিলেন। নিজের এই ত্রুটি এমনভাবে ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন যে, লোকে টেরই পেত না। তোৎলামি সারাতে গেলে আস্তে-আস্তে কথা বলা অভ্যাস করতে হয়। বিদ্যাসাগর জোরে কথা প্রায় বলতেনই না। ফলে বোঝাই যেত না তিনি তোতলা। সমস্যাটা নিয়ে বিদ্যাসাগর এত সচেতন ছিলেন যে, সংস্কৃত কলেজে এতদিন থেকেও পারতপক্ষে ক্লাস নেননি।

৮

পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন, একবার শোনা গেল বিদ্যাসাগর মশাই ক্লাস নেবেন, ছেলেদের উত্তরচরিত আর শকুন্তলা বই দু'টো পড়াবেন। বাস্তবে সে ক্লাস কোনদিনও হয়নি। যদিও সংস্কৃত কলেজের আগে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরি করার সময়ে সিভিলিয়ন ছাত্রদের ক্লাস তাঁকে নিতে হতো। পড়াতে হতো বিদ্যাসুন্দর কাব্য। এছাড়া 'পুরুষ পরীক্ষা' আর 'প্রবোধচন্দ্রিকা' নামে দুটি বই। পুরুষপরীক্ষা পড়াতে গিয়ে বিদ্যাসাগর বোধহয় হাড়ে চটে যেতেন। 'হিতোপদেশ' নামে একটি বাংলা বইও তখন পড়ানো হত, যার রচনারীতি অতি কদর্য।

ছাত্রদের জন্য কয়েকটা ভালো বই লেখার উৎসাহ ওই সময় থেকেই তাঁর মধ্যে দানা বাঁধতে থাকে। হিন্দিতে 'বেতাল পচ্চীসী' বলে একটা বই বিদ্যাসাগর দেখেছিলেন। লেখকের নাম, লাল্লু লাল। তখনই তাঁর মাথায় আসে ওই বইটি বাংলায় লেখার। বিদ্যাসাগর হিন্দি বইয়ের কঙ্কালটুকু মাত্র নিলেন। এরপর নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে প্রাণসঞ্চার করলেন তাতে। তবে অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, স্বাধীন পুনর্নির্মাণ একে বলা যাবে না, কারণ বিদ্যাসাগর হিন্দি 'বেতাল পচ্চীসী' থেকেই সরাসরি বাংলায় অনুবাদ করেন। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তিঞ্চ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রথম পণ্ডিত হিসেবে চাকরি করার সময়ে একজন হিন্দুস্থানি পণ্ডিত রেখে তিনি হিন্দি শিখেছিলেন। সেই ভাষাটি তাঁর কতটা আয়ত্তে এসেছে, বেতালের অনুবাদের মধ্যে দিয়ে সেটাই দেখতে চেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর।

এটা সত্যি, বেতাল পঞ্চবিংশতির প্রথম সংস্করণের বাংলায় যথেষ্ট জড়তা ছিল। বিদ্যাসাগর নিজেও তা বিলক্ষণ জানতেন। তাই দ্বিতীয় সংস্করণ থেকেই ধাপে ধাপে সেই জটিল গদ্য সাধারণ পাঠকের বোঝার মতো সহজ করে তুলতে থাকেন। অনেকখানি সফলও হন। এর চেয়েও বড় কথা, সেই প্রথম বাংলা গদ্যে—যাকে বলে সাহিত্যের সাধুভাষা—তার পরিচয় পাওয়া গেল। এ ভাষা সেকালের খটোমটো সংস্কৃত নয়, হুতোমি বা আলালি ভাষা নয়, এই ভাষায় এমন এক প্রসন্ন রস ছিল যে আপামর সাহিত্যপিপাসু বাঙ্গালি বেতাল পঞ্চবিংশতি পড়ে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। যেমন বেতাল পঞ্চবিংশতির উনিশতম উপাখ্যানঃ

''তথায় এক অতি মনোহর সরোবর ছিল। তিনি (রাজা রূপদত্ত) তাহার তীরে গিয়া দেখিলেন, কমল সকল প্রফুল্ল হইয়া আছে ; মধুকরেরা মধুপানে মত্ত হইয়া গুণগুণ রবে গান করিতেছে; হংস, সারস, চক্রবাক প্রভৃতি জলবিহঙ্গগণ তীরে ও নীরে বিহার করিতেছে; চারিদিকে কিশলয়ে ও কুসুমে সুশোভিত নানাবিধ পাদপসমূহ বসন্তলক্ষ্মীর সৌভাগ্য বিস্তার করিতেছে।.... রাজা নিতান্ত পরিশ্রান্ত ছিলেন; বৃক্ষমূলে অশ্ববন্ধন করিয়া তথায় উপবেশনপূর্বক শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন।''

৯

১৮৫৬ সাল, অর্থাৎ মহা বিদ্রোহের আগের বছর বিদ্যাসাগরের জীবনের সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। দিনের পর দিন তাঁর খ্যাতি আর প্রতিপত্তি তখন বেড়ে উঠছিল। শিক্ষাজগতের সাহেব কর্তারা বিদ্যাসাগরের পরামর্শ না নিয়ে এক পা-ও চলতে চাইতেন না। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ তো ছিলই। এর ওপর সাহেবরা তাঁর কাঁধে চাপালেন হুগলি, নদিয়া, বর্ধমান আর মেদিনীপুরের ইনস্পেক্টর পদ। পরিশ্রম চতুর্গুণ বাড়ল। কিন্তু কর্মযোগী বিদ্যাসাগর কোনোকিছুতেই বিচলিত হবার পাত্র নন। একদিকে বেথুন সাহেবের পরামর্শে চলছে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের আন্দোলন। অন্যদিকে বিধবা বিবাহ যে হিন্দুশাস্ত্র বিরোধী নয়, তা প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লেগেছেন তিনি। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ নিয়ে লেখা বইটি যখন বেরল, বাংলার রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে আগুন জ্বলে উঠল। ভ্রূক্ষেপ নেই বিদ্যাসাগরের। নিজের চেষ্টায় বিধবাদের বিয়ের আয়োজন করতে লাগলেন একের পর এক। পাশাপাশি ব্রিটিশ রাজপুরুষদের কাছে দরবার করে বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে আইন আনার চেষ্টা শুরু করলেন। কার সাধ্য তাঁকে থামায়?

কিন্তু দুর্ভাগ্য, চার জেলার ইন্সপেক্টর হিসাবে একের পর এক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়ার কিছুদিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের গোলমাল লেগে গেল। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর পদে তখন এসেছেন গর্ডন ইয়ং নামে এক সাহেব। মেয়েদের স্কুল গড়ার জন্য টাকা দিতে তিনি একেবারেই রাজি ছিলেন না। তাঁর ধারণা হয়েছিল, এ সব সরকারি অর্থের অকারণ অপব্যয়। বিদ্যাসাগর তাঁকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু সাহেব কোনও কথাতেই কান দিচ্ছিলেন না। বিব্রত বিদ্যাসাগর গেলেন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাছে। তাঁর হস্তক্ষেপে সে যাত্রা মুখরক্ষা হলো বটে, কিন্তু ডিরেক্টর বিষয়টাকে মোটেও ভালোভাবে নিলেন না। কথায় কথায় বিবাদ শুরু হলো। ডিরেক্টর সুযোগ পেলেই তাঁর প্রস্তাব বা সুপারিশ আটকে দিতে লাগলেন। ডিরেক্টরকে ডিঙিয়ে কতবার ওপরমহলে যাবেন বিদ্যাসাগর? সকলেই যে সাহেব! আর তিনি পরাধীন দেশের কৃষ্ণবর্ণ এক নাগরিক। এইভাবে বছর দুয়েক চলার পর বাধ্য হয়ে চাকরি ছাড়লেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। শুরু করলেন প্রকাশনা আর মুদ্রণের ব্যবসা। সেখানেও পিছিয়ে ছিলেন না। শোনা যায়, মৃত্যুর আগে ব্যবসায়ী বিদ্যাসাগরের বাৎসরিক রোজগার ছিল প্রায় তিরিশ হাজার টাকা। আজকের দিনে যার মূল্য অনেক।

সেকালের সাহেব-রাজপুরুষ মহলে কেন এত খাতির ছিল বিদ্যাসাগরের? জবাব একটাই। সাহেবরা বুঝতে দেরি করেননি ধুতি-চাদর পরা ছোটখাট চেহারার পণ্ডিতটি নিজের জন্য কিছু চাইতে আসেন না। আসেন মানুষের কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে। বিভিন্ন সমস্যায় বিদ্যাসাগরের পরামর্শ নেওয়ার জন্য সাহেবরাই তাঁকে ডেকে পাঠাতেন। এদিকে দিশি রাজা-মহারাজার দল চোগা-চাপকান পরে মাথায় পাগড়ি চড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন ঘরের বাইরে। তাঁদের ডাক আর আসত না।

১০

একদিন হ্যালিডে সাহেবকে সরাসরি প্রশ্নটা করেছিলেন বিদ্যাসাগর। আচ্ছা, আপনার ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখলাম, শহরের তাবড় তাবড় ধনী লোক বাইরে বসে আছেন। ওঁরা তো আমারই দেশবাসী। ওঁদের এত কষ্ট দেন কেন?

হ্যালিডে বাঁকা হেসে জবাব দিলেনঃ বলুন তো, ওরাই বা আমার কাছে কেন আসে? আমি তো ওদের ডেকে পাঠাই না। শুনে রাখুন, ওরা পাঁচদিন দেখা না পেলে ষষ্ঠদিন আবার আসবে। কারণ ওদের অনেক কিছু পাওয়ার আছে। কিন্তু আপনাকে পাঁচ মিনিট বসিয়ে রাখলে যদি একবার ফিরে যান, তাহলে তো ডাকলেও আর আসবেন না। এটাই তফাত।

সাহেব মহলে এই যে এত খাতির, তার সুযোগ কি কখনও তিনি নিতেন না? কিছু তো নিতেনই। অন্তত ইতিহাস সে কথাই বলছে। কারও কারও মতে, ক্ষমতার অলিন্দে এমন অবাধ প্রবেশাধিকার তো একদিনে হয়নি। স্বাভাবিক কারণেই বিদ্যাসাগর চাইতেন না তাঁকে টপকে কেউ সরাসরি সেখানে পৌঁছে যাক। এ

বোধহয় গুণী প্রভাবশালী মানুষদের একটা সাধারণ দুর্বলতা। বিদ্যাসাগরও ব্যতিক্রম ছিলেন না। শোনা যায়, সমকালীনদের মাথায় গার্জেনের মতো থাকতে চাইতেন বিদ্যাসাগর। কখনও কাউকে অল্প কিছু প্রশংসা করতেন। কাউকে আবার ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতেন। ভালই জানতেন, কেউ যদি কিছু লিখে থাকেন, বইটই বার করে থাকেন—বিদ্যাসাগরের সুপারিশ ছাড়া সে বই স্কুল-কলেজ বা শিক্ষিত সমাজে চালু হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।

যেমন শ্যামাচরণ সরকার। ইংরেজি সাহিত্যে দুর্ধর্ষ পণ্ডিত, লাতিন-গ্রিকও জানতেন ভালো মতন। সংস্কৃত কলেজে ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। শ্যামাচরণবাবু বাংলা ভাষায় একটি চমৎকার ব্যাকরণ বই লিখেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সে বই বিদ্যাসাগরের সমর্থন পেল না। দূর দূর, এসব কী লিখেছে শ্যামাচরণ— হাত উল্টে বলে দিলেন সংস্কৃত কলেজের মহা প্রভাবশালী প্রিন্সিপাল। এবং সে বইয়ের ভবিষ্যতের ওখানেই ইতি। বিদ্যাসাগরের একনিষ্ঠ ভক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যেরও আক্ষেপ, অত সুন্দর ব্যাকরণ লিখেছিলেন শ্যামাচরণবাবু। শুধু বিদ্যাসাগর মশাইয়ের আনুকূল্য না পাওয়ায় 'বাংলা সাহিত্য চিরদিনের জন্য তাঁহাকে হারাইল।'

রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় একটু অন্যরকম পদ্ধতিতে এনসাইক্লোপিডিয়া রচনা করেছিলেন। বাঁদিকের পৃষ্ঠায় কোনও ইংরেজি বই বা তার অংশবিশেষ। আর ডানদিকে কৃষ্ণমোহনের বাংলা অনুবাদ। কী কারণে জানা নেই বিদ্যাসাগর কৃষ্ণমোহনকে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। প্রসঙ্গ উঠলেই একে-ওকে বলতেন, লোকটার রকম দেখেছ? টুলো পণ্ডিতের মতো কথায় কথায় ভট্টির শ্লোক quote করে। ব্যস, এই মন্তব্যের পর কৃষ্ণমোহনের সাধের এনসাইক্লোপিডিয়ার দফারফা।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জি

১১

রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পর্কে বিদ্যাসাগর ব্যঙ্গ করে বলতেন, বুঝলে হে, লোকটা ইংরেজিতে ধনুর্ধর পণ্ডিত। এদিকে সাহেবদের কাছে বলে বেড়ায়ঃ আজ্ঞে ইংরেজি তো তেমন জানি না। যেটুকু জানি, সেটা সংস্কৃত। শুনে-টুনে সাহেবরা ভাবে—বাপরে! ইংরেজি এত ভালো জেনেও বলে কি না তেমন জানি না। না জানি সংস্কৃতে কিরকম পণ্ডিত! নাম না করে রাজেন্দ্রলাল সম্পর্কে এক সাহেবকে তিনি বলে এসেছিলেনঃ তোমরা না যেমন বুদ্ধিমান, তেমনই নির্বোধ। নইলে দেশের এত অকর্মণ্য লোকজন তোমাদের ঘাড়ে কাঁঠাল ভেঙে পশার জমায় কী করে?

বলাবাহুল্য, 'লেখক' রাজেন্দ্রলাল মিত্র এরপর শত চেষ্টাতেও আর দাঁড়াতে পারেননি।

(চার)

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালিদের যদি একটা তালিকা করা যায়, বিদ্যাসাগর কি সে তালিকায় আসবেন? নীরদ চৌধুরী এক কথায় বলে দিচ্ছেন—কিছুতেই না। অথচ বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব নিয়ে তাঁর কোনও সংশয় ছিল না। বিশেষ কয়েকটি বিষয়ে তিনি যে শ্রেষ্ঠ, এমন দাবিও নীরদবাবু মেনে নিয়েছেন। তাহলে তাঁর আপত্তিটা কোথায়? 'দি ইনটেলেকচুয়াল ইন ইন্ডিয়ার' লেখক নীরদ সি চৌধুরী যুক্তি সাজিয়েছেন এইরকমঃ ১। বিদ্যাসাগর কোনোদিন মহাকবি হননি। ২। তিনি কখনও উপন্যাস লেখেননি। ৩। কোনোদিন ধর্মপ্রচার করেননি। ৪। দেশের জন্য কখনও আত্মোৎসর্গ করেননি।

নীরদবাবুর যুক্তিতে সারবত্তা আছে, অস্বীকার করা যায় না। সে সব মেনেও বলা যায়, অসামান্য কিছু বিশিষ্টতা বিদ্যাসাগরের অবশ্যই ছিল যার জোরে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জন্মানো একজন বাঙ্গালি আজ দু'শো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও প্রাসঙ্গিক। সাহিত্য-শিল্পের সেই আলো-আঁধারি যুগে নতুন ধরনের বাংলা গদ্যভাষার সূচনা করেছিলেন বিদ্যাসাগর। যদিও এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধি তাঁর নয়, বরং বঙ্কিমচন্দ্রের। শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের স্মরণীয় অবদান, ছোটদের বর্ণমালা শেখানোর বইগুলো। বাংলা সাহিত্যসৃষ্টি বলতে হিসেব মতো দাঁড়াবে তিনটি বই—বেতাল পঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা আর সীতার বনবাস। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এদের কোনোটিই মৌলিক সাহিত্যসৃষ্টি নয়, অনুবাদমাত্র। ব্যাকরণ শেখানোর জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা নিঃসন্দেহে একটি চমৎকার বই। যুগে যুগে এই বইয়ের হাত ধরেই ছাত্র-ছাত্রীরা সংস্কৃত ভাষা ও

সাহিত্যের অন্দরমহলে পৌঁছে গেছেন। কিন্তু এই উপক্রমণিকাও কোনোভাবেই মৌলিক রচনা নয়—যা তাঁকে হাত ধরে মহাকালের সিংদরোজা পার করে দেবে।

তাহলে বাকি কী রইল, যার জোরে তিনি দেশবাসীর মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো স্থায়ী হয়ে থেকে গেলেন?

১২

জবাব সম্ভবত একটাই। বিদ্যাসাগর এমন এক বিরলতম বাঙ্গালি, যিনি ধুতি-চাদর গায়ে জীবন কাটিয়ে দিলেও যাঁকে আদৌ বাঙ্গালি বলা যায় কি না সে প্রশ্নটি এখনও অমীমাংসিত অবস্থায় পড়ে আছে। তাঁর চরিত্রের যেগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য, তার একটা উপাদানও বাঙ্গালি জাতির চরিত্রে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এতকাল পরেও নয়। ইউরোপীয় যুগপুরুষদের যে প্রধান তিনটি গুণ—আদর্শবাদ, কর্তব্যবোধ আর নীতিনিষ্ঠা— কীভাবে যেন এর প্রত্যেকটিই বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো ছিল। সঙ্গে ছিল অসামান্য মানসিক দৃঢ়তা। অর্থে, ভয়ে, প্রলোভনে কোনও কাজ থেকে পিছিয়ে আসা তাঁর ধাতুতেই ছিল না। বিধবা বিবাহ প্রচলনের সময়ে হিন্দুসমাজ থেকে যখন তাঁকে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হচ্ছে, তখনও নিজের বিশ্বাস আর কর্তব্যবোধ থেকে এক কদম পিছিয়ে আসেননি বিদ্যাসাগর। এমন চরিত্রবল বাঙালিদের মধ্যে কোথায়?

অনবরত ধাক্কা খেতে খেতে জীবনের শেষবেলায় মানুষ সম্পর্কেই তিনি খানিকটা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। মুখের ওপর যা-তা বলে দিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সম্পর্কে তাঁর ধারণা হয়েছিল, টাকার লোভে ওরা না পারে এমন কাজ নেই। আর সেকালের ইংরেজি শিক্ষিত বাঙ্গালি? এরা আরও ঘৃণ্য, চতুর, ডেঁপো এবং অসার। এদের সংস্পর্শে থাকার চেয়ে বরং 'অসভ্য' সাঁওতাল সমাজে দিন কাটানো ভালো। বৃদ্ধবয়সে সাঁওতাল পরগনার কর্মটাঁড়ে বাসা নিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। কলকাতায় প্রকাশনার ব্যবসা চালাতেন। বৌবাজারে বন্ধু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে যাতায়াত করতেন। ফাঁকে ফাঁকে যখনই সময় পেতেন, চলে আসতেন কর্মটাঁড়ে, সাঁওতালদের সান্নিধ্যে। তাদের সঙ্গে গল্প করতেন, মাদল শুনতেন। আশ্চর্য এক প্রশান্তিতে ভরে উঠত তিতিবিরক্ত মন। শেষপর্যন্ত কর্মটাঁড়ই হয়ে উঠল বিদ্যাসাগরের শেষবেলাকার প্রাণের আরাম, আত্মার শান্তি।।

ঋণ স্বীকার কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, বিপিনবিহারী গুপ্ত, প্রসাদ সেনগুপ্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ইন্দ্রমিত্র, বিদ্যাসাগর রচনাবলী, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, শ্যামাপ্রসাদ বসু

With Best Compliments from-

ANIL AHUJA

Ahujas Web Pvt. Ltd.

6/47, W. E. A, Karol Bag
New Delhi- 110005

হরিহরের পথ ও পাঁচালী

অচিন্ত্য বিশ্বাস

ইংরেজি ও ফরাসি অনুবাদে 'পথের পাঁচালী' অসম্পূর্ণ। 'অক্রূর সংবাদ' অংশটি পরিত্যক্ত হয়েছে।[১] রুশ ও জার্মান ভাষায় অনুবাদ হয়েছে কেবল 'আম আঁটির ভেঁপু' অংশ। 'বল্লালী বালাই' নেই— নেই 'অক্রূর সংবাদ'।[২] মার্কিন ও ইউরোপীয় মন 'পথের পাঁচালী'কে ঠিকমতো বুঝেছে কিনা ভাবা দরকার। আর্নেস্ট বেন্ডার লিখেছেন, এই উপন্যাস শিশুর চোখে দেখা ভারতীয় পল্লীজীবন।[৩] আমেরিকার 'চয়েস' পত্রিকা এখানে পেয়েছে ভারতীয় পল্লী জীবনের নিষ্ঠুর যন্ত্রণার নিরাবরণ বিবরণ।[৪] বস্তুত পশ্চিম পৃথিবী 'পথের পাঁচালী'র ভিতরের কথাটি বুঝতে পারেননি। পারার কথাও নয়। একই কথা আধুনিক মুদ্রিত মাধ্যমে প্রচলিত বাংলা সাহিত্যের দিকপাল গবেষক পণ্ডিতদের সম্পর্কেও। তারা জানেন না, দেশের প্রাচীন উপনিবেশপূর্ণ ভারতীয় জনসত্তার যাত্রাপথ, জানেন না, আমাদের সংস্কৃতির হাতে লেখা পথের পাঁচালী। 'ইউনেস্কো' না জানতে পারেন, কিন্তু লোকনাথ ভট্টাচার্যের সহধর্মিণী ফ্রান্স ভট্টাচার্য জানলেন না। জানলেন না 'সাহিত্য আকাদেমি'-র বিশেষজ্ঞরাও!

অবশ্য, এই স্ববিরোধ ও বিভ্রান্তির ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১২.৯.১৮৯৪ - ১.৯.১৯৫০)-ও কিছুটা দায়ী। 'স্মৃতির রেখা'য় যখন তিনি লেখেন, 'নভেলে... শৈশব কালের স্মৃতিরই পুনরাবৃত্তি করেছি মাত্র' কিংবা ১০.৯.১৯৪০-এ লেখা পত্রে স্ত্রী রমাদেবীকে লেখেন, ভাগলপুরের 'বড়বাসা'য় থাকাকালীন জন্মগ্রাম ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে 'মন খারাপ' থেকেই 'পথের পাঁচালী'র সৃষ্টি— তখন আর্নেস্ট বেন্ডারের বা শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীকে উত্তেজিত না করবে কেন! 'পথের পাঁচালী' উপহার দেবার সময় বিভূতিভূষণ স্বাক্ষর করেন 'অপু'। উপহারের প্রাপক ছিলেন সজনীকান্ত দাস (১৫.৮.১৯০০ - ১১.২.১৯৬২)। আবার 'তৃণাঙ্কুরে' বিভূতিভূষণই লিখেছেন তাঁর উপন্যাসটি নিছক আত্মজৈবনিক নয়— 'জীবনের সংযোগ' এখানে 'ভাসা ভাসা ধরনে'র। বস্তুত 'পথের পাঁচালী'-তেও আত্মজৈবনিক উপাদান কম নেই। আমরা সেই ক্ষেত্রে এই প্রবন্ধে বিস্তারে যাচ্ছি না। আমাদের লক্ষ্য পথ ও পাঁচালী।

পথ বলতে দেশ কাল পাত্রের মাত্রা। পথ দেশে দেশে ছড়িয়ে থাকে। কাল প্রবাহ খুবই জটিল। কিছুদিন আগে 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় (বৈশাখ ১৪২৫) একটি প্রবন্ধে ('নিমেষ ও মহাকাল') মুসলিম ও ব্রিটিশ শাসনপূর্ব ভারতীয় সময়-চেতনা নিয়ে বিস্তৃত তথ্য সমাবেশ করেছি। বিভূতিভূষণ এই কালচেতনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাঁর 'দেবযান' বা 'আরণ্যক' উপন্যাসে এর দুটি প্রসঙ্গ দেখা গেছে— 'ইছামতী' উপন্যাসে আছে এর আধ্যাত্মিক ভাষ্য। সাহিত্যকৃতিতে কালের মাত্রা বিচার মিখাইল মিখাইলোভিচ বাখতিন (১৬.১১.১৮৯৫ - ৭.৬.১৯৭৫) এবং নর্থপ ফ্রাই (১৯১২-১৯৯১) গভীরভাবে বিচার করেছেন। বাখতিন রুশী তাত্ত্বিক। ফ্রাই কানাডার অধ্যাপক। বাখতিন দেখিয়েছেন, টলেমির কাল চেতনা (Ptolemic) ছিল মধ্যযুগীয়— অন্যপক্ষে গ্যালিলিওর দৃষ্টিতে (to the Galilean view) হলো আধুনিকতার দিকে উন্মুখ।[৫] টলেমির ভাবনা ছিল পৃথিবী-কেন্দ্রিক। গ্যালিলিওর সময় ভাবনা সূর্যকেন্দ্রিক। বাখতিন দেখিয়েছেন, এই দুই ভাবনার মধ্য দিয়ে বিশ্ব-দৃষ্টির মৌলিক প্রভেদ ঘটে যায়। এভাবে গড়ে উঠেছে তাঁর 'কালক্রম চিহ্ন (Chronotope) -এর তত্ত্ব। তাঁর ভাষা থেকে উদ্ধৃত করি— 'Without such temporal spatial expression, even abstract thought is impossible. Consequently, every entry into sphere of meaning is accomplished only. Through the gates of chronotope'[৬]। এভাবে চলার পথ আর কাল মিশে যায়।

নর্থপ ফ্রাই ১৯৫৭ সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Anatomy of Criticism' -এ সময়কে ঋতুচক্র, দিন-রাত্রির সাময়িক চক্র; বর্ষচক্রের সঙ্গে মিশিয়ে নায়কের নায়িকার মনস্তত্ত্ব আর সাহিত্য সংরূপের সূক্ষ্ম বিচার করেছেন।[৭] এভাবে ফ্রাই দেখাতে থাকেন 1. 'yearly cycle of the season'; 2. 'the daily cycle of the sun'; 3. 'the nightly Cycle of dreaming and awakening'[৮]।

উপন্যাসে স্থান কালের সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত থাকে মুখ্য চরিত্রের (protagonist) যাত্রা। এভাবে দেখলে বলতেই হয় 'পথের পাঁচালী'কে আমরা এতদিন ধরে অপূর্ব রায় বা শ্রীমান অপুর যাত্রা বলে ধরে নিয়ে সামান্য ভুলই করেছি। পাশ্চাত্য সমালোচকরা একে দারিদ্র-লাঞ্ছিত পরিবারের উৎসন্ন হবার কাহিনি ভেবেছেন। কোনো কোনো অনুবাদক 'ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে সেকালের অবসান হইয়া গেল'[৯] —এই বাক্য থেকে ধরে নিলেন এপর্যন্ত অপুর ভূমিকা তো নগণ্য। অতএব এটুকু বাদ দেওয়া যাক। তাঁরা ধরে নিলেন, 'বল্লালী বালাই' বোঝানোর দরকার নেই— ও হলো ভারতীয় সমাজের একটি অননুবাদ্য অংশ। প্রত্যেক জাতি ও সমাজের কিছু চলন থাকে। তাতে মানুষ পীড়িত হয়— সেই পীড়ার মধ্যে মনুষ্যত্বের পরাভব, সম্পর্কের টানাপোড়েন থাকে। আমাদের সমাজে কৌলীন্যপ্রথা, বহুবিবাহ, সতীদাহপ্রথা (কিংবা ছিপছিপে বালিকা বধূটির সংসারহীন, একলা পরিতাজ্য হয়ে নিত্য পুড়ে মরা) ছিল। তা আড়াল করলে এই পথটি কি স্পষ্ট হয়? যে পথ চলে যায়, 'ঠাঙাড়ে বীরু রায়ের বটতলায়' থামে না— 'ধল চিতার খেয়াঘাটের সীমানায়' বাঁক নেয়— থামে না। 'দিন রাত্রি পার হয়ে, জন্ম মরণ পার হয়ে, মাস, বর্ষ, মন্বন্তর, মহাযুগ পার হয়ে'— এই পথ চলে যায়। চলেই যায়।

পদাতিক অপু। পথচারী তার পিতা হরিহরও। অপু দু'পাশ দেখে। হঠাৎ নজরে পড়ে পথপ্রান্তে কী যেন চলে গেল। হরিহরের মনে হয় যাত্রাশেষে কোথাও পৌঁছতে হবে। হঠাৎ উঁচু উঁচু কানের কী যেন চলে গেল, ফাঁকা মাঠে টেলিগ্রাফের খুঁটিতে কান দিয়ে দূর দেশের রহস্য রোমাঞ্চে তার আগ্রহ জন্মালে চলে না। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে এক বিচিত্র দ্বিরালাপ লক্ষিত হয়। কিছুতেই যেন স্থির হয় না উপন্যাসের আসল মুখ্য চরিত্র (protagonist) কে? বাংলা ভাষার নোট মুখস্থ করা ছাত্রছাত্রীরা বলবে— এটা অবান্তর প্রশ্ন। মুখ্য চরিত্র অবশ্যই অপু। তার বড় হওয়াই তো উপন্যাসের মর্মবস্তু। আমরা ভিন্ন মত পোষণ করছি। দুই খণ্ড 'অপরাজিত' আর চলচিত্রায়িত 'পথের পাঁচালী', 'অপুর সংসার' দেখে আমাদের মনে এই বিচিত্র ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে বটে। আমাদের মনে হয়েছে, অপুই এই কাহিনির মুখ্য। আমাদের বিহ্বল করে বিভূতিভূষণের বর্ণনার অপরূপতা। দেখাই :

১. 'অনেক দূরের কথায় তাহার শিশুমনে একটা বিস্ময় মাখানো আনন্দের ভাবের সৃষ্টি করিত।'[১১]

২. 'জীবন-পথের যে দিক মানুষের চোখের জলে, দীনতায়, মৃত্যুতে আশাহত, ব্যর্থতায় বেদনায় করুণ— পুরোনো বইখানার ছেঁড়া পাতায় ভরপুর গন্ধে, মায়ের মুখের মিষ্টি সুরে, রৌদ্রভরা দুপুরের মায়া-অঙ্গুলি নির্দেশে, তাহার শিশু দৃষ্টি অস্পষ্টভাবে সে পথের সন্ধান পাইত।'[১২]

অপুর এই বহুদূরের সংবাদ শুধু কল্পনা থেকে আসেনি। এর ভিত্তি আমাদের কথনরীতি, আর পুঁথিপত্রের মাধ্যমে যা কতকাংশে মৌখিক। দ্বিতীয় উল্লেখটিতে স্পষ্ট যে সর্বজয়া মুখে পান পুরে জীর্ণ মহাভারত শোনাচ্ছিল— অপু তো এভাবেই পাচ্ছিল তার দূর একটি আশ্চর্য উৎস পথের সন্ধান। উপন্যাস জুড়ে এই উৎসপথের ভালো মন্দ রহস্য রোমাঞ্চের রাজপথ আর অভিসন্ধির পরিচয়। আমরা

ভালো করে খেয়াল করলে ইন্দির ঠাকরুণের ছড়ায়, দুর্গার ব্রতগীতে, সর্বজয়ার মহাভারতপাঠে, গ্রাম্য যাত্রাগানের অদ্ভুত সংলাপ ও টিনের তরবারির বিষম যুদ্ধে এর পরিচয় পাবো। অপু যে মহাবীর কর্ণের ছবি দেখতে পায় সূর্যাস্তের দিকচক্রবালে তার প্রত্ন প্রতিমা ব্যাখ্যায় বিভূতিভূষণের সিদ্ধির চমৎকারটুকু দেখলে একে সবটা দেখা হয় কী? দেখাই,

বিভূতিভূষণ

বাখতিন

'কর্ণ যেন ওই অশ্বত্থ গাছটার ওপারে আকাশের তলে, অনেক দূরে কোথায় এখনও মাটি হইতে রথের চাকা দুই হাতে প্রাণপণে টানিয়া তুলিতেছে— রোজই তোলে— রোজই তোলে— মহাবীর, কিন্তু চিরদিনের কৃপার পাত্র কর্ণ।'[১৩]

সূর্যপুত্র কর্ণ, সূর্যাস্তের সঙ্গে তার এই আশ্চর্য আবর্তন আপতন মহাকবি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসই কি নির্দিষ্ট করে দেননি? এই ধারাবাহিকতাই ভারতবর্ষের জীবনপথের পাঁচালী।

অপুর সৃজনশীল কল্পনা হরিহরের উত্তরাধিকার। হরিহরের বাক্সটিতে অপু কিছু আশ্চর্য বস্তুর ইশারা পেয়েছিল। আধুনিক উত্তর উপনিবেশিক পরিস্থিতি দিয়ে একে বুঝতে চাওয়া বিভ্রান্তিকর। হরিহরের বিদ্যাগ্রহ, পাণ্ডিত্য, কল্পনাচারিতা, শিল্পবোধ— সবই নিতান্ত 'দেশী'। তাকে বুঝতে না পারলে পথের পাঁচালী নিছক এক শিশু মনের আশ্চর্য ভেবে রোমাঞ্চ হতে পারে, কিন্তু পথের পাঁচালী তো হরিহরেরও জীবনের পাঁচালী— তা না বুঝলে উপন্যাসের পাঠ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পশ্চিমী অনুবাদকরা 'অক্রুর সংবাদ'কে পরিশিষ্ট বা বর্জনীয় বিবেচনা করেছেন— কিন্তু ওখানেই আছে ইছামতী থেকে বারাণসীর গঙ্গা পর্যন্ত এক অভিনব পথের ইঙ্গিত। আঞ্চলিক কেমন করে মহাভারতীয় জাতীয়, আধ্যাত্মিক আর বৈশ্বিক হচ্ছে, আর ঠিক কোথায় নিমেষ ও ক্ষণকাল হয়ে উঠছে মহাকাল বা চিরকাল — তা বোঝার সঙ্গে আমাদের বুঝে নিতে হবে দুই প্রজন্মের দ্বান্দ্বিকতার পরিণতি।

পিতা খেয়ালী মানুষ, বিষয়বুদ্ধি নেই। তবে তার পুঁজিটি নেহাৎ কম ছিল না। অপু তা সবার আড়ালে পড়ত। পেয়েছিল 'সর্বদর্শন-সংগ্রহ', সেই বই খুলতেই 'কাগজ-কাটা পোকা' বেরিয়ে পালাল। 'অপু বইখানা নাকের কাছে লইয়া গিয়া ঘ্রাণ লইল, কেমন পুরনো গন্ধ।' শুধু কী তাই— 'গন্ধটায় কেবলই বাবার কথা মনে করাইয়া দেয়। যখনই এ গন্ধ সে পায় তখনই কী জানি কেন তাহার বাবার কথা মনে পড়ে।'[১৪] সেখানে ছিল শকুনির ডিম আর পারদের মাধ্যমে শূন্যমার্গে ভ্রমণের বিচিত্র ভেল্কিবাজির সংবাদ। শেষ অবধি দিদি দুর্গার ভাষায় 'হাঁ-করা ছেলে' অপুর কাছ থেকে রাখাল এসে চার পয়সায় বিক্রি করে গেল শকুনের ডিম! সর্বজয়া বুঝল, 'রাখাল ছোঁড়াটা, বদমায়েশের ধাড়ি'। আর অপু 'ছেলেটা যে কী বোকা' তা বলে বোঝানো যাবে না। সর্বজয়ার জানার কথা নয়— 'সকলেই তো কিছু সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ পড়ে নাই, বা সকলেই কিছু পারদের গুণও জানে না।'[১৫]

গ্রামের একলা বৃদ্ধ নরোত্তম দাস, তাঁর কাছে 'প্রেম ভক্তিচন্দ্রিকা'-র পদাবলী আর পুরাণ সাহিত্য আকণ্ঠ পান করত অপু। নরোত্তমের ছিল শিল্পবোধ। এক শিষ্যের বাঁধা পদ তার ভালো লাগত না। তার আদর্শ 'বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস'। রসিক বালক অপুকে তার 'গৌর' মনে হত। বলেছিল, 'আমি মরবার সময়ে এই বইখানা তোমাকে দিয়ে যাবো দাদু, তোমার হাতে বইয়ের অপমান হবে না।'[১৬]

হরিহরের কাছে অপু চেয়েছিল পদ্মাপুরাণের একটি খণ্ড। যুগীপাড়া থেকে সেই বইখানা 'বটতলায় ছাপা', পড়ার জন্য এনেছিল হরিহর। সেটি পড়ত অপু। 'কুচুনী পাতায় শিব ঠাকুরের মাছ ধরিতে যাওয়ার কথাটা পড়িয়া তাহার ভারী আমোদ।'[১৭] নরোত্তম দাস এই বটতলার পদ্মাপুরাণ— এক অনিন্দ্য শিল্পপথের সন্ধান দেয় অপুর শিশু মনের কল্পনাচারিতাকে। পিতার টিনের বাক্সে অপু খুঁজে পায়— 'নিত্য কর্মপদ্ধতি', 'প্রাকৃতিক ভূগোল', 'শুভঙ্করী', আর 'পাতা-ছেঁড়া বীরাঙ্গনা'। আর আছে 'মায়ের সেই মহাভারত।'[১৮] হরিহরের পথ— উদাসীন জ্ঞান সন্ধানীর শুধু নয়, তার ছিল সৃজনশীল ক্ষমতা, মৌখিকভাবে চলে আসা যা কিছু দেশী—সবই তার আগ্রহ অনুধ্যানের বিষয় ছিল। খোড়ে নদীর ধারে কাঠগোলার অধিকারী তার গলায় 'শ্যামা বিষয়ক' গান শুনে খুশি হয়ে এক টাকা প্রণামী দিয়েছিল।[১৯]। এক ভাগ্য বিড়ম্বিত বিদ্যানুরাগী শিল্পী মনের হরিহরের এই জ্ঞান-পথের সঙ্গে সংযোগ না থাকলে অপু অপু হতো না।

বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটের ষষ্ঠী মন্দিরের নিচে 'কাশী খণ্ডের' পুঁথি নিয়ে বসার পিছনে সর্বজয়ার উৎসাহ পরামর্শও ছিল। এমনিতে 'কয়েক স্থানে হাঁটাহাঁটি' করে 'কয়েকটি মন্দিরে নিত্য পুরাণ পাঠের' কাজ জোগাড় হলো। সর্বজয়া বলল, দশাশ্বমেধ ঘাটে রোজ বিকেলে পুঁথি নিয়ে বোসো না কেন? কত ফিকিরে লোক পয়সা আনে, তোমার কেবল বসে বসে পরামর্শ আঁটা'।[২০] সর্বজয়ার কি হরিহরের মতো মন আছে! হরিহরের আজন্ম স্বপ্ন ছিল, 'ঝাড় লণ্ঠনের আলো ঝোলানো বড় আসরে সে দেখিতে পায়, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে' তার 'ছড়া, গান, শ্যামা সংগীত, পদ, রাত্রির পর রাত্রি' ধরে 'গাওনা'

হচ্ছে— 'কত দূর দূরান্তর' থেকে মাঠঘাট ভেঙ্গে লোক খাবারের পুঁটুলি বেঁধে এনে বসে থাকবে শোনার আগ্রহে।' 'দলের অধিকারী' তার বাড়িতে এসে পালা চেয়ে নিয়ে যাবে। লোক জানতে চাইছে— বাঃ! ভারী চমৎকার তো! কার বাঁধা ছড়া?— 'কবির গুরু ঠাকুর হরু'— হরু ঠাকুরের? — না। নিশ্চিন্দপুরের হরিহর রায় মহাশয়ের।'[২১] তবে জীবনের সংঘাত সংঘর্ষের উত্তাপে সেই স্বপ্নাচ্ছন্নতা কর্পূরের মতো উড়ে গেল। 'যৌবনের স্বপ্নজাল জীবন-মধ্যাহ্নে কুয়াসার মতো দিগন্তে মিলাইয়া গেল'।[২২] আজ এই প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় ধর্মসঙ্গিনী সর্বজয়ার তির্যক-বাণী তাকে স্বপ্নলোকে ফিরিয়ে দিল। 'পুরাণ পাঠ করা' তার পরিচিত, অভ্যস্ত বিষয়। শিষ্য বাড়িতে এরকম করতেই হতো। তীর্থস্থানে যাত্রীদের মধ্যে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক রাজধানীতে, অনিয়ন্ত্রিত জনতার মাঝখানে এই নতুন পটভূমিতে প্রাথমিকভাবে উৎরে গেল হরিহর। 'ভিড় মন্দ হয় না।'[২৩]

কিছুদিনের মধ্যেই পেশায় এল প্রতিযোগিতা। দেবনাগরী বর্ণ না জানা 'বাঙাল' কথক ঠাকুর অন্য উপায়ে লোক জড়ো করে। হরিহর বোঝে নতুন সময়ে পুরনো ধ্রুপদী পুরাণ-নিষ্ঠা নয়— 'বাঙাল' কথক 'শুধু ছড়া কেটে মেয়ে ভুলিয়ে পয়সা নেয়।' তাই 'গোটাকতক পালা' লিখবে হরিহর— 'গান থাকবে, কথকতার মতও থাকবে।' শুরু হলো নতুন সাধনা। কয়েকদিন ধরে তার কথকতা শুনতে 'বেশ ভিড়' হচ্ছে। উৎসাহ পেয়ে 'হরিহর পুরাতন খাতাপত্রের তাড়া আবার' বের করে। সর্বজয়া বলে, 'ধ্রুব চরিত্র শুনতে শুনতে লোকের কান যে ঝালাপালা হলো, নতুন একটা কিছু ধরো না!'[২৪] সৃজনশীল মানুষকে উৎসাহ দেবার মানুষ চাই— সেই মানুষ যদি সহধর্মিণী হয়, তার তুলনাই হয় না। কখনো শুনতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ, কখনো নতুন পালা রচনার অনুরোধ— হরিহরের পথের পাঁচালী এগিয়ে চলে। 'জড় ভরতের উপাখ্যান' লিখে ফেলল হরিহর। বাইশ বছর আগে এই বারাণসীতেই হরিহর 'গীত গোবিন্দের পদ্যানুবাদ' করেছিল। পরে নিশ্চিন্দিপুরে গিয়ে বুঝতে পারে সময় বদলে গেছে। চারিদিকে 'দাশুরায়ের গান, দেওয়ানজীর গান, গোবিন্দ অধিকারীর শুকসারীর দ্বন্দ্ব, লোকা ধোপার দলের মতি জুড়ির গানের বিস্তৃত প্রচলন ও পসার তাহার মনে একটা নতুন ধরনের প্রভাব বিস্তার করিল।'[২৫] হরিহর ভেবেছিল এই ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়েই নতুন শিল্পসম্ভার গড়ে উঠবে। তবে তা ছিল ইতিহাসের ধারার স্বাভাবিক গতিকে অস্বীকার করা, মোড় ফেরানোর ব্যর্থ চেষ্টা।

ইতিমধ্যে বদলে গেছে সময়। মধুসুদনের 'বীরাঙ্গনা'র ছেঁড়া বইটি মন দিয়ে পড়লেই হরিহর ঠিক বুঝতে পারত। হরিহর কতটা অনুধাবন করেছিল জানি না। অপূর্ব রায়কে আকর্ষণ করেছিল এই নতুন কবিত্বের আকর্ষণ। সেই সঙ্গে তার মনে এসেছিল নতুন এক বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা। সে ক্ষুধা জ্ঞানের, তথ্যের বিস্ময়ের আর অজানাকে জানার ক্ষুধা। যাত্রাপালার অনুকরণে পালা লেখার আকর্ষণ তার উপরেও বর্তেছিল— 'বিচিত্র কেতুর যুদ্ধে'র আকর্ষণ তাকেও বিনিদ্র করে রাখত। সে দেখেছে নতুন সংযোগ ব্যবস্থা— ডাক ব্যবস্থা, চিঠি আদান-প্রদান, বাবার পাঠানো 'খরচ' কীভাবে পিওনের মাধ্যমে আসে— জেনেছে দারিদ্র্য অনিশ্চয়তার মধ্যে।

নতুন একটি মাধ্যমের ইশারা দুর্গাকে আশ্চর্য করেছিল— তার নাম জানত না দুর্গা। 'সিনেমা বাক্স', সেই একবারই এসেছিল গ্রামে। তবে তার অভিঘাত ছিল দূর সঞ্চারী। বুড়ো মুসলমান তার পয়সা নেই দেখেও ডেকে দেখিয়েছিল— 'তাজ বিবিকা রোজা দেখো, হাতী বাঘকা লড়াই দেখো।' সেই 'দশ মিনিটের কথার' কোনো বর্ণনা করতে পারে না দুর্গা। তখন তার নিয়মিত জ্বর আসে। ঠিকমতো বলতেই পারেনি কী আশ্চর্য ছিল তার অভিজ্ঞতা। 'সত্যিকারের মানুষ ছবিতে কি করিয়া দেখা যায়?'[২৬] অপু আভাস পেয়েছিল।

অপুর মন বদলে গেল শহর থেকে আসা ইংরেজি মাধ্যমে পড়া সুরেশের কথাবার্তা চালচলনে। নীলমণি রায়ের বড় ছেলেটি পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। অপু তখনও স্কুলেই যায় না— পাঠশালার পরে পাঠ অগ্রসর হয়নি। দোলের ছুটিতে এসে গ্রামের ছেলেদের 'দিগ্বিজয়ী নৈয়ায়িক পণ্ডিতের' মতো প্রশ্ন করে করে নিজের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল। অপুকে জিজ্ঞাসা করল— 'ইন্ডিয়ার বাউন্ডারি কী? জিওগ্রাফী জানো?' অপু এসব জানে না, শুধু কী তাই— 'যখন সুরেশ উপেক্ষার ভঙ্গিতে জানতে চাইল, অঙ্ক কি কষেছ?' ডেসিমল্ ফ্রাকশান করতে পারো?।'[২৭] অপুর জানার সীমা ছিল ছেঁড়া ছেঁড়া— 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার বান্ডিল পড়ে সে জেনেছে বহু রহস্যময় অভিযাত্রার কথা। কিন্তু 'মোটে ভাগ পর্যন্ত অঙ্ক জানে, ইতিহাস নয়, ব্যাকরণ নয়, জ্যামিত পরিমিতির নামও শোনে নাই, ইংরাজির দৌড় ফার্স্ট বুকের গোড়ার পাতা।'।[২৮]

বাবার দপ্তরে ছিল বিদ্যাসাগরের লেখা 'চরিতমালা।' সেখানে অপু পড়েছিল আলু বিক্রি করা কৃষকের ছেলে রাস্কো-র বীজগণিতে বিশেষজ্ঞ হওয়ার কথা, মেষপালক ডুবালের ভূচিত্র-বিদ হয়ে ওঠার আশ্চর্য কথা। ক্রমে ক্রমে সীমিত স্বশিক্ষা তার মনে জাগিয়ে তুলল এক নতুন আকাঙ্ক্ষা— তার মনে এই নতুন আকাঙ্ক্ষা তাকে পিতার পথের পাঁচালী অতিক্রম করার দুঃসাহস জোগাল। 'সে এই হাতের লেখা শিখিতে চায় না, ধারাপাত কী শুভঙ্করী এসব তাহার ভালো লাগে না।' সে চায় পশ্চিমী শিক্ষা— তার এই নতুনের আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই বিদ্রোহের মতো। এই গ্রাম্য চিরাচরিত শিক্ষায় তার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হচ্ছিল না। 'এই কড়ি কষার আর্যা', 'এই নামতা'য় তার ক্ষুধা মিটছে না। 'মা বকিলে কী হইবে, যাহা সে পড়িতে চায়, তাহা এখানে কই?'।[২৯] একে মনে হয় গ্রাম বাংলায় নবজাগরণের বিলম্বিত অভ্যুদয়।

১৮৩৪ নাগাদ সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার্থীরা Committee of Public Instruction-এর উদ্দেশ্যে একটি আবেদন করে। তাদের দাবি, ইংরেজি শিখতে চায়। পুরনো টোল চতুষ্পাঠীর বিদ্যা এখন আর কর্মমুখী থাকছে না। এই চিঠি গেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক-এর কাছে। উইলিয়াম অ্যাডামস্ হলেন শিক্ষা কমিশনের দায়িত্ব পেলেন।[২৯] সেই শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে লর্ড মেকলে ১৮৩৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে লিখলেন 'To sum up what I have said... that English is better worth knowing than Sanskrit or Arabic; that the natives are desirous to be taught English and are not

desirous to be taught Sanskrit or Arabic'[৩০]। মেকলের শিক্ষানীতি ভারতের চিরাচরিত বিদ্যাশিক্ষার পক্ষে বিপজ্জনক হয়েছিল— ভারততত্ত্ব বিদ্যার মৃত্যুর চিহ্নও স্পষ্ট হয়েছিল। ডেভিড কফের গবেষণায় এ বিষয়টি দেখেছি। এই গবেষণা গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'Macaulayism and the Defeat of the Orientalist'[৩১]। উৎসাহী পাঠক এই পরিচ্ছেদ পড়লে বুঝবেন নতুন শিক্ষানীতি কেমন করে হরিহরদের পথ ও পাঁচালীর জগৎকে পরাভূত করল আর অপুদের পথের পাঁচালী নতুন পথের দেবতার ডাক শুনতে পেল।

কৌলীন্য প্রথা বল্লালী আমলের বালাই। বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় এই গ্লানি দুর্মোচ্য। এই ব্যবস্থার দুটি নিষ্ঠুর পরিণতির ইঙ্গিত আছে উপন্যাসে। ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়কে ঘিরে যে লোক প্রচলিত কাহিনিকে বলব পথের পাঁচালীকে সাগা (Saga) তথা বংশ পরম্পরার স্মৃতিচিহ্নিত সংরূপের ইঙ্গিত দিয়েছে। 'তখনকার কালে অনেক সমৃদ্ধিশালী গৃহস্থও ডাকাতি' করত, বিষ্ণুরাম রায়ের পুত্র মূর্খ বীরু রায় ছিল ঠ্যাঙাড়ে দলের সরদার। নিষ্ঠুর ভাবে এক ব্রাহ্মণ পথিককে সপুত্র হত্যা করে সে। মূর্খ বীরু রায়ের একমাত্র পুত্র হলুদবেড়ে গ্রাম থেকে ফেরার পথে ইছামতী নদীতে কুমিরের গ্রাসে পড়ে। একে হয়ত Poetic justice বলা যায়। বিভূতিভূষণের ভাষায় 'অদৃশ্য ধর্মাধিকরণের দণ্ড' — আর তাই 'বংশের জ্যেষ্ঠ সন্তান কখনো বাঁচিত না।'[৩২]

এই নিষ্ঠুরতার পাশে ছিল অন্য এক গোপন নিষ্ঠুরতা। কুলীন কন্যাদের পক্ষে তা কেমন ছিল— ইন্দির ঠাকরুণের মাধ্যমে তা স্পষ্ট হয়েছে। সারা জীবন এই ভাগ্য বিড়ম্বিত মহিলাদের হয় চিতায় যেতে হতো না হয় সারা জীবন দগ্ধে মরতে হতো। বল্লাল সেনের নির্দেশে এই কৌলীন্য প্রথার বালাই— যা মূর্খ খুনি ঠ্যাঙাড়ে আর অবলা কুলীন কামিনীদের হাহাকারের মাঝখানে হরিহর ব্যতিক্রম। তারকেশ্বরের মাদুলির গুণ হোক, ব্রহ্মশাপের তেজ 'কর্পূরের মতো' উবে যাওয়ার কারণেই হোক হরিহর বেঁচে থাকল। সমাজে পরিবারে কৌলীন্যের আভিজাত্য ক্ষয় পেল। সর্বজয়া আর হরিহরের দাম্পত্য জীবন তো বিবাহ ব্যবসায়ী কুলীন পুরুষ আর ইন্দির ঠাকরুণের মতো অতৃপ্ত দীর্ঘশ্বাসে পূর্ণ ছিল না।

স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের মধ্য দিয়ে হরিহর-সর্বজয়ার দাম্পত্য জীবন ঢেউ ভেঙ্গে ভেঙ্গে এগিয়েছে। পানফল সংগ্রহের দিন অপু মাটি খুঁড়ে মজুমদারদের পরিত্যক্ত ভিটেতে 'গোলমতো একদিক ছুঁচোলো পল কাটা কাটা চকচকে' যে জিনিসটা পায় তা বোধহয় হীরে। দুর্গা ভেবেছিল। অপুরও 'রূপকথার রাজপুত্র ও রাজকন্যার হীরামুক্তার' কথা মনে পড়েছিল। 'সর্বজয়ারও হীরক সম্বন্ধে ধারণা' ছিল না। ছিল না হরিহরেরও। তবে দুর্গা মনে করায় 'মজুমদারেরা বড়লোক ছিল তো মা? ওদের ভিটের জঙ্গলে কারা নাকি মোহর কুড়িয়ে

পেয়েছিল— পিসি গল্প করতো।[৩৩] যে কুলীন ব্রাহ্মণরা লুণ্ঠন করেছিল অন্য পথচারীর সর্বস্ব, স্বজাতি নারীদের জীবন-যৌবন, তাদের পরের প্রজন্ম 'অদৃশ্য ধর্মাধিকরণের' কাছে এমন স্বপ্ন-দর্শী ভিক্ষুক হয়ে গেল! বাংলার সমাজ জীবনে, চিরাচরিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী বর্গ গঠনে (traditional middleclass formation) এই স্বপ্নভঙ্গের অভিঘাতটি চমৎকার, নির্মোহ, অনিবার্য মনে হয়। হরিহর ফিরলে সর্বজয়ার স্বপ্ন তার মধ্যেও সঞ্চারিত হলো। যা ছিল সর্বজয়ার 'সমস্ত গা দিয়া যেন কিসের স্রোত বহিয়া গেল, ... নানা সংশয়ের বাধা ঠেলিয়া একটা গাঢ় দুরাশা ভয়ে ভয়ে একটু উঁকি মারিল— সত্যিই যদি হীরে হয়, তা হলে।'[৩৪] হরিহর বলল, 'ঠিক বুঝতে পারচি নে।' তবে তারও মনে স্বপ্ন সঞ্চারিত হলো— মনে হল, 'কথায় বলে,কপালে না থাকিলে গুপ্তধন হাতে পড়িলেও চেনা যায় না— শেষে কী দরিদ্র ব্রাহ্মণের গল্পের মতো ঘটিবে!'[৩৫] গাঙ্গুলী মশাইয়ের জামাই সত্যবাবু জানিয়ে দিল 'এ একরকম বেলোয়ারী কাঁচ— ঝাড় লণ্ঠনে ঝুলানো থাকে।' রূপকথার গুপ্তধন নতুন বৈভবের প্রতিনিধি ঝাড়লণ্ঠনের কাঁচে পরিণত হওয়াটা স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের মরমী এক জীবনকথার টুকরোই বলতে হবে।

'ঝোপ জঙ্গলের অন্ধকারে ঝিঙের বিচির মতো কালো' হয়ে এলে 'গ্রামের বিস্মৃতা অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশালক্ষ্মী'কে অনুভব করে অপু। খেলতে খেলতে গিয়ে দুর্গা-অপু হঠাৎ হাজির হয় 'আতুরী বুড়ি'র ভিটেয়। এসবই ঠিক যেন আজকের বিখ্যাত জাদু বাস্তবতা (inagic realism)। এসবই অপুর মতো এক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন শিশু পর্যটকের ভাবনা। 'পুলিন শালিনী ইছামতীর ডালিমের রোয়ার মতো স্বচ্ছ জলের ধারে' সেই পরিত্যক্ত দেবী 'এ গ্রামকে এখনো ভোলেন নাই।' কবে কোন জনশ্রুতির 'স্বরূপ চক্রবর্তীর পর' তাকে কেউ দেখেনি, তবে অপু অনুভব করে 'বাসক ফুলের মাথা', 'ছাতিম ফুলের দল', 'নীল পাপড়ি কলমী ফুলের দল ভিড়' পাকিয়ে থাকে— আর এই সবের মধ্যেই দেবী বিশালাক্ষ্মী 'রূপের স্নিগ্ধ আলোয় বন' ভরে দিয়ে যান। দিনের আলো ফোটার আগেই বনলক্ষ্মী হারিয়ে যায়।।[৩৬] এসব জায়গায় মনেই হয় 'পথের পাঁচালী' বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' উপন্যাসেরও ভূমিকা তৈরি করে হয়তো। এসব বর্ণনা পড়ে পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শ প্রভাবিত 'আধুনিক' সাহিত্য সমালোচকবর্গ ঠিক পশ্চিমা অনুবাদকদের মতোই 'পথের পাঁচালী'কে খণ্ড করে পড়তে চান। যে মৌখিক সাহিত্য ধারা প্রাচীন ধ্রুপদী সাহিত্য থেকে রস গ্রহণ করে কথকতা পালাগান শ্যামা বিষয়ক হতে হতে পাঁচালীতে পরিণত হয়— তা ঠিক মতো খেয়াল করলে তারা নিশ্চয় স্বীকার করবেন, 'পথের পাঁচালী' অপুর পথের পাঁচালী নয়— এ উপন্যাসের প্রকৃত নায়ক হরিহরের পথ ও তার পাঁচালী অবলম্বনে বেঁচে থাকার স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের আখ্যান।

বনগাঁ-আষাঢু-দুর্গাপুর-টাকী থেকে কলকাতা তো খুব দূর নয়। তবু অপুকে এত দীর্ঘপথ পর্যটন করতে হলো কেন? নিশ্চিন্দপুর থেকে মাঝেরহাট রানাঘাট হয়ে সর্বজয়ার আড়ংঘাটার মেলায় যাওয়া সেই রেলযাত্রার পথ ছাড়িয়ে যেতে হলো রানাঘাট। সেখান থেকে কাশী। তারপর 'অপরাজিত' থেকে দৃশ্যাহরণ করলেন মহান শিল্পী সত্যজিৎ রায়। হরিহরের হাতের ঘটি ঠং ঠং করে পড়ে গেল দশাশ্বমেধ ঘাটের রক্তবর্ণের বড় বড় ধাপ ধাপ সিঁড়ি ধরে— 'ইছামতী'র আঞ্চলিক মিশে গেল সর্বভারতীয় পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার জাতীয়তার (national) বৃহৎ ঐতিহ্যে (greater tradition)। কবে এতো 'অপরাজিতের' দৃশ্য। সত্যজিৎও বিভূতিভূষণের শাসন মেনে পথের পাঁচালী শেষ করেন হরিহরের ভিটের একটি সাপের ধীর অনুপ্রবেশের মাধ্যমে। ঠিক যেন দাঁড়াশ— বাস্তু সাপ। বিভূতিভূষণ লিখেছিলেন, 'কতদিনের পৈতৃক ভিটা', 'পিতা রামচাঁদ তর্কবাগীশ'-এর ভিটের 'মাটির প্রদীপ টিমটিম করিতে ছিল'— 'আজ সন্ধ্যা হইতে চিরদিনের জন্য নিবিয়া গেল।।[৩৭]

অপুর পথ অপুর মতো তীর্থ শহর কাশীতে থামতে পারে না। সে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অভিঘাতে গড়ে ওঠা দক্ষিণ এশিয়ার মহানগর কলকাতার নায়ক। তাকে তাই কলকাতায় ফিরতে হয়। মাঝেরপাড়া থেকে রাণাঘাট, ব্যান্ডেল হয়ে সেই যে পথ, যা ছিল পারিবারিক— তা হলো একান্ত ব্যক্তিগত। 'মনসা পোতা'র জীবনের ছক ভেঙ্গে সর্বজয়াকে একা রেখে সেই পথ কলকাতার অন্ধকার ছাপাখানায়, গোলদীঘির বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় স্বপ্নের নতুন এক যাত্রার দিকে অগ্রসর হলো। জীবন প্রস্তুতির সময় পিতা হরিহরও বারাণসীতে এমন স্বপ্নাচ্ছন্ন ছিল নাকি! যদি প্রশ্ন করি আজকের 'ইছামতী-এক্সপ্রেস' বা 'বনগাঁ লোকাল' ধরে কয়েক ঘণ্টার যাত্রাপথের পাঁচালী এত ঘুরপাক খেল কেন? উত্তর হলো ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের দিন এত সহজে কী দিনান্তের প্রদীপ হয়ে জ্বলে?

বারাণসীর সেই বাঙাল অল্প শিক্ষিত লোভী কথকের চিত্র মনে পড়ছে। ভদ্রলোক শ্রোত্রীয়। তাদের কন্যাপণ জোগাড় করতে হয়। শ্রোত্রীয় আর কুলীন— ব্রাহ্মণ সমাজের এই বল্লালী প্রথা হরিহরের কালে হারিয়ে গেছে, কিন্তু ওই দরিদ্র কথক ঠাকুরের পথ ও পাঁচালী তখনও শেষ হয়নি। হরিহরের পথ ও পাঁচালী দশাশ্বমেধ ঘাটে শেষ হয়— অপুর পথ ও পদাতিক জীবন শুরু হয় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক মহানগরে। সে তো ভিন্ন আখ্যান।

অনুষঙ্গ

১। ইংরেজি অনুবাদক টি. ডব্লিউ. ক্লার্ক এবং অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায়; ফরাসি অনুবাদক শ্রীমতী ফ্রান্স ভট্টাচার্য। সাহিত্য আকাদেমি ও UNESCO -র উদ্যোগে এই অনুবাদ দুটি যথাক্রমে ১৯৬৮ ও ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয়।

২। সূত্র : 'পথের পাঁচালী' : রচনা ও প্রকাশন— জিতেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, ভাদ্র ১৩৭৯; 'পথের পাঁচালী', মিত্র ও ঘোষ পেপারব্যাক ক্লাসিক্স্; ষোড়শ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ। ৫ পৃঃ।

৩। তদেব, ৯ পৃঃ।

৪। তদেব।

৫। দেখুন : অচিন্ত্য বিশ্বাস : 'মিখাইল বাখতিন উপন্যাস তত্ত্ব'; বিদ্যা, জানুয়ারি ২০১৪, ১০৯ পৃঃ।

৬। Mikhail Bakhtin : "Forms of Time and Chronotope in the Novel" শীর্ষক প্রবন্ধ, 'The Dialogic Imagination', ২৫৪ পৃঃ।

৭। দেখুন 'Anatomy of Criticism' প্রিন্সটন, নিউ জার্সি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; ১৮৫৭।

৮। দেখুন : অচিন্ত্য বিশ্বাস : 'পুরাকথা, সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য ভাবনা' — শীর্ষক প্রবন্ধ; নবেন্দু সেন সম্পাদিত 'পাশ্চাত্য সাহিত্য তত্ত্ব ও সাহিত্য ভাবনা', রত্নাবলী; কলকাতা; জুন ২০০৯; ৩৩২ পৃঃ।

৯। 'পথের পাঁচালী' ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, শেষ বাক্য। উক্ত ২০ পৃঃ।

১০। ওই; 'অক্রূর সংবাদ' — পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ; ১৮০ পৃঃ।

১১। ওই; 'আম আঁটির ভেঁপু'— পঞ্চম পরিচ্ছেদ, ২৮ পৃঃ।

১২। তদেব; ২৯ পৃঃ।

১৩। ওই।

১৪। তবেদ; ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ; ৮৯ পৃঃ।

১৫। তবেদ; ৯১ পৃঃ।

১৬। তদেব; বিংশ পরিচ্ছেদ, ৯২ পৃঃ।

১৭। তদেব; ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ, ১১৭ পৃঃ।

১৮। তদেব; সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ, ১২১ পৃঃ।

১৯। তদেব; ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ, ১১৭ পৃঃ।

২০। তদেব; 'অক্রূর সংবাদ'; ত্রিংশ পরিচ্ছেদ; ১৪৮ পৃঃ।

২১। তদেব; ১৪০ পৃঃ।

২২। তদেব।

২৩। তদেব; ১৪৮ পৃঃ।

২৪। তদেব; ১৪৯ পৃঃ।

২৫। তদেব।

২৬। তদেব; চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ, ১০৯ পৃঃ।

২৭। সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ, ১১৯ পৃঃ।

২৭। তদেব।

২৮। চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ, ১১০ পৃঃ।

২৯। শিবনাথ শাস্ত্রী : 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'; নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা; তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৮৪ ব., ৬১-৬২ পৃঃ। উইলিয়াম অ্যাডাম ছিলেন রাজা রাধাকান্দ দেব ও রাজা রামমোহন রায়-সহ বহু বিশিষ্ট কলকাতাবাসী নাগরিকের পরিচিত।

৩০। Macauley, Thomas B : 'Minutes on Education'; আমরা উল্লেখ করছি, শিবনাথ শাস্ত্রী : 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'; উক্ত; ১৪১ পৃঃ থেকে।

৩১। David Kopf : 'British Orientalism and the Bengal Renaissance (The Dynamics of Indian Modernization 1773-1835)' ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়; কলকাতা, ১৯৬৯; XIV - Chapter. ২৩৬-২৫২ পৃঃ।

৩২। 'পথের পাঁচালী'; উক্ত; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, ৮ পৃঃ।

৩৩। তদেব; উক্ত; একাদশ পরিচ্ছেদ; ৩৯ পৃঃ।

৩৪। তদেব; ৪০ পৃঃ।

৩৫। তদেব।

৩৬। তদেব; ষোড়শ পরিচ্ছেদ, ৭৬ পৃঃ।

৩৭। তদেব; ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ, ১৪০ পৃঃ।

smc
Moneywise. Be wise.

SMC WISHES YOU A
HAPPY DURGA PUJA

Call Toll-Free
1800 11 0909
www. smctradeonline.com

Broking - Equity, Commodity & Currency | Wealth Management | Insurance Broking | Real Estate Advisory | Mortgage Advisory | Distribution of IPOs, Mutual Funds, FDs & Bonds | Investment Banking | NBFC Financing | PMS | Institutional Broking | Clearing Services | NRI & FPI Services | Research

DELHI | MUMBAI | KOLKATA | AHMEDABAD | CHENNAI | BENGALURU | DUBAI

SMC Global Securities Ltd., CIN No.: L74899DL1994PLC063609 | REGISTERED OFFICE: 11/6-B, Shanti Chamber, Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel +91-11-30111000 | SMC Comtrade Ltd., CIN : U67120DL1997PLC188881

SEBI Reg. No. INZ000199438, Member: BSE (470), NSE (07714) & MSEI (1002), DP SEBI Regn. No. CDSL/NSDL-IN-DP-130-2015, Mutual Funds Distributor ARN No. 29345. SMC Comtrade Ltd. SEBI Regn. No. INZ000035839, Member: NCDEX (00021), MCX (8200) & ICEX (1010). SMC Investments and Advisors Limited, SEBI PMS Regn. No. INP000003435. SMC Insurance Brokers Pvt. Ltd. IRDAI Regn. No: DB 272/04 License No. 289 Valid upto 27/01/2020.

Investment in securities market are subject to market risks, read all the related documents carefully before investing

Follow us on

আমার বন্ধু পার্থ

রমানাথ রায়

পার্থ আমার বন্ধু। পার্থর সঙ্গে আমি গল্প করি, ঘুরে বেড়াই। মাঝে মাঝে একসঙ্গে ঝালমুড়ি খাই, ফুচকা খাই, ঘুগনি খাই। আসলে আমি পার্থকে ভালোবাসি। কিন্তু এই ভালোবাসা, এই বন্ধুত্ব যে আমার কাল হয়ে দাঁড়াবে তা জানতাম না। একদিন জানলাম, সেদিন অফিস থেকে ফিরে সবে টিভির সামনে বসেছি। এমন সময় আমার মোবাইল বেজে উঠল। স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে দেখি একটা অচেনা নাম্বার।

আমি ফোনটা ধরলাম, হ্যালো...

ওদিক থেকে প্রশ্ন ভেসে এলো, আমি কি অনিলবাবুর সঙ্গে কথা বলছি?

— বলছেন।

— আমি আমাদের দলের মুখ্য সচিবের অফিস থেকে বলছি।

— বলুন।

— আপনার বিরুদ্ধে একটা মারাত্মক অভিযোগ আছে।

— কী অভিযোগ?

— পার্থ রায় আপনার কে হন?

— পার্থ আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু।

— আপনি পার্থবাবুর সঙ্গে ঝালমুড়ি খান?

— খাই।

— ফুচকা খান?

— খাই।

— ঘুগনি খান?

— খাই।

— এটা খুব দলবিরোধী কাজ।

— কেন?

— কারণ, এই পার্থ রায় একসময় আমাদের দলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। এখন তিনি আমাদের দল ত্যাগ করে অন্য দলে ভিড়েছেন। আপনি কি তা জানেন?

— জানি।

— তবুও আপনি পার্থ রায়ের সঙ্গে ঝালমুড়ি খান? ফুচকা খান? ঘুগনি খান?

— খাই। আমি এতে কোনো অপরাধ দেখছি না। যদি না খেতাম তাহলেই অপরাধ হতো। আমি একটা ঠুন্‌কো রাজনীতির জন্য বন্ধুকে বিসর্জন দিতে পারি না।

— কী বলছেন আপনি! এটা দলবিরোধী কাজ। মুখ্যসচিব আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

— আমার সময় নেই। আমি এখন টিভি দেখব।

— এখন টিভি দেখা আপনার কাছে বড়ো হয়ে উঠল?

— হ্যাঁ। — বলে একটু হেসে বললাম, আপনি দয়া করে এখন আমাকে বিরক্ত করবেন না।

— এর ফল আপনাকে পেতে হবে।

— আমি তার জন্য তৈরি আছি। — বলে ফোন বন্ধ করে দিলাম।

।। ২।।

আমরা আমিষাশী। তাই বলে নিরামিষাশীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব চলবে না! তাদের সঙ্গে ঝালমুড়ি খাওয়া চলবে না! ফুচকা খাওয়া চলবে না! ঘুগনি খাওয়া চলবে না! এ তো একেবারে কালা কানুন। না, এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। এর একটা প্রতিবাদ হওয়া দরকার। আমি দরকার হলে আমাদের দলের সর্বোচ্চ নেতার সঙ্গে দেখা করব। বলব, এ হয় না। এ হতে পারে না। তিনি যদি আমার কথা না শোনেন তাহলে আমি দল ছাড়ব। নিরামিষাশীদের দলে নাম লেখাব। পার্থ তো এই কারণেই দল ছেড়েছিল। তাকে বলা হয়েছিল, কী কী বই পড়বে, কী কী বই পড়বে না। তাতে পার্থ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, আমার যে বই পড়তে ভালো লাগে আমি সেই বই পড়ব। আপনাদের নির্দেশ মতো বই পড়ব না। ব্যাস! তাতেই গোলমাল বেধে যায়। পার্থ আমিষাশীদের দল ছেড়ে নিরামিষাশীদের দলে নাম লেখায়। আমাকেও হয়তো শেষপর্যন্ত তাই করতে হবে।

আমি একদিন পার্থর ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হলাম। পার্থ আমাকে সোফায় এনে বসাল।

পার্থ জিজ্ঞেস করল, কী খবর?

বললাম, ভালো নয়।

— কেন?

আমি উত্তরে যা বলার তা বললাম।

পার্থ সব শুনে বলল, আমি আমিষাশীদের দল ছেড়ে ভালো আছি। নিরামিষ খাবার খেয়ে শরীর ঠিক আছে। মন ঠিক আছে। কোনো অসুখ-বিসুখ নেই বললেই চলে। ডাক্তারের খরচ এখন যৎসামান্য। আমার পরামর্শ হলো, তুই আমিষাশীদের দল ছেড়ে আমাদের দলে আয়। তুই ভালো থাকবি।

— সে আমি জানি। কিন্তু...

— কিন্তু কী?

— তোদের বাড়িতে সবাই নিরামিষাশী। আমাদের বাড়িতে সবাই আমিষাশী। আমাদের বাড়িতে রোজ মাছ রান্না হয়। মাছ ছাড়া আমাদের মুখে ভাত উঠবে না। মাছ আমাদের চাই।

— তাতে অসুবিধা নেই। বাড়ির সবাই মাছ-মাংস খাক। তুই না খেলেই হলো।

— আমার এতে অসুবিধা নেই। কিন্তু ছোঁয়াছুঁয়ি এড়াবো কী করে?

— মানে?

— মাছের ঝোলের বাটির সঙ্গে যদি আমার ডালের বাটির ছোঁয়া লাগে তাহলে তো আমার আর খাওয়া হবে না। শুধু তাই নয়, যে বঁটিতে মাছ কাটছে সেই বঁটিতে আমার কুমড়ো বা আলু কাটছে কিনা তা আমাকে দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে হবে। আমাদের রাঁধুনির দিকে সবসময় নজর রাখতে হবে। সে কি সম্ভব?

— তাহলে এক কাজ কর।

— কী?

— বাড়ির সকলকে নিরামিষাশী করে তোল।

— দেখি, কী করা যায়।

।। ৩।।

নিরামিষাশীরাও কম যায় না। তারা এখন আমার মতো আমিষাশীদের দলে টানতে চাইছে। পার্থ আমিষাশীদের দল ছেড়ে নিরামিষাশী হয়েছে। হতে কোনো অসুবিধা হয়নি। কারণ, সংসারে ওরা মাত্র

দুজন। একজন পার্থ, আর একজন ওর বিধবা মা। ওর মা মাছ-মাংসের গন্ধ একদম সহ্য করতে পারে না। ফলে ওদের বাড়িতে মাছ-মাংস এমনিতেই ঢুকত না। মাছ-মাংস খাবার ইচ্ছে হলে পার্থ রেস্তোরাঁয় ঢুকে ফিশ ফ্রাই খেত, কষা মাংস খেত। এখন নিরামিষাশীদের দলে ঢুকে সেটাও বন্ধ করে দিয়েছে। আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। আমার বাড়িতে বাবা-মা-ভাই-বোন আছে। মাছ ছাড়া তাদের চলবে না। শুধু তাই নয়, সপ্তাহে প্রতি রবিবার তাদের মাংস চাই। আমি এদের কী করে নিরামিষাশী করব? সম্ভব নয়। তবু একদিন আমি বাবাকে বললাম, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

বাবা জানতে চাইল, কী কথা?

বললাম, শুনেছি নিরামিষ খাবার খেলে শরীর ভালো থাকে। আমরা কী আমিষ ছেড়ে নিরামিষাশী হতে পারি না?

বাবা কয়েক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, তুই কি আজকাল নিরামিষাশীদের সঙ্গে মিশছিস?

— একথা বলছ কেন?

— তোর কথা শুনে তাই মনে হচ্ছে।

— যদি মিশে থাকি তাহলে অপরাধ কোথায়?

— ওরা মোটেও সুবিধার নয়। ওরা ভীষণ গোঁড়া। ওরা যেনতেন প্রকারে তোকে ওদের দলে টানবে। তারপর বুঝবি ঠেলা। ওরা তোকে একেবারে গৃহপালিত গোরু করে দেবে। সেটা কি খুব ভালো হবে? তবে তুই যদি গোরু হতে চাস তাহলে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু তারপর তোর আর এ বাড়িতে থাকা চলবে না। তোকে ঘর ভাড়া করে আলাদা হয়ে যেতে হবে। তুই কি তা পারবি?

বললাম, না, আমি তোমাদের ছেড়ে আলাদা হতে পারব না।

বাবা বলল, তাহলে নিরামিষাশী হওয়ার চিন্তা একদম মাথায় আনবি না। বুঝেছিস?

বললাম, বুঝেছি।

তারপর পার্থকে ফোন করে বললাম, আমার দ্বারা নিরামিষাশী হওয়া সম্ভব নয়। বাবাকে কথাটা বলতেই বাবা আমার ওপর খুব রেগে গেল। স্পষ্ট ভাষায় বলে দিল, নিরামিষাশী হতে হলে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে।

— তুই তাতে রাজি হলি না কেন?

— বাবা-মা-ভাই-বোন ছেড়ে আমি আলাদা হতে পারব না।

— তার মানে তুই একটা আস্ত কাপুরুষ।

— তা হতে পারি।

— তুই আর আমার সঙ্গে কোনোদিন মিশবি না। আমি তোর সঙ্গে আর কোনোদিন ঝালমুড়ি খাব না, ফুচকা খাব না, ঘুগনি খাব না।

— তাহলে আমি একাই খাব।

— তা যা। তবে তোর কপালে বিপদ আছে।

— কী বিপদ?

বিপদ এলে বুঝতে পারবি।

।। ৪ ।।

জানি না কী বিপদ আসতে পারে। কিছুদিন আগে আমিষাশীদের কাছ থেকে ধমক খেয়েছি। এখন আমার নিরামিষাশী বন্ধু ধমকাচ্ছে। মহা সমস্যায় পড়ে গেলাম। কী করব এখন? 'যত মত তত পথ'-এর দলে ভিড়ে যাব? এই দল আমিষ ও নিরামিষ-এর বাছবিচার করে না। তারা কারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। যে কেউ নিজের পছন্দমতো বই বা খবরের কাগজ পড়তে পারে। যে কেউ তার ইচ্ছেমতো বন্ধু বেছে নিতে পারে। কোনো অসুবিধা নেই। তবে তাদের একজন গুরু আছে। তার লেখা একটি বই আছে। নাম— গুরু বাক্য। সেখানে সকলকে কয়েকটি নিয়ম মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া আছে। আমি সব নিয়মের উল্লেখ করতে চাই না। শুধু পাঁচটি নিয়মের কথা বলছি। সেই পাঁচটি নিয়ম হলো— এক, তুমি আস্তিক হতে পারো, নাস্তিক হতে পারো, তবে যাই হও না কেন তোমাকে সারাজীবন গুরুকে মান্য করতে হবে।

দুই— গুরু যখন যা বলবেন তাই হবে শিরোধার্য।

তিন— গুরুর নির্দেশ অমান্য করার শাস্তি প্রাণদণ্ড।

চার— কোনো কিছু খাওয়ার আগে গুরুর নাম নেবে।

পাঁচ— কোনো কাজ করার সময় বলবে, গুরুর অনুপ্রেরণায় এই কাজ করছি।

এদের আমি চিনি, জানি। এরা সবাই গুরুবাদে বিশ্বাসী। গুরু ছাড়া এরা কিছু জানে না। গুরুই এদের কাছে সব। আমি এদের দলে ভিড়তে পারি। কিন্তু গুরুবাদে আমার বিশ্বাস নেই। কারণ গুরুই যদি শেষ কথা হয়, তাহলে যত মত তত পথ-এর মূল্য কোথায় থাকল? এ তো এক ধরনের ভণ্ডামি। এই কারণে এই দলটাকে আমার পছন্দ হয় না। এদের চেয়ে আমিষাশীরা অনেক ভালো। তাদের মধ্যে আর যাই হোক, ভণ্ডামি নেই। তবে আমিষাশীদের অনেক জিনিস আমি পছন্দ করি না। এ নিয়ে একটা আলোচনা হওয়া দরকার।

ঠিক এইসময় একদিন মুখ্য সচিবের ফোন এল।

— হ্যালো...

— আমি মুখ্যসচিব বলছি।

— বলুন।

— কিছুদিন আগে আমার অফিস

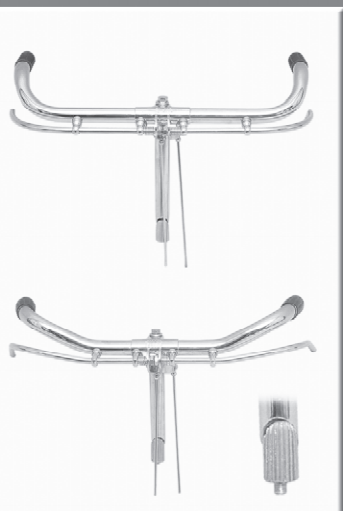

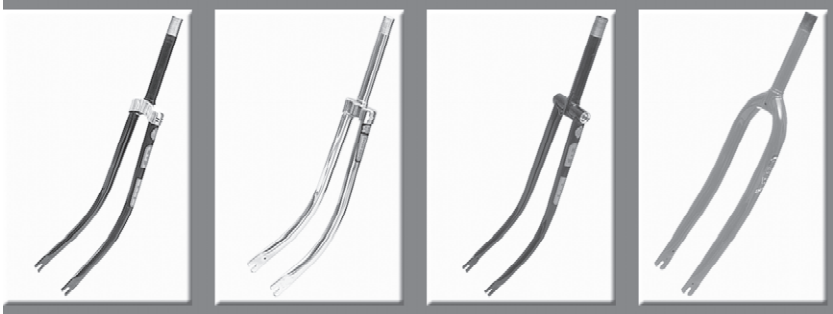

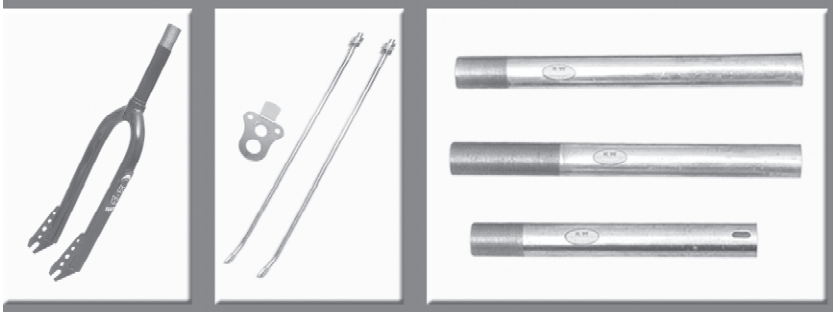

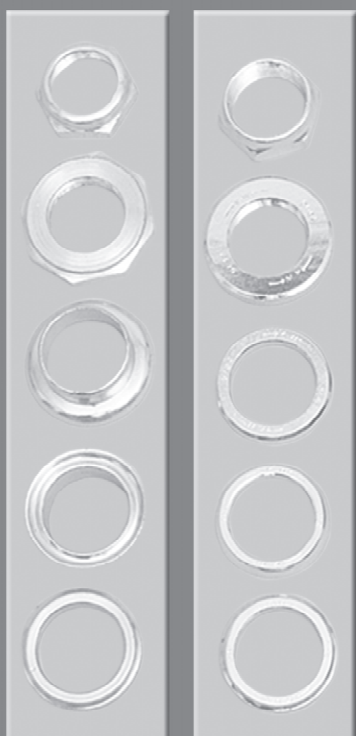

K.W
K.W. ENGG. WORKS (REGD.)
K.W
BICYCLE
K.W
BICYCLE
FORK
The Name of Quality
& Durability
K. W. Engineering Works (Regd.)
B-11, Focal Point, Ludhiana-141010 (Pb) INDIA
Phones : +91-161- 2670051-52-, 2676633
Fax : +91-161-2673250,
E-mail : sales@kwcycles.com,kwengg@sify.com
Website : http:/www.kwcycles.com

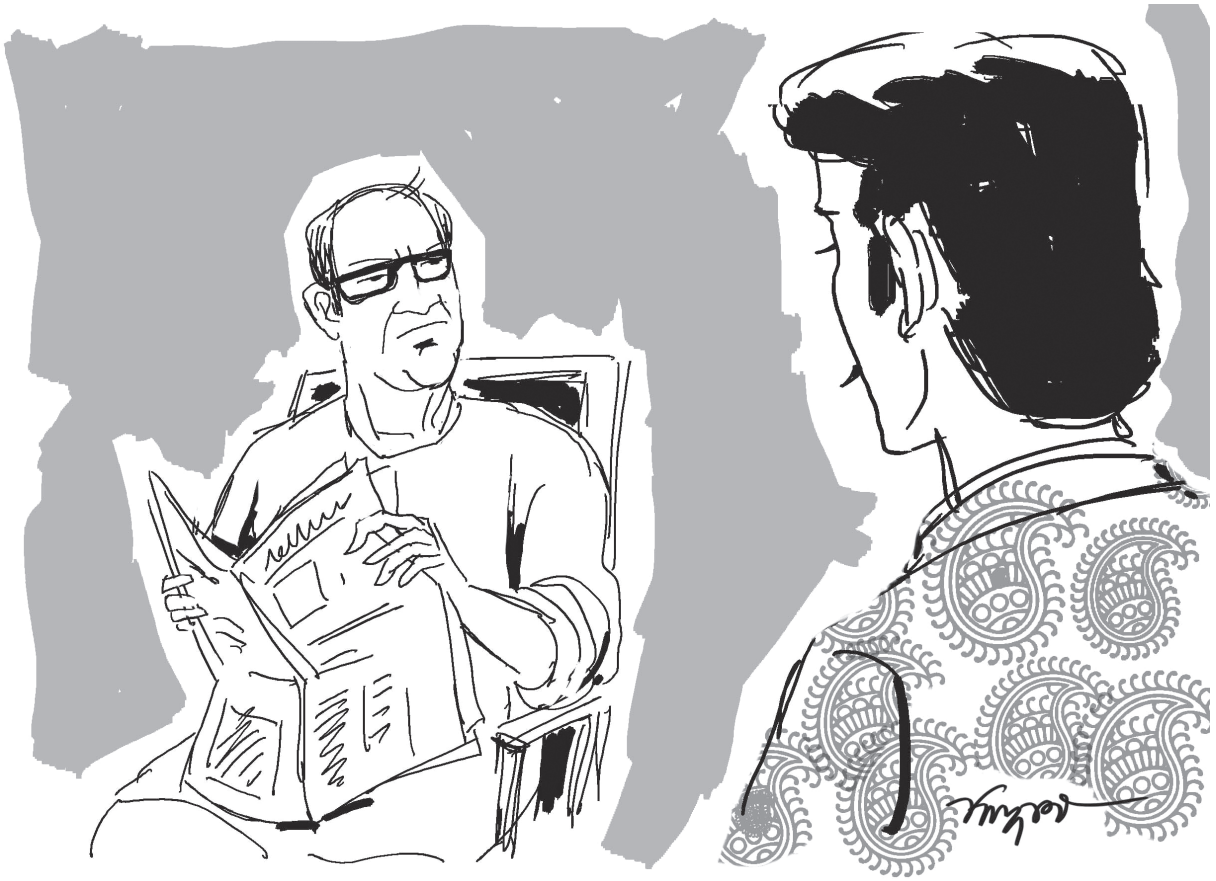

থেকে একজন আপনাকে ফোন করেছিল?

— হ্যাঁ।

— আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম।

— জানি।

— কিন্তু আপনি তখন টিভি দেখায় ব্যস্ত ছিলেন বলে আমার সঙ্গে কথা বলেননি। শুধু তাই নয়, আপনি এতে খুব বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। সত্যি?

— সত্যি।

— আমি এতে রেগে গেছি। আজ বা কাল সন্ধেবেলা আমার সঙ্গে দেখা করুন। আপনার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে। — বলে একটু থেমে মুখ্যসচিব জানতে চাইলেন, আজ আসতে পারবেন?

একটু ভেবে নিয়ে বললাম, আজ হবে না। কাল আসব।

— ঠিক আছে। কালই আসুন। কথার যেন খেলাপ না হয়।

— তা হবে না।

।। ৫ ।।

মুখ্যসচিবের ডাক। একবার উপেক্ষা করেছি। দ্বিতীয়বার আর উপেক্ষা করা সম্ভব হবে না। উচিতও নয়। শুনতে হবে উনি কী বলেন। না শুনলে কপালে দুর্ভোগ। কী দুর্ভোগ হবে বা হতে পারে তা অবশ্য জানি না। জানা সম্ভবও নয়। মুখ্যসচিবের সঙ্গে দেখা হলে সব জানতে পারব। তবে কেন জানি না আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে, ভয় হচ্ছে। যাক গে যা হবার হবে।

ভগবানের নাম নিয়ে আমি মুখ্যসচিবের অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। ঘরে উনি একা বসে আছেন। হয়তো আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

আমাকে দেখে মুখ্যসচিব বললেন, বসুন।

আমি একটা চেয়ার টেনে তার মুখোমুখি বসলাম।

বসতেই মুখ্যসচিব বললেন, আপনি তো জানেন পার্থ একজন দলত্যাগী।

বললাম, জানি।

— আপনি কি জানেন একজন দলত্যাগী মাত্রই আমাদের ঘোর শত্রু। ফলে পার্থ আমাদের আর মিত্র নয়। শত্রু।

— কিন্তু পার্থ যে আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু!

— তা হতে পারে। কিন্তু এখন আর সে আপনার বন্ধু নয়, শত্রু। অতএব তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া আমাদের কাজ।

আমি একথা শুনে আঁতকে উঠলাম, কী বলছেন আপনি!

মুখ্যসচিব বললেন, আমি ঠিক কথাই বলছি। পার্থ ইতিমধ্যে কী করেছে তা জানেন?

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী করেছে?

— আমাদের সাতজন আমিষাশীকে টাকার লোভ দেখিয়ে নিরামিষাশী করেছে।

— তাই নাকি?

— হ্যাঁ। এখন আপনাকে নিরামিষাশী করতে চাইছে। কথাটা কি ঠিক?

আমি আমতা আমতা করে বললাম, ঠিক। কিন্তু আপনি কী করে একথা জানলেন?

মুখ্যসচিব হেসে বললেন, আমার কাছে সব খবরই আসে। আপনি জেনে রাখুন, ওদের মধ্যে আমাদের গুপ্তচর আছে। অবশ্য আমাদের মধ্যেও ওদের গুপ্তচর আছে। ধরা পড়লে আমরা সেই গুপ্তচরকে মেরে ফেলি। ওরাও মেরে ফেলে।

আমি চমকে উঠলাম, এতো খুব ভয়ংকর কথা।

মুখ্যসচিব বললেন, দলকে মজবুত করতে হলে এসব করতে হয়। আপনিও বিপদে পড়ে যাচ্ছিলেন। খুব জোর বেঁচে গেছেন।

— কেন?

— আপনার প্রথম অপরাধ আপনি একজন দলত্যাগীর সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছেন। দ্বিতীয় অপরাধ, আপনি আমার ডাক উপেক্ষা করেছেন। আমার ডাকের চেয়ে টিভি দেখাটাই বড়ো হয়ে উঠেছিল। আমাকে উপেক্ষা করা যে কত বড়ো অপরাধ তা আপনি জানেন না। আপনি বেঁচে গেছেন শুধু একটা কারণে।

জিজ্ঞেস করলাম, কী কারণ?

— আপনি যে পার্থর ডাকে নিরামিষাশী হননি তার জন্য।

ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এলো। বললাম, আপনি করুণাময়, আমি শুধু অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে আপনার কাছে কোনো কথাই গোপন থাকে না। মুখ্যসচিব আমার কথা শুনে হাসলেন। হেসে বললেন, তবে আপনাকে শুধু একটা উদ্দেশ্য নিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছি।

আবার আমার মধ্যে ভয় ফিরে এলো। জিজ্ঞেস করলাম, কী উদ্দেশ্য?

মুখ্যসচিব বললেন, পার্থ আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে। — বলে একটা রিভলবার আমার হাতে তুলে দিলেন।

আমি হতভম্ব হয়ে রিভলবার হাতে নিয়ে বললাম, এই রিভলবার নিয়ে আমি কী করব?

মুখ্যসচিব চোয়াল শক্ত করে বললেন, পার্থকে খুন করতে হবে।

বললাম, পার্থ এখনও আমার বন্ধু। আমি একাজ করতে পারব না। অসম্ভব।

— তাহলে আপনি খুন হবেন। আপনি এবার বেছে নিন কী করবেন।

আমি কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেললাম।

।। ৬ ।।

কী করব আমি? আমি মরতে ভয় পাই না। কারণ আমি ছাড়া বাড়িতে আমার ভাই আছে, বোন, বাবা-মা, তাদের নিয়ে বাঁচতে পারবে। আমি মারা গেলে তাদের দুঃখ হবে ঠিক, কিন্তু আস্তে আস্তে তারা সে দুঃখ সামলে উঠবে। আর পার্থ মারা গেলে ওর মা-র কী হবে? বিধবা মা। পার্থ ছাড়া তার আর কেউ নেই। তার কাছে পার্থই সব। আমি কী এই পার্থকে মারতে পারি? পারি না। পারা সম্ভব নয়। তাহলে? তাহলে আমাকেই মরতে হবে। ঠিক আছে। তাই হবে। তবে মৃত্যুর আগে একটি মেয়েকে ভালোবাসার ইচ্ছে ছিল, ইচ্ছে ছিল তাকে নিয়ে আইসক্রিম খাব। ইচ্ছে ছিল তাকে নিয়ে সুন্দরবন ঘুরে আসব। ইচ্ছে ছিল তাকে নিয়ে আইফেল টাওয়ারের মাথায় উঠব। কিন্তু কপাল খারাপ। আজ পর্যন্ত সেরকম কোনো মেয়ের সঙ্গে আলাপ হলো না। মৃত্যুর আগে কাউকে না ভালোবেসে মরার ইচ্ছে আমার নেই।

একদিন মুখ্যসচিব ফোন করলেন, কাজ কতদূর এগোলো?

মিথ্যে কথা বললাম, এগোচ্ছে।

মুখ্যসচিব বললেন, সাবধানে থাকবেন।

— কেন?

— আপনাকে খুন করার জন্য পার্থকে ব্যবহার করা হবে।

— কেন?

— পার্থর কথা শুনে আপনি ওদের দলে যাননি বলে।

— কিন্তু আমার এই মুহূর্তে মরার ইচ্ছে নেই।

— তাহলে আগে পার্থকে খুন করুন। দেরি করবেন না। আর একটা কথা।

— কী!

— সঙ্গে সবসময় রিভলবার রাখবেন।

— রাখব। — বলে ফোন বন্ধ করে দিলাম।

প্রথমে কথাটা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তারপর ভেবে দেখলাম, পার্থকে খুন করার দায়িত্ব যদি আমার কাঁধে চাপে, তাহলে আমাকে খুন করার দায়িত্ব পার্থর কাঁধেও চাপতে পারে। আবার আমি যেমন পার্থকে খুন করতে চাইছি না, পার্থও হয়তো আমাকে খুন করতে চাইছে না। আমার মতোই খুন করতে বাধ্য হচ্ছে। আমাকে এখন অপেক্ষা করতে হবে।

।। ৭ ।।

একদিন ঠিক করলাম পার্থকে ফোন করব। ওর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার। কিন্তু তার আগেই পার্থ আমাকে ফোন করল।

— হ্যালো...

— তোর সঙ্গে দরকার আছে।

— আমারও তোর সঙ্গে দরকার আছে।

— তাহলে সামনের রবিবার বিকেল পাঁচটায় আমরা দেখা করব।

— কোথায়?

— ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সামনে।

— এটাই হয়তো আমাদের শেষ দেখা।

— হয়তো।— বলে পার্থ ফোন বন্ধ করে দিল। দেখতে দেখতে রবিবার এলো। আমি ঠিক পাঁচটার সময় পকেটে রিভলবার নিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সামনে এসে হাজির হলাম। দেখি, পার্থ আগেই চলে এসেছে। জিজ্ঞেস করলাম, কতক্ষণ হলো এসেছিস?

পার্থ বলল, পাঁচ মিনিট।

বললাম, এখানে একটু বসবি?

পার্থ বলল, না। বরং একটু হাঁটি।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে একটা বড় গাছের তলায় এসে দাঁড়ালাম। চারপাশ ফাঁকা। কেউ কোথাও নেই।

পার্থ জিজ্ঞেস করল, তোকে কেন এখানে ডেকে এনেছি জানিস?

— জানি।

— কী জানিস?

— আমাকে খুন করবি বলে।

সঙ্গে সঙ্গে পার্থ রিভলবার বের করে আমার দিকে তাক করে বলল, তাহলে তৈরি হ।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে রিভলবার বের করে তার দিকে তাক করে বললাম, তুইও তৈরি হ।

পার্থ হেসে বলল, জানতাম তুইও এরকম একটা কিছু করবি। কিন্তু আমার যে মরার ইচ্ছে নেই।

— কেন?

— আমি একটা মেয়েকে ভালোবাসি। তার জন্য আমি মরতে চাই না। তুই আমাকে ছেড়ে দে। তার সঙ্গে আজ আমার দেখা হওয়ার কথা। আজ আমরা একসঙ্গে সিনেমা দেখব। তুই আমার বন্ধু। তুই আমার কথা রাখ।

আমি তা শুনে বললাম, তাহলে তুই আমার কথা শোন।

পার্থ জানতে চাইল, কী কথা?

বললাম, আমিও ভালোবাসা চাই। কোনো মেয়ের ভালোবাসা না পেয়ে মরতে পারব না। তুই আমার বন্ধু। তুই আমাকে মারিস না। আমার কথা শোন।

পার্থ চিন্তায় পড়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, তাহলে আমরা এখন কী করব?

হেসে বললাম, কী আর করব! এখন আমরা ঝালমুড়ি খাব। ■

MUNJAL SHOWA

Munjal Showa Ltd. is the largest manufacturer of Shock Absorbers, Front Forks, Struts (Gas Charged and Conventional) and Gas Springs for all the leading OEM's in 2 Wheeler/4 Wheeler Industry in the Country. Manufactured Products conform to strict its standard for Quality and Safety. Company's Products enjoy reputation for Smooth, Comfortable, Long-Lasting, Reliable and Safe Ride. The Company is QS 9000, TS – 16949, ISO 14001, OHSAS 18001 and TPM Certified Company. MSL has technical and financial Collaboration with Showa Corporation Japan.

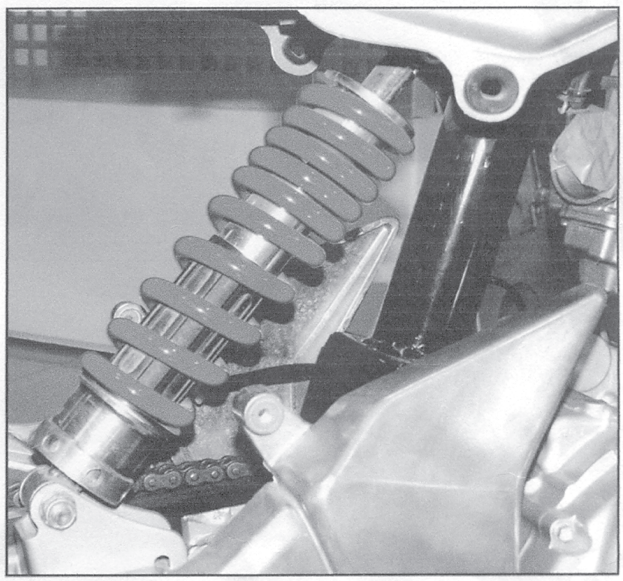

TPM Certified Company

ISO / TS - 16949 – 2002 Certified

ISO - 14001 & OHSAS – 18001 Certified

Our prestigious Client List :

- Hero MotoCorp Ltd.
- Maruti Suzuki India Ltd.
- Honda Cars India Ltd.
- Honda Motorcycle & Scooter India (P) Ltd.
- India Yamaha Motor Pvt. Ltd.

Our Products

- **Struts/Gas Struts**
- **Shock Absorbers**
- **Front Forks; and**
- **Gas Springs**

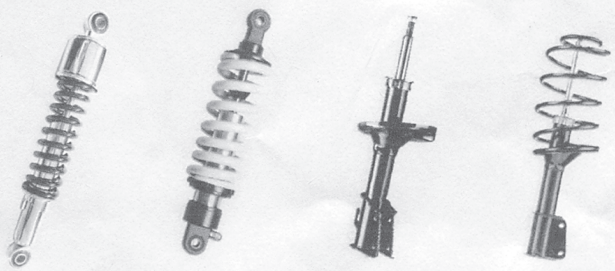

MUNJAL SHOWA LTD.

• Plot No. 9 – 11, Maruti Industrial Area, Gurgaon. Tel. No. : 0124 – 2341001, 4783000, 4783100
• Plot. No. 26 E & F, Sector – 3, Manesar, Gurgaon Tel. No. : 0124 – 4783000, 4783100
• Plot No.1, Industrial Park – II, Village Salempur, Mehdood – Haridwar, Uttarakhand Tel. No. : 0124–4783000, 4783100

সমাপ্তি

এষা দে

কেউ বিশ্বাস করবে এগারো বছরের ছোট্টখাট্টো সইফুদ্দিন, যাকে দেখলে মনে হয় ন'সাল, কোরান মুখস্ত করে হাফিজ হয়েছে। অথচ সেটাই ঘটনা। তাকে ঘিরে আব্বা আম্মির কত গর্ব, কত আশা। এমনিতে তাদের কোনো অভাব নেই। শুখা সিস্তানে হেলমন্দ নদীর দুধারে যে সবুজ আছে তারই মধ্যে অব শিরিন গাঁয়ে তাদের জমিজিরেত, বসবাস। ক'পুরুষের ফল বাগিচা আর গেহু ভাঙার কলের মালিকানায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সংসার। তবে কিনা সৈয়দ বলে কথা। খোদ রসুল হজরত মহম্মদের সিধা ওয়ারিশ। সিলসিলা আছে। বাবা মকতবে পড়া, আরবিতে দুরস্ত। তিনি নিজে সইফুকে তালিম দিয়েছেন। সইফুদ্দিন বড়ো হয়ে যেন দানেশমন্দ ইমাম কী উজির হতে পারে। ইন্‌শাল্লা। তার জন্য আরও তালিম চাই। এই সিস্তানে সেরকম মাদ্রাসা কোথায়! যেতে হবে সেই বলক্ বা সমরখন্দ। কিন্তু সইফুকে দূরে পাঠাতেও মন চায় না আম্মির। তার আগে চার চারটে লেড়কা লেড়কি হয়েছিল, কেউ পাঁচ সাল বাঁচেনি। সবই খোদাতাল্লার মরজি। বলে খোদা চাইলে সব সম্ভব, এখানেই সইফুর ভবিষ্যৎ খুলে যেতে পারে। আব্বু তর্ক করেও তাকে বোঝাতে পারে না।

আম্মার কাছে কোলের ছেলে হলেও এগারো সাল তো কম উমর নয়। আব্বু তাকে কাছে বসিয়ে বলল, 'বেটা গেহু পেষার কল, জমিনবাগিচা এসবেরই তুই মালিক হবি। এখন থেকে দেখাশুনা

করতে শেখ।' বাধ্য ছেলে বাপের কথা শুনে কামকাজ শিখছে। বাকি সময় ইচ্ছে মতো গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায়। অবশ্য যাওয়ার জায়গা বিশেষ নেই অব শিরিনে। সেদিন সুরজ পশ্চিমে ঢলছে। আবার সেই পাগলা সোহরাব তাকে পাকড়ে ফেলে। গাঁ সুদ্ধু ছেলেপুলের নানা সোহরাব দেখতে একদম বুচ্চা, উমর কত কেউ জানে না। নিজে বলে সও সাল। আসলে নাকি তার অর্ধেক। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। এ গাঁয়ে তার চোদ্দ পুরুষের বাস। সোহরাবকে জনম দিয়ে তার আম্মি মারা যায়। মানুষ করে দাদি। বাপ আবার শাদি করে, তার ক'টা সৎ ভাই-বোনও আছে, আছে চাচা খালা সব। কারও কাছে সে বরাবর থাকেনি। কোনোদিন খালার বাড়িতে দুটো রুটি, শালগমের ঝোল চেয়ে খায়, কোনোদিন চাচা তাকে ডেকে ক'টা বাদাম আর এক বাটি দই দিত। ক্রমে তার বয়স হয়ে গেল। এখন চাচা খালার নাতিপুতিরা খেতেটেতে দেয়, বেমার হলে দাওয়াই। শীত গ্রীষ্ম তার রুটিনে ভেদাভেদ নেই। পরনে সেই টুটাফাটা লম্বা জোব্বা আর ছেঁড়া একটা ফেজ টুপি। ঠাণ্ডায় একটা কাংড়িতে আগুন নিয়ে জোব্বার মধ্যে রেখে বসে থাকে। সারাক্ষণ নিজের মনে বকবক করে যায়। কোনো মাথামুণ্ডু নেই।

অথচ বাপ ছিল মুয়াজ্জিন, আজান হাঁকত পাঁচ দফা। সোহরাবকে মক্তবে ভর্তি করা হয়েছিল। আট সাল বয়সে দাদিও মারা গেল। সেই থেকে কেমন হয়ে গেল। কারও সঙ্গে বিশেষ বাতচিত করত না। চুপচাপ একলা বসে থাকত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আব্বা যত বোঝায়, 'আরে ইনসান হতে হবে। বিলকুল আনপঢ় হলে চলে! মুসলমান বলে কথা যা মক্তবে বস।' কিন্তু কোরান মুখস্ত করায় তার মন নেই, মন নেই কোনোরকম তালিমে। আর পাঁচটা লেড়কার সঙ্গে ঘুড়ি ওড়াতে যায় না। যখন পুরো জওয়ান হলো, মাথাটা পুরো বিগড়োল। নিজের মনে কী সব বিড় বিড় করত। আস্তে আস্তে বয়স বাড়ল, চুল সফেদ হলো। তখন আরও বাড়ল তার পাগলামি। জনে জনে ডেকে জিগ্যেস কর, 'শুনতে পাচ্ছ? ওই যে দূর থেকে কান্নার আওয়াজ? কোনো আওরত কাঁদছে। শোন শোন বলছে আহুরা ম্যাজ্‌দ আহুরা ম্যাজ্‌দ, বাঁচাও বাঁচাও।'

ছেলেবেলায় এ কিস্সা সইফুও শুনেছে। আব্বুকে প্রশ্ন করেছে, আহুরা ম্যাজ্‌দ মানে কী? প্রচণ্ড রাগ করে গর্জে উঠেছে আব্বু, 'খবরদার ফের যদি ওসব খারাপ বাত্ মুখে আনিস তো জিভ ছিঁড়ে ফেলব। ও নাম নেওয়াও গুনাহ। ব্যাটা মুরতাদ, আল্লার গজবে পড়বে। কবে সরকারের কানে পৌঁছবে, গর্দান যাবে। হারামখোরের বাত শুনলে আর পাঁচটা মোমিনও বরবাদ হবে।' সইফু তার সঙ্গীসাথীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, ব্যাপারটা কী রে? তাদেরও এক অভিজ্ঞতা। বড়োরা আহুরা ম্যাজ্‌দ শুনলেই ক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

আজ বাড়ি ফেরার পথে দেখে চারিদিকে কেউ নেই, মওসমও ফুরফুরে, না গরম না শীত। বিকেলের নরম আলোয় সোহরাব নানাকে অতটা বিকট লাগছে না। 'এই হাফিজ, এদিকে আয়, শুন, বাত শুন।' অন্যদিন কামকাজ বা পড়ালিখার বাহানা তুলে অন্য ছেলেদের মতো সইফুও নানার খপ্পর থেকে পালিয়ে যায়। আজ কী মনে হলো, বলল, 'কী বাত? তুমি সারাক্ষণ কী সব বল?'

'শুনতে পাস কোনো আওরত কাঁদছে? না, তুই কী করে শুনবি?' কোটরাগত কালচে নীল চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে ওঠে। তার রাতের আস্তানা কতগুলো আধভাঙা পাথরের ঢিবির মধ্যে। তার ফোকরে অর্ধেক সেঁদিয়ে যায়। 'যা যা তোর সঙ্গে কোনো বাতচিত নেই। তোরা আরবরাই তো ইরানিদের সর্বনাশ করেছিস।'

সইফু একেবারে হতবাক। হ্যাঁ, তারা সৈয়দ, আব্বু আরবিতে পণ্ডিত, সকলে ইজ্জত করে। কিন্তু সোহরাব নানা বা গাঁয়ের আর পাঁচজনের মতো তারাও তো ফারসিতে সর্বদা কথা বলে। তাহলে তারা আরব হয় কী করে? 'না, না, আমিও তো ইরানি, তোমার মতো।' আধপাকা চুল দাড়ি জোরে জোরে নাড়ে সোহরাব। 'ঝুট, ঝুট। যা তোর নানা-নানি দাদা-দাদিকে পুছতাছ করে জান গে তোরা কী। ব্যাটা সৈয়দের আওলাদ, তুই আবার ইরানি হলি কবে রে? যা যা ভাগ, ভাগ বলছি।'

হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে সোহরাব। এক দৌড় দেয় সইফু। পাগলা কী কখন করে বসে। কাউকে ঘটনাটা বলতে পারে না। সোহরাব নানার সঙ্গে বাতচিত একদম হারাম, আব্বাজান আম্মিজান পইপই করে বলেছেন। তাহলে কাকে জিজ্ঞেস করবে! তার দাদা দাদির তো কবে ইন্তেকাল হয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, নানি আছে, মামুদের সঙ্গে থাকে। সিস্তানেই, হামুন দরিয়ার ধারে। নানি নিশ্চয় জানবে। ফির সাল এক বার ওখানে এক মাহিনা থাকে সইফু। সেখানেও তার খুব আদর। পরের বার মামুর বাড়ি গেলে জিজ্ঞেস করবে।

বড়ো মামু আসে আব্বা আম্মির সঙ্গে দেখা করতে। গপসপ করে, মোঙ্গল তাতার তুর্কিদের গালি দেয়। অসভ্যদের দাপটে ইরানিদের দুরবস্থার জন্য হাহুতাশ করে। আব্বু বলে 'তোমরা ইরানি বলে খুব অহংকার কর, অথচ ইরানি একটা জাত নয়, তুর্কি মোঙ্গলরা তবু তো এক একটা জাত। যেমন আরব একটা জাত। তোমরা তো পাঁচমেশালি খিচুড়ি। কবে কোন কালে গ্রিক বীর পারসিউসের আওলাদ পেরেস-এর থেকে পরস নামে এক জাত হয়েছিল, তাদের রাজা সাইরাস আকিমিদ বংশের পত্তন করেন। তাই দুনিয়া আমাদের পারসি বলে, এ মুলুককে বলে পারস্য। অথচ তোমরা নিজেদের বল ইরানি।'

‘দুলাভাই, আমাদের বুলি পারিস ’ ফারসি, জাতে আমরা বরাবর ইরানি।’ আম্মি হেসে বলে বকওয়াস বন্ধ কর, খানা তৈয়ার। পরদিন তার সঙ্গে সইফু মামাবাড়ি যায়।

।। দুই।।

তখন শীত কাল শেষ হতে চলেছে। রাতে এখনও রেজাই কম্বল লাগে। নানা-নানির বিছানায় তার শোওয়া চাই। নানা তো নেই, তার জায়গাটা খালি। নানির গায়ের ওমে কী আরাম। প্রতি রাতে নানি কত কিস্সা বলে, শুনতে শুনতে কখন তার চোখ বুজে যায়, নিদ আসে ঘুমের মধ্যে কোনটা কিস্সা কোনটা খোয়াব আলাদা থাকে না, মিলেমিশে যায়। একরাতে মামু ঘরে নেই, হেরাটে গেছে কারবারের কাজে। মইনুদ্দিন নানিকে জিজ্ঞাসা করে, ‘আচ্ছা নানি, তুমি আহুরা ম্যাজ্‌দ-এর নাম শুনেছো?’

চমকে ওঠে নানি। ‘কী, কী বললি? আহুরা ম্যাজ্‌দ! কোথায় কার কাছে এ নাম শুনলি?’

একটু ভড়কে যায় সইফু। এই রে, নানিও বুঝি আব্বু আম্মির মতো রাগ করবে, বকবে। আস্তে আস্তে সোহরাব পাগলার কথা বলে। নানি চুপ করে থাকে। বেগতিক দেখে কথাটা ঘোরাতে অন্য প্রসঙ্গে চলে যায় সইফু।

‘ঠাণ্ডা চলে যাচ্ছে, কী সুন্দর নীল আশমান এখন, সারাদিন ধুপ।’

এবার নানি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে বলে, ‘অনেক অনেক কাল আগে এসময় উৎসব হতো। আমিও দেখিনি। আমার নানি তার নানি, তার নানির কাছ থেকে শুনেছে। তখন আমাদের আলাদা ইমান ছিল। অন্য খোদা ছিল। আমরা নমাজ পড়তাম না, আল্লার নাম নিতাম না। হ্যাঁ, সচ্। কাউকে বলিস না। শুধু আমাদের গাঁয়ে নয়, সারা ইরানশহর, ইরানজমিন জুড়ে ছিল অন্য খোদা। তারই নাম আহুরা ম্যাজ্‌দ, প্রভু শ্রেষ্ঠ মেধা, তিনি আলোক, তিনি মঙ্গল, যা কিছুর শুভ সব। তাঁর রসুল ছিলেন জরাথুস্ত্র। কোরানের মতো তাঁর সব কথা লেখা ছিল কিতাবে, তাকে বলত জেন্দ আভেস্তা।’

সইফুদ্দিন স্তম্ভিত, বলে ওঠে, ‘মাশআল্লা! সে কী করে হবে! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো। আল্লা ছাড়া আর কোনো খোদা নেই। নবি হজরত মহম্মদ তাঁর একমাত্র রসুল।’

‘আরে, দুনিয়ার উমর তো হজরত মহম্মদের চেয়ে ঢের ঢের বেশি। তাঁর জন্মের আগে হাজার বছর ধরে এক বিশাল ইরানি সাম্রাজ্য ছিল, সারা দুনিয়ায় মশুর, তার কত ইজ্জত কত কীর্তি। আমাদের নবি জরাথুস্ত্রকে দেখা দিয়েছিলেন প্রভু শ্রেষ্ঠ মেধা। তিনি যা বলেছিলেন সব লেখা হয়েছিল। তখনকার জবান পহ্লবিতে, নিজস্ব হরফে। মসজিদ আমাদের এবাদতখানা ছিল না, ছিল মন্দির। সেখানে হরবখত আগ্ জ্বলত। আগ হচ্ছে পুণ্য, পবিত্রতার প্রতীক, মন্দিরকে বলত আগিয়ারি। এই সিস্তান ছিল জরাথুস্ত্রীদের তীর্থ। তাকে বলত সেইয়ানা। আরবদের দেওয়া নাম সিস্তান। আমাদের ধরমে কোনো ভয়ডর ছিল না, মারামারি ছিল না, ছিল আনন্দ, পেয়ার। সৎবাক্য সৎকর্ম সৎ চিন্তা। ব্যস, এই হলেই জিন্দগি সুখশান্তির। হর মরশুমে ফসল বোনা, কাটা, ঘরে তোলা, সব কিছু নিয়ে আমাদের ‘গাহানবার’ বা উৎসব হতো। কত শাহেনশাহ এ ধরম পালন করে গেছেন সাইরাল দারিউস জেরেক্সেস। হাজার সাল ধরে পুরা ইরানজমিন ছিল এখান থেকে সেই সমরখন্দ বোখারা পর্যন্ত। সর্বত্র আহুরা ম্যাজ্‌দকে মানত, সক্কলে ছিল জরাথুস্ত্রী। আমরা কত কী কীর্তি হাসিল করেছিলাম। সারা দুনিয়া আমাদের তারিফ করত।’

একেবারে স্তম্ভিত সইফু। বরাবর শুনে আসছে ইসলাম প্রবর্তনের আগের সময় ছিল খুব খারাপ। তাকে বলে জাহিলিয়া, সেটা অন্ধকার যুগ, যার থেকে নবি আমাদের উদ্ধার করেছেন। সেসব কথা সত্যি নয় তা কি হয়! নানিকে জিজ্ঞাসা করে, ‘তারপর কী হলো?’

নানি আবার খানিকক্ষণ চুপ। পরে আস্তে আস্তে বলে, ‘ইরানিদের বদনসিব। আরব মুলুকে নবি হজরত মহম্মদের ওপর ওহি, আল্লার বাণী অবতীর্ণ হলো। তার নাম ইসলাম। আরবরা মুসলমান হয়ে নিজেদের মুলুকের বাইরে অনারবদের দেশে হামলা চালাতে লাগল। প্রথমেই আমাদের সাম্রাজ্য আক্রমণ করল। সে এক ভয়ংকর ইতিহাস। কত জরাথুস্ত্রী খুন হলো তার হিসাব নেই। রিয়াসাত হাতিয়ে নিয়ে সরকার হয়ে বসল আরব মুসলমানরা। জ্বালিয়ে দিল জরুথুস্ত্রী পুঁথিপত্তর। ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল আগিয়ারি। তাতেও শান্তি নেই হানাদারদের। কত রকমের যে অত্যাচার চালালো সব বলাও যাবে না।’

‘না, না। বল আমি জানতে চাই নানি। ইসলাম মানে তো আত্মসমর্পণ, শান্তি। তাহলে মুসলমান হয়ে আরবরা কেন এমন করত?’

‘জানি না রে। আমি তো আরবি জানি না। নমাজ আদা করি তোতা পাখির মতো। তুই তো কোরান মুখস্ত করেছিস! তুই খুঁজে দেখ অমুসলমানদের প্রতি কী আচরণের নির্দেশ আছে।

সইফুদ্দিনের কোরান কণ্ঠস্থ বটে, কিন্তু প্রতিটা সুরা বা আয়াতের অর্থ তার জানা নেই। তবে এটুকু জানে, স্বয়ং নবি কত যুদ্ধ করেছিলেন যারা ওহিতে বিশ্বাস করে না সেই সব অংশীদার কাফেরদের সঙ্গে, ভেঙেছিলেন তাদের মন্দির। জিজ্ঞাসা করে, ‘আরবরা ফতে করলে সবাই তাদের মতো মুসলমান হয়ে গেলেই তো হলো। ব্যস আর কী অসুবিধা?’

‘ইরানিরা তো আরব নয়, তারা কেন চোদ্দপুরুষের ধরম ছাড়বে? না ছাড়লে

তখন তাদের কাছ থেকে জিজিয়া কর আদায় করত মুসলমানরা। যারা জিজিয়া দিত তাদের আরবরা ভারি হতশ্রদ্ধা করত। আর জিজিয়া না দিলে তো সটান গর্দান। ইরানি মেয়েদের জোর জবরদস্তি করে তুলে নিয়ে যেত। আরবদের রাজত্বে ইরানিদের সরকারি চাকরি মিলত না, মজুর কারিগরেরা কাজ পেত না মুসলমান না হলে। কোনো বিচার ছিল না। হাজার সাল যে মাটিতে তাদের পূর্বপুরুষ হেসেখেলে বাস করেছে, সেই বেহেস্ত ইরানিদের কাছে দোজখ হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে তারা আহুরা ম্যাজ্‌দ আর জরাথুস্ত্রকে ছেড়ে আরবদের আল্লা আর হজরত মহম্মদকে তাঁর রসুল হিসাবে মানল। হলো মুসলমান। অনেক পুরোহিত বড়োলোক ইরানি ধরম বাঁচাবার জন্য মুলুক ছেড়ে বাইরে পালিয়ে গেল। বেশিরভাগ গেল হিন্দ-এ, সেখানে গিয়ে ধরম বাঁচাল।'

'আমার বিলকুল তাজ্জব লাগছে। এ সব কেউ জানে না! আমি তো কারো কাছে ইরানিদের আলাদা ধরম, জরাথুস্ত্র, আরব হামলা, জিজিয়া করের কথা শুনিনি!'

নানি আস্তে আস্তে বলে, 'আমাদের ভুলতে বাধ্য করা হয়, যাতে আমরা কী ছিলাম যেন জানতে না পারি। জানলে পাছে আবার যদি ধরমে ফিরে যেতে কোশিশ করি।'

'তুমি কী করে জানলে?'

'আমার নানির নানির নানি ছিল এমনই এক জরাথুস্ত্রী আওরত, যাকে আরব হানাদার তুলে নিয়ে গিয়েছিল, জবরদস্তি করে কলমা পড়িয়ে নিকাহ করেছিল। আওরতের পেটে একবার বাচ্চা এসে গেলে তার বাচ্চার বাপের কাছ থেকে আর রেহাই নেই। রেহাই নেই দুশমনের ধরম থেকে। এভাবেই কত ইরানি আওরত মুসলমান হতে বাধ্য হলো। আর নিজের ধরমের সন্তানের জনম দিতে পারল না। জরাথুস্ত্রীদের সংখ্যা কমতে লাগল। নানি খুব কাঁদত, লুকিয়ে লুকিয়ে একা একা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে যেন কেউ শুনতে না পায়। প্রভু শ্রেষ্ঠ মেধা এ কোন শয়তান আহ্‌রিমান, কোন অন্ধকারের অশুভের, দানবের পায়ে আমাদের সমর্পণ করলে? কোথায় তোমার ফেরেস্তারা? নানি তার লেড়কিকে বলেছে, সে তার লেড়কিকে। এইভাবে সও সও সাল ধরে আমরা ইরানি আওরতরা জানি।'

'তুমি তোমার লেড়কিকে বলেছো? আম্মিকে?'

'বলেছি। তখন ও ছোটো। তারপর ওর শাদি হয় সৈয়দের সঙ্গে। তাই ও ভুলে থাকে। তাছাড়া ওর তো লেড়কি নেই। কাকেই বা বলবে। এ পরিবারে আমার সঙ্গে সঙ্গে আহুরা ম্যাজ্‌দ-এর স্মৃতিও হারিয়ে যাবে। মরেও আমার শান্তি হবে না।'

চুপ করে থাকে সইফুদ্দিন। মনটা বড়ো খারাপ হয়ে যায়। সে জানে আল্লা একমাত্র উপাস্য, হজরত মহম্মদ তার একমাত্র রসুল। যারা অবিশ্বাসী তাদের সঙ্গে লড়াই করে বিশ্বাসী করতে হয়। জরাথুস্ত্রীদের তো ইসলাম নিতেই হতো। আবার চায় তার নানি যেন শান্তি পায়। হঠাৎ একটা ভাবনা তার মাথায় আসে। নানি তো একলা নয়। তার মতো অনেক নানি-দাদি মুসলমান হয়েও মনে মনে আহুরা ম্যাজ্‌দ-এর কথা ভাবে। ভাবে সেই হাজার বছর আনন্দে মাথা উঁচু করে বাঁচার কথা, যখন আরব তুর্কিরা তাদের ওপর রাজ করত না। পাগলা সোহরাব আদতে পাগলা নয়। কে জানে কত সোহরাব এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে। কত ইরানি মনে মনে আহুরা ম্যাজ্‌দ-এর নাম করে, দুঃখ করে সেই খোলামেলা আনন্দের জিন্দগি হারিয়ে গেল বলে। মানে মুসলমান হয়েও তারা এত সাল ধরে ইসলামে পুরা খুশ হতে পারেনি। এ তো ভয়ংকর ব্যাপার। সে রাতে ভালো নিদ হয় না সইফুর। তার আর মন লাগে না নানির আদর যত্নে।

মামাবাড়ি গিয়েছিল এক বালক। ফিরে এল এক সাবালক। এক রাতে যেন সে লায়েক হয়ে গেছে। কাউকে সইফুদ্দিন এসব কথা বলতে পারে না। আব্বুর সঙ্গে যথারীতি কামকাজ করে, বাগিচায় আগাছা সাফ করে, মাটি খোঁড়ে, নারাঙ্গি খেজুর পাকলে পেড়ে জড়ো করে। আঙুরের মতো ফল আবার শুখাতে হয়। কিশমিশ হবে। বাকি সময় কোরান নিয়ে বসে। প্রতিটি আয়াত প্রতিটি সুরা বারবার পড়ে। না, মুখস্ত তো তার হয়েই আছে। এখন নিঃশব্দে পড়ে। প্রতিটি কথার অর্থ, তার সব রকম উপলব্ধি কী হতে পারে। আম্মি মাঝে মাঝে বলেন, 'একটু বাইরে বেড়িয়ে আয় না। সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে পাঁচটা গপসপ কর গিয়ে। সারাক্ষণ কাজ আর পড়া নিয়ে থাকলে আদমির দিমাগ ঠিক থাকে!' মৃদু হাসে সইফুদ্দিন। 'আমার দিমাগ বিলকুল ঠিক আছে, থাকবে। তুমি ফিকর করো না।'

শুধু আম্মি নয়, গাঁয়ের পাঁচজন বয়স্করাও ওই এক বাত বলে। বাপ ঠিক করে ছেলে যোল সাল হলেই শাদিনিকাহ দিয়ে দেবে। ঘরে একটা ছোট্ট খুবসুরত বিবি থাকলে দেখি কত কিতাব মুখে করে থাকতে পারে! কিন্তু তকদিরে কী লেখা কে বলতে পারে। সইফুর যোলো সাল হতে না হতে তল্লাট জুড়ে কী একটা অজানা বেমারি লাগল। গাঁয়ের অনেক মানুষের সঙ্গে সেই মড়কে আব্বা আম্মা দুজনেরই ইন্তেকাল হয়ে গেল।

।। তিন।।

আল্লার কী মরজি, সইফুর কিচ্ছু হলো না। কেন হলো না? তবে কী আল্লা চান না এই জমিজিরেত পেষাই কলের দুনিয়াদারিতে জিন্দগি না কাটিয়ে সে অন্য কিছু করুক। যা জানতে চাইছে, কোরানের নিগুঢ় অর্থ, তার তালাশ করুক। অবস্থা স্বাভাবিক হলে শহরের

এক কারবারিকে তার বাগবাগিচা পেযাই কল সব বেচে দেয়। টাকাকড়ি পরনের লম্বা ঢিলা পোশাকে সেলাই করে লুকিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। আব্বুর যত্ন করে রাখা ক'পুরুষের পুরনো চামড়ায় লেখা বিশাল কোরান সঙ্গে বইতে পারল না বলে বড়ো আফশোষ। দিয়ে দিল মক্তবে। সঙ্গে খালি একটা লাঠি, আর এক প্রস্থ পোশাক, একটা বদনা আর হালকা রেজাই। মড়কে পাগলা সোহরাব খতম হয়নি। সে আরও একটা জিগির বানিয়েছে, 'দেখ ইরানি দেখ, আল্লার পাঠানো আরব তাতারদের রাজত্বে কত ভালো আছিস।' তার ফোকরটা পাশ দিয়ে যেতে যেতে সঙ্কল্প করে, আর কাউকে সোহরাব নানার মতো পাগলা হতে দেব না। ইসলাম মানে সমর্পণ, সম্পূর্ণ সমর্পণ। করম ধরম শাদিনিকাহ ঘরগিরস্থি সব ইসলামের বিধান অনুযায়ী শাসিত হবে, কোনো অতীত থাকবে না, থাকবে না অন্য কোনো জীবনের স্মৃতি। থাকবে না ভিন্ন জীবনের কোনো স্বপ্ন। তার জন্য সইফুকে আরও গভীর ভাবে কোরান বুঝতে হবে।

কাউকে কিছু না বলে তার যাত্রা শুরু। প্রথমে পৌঁছয় বলখ্, হিন্দ-এর লোকেরা বলে বাহ্নিক। সেখান থেকে সমরখন্দ। দু-জায়গাতেই তার স্থান হয় মাদ্রাসায়। বড়ো সুবিধা খরচ নেই। এতদিন কোরান মুখস্থ করেছে। এখন তার প্রতিটা সুরা প্রত্যেকটি রুকু, প্রত্যেকটি আয়াতের ব্যাখ্যা শোনে। পড়ে হাদিস, ফিকহা। মুসলিম রাষ্ট্র দেশ সমাজ পরিবার সব একসূত্রে গাঁথা, ইসলাম ধর্মে। শেখে রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতি, ভালো করে আয়ত্ত করে ইসলামের আইনকানুন। যত শেখে তত বাড়ে তার অতৃপ্তি। না, কোনো আয়াত অবিশ্বাসের প্রশ্নই ওঠেনি। এ সবই 'ওহি' আল্লার প্রেরিত ফেরেস্তা জিব্রাইলের মারফত স্বয়ং নবির কাছ থেকে প্রাপ্ত। তার শুধু মনে হয়, আরও গভীর কোনো অর্থ আছে, যা ব্যাখ্যা শুনছে সেটাই সব নয়। কিন্তু সেটা কী!

আবার বেরিয়ে পড়ে সইফুদ্দিন। সেটা ইসলামের স্বর্ণযুগ। চারিদিকে উলেমা পণ্ডিত জ্ঞানী। দানেশমন্দ ক'জনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় সইফুদ্দিনের। দুনিয়ার মানুষ কত রকম কী বিশ্বাস করতে পারে, কিন্তু একজন নবি আর কিতাব না হলে তা গ্রাহ্য নয়। তাঁদের পায়ের তলায় বসে সে অনেক শেখে। নবি হজরত মহম্মদের আগে দুনিয়ায় আরও দুজন নবি জন্মেছিলেন, মুসা আর ইসা। আরবের কাছাকাছি সব দেশে। তাঁদের বাণীও কিতাবে লেখা। তাই ইহুদি আর ইসাহিকে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু আহুরা ম্যাজ্‌দ-এর নাম সইফুদ্দিন এঁদের মুখেও শুনল না। অথচ জরাথুস্ত্র তো পহেলা নবি, তাঁর বাণীরও তো কিতাব আছে। তাহলে তাঁকে কবুল করা হয় না কেন? একদম উপরওয়ালার কাছে যাবে জানতে।

তখন খিলাফত বাগদাদে। কী বিরাট শহর। সইফুর তো চোখ ধেঁধে গেল। সবচেয়ে তার মন কাড়ল সেখানকার বিশাল জ্ঞানভবন। একেবার তাজ্জব। খলিফার মেহমান হয়ে কত কিসিমের জ্ঞানীগুণী সেখানে সাল সাল বাস করে কত ভাষার পুরানা সব কিতাব তরজমা করে যাচ্ছেন, গ্রিক সংস্কৃত সিরিয়ান। গণিত জ্যোতির্বিদ্যা ভূগোল জ্যামিতি দর্শন চিকিৎসাশাস্ত্র— আরও কত কী? আশ্চর্য ব্যাপার, এই ভাণ্ডার যাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন সেসব প্রতিভারা ছিলেন মূর্তি পূজারি, বহু দেবদেবীর উপাসক। কেউ মুসলমান খ্রিস্টানদের মতো মূর্তিহীন একেশ্বরে বিশ্বাস রাখতেন না। তাহলে প্রাক ইসলাম যুগকে অন্ধকার যুগ বলি কেন? কেন অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা? তাদেরই অর্জিত জ্ঞান আমরা এত মূল্যবান মনে করি যে আজ খলিফা এই বিরাট আয়োজন করে রেখেছেন। শুধু এখানে নয়, সইফু শোনে অন্যান্য আরব শাসকরাও কাফেরদের কিতাব তরজমা করিয়ে যত্ন করে রাখেন। যেমন করা হয়েছে আল্ আন্দালুসে কর্ডোবায়। তাহলে আমরা জেহাদ হেঁকে মুজাহিদ হয়ে যাদের ধ্বংস করি আবার তাদের সৃষ্টি নিজেরা গ্রহণ করে লাভ করি জ্ঞান। এটা কী চুরি রাহাজানির মতো গুনাহ্ নয়?

মাথাটা গোলমাল লাগে সইফুদ্দিনের। কী করে এই তরজমা আন্দোলন হলো অনেককে জিজ্ঞাসা করে শেষে জানতে পারে এর মূল হচ্ছে ইরানিরা। জরাথুস্ত্রীদের আমলে সম্রাট আসুরবানিপাল গ্রিক সংস্কৃত ভাষায় লেখা অনেক জ্ঞানবিজ্ঞানের বই ফারসিতে অনুবাদ করান। আরবরা দখল নিয়ে সবাইকে মুসলমান করলে মুসলিম ইরানিরাই নয়া শাসকদের এই সব কিতাব আরবিতে তরজমা করে দিতে থাকে। এইভাবে শুরু। তারপর ইরানজমিনের উত্তরপূর্ব কোণে খাওয়ারাজেমে পুরো প্লাবন। মুসলিম পণ্ডিত মানেই বহুভাষাবিদ ইরানি।

অথচ এখানে আহুরা ম্যাজ্‌দ-এর নাম শোনে না সইফুদ্দিন। শোনে না জরাথুস্ত্রী কোনো জ্ঞানীর নাম। তার কাছে দুনিয়াটা যেন অর্থহীন। দিনের পর দিন তার নিদ হয় না। আজান শুনে নমাজ আদায়ে মন লাগে না। তার শরীর শুকিয়ে যায়, অর্ধেক দিন খাওয়া নেই।

এমন সময় এক ইরানি তরজমাকারী তাকে একটা কিতাবের কথা বলে। 'দার্শনিকদের অনৈক্য'। লেখক : আল্ গাজালি, বিশাল পণ্ডিত। বলা বাহুল্য, ইরানি। অনেক কষ্ট করে পড়ে। ভাগ্যিস। আহা মহাজ্ঞানী এই গাজালি। কেমন চমৎকার দেখিয়েছেন ও সব প্লেটো অ্যারিস্টটল যুক্তিবাদ সব তুচ্ছ। আসল হলো অতীন্দ্রীয় উপলব্ধি। দিল্ হচ্ছে সব, দিমাগ কিচ্ছু নয়। আল্লার প্রেমে আত্মবিসর্জনের মরমিয়া অনুভূতি। সুফির সাধনা। নবজন্ম হলো সইফুদ্দিনের। কিতাব পড়ালিখা তার

দরকার নেই। তার দরকার একজন মুরশিদ। যাঁর কাছে সে দীক্ষা নিয়ে হবে মুরিদ। কোথায় পাব তারে!

ফিরে আসে দেশের দিকে। পথে হেরাটে এসে শোনে সও মাইল দূরে চিসতি শহরে মস্ত খান্‌কা, অনেক সুফি সেখানে সাধনা করে। সিরিয়ার আবু ইশাক শামি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সুফি আশ্রমে তাঁর অষ্টম উত্তরাধিকারী মইনুদ্দিন হাসান এখন মুরশিদ, যে মইনুদ্দিন ন' সাল উমরে কোরান মুখস্থ করে মুসলিম দুনিয়ার কত পণ্ডিদের সঙ্গে ওঠাবসা করেছেন। তাঁর অনেক চেলা। সইফু তাঁর চরণে প্রণত। তিনি দীক্ষা দেন। চার দফা মুখে আল্লার নাম, মনে মনে আল্লার নাম, ধ্যান, ৪০ দিন একা নির্জনে সাধনা। আত্মাকে উপলব্ধি। হলো সুফি। মহাজ্ঞানী হাজালি ঠিকই বলেছেন, কাফেরদের অনুসরণে বিজ্ঞান দর্শন পড়ে যুক্তির ভিত্তিতে বহির্জগতকে পর্যবেক্ষণ করে কোনো সিদ্ধান্তে আসা অর্থহীন। ইসলাম মানে নিঃশর্ত প্রশ্নহীন আত্মসমর্পণ। বিশ্বাস, বিশ্বাসই সব। তর্কের অতীত মরমিয়া অনুভূতি। তিনি এও বলেছেন, অবিশ্বাসীদের বিশ্বাসী করার মহান ব্রত সুফিদের মারফতই ইসলাম তামাম দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

কিন্তু কী করে? বাগদাদে কয়েকজন ইশাহির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তাদের সঙ্গে বাতচিত করে সইফুদ্দিন জেনেছে ইশাহিদের এক বড়া ইমাম আছেন, রোমে থাকেন। তাকে পোপ নামে সব ইসাহি মানে। তাঁর ক্ষমতা ধনসম্পত্তি সব বিলকুল এক সুলতানের মতো। তিনি ইশাহি ধরম প্রচার করতে মুরিদদের চারিদিকে পাঠান। তারা শাদিনিকাহ করে না, সারা জীবন ধরমের কাজ করে। এদের বলে মিশনারি। এদের কায়দা খুব সোজা। কাফেরদের রাজ্যে গিয়ে তারা সিধা রাজার সঙ্গে দেখা করে ইশাহি ধরমের মাহাত্ম্য বোঝায় এবং রাজারানী ইশাহি হলে খোদ পোপ তাদের ইনাম দেবেন প্রতিশ্রুতি দেয়। রাজা ইশাহি হয়ে ফরমান জারি করেন প্রজাদের ইশাহি হতে। ব্যস, কেল্লা ফতে। ওমনি সেই রাজাকে পোপ সন্ত ঘোষণা করেন। একটা পুরো দেশ ইশাহি হয়ে যায়। জিজিয়া কর আদায়, আওরতদের তুলে নিয়ে শাদি, এসব ঝঞ্ঝাট করতেই হয় না। রাজার ধরম প্রজার ধরম হয়ে যায়।

কিন্তু মুসলমানদের তো পোপ নেই, কে পয়সা দিয়ে মিশনারদের মতো সুফিদের পাঠাবে দারুল হারাবকে দারুল ইসলাম বানাতে? বাগদাদে খলিফা তো আছেন তাঁর তরজমার শখ নিয়ে। কালি খাওয়ারাজেম নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা। সেখানকার ইরানিরা জ্ঞানীগুণী হয়ে ভারী নিজেদের কেউকেটা মনে করে। আরব আব্বাসিদ খলিফাকে আজকাল রেয়াতই করে না। খলিফার তাই চিন্তা কী করে খাওয়ারজেমকে শায়েস্তা করবেন। তাহলে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে জং লড়াই ছাড়া গতি নেই? কিন্তু লড়াইয়ের শেষে তো ওই নানির মতো, সোহরাবের মতো মুসলমান হবে, যারা শত শত বছরেও ইসলামকে মনে মনে পুরো মেনে নেয়নি।

।। চার।।

খান্‌কার আর পাঁচজন সুফিকে কিছু বলে না সইফু। কাছে মাদ্রাসার দুচার জন শিক্ষকদের আলাপ হয়েছিল তাদের সঙ্গে বাজারে শরবতখানায় আলোচনা করে। তাদেরও ভাবনাচিন্তা তারই মতো। তাদের মধ্যে ইরানি ফিরোজ বড়ো চালাকচতুর। তাকে পরামর্শ দিল, 'তুমি ঘুর্ চলে যাও, সুলতানের সঙ্গে দেখা কর, উনি কাফেরদের মুলুক দখল করে ইসলামের গৌরব জারি করার কাজ নিয়েছেন। ইসলাম প্রচারের কামিয়াব আদমি চান। হ্যাঁ, এসব বাত কাউকে বলো না। যাও চলে যাও।'

ইতস্তত করে সইফু। কোনোদিন আমির ওমরাহ ফৌজি জাতীয় মানুষজনের সঙ্গে তার জানপহচান বাতচিত নেই। কীভাবে হঠাৎ খোদ সুলতানের কাছে যাবে। 'আরে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আমি একটা চিঠা দিয়ে দিচ্ছি, সোজা চলে যাও। পয়সাকড়ি লাগবে তো? নাও, রাখ। আরে তুমি আমার ছোটো ভাইয়ের মতো। যাও যাও দেরি কর না। অনেকটা রাস্তা। শুনছি সুলতান আবার অভিযানে যাবেন। কবে বেরিয়ে পড়বেন, ধরতে পারবে না।'

অতঃপর সইফুদ্দিন পৌঁছায় রাজধানীতে, সুলতানের কিল্লায়। চারদিকে ফৌজি হাতিয়ারওলা ইয়া ইয়া মরদ দেখে ভয় ভয় করে। ফটকের সামনে যেতেই তাজ্জব, সশস্ত্র রক্ষী তাকে দেখে ভারী নরম সুরে বলে, আপনি সুফি? কোথাকার খান্‌কা? চিসতি? সুলতানের হুকুম আছে সুফি মাত্রেই সিপাহ্‌সলারের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে। চলুন।'

সইফু যেন স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে চলেছে। একটা কামরায় আবার এক ফৌজি। এর বয়স একটু বেশি, পোশাক আরও জমকালো। মুখখানা কেমন চ্যাপ্টা, কুতকুতে চোখ, নাকটা ইরানিদের মতো চোখা নয়। সইফু সালাম করে চিঠাটা দেয়। মাথা নেড়ে বলেন, 'হুম! আল্লাহর বাণী কাফেরদের কাছে পৌঁছে দিতে চান? বহোত খুব। সুলতান এমন আদমিরই তালাশ করছেন। বন্দোবস্ত সব আমরা করব। আল্লা তো আর সুফিদের ডানা দেননি যে সও সও মাইল উড়ে চলে যাবেন। এমন পেট দেননি দুবেলা খানা ছাড়া বাঁচতে পারবেন। আমাদের মারফতই তিনি কাজ করেন। শুনেছে নিশ্চয় হুজুর আল্ হিন্দে হামলা চালাচ্ছেন। আমরা কাফের রাজশক্তিকে খতম করে মুলুক দখল করব। কিন্তু আমআদমি আমাদের মেনে না নিলে দখল নিয়ে লাভ কী? চাষা চাষ করবে, বানিয়া বেওসা চালাবে যে যার

কাজ করলে তবেই না খাজনা মিলবে, রাজ কায়েম হবে! আপনাদের কাজ হবে আমআদমিকে ইসলামের শাসন মানানো। যেমন করে পারেন তাদের বশ করবেন। তার জন্য পহেলা কাম হিন্দভি বুলি শেখা। আপনি জাতে ইরানি তো? তাহলে শক্ত হবে না। ফার্সির সঙ্গে অনেক মিল আছে।'

সুফিদের দর্শন, সব আদমিকে পেয়ার আল্লার প্রতি প্রেম ইত্যাদি সইফু বলতে গিয়েছিল। সিপাহ্সলার বাধা দেন। 'ও সব জানি। তবে আপনার নিজের একটা বাড়তি বড়ো দায়িত্ব থাকবে। যেখানে পাঠানো হবে সেখানকার মানুষজনেরা তাদের রাজা সম্বন্ধে কী বলছে, রাজার স্বভাবচরিত্র কাজ কর্ম অভ্যাস, তার ফৌজই বা কত বড়ো, ক'টা উট, ক'টা হাতি। ওই হাতি হিন্দের খতরনাক জানওয়ার। আমাদের মুসিব্বতে ফেলে। এসব খবর আমাদের জানা জরুরি। নইলে হামলা করে ফতে করতে পারব না। এমনভাবে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে আপন লোক হতে হবে যেন কেউ বুঝতে না পারে আপনি খবর জানতে চাইছেন।'

সইফু স্তম্ভিত, নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না। এসব কী! সে তো এতকাল শুধু পড়ালিখা করে এসেছে, আর করেছে আল্লার ধ্যান। বেশ রাগই হয়ে যায়। বলে ওঠে, 'এতো জাসুসি!

গুপ্তচরের কাজ। আমি সুফি, আল্লার সেবক হয়ে কী করে— কথা শেষ হয় না। সিপাহ্সলার বলেন, 'এটাও তো আল্লারই কাজ। সবই তাঁর জন্য। স্বয়ং নবি কী কী করতেন মনে নেই? বেওসা থেকে হাতিয়ার হাতে লড়াই। আর লড়াই মানেই পহেলে খোঁজখবর, তবে হামলা। নইলে কামিয়াব হলেন কী করে। হ্যাঁ, আপনার এসব কায়দা জানা নেই। তার জন্য তালিমের বন্দোবস্ত করা আছে, কী কী নজর করবেন, কেমন করে খবর পাঠাবেন সব শিখিয়ে দেওয়া হবে। শুনুন, ক'টা জিনিস খেয়াল করবেন। কাফেরদের লড়াই আমাদের চেয়ে কোন কোন বিষয়ে আলাদা। হিন্দ-এর কাফেররা পুরানা কাল থেকে অনেক লড়াই করেছে। জরুর তাদের নিজেদের নিয়ম রীতিনীতি থাকবে। এ খবরটা জরুরি।'

সইফু যেন এক উদ্দাম স্রোতে ভেসে যাচ্ছে, তার নিজের কোনো ক্ষমতা নেই। তবু কোনোক্রমে বলে, 'হুজুর আমি তো মইনুদ্দিন হাসান সাহেবের মুরিদ। আমার চলাফেরা ওঠাবসা ওঁরই হুকুমে। ওঁকে বাদ দিয়ে একলা আমার পক্ষে হিন্দ যাওয়া'— কথা শেষ হওয়ার আগে সিপাহ্সলার বলেন, 'আপনি একা যাবে না। তিনিও যাবেন।'

বিস্ময়াহত সইফু জিজ্ঞাসা না করে পারে না, 'আপনারা কী ওঁকে হিন্দ্ যেতে রাজি করিয়েছেন?'

মৃদু হাসেন সিপাহ্সলার, 'ওঁকে খোদ আল্লা রাজি করাবেন। আপনি এ নিয়ে ভাববেন না। যান, তালিম নিন। হ্যাঁ, আসল কথাই তো বলা হয়নি। হিন্দ্ বিশাল দেশ। আপনারা যাবেন একটা শহরে, অজয়মেরু। রাজা পৃথ্বিরাজ চৌহানের রাজধানী। ওখানেই হিন্দ্-এ ইসলামের খুঁটি গাড়বেন। ব্যস আসুন, খোদা হাফিজ।'

তালিম নিতে গিয়ে সইফু যেন অন্য মানুষ হয়ে গেল সইফু। এতদিন সে দুনিয়াদারি কিছুই জানত না। সুলতান মহম্মদ ঘোরি নিজে আদতে ইরানি হলেও তাঁর ফৌজে তুর্কিদেরই দাপট, যেমন খোদ সিপাহসলার। আম ফৌজি স্থানীয়, ঘুর, হেরাট, বলখ্ সিস্তান— এসব জায়গার আনপঢ়রা। খানাপিনা দুশমন খতম আর গনিমতের মাল ভোগ ছাড়া আর তাদের কিছুতে মন নেই। এদের জয় হাসিল করার জন্য তাকে কাম করতে হবে। নইলে আল্লার সেবা হবে না। মাথার ওপরে যেন একটা বিশাল বোঝা, যার থেকে তার শয়নে স্বপনে জাগরণে কখনো মুক্তি নেই। হেরাটে ফিরে চিসতিতে গিয়ে দেখে সাজ সাজ রব। মইনুদ্দিনকে আল্লা স্বপ্নে হুকুম দিয়েছেন, 'যাও, হিন্দ-এ, আল্লার বাণী প্রচার কর।' ভয়ে ভয়ে সইফু প্রশ্ন করে— 'হুজুর হিন্দ্ তো বিরাট দেশ। আমরা কোথায় যাচ্ছি?' প্রশান্ত মুখে মুরশিদ জবাব দিলেন, 'অজয়মেরু, রাজা পৃথ্বিরাজের রাজধানী।'

।। পাঁচ।।

আরাবল্লি পার্বতমালায় ঘেরা চারশো সাল পুরানা রাজা অজয়দেবের তৈরি অজয়মেরু নগরীর নামের মানে অপরাজিত পর্বত। সেখানে খান্কা বসেছে, তার মুরশিদ খাজা মইনুদ্দিন হাসান চিসতি। আর অন্য সুফিদের সঙ্গে রয়েছে সইফু। দশ সালের উপর কেটে গেছে। কত লোক এ মুলুকে বাপরে বাপ! সব কাফের! কত কিসিমের ঠাকুর দেবতা, ভজনপূজন লেগেই আছে। বেপরদা আওরতের দল বাইরে কাম কাজ করে, মাথায় তিনচারটা গাগরি পানি ভরে ঘরে নিয়ে যায়। লম্বা পোশাকপরা সুফিদের দেখলে মুচকি হাসে বেশরম বেতমিজের দল। সইফু জানে, অনেক সুফির দেহমন চনমন করছে। তার বরাবর আওরতে নফরত, মরদদের সঙ্গে থাকতেই ভলো লাগে। এত খুবসুরত আওরত, কী সব বাহারি রঙের পোশাক। সইফু তাকাতে পারে না।

কাফেরদের একটা বৈশিষ্ট্য হলো, নিজেরা অনেক দেবদেবী মানে বলে পরদেশি এসে যখন বলে, 'আমরা অন্য এক দেবতার পূজা করি' তারা মারতে ওঠে না। বলে, 'বেশ তো করুন।' আর একটা বৈশিষ্ট্য হলো, এ মুলুকে এক মরদের বহুত জমিন জায়গা ধনদৌলত পাঁচ-দশটা বিবি, বিশটা বালবাচ্চা থাকলেও কেউ খাতির করে না। কিন্তু একটা আধ নাঙ্গা আদমি যার কিচ্ছু দৌলত নেই, নেই আওরত, বালবাচ্চা, সে যদি নদীর কিনারে কী পাহাড়ের গুহায় একলা বসে ধ্যান করে, তার খাতির দারুণ। আমআদমি, ছেলেবুড়ো মরদ-আওরতও তার পায়ে গিয়ে পড়ে, সে যা বলে, সব তারা শোনে। মইনুদ্দিন সাহেব বলে দিয়েছেন, সুফিদেরও এমন সাধু-সন্ন্যাসীর মতো চালচলন করতে হবে। নইলে হিন্দ্-এ পাত্তা পাবে না। তারা সেই পথই নিয়েছে। যদিও কোরানে প্রত্যেক মুসলমানকে শাদি করে আল্লার বান্দা বালবাচ্চা পয়দা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হিন্দে সুফিরা সে সব বিশেষ মানছে না। শাদি করলেও খুব দরিদ্র খুব সংযতভাবে থাকে, ব্রাহ্মণদের মতো। মানুষজন তাই কাছাকাছি আসে, বাতচিত হয়। যেটা সইফুর খুব দরকার।

তবে মইনুদ্দিন সাহেবের একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে। কেরামত। তারা পৌঁছেই যে গাছপালা ঘেরা জায়গাটি থাকার জন্য বেছেছিল, সেখান থেকে রক্ষীরা তাড়িয়ে দিল। 'ওখানে রাজার উট বাহিনী বিশ্রাম করে।' মইনুদ্দিন বললেন, 'বেশ, রাজার উটরা ওখানে বসে থাক।' পরদিন উটচালকরা উটদের নিয়ে যেতে এল। শত চেষ্টা করেও উটদের দাঁড় করাতেই পারল না। ভয় পেয়ে মইনুদ্দিনের পায়ে পড়ে। মুরশিদ বললেন, 'এবার উটদের ওঠার সময়।' উঠে দাঁড়াল উটেরা সব। রক্ষীরা বলল,

‘প্রভু আপনারা যেখানে ইচ্ছা থাকুন।’ থাকার জায়গা হলো।

এবার খাওয়া। সুফিরা গয়লাদের কাছে গিয়ে এঁড়ে বাছুর চায়। তারা হেসে আকুল। কোন কম্মে লাগবে! বড়ো করে বলদ গাড়িতে জুতবে নাকি! সস্তায় দিয়ে দেয়। যখন দেখে সেই বাছুর কেটে তার মাংস ধুতে সুফিরা সায়রের ঘাটে এনেছে তখন হুলুস্থূল। পুরোহিত আমআদমি সব রে-রে করে ছুটে এসে সুফিদের তাড়ায়। ধোওয়াধুয়ির তো প্রশ্নই ওঠে না, পানীয় জল পর্যন্ত তারা এই সায়র থেকে নিতে দেবে না। এর তীরে কত মন্দির রয়েছে। সেখানে প্রতিদিন দেবোপাসনা চলে মহাসমারোহে। মইনুদ্দিন তাদের চোখে চোখে রেখে সুফিদের চুপচাপ নিজেদের ডেরায় ফিরে আসতে বলেন। পরদিন সকালে ফজরের নমাজ শেষ হতে না হতে মানুষজনের আর্তনাদ। সর্বনাশ, সায়র থেকে এক রাতের মধ্যে সব জল উধাও। খটখটে শুকনো। স্বয়ং ব্রাহ্মণ পুরোহিত হাত জোড় করে মইনুদ্দিনের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

‘অপরাধ মার্জনা করুন। আপনার মাহাত্ম্য আমরা বুঝতে পারিনি।’

‘মাহাত্ম্য আমার নয়, আমি যাঁর উপাসক তাঁর।’

‘কে তিনি?’

‘বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র প্রভু, আল্লা। পানি তিনি নিয়েছেন, তিনিই ফিরিয়ে দিতে পারেন। আপনারা তাঁকে মানবেন?’

পুরোহিত সহ বহু কণ্ঠ একসঙ্গে বলে উঠল, ‘মানব।’

‘আসুন, আমার দিকে তাকান, সকলের চোখ মুরশিদের দিকে। খানিকক্ষণ কাটে। এবার চলুন, তালাওয়ে ফিরে যাওয়া যাক।’ সকলে যায়। সায়রে টলটল করছে জল। কানায় কানায় ভরা।

‘বলুন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো মহাম্মাদুর রসুলাল্লাহ...’

এইভাবে কত কাফের অন্ধকার থেকে মুক্তি পেল। একের পর এক কেরামত। একবার ভয়ে বয়ে সইফু জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘হুজুর, আল্লার নিয়মে প্রকৃতি পশুপাখি সবাই বরাবর একভাবে চলে। কী করে অন্যরকম হচ্ছে?’

স্মিত মুখে মুরশিদ বলেন, ‘আল্লার নিয়মেই সব চলছে। অন্য রকমটা মানুষের মোহ। তাই নজর ভুল হয়।’

সন্তদের আল্লা নাকি বিশেষ ক্ষমতা দেন। মইনুদ্দিন তাহলে তেমনই সন্ত। নিজের চোখে দেখে দেখে সইফুর গা শিউরে ওঠে। মাথা কেমন করে। সে তাড়াতাড়ি সুলতানের কাজে মন দেয়। হ্যাঁ, অনেক খবরই সে পাঠিয়েছে। ভাগ্যে হরেক বুলি শেখার তার স্বাভাবিক এলেম ছিল। আর বাজারহাট করা লোকের সঙ্গে যোগাযোগের ভারটা তার ওপরেই ন্যস্ত। হিন্দি সে জলদি শিখে নিয়েছে, শহরে ঘোরাফেরা করতে করতে লোকজনের সঙ্গে বাতচিত চালায়। কাফেরদের মধ্যে তার কটা বন্ধুও হয়ে গেছে। সইফুর ওপর তো হুকুমই ছিল, খবরদার ঘুরে সুলতান মহম্মদ ঘোরির সঙ্গে তাদের যে কেনোরকম সম্পর্ক আছে সেকথা যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না পায়। প্রসঙ্গ উঠলে আর পাঁচজনের মতো সইফু ঘোরির মুণ্ডুপাত করে কাফেরদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে।

ফলে খুব সহজেই জেনে গেল রাজা পৃথ্বিরাজ তরাইনের পহেলা লড়াইয়ে ঘোরিকে জখম করে পিছু ধাওয়া করেননি। কারণ হিন্দুদের ওটাই রীতি, দুশমন হার স্বীকার করে পিছন ফিরলেই লড়াই খতম। হাজার সাল আগের মহাভারত নামে কিতাবে কাফেরদের লড়াইয়ের সব নিয়ম লিখা আছে। যে হেরেছে, জখম হয়েছে, তার পিছু ধাওয়া করে কতল করা উচিত নয়। ওই মহাভারতেই লিখা লড়াই খালি দিনের বেলা করতে হবে, সূরজ ডুবলে আর লড়াই নয়, যতক্ষণ না সূরজ পরদিন উঠছে। তরাইনের পরের যুদ্ধে রাতের লড়াইয়ে বুদ্ধু কাফেরের হারের খবর অজয়মেরুতে পৌঁছালে সইফু অবাক হয়নি। অবাক হয়নি যে হেরে যাওয়া পৃথ্বিরাজকে পিছু ধাওয়া করে সুলতান কতল করেছেন। তবে তার অবাক লাগে এরকম একটা নিকম্মা রাজা, যে পহেলাবার দুশমনকে তাড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে নয়া বিবি নিয়ে ফুর্তিতে মশগুল থাকে, জখমি দুশমন যে জখমি সাপ, ফির মাথা উঁচাবে, জহর ঢালবে তার জন্য সৈন্যসামন্ত তৈয়ারের কোনো চেষ্টাই করে না, দরবারে বসে বেকার সব লিখালিখি করা আদমিদের বকোয়াস শোনে। সেই রাজাকে কিনা প্রজারা এত পেয়ার করে। দিল্‌পসন্দ পিথৌরার জন্য সকলের এত দুখ। কাফেরদের সইফু কখনো বুঝতে পারবে না। সত্যি কথা বলতে কী এদের ওপর তার কেমন ঘৃণাই হয়, যদিও সুফিদের সবাইকে পেয়ার করাই ফরজ।

তারপর সুলতানের ফৌজ অজয়মেরু পৌঁছে শহর জুড়ে লুঠতরাজ চালায়, রাজার দুর্গ দখল নিয়ে তার বিবি ও আওরতদের সঙ্গে লড়াইয়ের ইসলামি বিধি অনুযায়ী গনিমতের মাল হিসাবে নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা সেরে ভোগ করে, একের পর এক কাফেরদের মন্দির ভেঙে গুঁড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেয়। কাফেরদের মাদ্রাসা যাকে টোল চতুষ্পাঠী বলে, সেগুলো ভাঙে, পুঁথিপত্তর বের করে পোড়ায়। খান্‌কার অন্য সুফিদের সঙ্গে সেও চুপচাপ। চোখ-কান বন্ধ করে বসে থাকে। একটাও মন্দির ভাঙার সময় তারা টুঁ শব্দটি করেনি, একজন আওরতের ইজ্জত বাঁচাতে তারা কেউ কড়ে আঙুলটি নাড়ায়নি। সইফুর শুধু শুয়ে নিদ আসে না। মালুম হয় এভাবেই ইরানজমিনে আরব আক্রমণ, এরকম লাগাতার নিষ্ঠুরতাই জরাথুস্ত্রীদের উৎখাত করেছে।

সইফু কত অজ্ঞ ছিল। যে

অমানুষিকতাকে সে এতকাল তাতার মোঙ্গল সব অসভ্য জাতের স্বভাব ভেবেছে, মুসলমানও সেই একই বর্বরতার শরিক। একদিকে খুন লুঠতরাজ, মন্দির দেবমূর্তি ধ্বংস, নারী ধর্ষণ, আর তার পাশাপাশি ইসলাম মানে শান্তি, আল্লার প্রতি প্রেম, আমআদমিকে পেয়ারের মিঠা মিঠা বুলি। ভুখ লাগে না, দানাপানি দেখলে যেন উলটি আসে। কাফেরদের ওপর ইসলামের রাজ কায়েম করায় মদতের ইনাম। মাঝে মাঝে সইফু কাউকে না জানিয়ে হিন্দু ধ্বংসস্তূপ ঘুরে ঘুরে দেখে। কত শত বছরের সব অনুপম কীর্তির আজ এই পরিণতির জন্য সে নিজেও কী দায়ী নয়? পৃথ্বিরাজের পূর্বপুরুষ বিগ্রহরাজ বহু রাজ্য জয় করে এই বিরাট সাম্রাজ্যের অধিপতি আদর্শ হিন্দু শাসক ছিলেন। পাথরে উৎকীর্ণ তাঁর বর্ণনা সইফুর চোখের সামনে, 'দীনদুর্গত রক্ষক'। ভারী মনে খান্‌কায় ফেরে। পরবর্তীকালে আর এসবও দেখতে পায় না। হিন্দুদের মহলমন্দির চতুষ্পাঠী ভাঙা সুন্দর সুন্দর টুকরো মুসলমানদের মসজিদ আর ইমারতে লাগানো হতে থাকে।

মইনুদ্দিন সাহেব সবাইকে বলেছেন, গরিব দুঃখীদের কাছে টানতে। তারা কারা? হিন্দু সমাজের জাতিভেদের শিকার অচ্ছুত নিম্নবর্গের মানুষজন। প্রচার চলে ইসলামে জাতপাত নেই, ব্রাহ্মণের দাপট নেই, পূজাতে নৈবেদ্য ফুলবেলপাতা ভোগের বালাই নেই। খুব সস্তার ধরম, সব ঝড়তিপড়তিরা দলে দলে এসে কলমা পড়ছে। তবে আরবিতে পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ আদায় করতে পারছে কী না সন্দেহ। মইনুদ্দিন বলেন, 'কী পারল কতখানি পারল বিচারের প্রয়োজন নেই। মুসলমান হলেই যথেষ্ট, বাকি আস্তে আস্তে হবে।'

তিনি আবার হিন্দুদের মতো গানবাজনা চালু করেছেন। অনেক সুফির কিন্তু ছিল। কোরানে কি এসব হালাল? মুরশিদ বললেন, 'মূর্তিপূজারিদের রেওয়াজ নাচগান বাজনা নৌটঙ্কি, মরশুমে মরশুমে উৎসব, আলোর রোশনাই। দেখছ না রামনবমী, নবরাত্রী, দশেরা, দেওয়ালি, হোলি— কিছু না কিছু লেগেই আছে। সালভর পূজাপার্বণ। আমরা একটু কিছু না করলে এদের মন টানব কী করে? শুধু বাত কেরামত যথেষ্ট নয়।' শুরু হলো কাওয়ালির ধুম। দিনে দিনে তাঁর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কত গভীর বাত্ তিনি সহজ করে মিঠা মিঠা করে বলেন। সেসব লেখাও হয়ে যায়। হুজুর কী না পারেন। সইফু মনশ্চক্ষুতে দেখে গৌরবময় ভবিষ্যৎ, অজয়দেবের অজয়মেরু তো পরাজিত, একদিন এর নাম হয়ে আজমীঢ় শরিফ, এই খান্‌কা হবে দরগা, দূরদূরান্ত থেকে অসংখ্য মোমিন আসবে চাদর চড়াতে। আর তাদের মুরশিদ অমর হয়ে থাকবেন। হজরত খাজা মইনুদ্দিন হাসান চিসতি। ভূমিপুত্র সাম্রাজ্যনির্মাতা বিগ্রহরাজের উপাধি দীনদুর্গতরক্ষক, ন্যস্ত হবে তাঁর ওপর। হবেন 'গরিব নাওয়াজ' গরিব রক্ষাকর্তা, সুলতানুল্ হিন্দ। ততদিনে দারুল হারাব থেকে দারুল ইসলামে পরিণত হবে হিন্দ, যেমন সারা ইরানজমিন হয়েছে।

তাজ্জব ব্যাপার হলো, এসবে সইফুর দিল্ তেমন খুশ হয় না। কোথায় যেন একটা কাঁটা বেঁধে। এদিকে তার গোপন কর্ম ধীরে ধীরে কমছে। সুলতান পৃথ্বিরাজের লেড়কাকে সিংহাসনে বসিয়ে গেছেন, সে সুলতানকে মেনে নিয়েছে। আশপাশের সব হিন্দু রাজ্য সুলতান জয় করে নিয়েছেন। তবু চোখ খোলা রাখতে হয়। ঘুর-এর ফৌজের তুলনায় দিশি মুসলমানদের অনুপাতে মুলুকে কাফেরের সংখ্যা বহুগুণ বেশি। কেউ ষড়যন্ত্র করে এককাঠ্ঠা হওয়ার চেষ্টা করছে কিনা খেয়াল কর। এর মধ্যে কোনো এক শয়তান, খাক্কার জাতের কাফের মসজিদে নমাজ পড়ার সময় সুলতানকে খুন করে দিল। তাঁর তো আওলাদ ছিল না। তুর্কি গুলামদের বহুত পেয়ার করতেন তাদেরই একজন সিপাহ্‌সলার দিল্লিতে সুলতান হয়ে শুরু করল গুলামশাহি।

দিন যায়। সইফুর আর মন লাগে না। তার তবিয়ত দিন দিন খারাপ হয়। যেসব কাফের প্রথমে কলমা পড়েছিল তাদের মধ্যে এক পুরোহিতের সঙ্গে তার দোস্তি। তার নাম এখন রহমতুল্লা। খান্‌কায় মুন্সির কাজ করে, দরকার মতো সংস্কৃত থেকে হিন্দভিতে তরজমা করে কাছাকাছি থাকে একা সালভর। তারও দিনে দিনে বয়স হয়েছে। একদিন সইফু জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি গাঁয়ে যাও না? ঘরে সব ভালো তো?'

'ঘর আর কোথায়। মুসলমান হবার সঙ্গে সঙ্গে সাত পুরুষের ভিটেমাটি থেকে সবাইকে কবে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

'তোমার মা আছেন তো? তিনি কিছু বলেনি তোমার হয়ে?'

'আমি ধরম ত্যাগ করায় মা কেঁদে কেঁদে পাগল হয়ে গেছে। দিনরাত ঠাকুর ঘরে পড়ে থাকে। মাটিতে মাথা ঠোকে, খালি বিড়বিড় করে বলে, আমার লেড়কা বাপঠাকুরদাকে পানি দেবে না, আমি মরলে মুখে আগুন দেবে না, নরকে যাব নরকে যাব। দুর্গা মায়ি, তুমি কোথায় তুমি কোথায়?'

'সবই আল্লার মরজি। আল্লাকে ডাকো। শান্তি পাবে।' সইফু সুফিকর্তব্য ভোলে না। কিন্তু তার নিজের মনে শান্তি কই। সেখানে উথালপাথাল। শুনতে ভয় করে। স্বপ্নে দেখে কোনো আওরত কাঁদছে। 'দুর্গা মায়ি, তুমি কোথায়?'

শেষে মুরশিদের পায়ে পড়ে। হুজুর মাপ করবেন। আর এখানে থাকতে দিল্ লাগছে না। সে মুলুকে ফিরতে চায়।

মইনুদ্দিন বলেন, 'সারা দুনিয়া আল্লার। সুফি যেখানে থাকে সেটাই তার আপনা মুলুক। তাছাড়া সিস্তানে খান্‌কা নেই, কী করবে ওখানে?'

‘ওখানেও গরিবদুঃখী আছে, তাদের খিদমদ করব।’

‘তোমার বাড়ি ঘরজমি আর নেই। খাবে কী?’

‘পড়াব। মক্তব ছিল, এতদিনে মাদ্রাসাও হয়েছে নিশ্চয়।’

‘বেশ যাও, খোদা হাফিজ।’

এবারে একা। আরও কঠোর আরও দীর্ঘ যেন পথ। তবু শেষ হয়। সিস্তানে পৌঁছে যেন সব অচেনা লাগে আবার চেনাও। কত লোক বেড়েছে। তার গাঁ-ই তো পুরানো সীমানা ছাড়িয়ে কত বড়ো হয়ে গেছে। তবে কবরখানাটা আছে। সইফু আব্বুআম্মির আগাছায় ঢাকা করবদুটো খুঁজে পায়। কিন্তু তার মনে কোনো অনুভূতি হয় না। তিস সাল হয়ে গেছে। বুড়োদের কাছে পরিচয় দেয়। ও, সেই সইফুদ্দিন, এগারো সালে হাফিজ হয়েছিল! কী করছিলে এত কাল? সুফি? বাহ্! হ্যাঁ, মাদ্রাসা হয়েছে, জরুর পড়াবে। সবাই খুশ। শুধু সইফুর মন ভরে না। হিন্দ-এর রূপরং, হরেক কিসিমের মানুষের ভিড়, কোলাহল, উৎসব, পুজোপার্বণ মেলা কিচ্ছু নেই সিস্তানে। সব শূন্য।

একদিন হাঁটতে হাঁটতে যায় গাঁয়ের পুরনো অঞ্চলের দিকে। ভাঙাচোরা পাথরের ঢিবির মধ্যে একটা ফোকর যেন চেনা চেনা লাগে। ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে এক হাড়জিরজিরে জীব, ছেঁড়াখোড়া পোশাক, পিঠটা পুরো নুয়ে গেছে, তোবড়ানো গাল, গর্তেঢোকা চোখ দুটোয় ছানি, যেন দুটো মোতি। বিড়বিড় বকছে। সইফু বিস্ময় সামলে বলে ‘ইনশাল্লা, সোহরাব নানা, তুমি জিন্দা আছো! আমি সইফু।’

‘কে সইফু, সেই সৈয়দের আওলাদ? এতকাল কোথায় ছিলি?’

‘হিন্দ্এ ছিলাম বিশ সাল।’

‘হিন্দ্এ কী করছিলি, জেহাদ?’

‘না, না। আমি সুফি, চিসতিয়া সুফি। সবাইকে পেয়ার গরিবের সেবা আমার কাজ।’

‘ঝুট, সব ঝুট।’ হঠাৎ ক্ষেপে যায় সোহরাব, চেঁচিয়ে ওঠে, ‘শুনতে পাচ্ছিস কোনো আওরত কাঁদছে? আহুরা ম্যাজ্দ বাঁচাও বাঁচাও...’

কত বছর কেটে যায়। ভাঙাচোরা পাথরের ঢিবির মধ্যে বাস করে এক পাগলা। মাঝে মাঝে রাস্তায় বেরিয়ে লোকজনকে ধরে ধরে বলে, ‘শুনতে পাচ্ছ কোনো আওরত কাঁদছে? দুর্গা মাই, বাঁচাও বাঁচাও...’। সিস্তানে কেউ তার কথার মাথামুণ্ডু পায় না।

M.T. GROUP

Estd. 1954

M.T. MECHANICAL WORKS

M.T. INTERNATIONAL

EN. EN. ENGG. WORKS

D-75, Phase - V, Focal Point,
Ludhiana - 141010 (Punjab) India
Ph: 91-161-2670128, 2672128
Fax : 91-161-2673048, 5014188
E-mail : mtgroup54@sify.com
Visit us at : www.mtexports.com

Manufacturers :
Domestic Sewing Machine & Parts, Overlock Machines, Industrial Machine, TA-1, Embroidery, Bag closer and Aari Machines

Phones : Fac : 2222224, 2222225, 2222226
Resi : 2426562, 5050350

Rai KNITWEARS

842/2, Industrial Area - A,
Backside R.K. Machine Tools Ldt.
LUDHIANA - 141003

HOSIERY MANUFACTURERS
& EXPORTERS OF:

EXCLUSIVE SCHOOL
UNIFORMS & T-SHIRTS
ALL FASHION WEARS

S.T. No. 55615216 Dt. 4-9-68
C. S. T. No. 55615216 Dt. 10-9-68

Ph. :-0161- 2510766, 2512138, 2510572
Fax No. 0161-2510968/ 2609668,
Gram : **TYRES**

HINDUSTAN TYRE CO.

Prop. : HINDUSTAN CYCLES & TUBES (P) LIMITED

Regd. Office :
G-3, TEXTILE COLONY
INDUSTRIAL AREA - A,
LUDHIANA - 141 003

Works :
KANGANWAL
G. T. ROAD
LUDHIANA - 141 120

বনবাসী সংস্কৃতিতে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ

ড. সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ বিচিত্র সাধনা ও সংস্কৃতির এমনই এক মিলনক্ষেত্র যে এখানে নির্দিষ্ট করে সবসময় বলা কঠিন— কোন গোষ্ঠী অপর কোন গোষ্ঠীর থেকে কতটা নিয়েছে বা কতটা দিয়েছে, কে কার কাছে কতটা ঋণী। বনবাসী সমাজের চিরাচরিত কাঠামো হিন্দু ভারতবর্ষের শ্রেণীবর্ণ বিভাজিত সমাজের থেকে অকেটাই ভিন্ন। তাত্ত্বিকভাবে এই ভিন্নতার কথা বলা হলেও, বৃহত্তর হিন্দু সমাজ সংস্কৃতির বহু কিছু এমনভাবে বনবাসী সংস্কৃতির মধ্যে ঢুকে গেছে এবং উল্টোদিক দিয়েও এমন একটি প্রবাহ বহমান থেকেছে যে এদের মধ্যে চরম কোনো সীমারেখা টানা দুষ্কর। বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ গোবিন্দ সদাশিব ঘুরে বনবাসীদের বলেছিলেন, 'অনগ্রসর হিন্দু'। বাস্তবে বহু বনবাসী গোষ্ঠী তাদের নিজেদের ধর্মের কথা বলতে গিয়ে হিন্দু ধর্মের নামই উল্লেখ করে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বনবাসী গোষ্ঠীর হিন্দু দেবদেবীর উপর যেরকম বিশ্বাস এবং গভীর ভক্তিতে তাদের পূজার্চনা করতে দেখা যায়— তা ভারতীয় সংস্কৃতির এক সমন্বয়ী রূপকে আমাদের সামনে নিয়ে আসে। এই সমস্ত দেবদেবীর মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন।

পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহলের জেলাগুলিতে যে সমস্ত বনবাসী গোষ্ঠীর বাস, তাদের জীবন সংস্কৃতির উপর বহুদিন ধরেই বৈষ্ণব প্রভাবের চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। সাঁতাল, ভূমিজ, কোড়া, মাহালি, ওরাঁও, বাইগা, মুণ্ডা, লোধা, শবর— এই সমস্ত বনবাসী জনগোষ্ঠীর কোনোটিই এই প্রভাবের বাইরে যেতে পারেনি। এই অঞ্চলের বনবাসী গৃহের অঙ্গনে তুলসীথান যে পবিত্রতার আসন অধিকার করে আছে, তা তাৎপর্যপূর্ণ। একথা হয়তো ঠিক যে, তারা তুলসীর

তিরমূর্তি সিরিজিলা
কানুরে গোয়ালা
পুরুকাহি দাহারালি
গাইয়া জো জো রে।

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে রাম-সীতা-লক্ষ্মণের কথাও শোনা গিয়েছে একটি করম গানে।

বারো যে বৎসর সীতা লঙ্কাগাড়ে রহলোম
লঙ্কার গাড় সীতা কহিস নো গাড় হিয়োরে
বারো যে বৎসর সিতা লঙ্কাগাড়ে রহলোম
সিতা তো সিতাতো গেল অবিন দেশে
সিতাতো সিতাতো গেল অবিন দেশে
আর নাহি পাবি রে রামেরে লক্ষ্মণ
সিতাতো গেল অবিন দেশে

পৌরাণিক উপাখ্যান জানেন না। কিভাবে দেবী লক্ষ্মী তুলসী হিসেবে জন্ম নিলেন, কিংবা সুদামা অভিশপ্ত হয়ে শঙ্খচূড় দৈত্য হিসেবে জন্মলাভ করলেন। অতঃপর তুলসীর সঙ্গে তার বিবাহ, তুলসীর সতীত্ব হরণ— এসব কাহিনি হয়তো তাদের গোচরে নেই। কিন্তু তুলসীকে বিশেষ মর্যাদার আসনে বসাতে তাতে কোনো অসুবিধা হয়নি। এই তুলসীর অন্য নাম— বৃন্দা। যার থেকে তীর্থক্ষেত্র বৃন্দাবনের নাম। এই বৃন্দাবনের কথা এসেছে সাঁওতালদের কারাম গানে—

সিরি বৃন্দাবনে করমে কাটাই লো
গোড়াই লোম দেশাই আখোড়া হে
অহিরে সিরি বৃন্দার বন
অহিরে পহরে বাতি হরিনিত নাম হে যাই
ঘড়েতে লাগে গেল ফাঁসি
হরিনিত কাঁদে ভাই বৃন্দারে বনে
হরিনিত কাঁদে ভাই মিজুরে বনে।

শুধু করম বা কারাম গানে নয়; সোহরাই পরবের গানে শোনা যায় শ্রীকৃষ্ণের কথা—

আসলে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা বা শ্রীকৃষ্ণের কাহিনির মৌখিক ধারা সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারত ভূখণ্ডে বহমান ছিল। রামের তির-ধনুকধারী রূপ, অশ্বেতকায় গাত্রবর্ণ; কিংবা গোপালক গোষ্ঠীর নেতা বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বনবাসী সমাজের একটি বড় অংশ নিজেদের মিল খুঁজে পেয়েছে। সে কারণে নানা সংযোগ সূত্রে এদের বাঁধতে চেয়েছে আপন সংস্কৃতির সঙ্গে। এখানে যারা বিপ্রতীপ বা অপর ব্যাখ্যায় প্রয়াসী তাদের মত হলো, আদিতে এরা ছিলেন বনবাসী নায়ক— যাদের হিন্দুকরণ ঘটেছে পরবর্তী সময়ে। যেমন, সাঁওতালরা মনে করেন শ্রীরামচন্দ্র বনবাসকালে সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে অযোধ্যা পাহাড়ে এসেছিলেন। পাহাড়ের উপরে একটি অনিঃশেষ জলধারা কুণ্ডের আকারে এখনো প্রবহমান, যা সীতাকুণ্ড নামে পরিচিত। এই সীতাকুণ্ড নিয়ে প্রচলিত কাহিনিটি হলো ঃ পরিভ্রমণে ক্লান্ত সপরিবার রামচন্দ্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে রান্নার তোড়জোড় করতে থাকেন। রান্না তো হবে, কিন্তু জলের কোনো বন্দোবস্ত নেই। সীতা অনুরোধ করেন, শ্রীরামচন্দ্র যেন জলের একটা ব্যবস্থা করেন। তখন তিনি ভূমিতে তির নিক্ষেপ করলে জলধারা উৎসারিত হয়, যা এই সীতাকুণ্ড। অযোধ্যা পাহাড়ে

রাম-সীতার এমন অনেক কাহিনি ছড়িয়ে আছে। পাহাড়ে প্রকাণ্ড সব গাছের বাকলে লেগে থাকা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উদ্ভিদের দেহাবশেষ, যা কিনা সরু চুলের মতো মনে হয়। সেগুলিকে সীতার কেশরাশি বলে মনে করা হয়। এই পাহাড়ে বসবাসকালে সীতা মা যে কেশমার্জন করতেন, তারই চিহ্ন রয়ে গিয়েছে জঙ্গলের গাছে গাছে। অযোধ্যা পাহাড়ে শিকার উৎসবে গিয়ে দেখেছি বাকলে লেগে থাকা এই সীতার কেশরাশি পবিত্র সামগ্রী হিসেবে বিক্রি হচ্ছে।

দুর্বা ঘাসের জন্ম কাহিনির মধ্যেও রাম-সীতার যোগসূত্র রয়েছে। প্রজাদের অনুরঞ্জনে রামচন্দ্র সীতার অগ্নিপরীক্ষার আয়োজন করেন। অগ্নিপরীক্ষান্তে সীতার যখন পাতাল প্রবেশ ঘটছে, তখন রামচন্দ্র আর স্থির থাকতে পারেননি। ভূমিতে প্রবিষ্টমানা সীতার কেশাকর্ষণ করে তিনি আটকাতে চেয়েছিলেন সীতার পাতাল প্রবেশ। কিন্তু পারেননি, তাঁর হাতে সীতার কয়েকগুচ্ছ মাত্র কেশ রয়ে যায়। আর এই কেশ থেকেই জন্ম হয় দুর্বাঘাসের।

শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বনবাসী সমাজের এই আকর্ষণ মূলত বৈষ্ণব ভাবধারা সঞ্জাত। বিভিন্ন বনবাসী সমাজেই এই প্রভাবের সাক্ষ্য দেখা যায়। সাঁওতাল সমাজে এর খুব স্পষ্ট পরিচয় বহন করেন 'গোঁসাই এরা' দেবী। 'এরা' শব্দের অর্থ স্ত্রী। সাঁওতালদের পবিত্র জাহেরথানে গোঁসাই এরা পূজা পান। কিন্তু গোঁসাই-এর স্ত্রী কীভাবে সাঁওতাল দেবী মণ্ডলীতে স্থান পেলেন। অধিকাংশ স্থানে বা লিখিত বিবরণীতে এর কোনো সদুত্তর আমি পাইনি। কিন্তু এ বিষয়ে একটি কাহিনি আমি শুনেছিলাম, বীরভূম জেলার রাজনগরে ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন একটি সাঁওতাল গ্রামের প্রধান বা মাঝির কাছ থেকে। কাহিনির সারাৎসার হলো, একদা গোঁসাই পরিবারের এক বিবাহিতা রমণী জঙ্গলে পথভ্রষ্টা হয়ে লাঞ্ছনার শিকার হন। সে সময় সাঁওতালদের কয়েক ভাই মিলে তাকে রক্ষা করে বাড়িতে আশ্রয় দেন। রমণীটিকে বাড়িতে নিয়ে আসার সময় কতকগুলি ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা তাদের মাথায় চাড়া দেয়। প্রথমত, রমণীটিকে একা পেয়ে আবার যদি কেউ লাঞ্ছনা করে। দ্বিতীয়ত, রমণীটিকে কেন্দ্র করে যদি ভাইদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ বাঁধে। তার চেয়ে রমণীটিকে পূজ্য আসনে বসিয়ে সম্মান করলে তাঁর সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়। এভাবেই গোঁসাই এরা হিসেবে পরিগণিত হন বৈষ্ণব রমণীটি। এই কাহিনি একই সঙ্গে বনবাসী সমাজের মানুষদের উদারতা, মহত্ত এবং দায়িত্ববোধের পরিচয় বহন করে।

এই কাহিনির অন্য ব্যাখ্যাও হতে পারে। শ্রীচৈতন্যের পরবর্তী সময়ে ঝাড়খণ্ডে বৈষ্ণব প্রভাব বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এমতাবস্থায় বনবাসী সমাজকে এই প্রাবল্যের সামনে কিছুটা সমঝোতার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন—

ঝারিখণ্ডে স্থাবর ভাঙ্গম হয় যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া প্রেমে কৈল উন্মত্ত।।
যেই গ্রাম দিয়া যায় যাঁরা করি স্থিতি।
সে সব গ্রামের লোকের হয় কৃষ্ণ ভক্তি।।

এই কৃষ্ণ ভক্তি নানা রূপে বনবাসী জীবন ও সংস্কৃতিতে প্রকাশিত হয়েছিল। পণ্ডিতরা বলছেন, সাঁওতালদের করম গোঁসাই-এর ধারণা শ্রীকৃষ্ণের রূপের সঙ্গে অভিন্ন। আর মুণ্ডাদের করম গানও শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক। এই গানই আবার পাঁচপরগনা অঞ্চলে ভাদরিয়া গীত নামে প্রচলিত। সাঁওতাল, মুণ্ডা ছাড়াও সংলগ্ন অচলের জুয়াংদের মধ্যেও বৈষ্ণব প্রভাব লক্ষণীয়। তারা বলেন, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য তাদের মধ্যে এসেছিলেন। প্রথিতযশা নৃবিজ্ঞানী নির্মলকুমার বসুর লেখায় আছে, জুয়াংরা মহাপ্রভুকে ফল দিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাদের কাছে মাধব। মাধবকে লেবু খাওয়ানোর কথা শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক একটি গানে রয়েছে, যা অধ্যাপক সুহৃদকুমার ভৌমিক উল্লেখ করেছেন। গানটি হল—

টাবাকি নারেঙ্গা বেন্টই টরমর।
বেলে, মাধবরে। সে টুপা খাইলে মধুর।।
রসে টুইটম্বুর লেবু স্বাদ, মাধব খেয়ে দেখ, অত্যন্ত মধুর লাগবে।

বস্তুত রাম ও কৃষ্ণকথার রসমাধুর্য সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় সভ্যতায় প্রবাহিত রয়েছে জাতি-ধর্ম-বর্ণ গোষ্ঠী নির্বিশেষে। বনবাসী সমাজও এই প্রবাহে অবগাহন করে স্বাদ নিয়েছে মাধুর্যের। ■

মহিষাসুর নির্ণাশী

প্রবাল চক্রবর্তী

অর্ধগোলাকৃতি একটা চাঁদ জঙ্গলে চাঁদোয়া ছাড়িয়ে উঁকি মারলো এইমাত্র। তার সঙ্গেই পরিবেশটা বেমালুম বদলে গেল।

একটি তন্বী খরস্রোতা নদী বয়ে চলেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে, এবড়োখেবড়ো বন্ধুর বনাঞ্চলের আঁকেবাঁকে। সে তটিনীর জলে তনুময় চাঁদের গুঁড়ো ভাসছে ছলাৎ ছলাৎ। পশ্চিমপাড়ে অনতিউচ্চ নীল পাহাড়ের সারি। পূর্বপাড়ে ঘন বনানী। তবে তারা কেউই নদীর ঘাড়ে এসে পড়েনি। দুই পাড়ে সংকীর্ণ চারণক্ষেত্র পাহাড় ও বনানীর সঙ্গে নদীর ন্যূনতম ব্যবধান রচনা করেছে।

পূর্বপাড়ের আদিম সেই বনভূমিতে আকাশছোঁয়া উঁচু গাছের ভিড়। সেখানে গাছের গুঁড়ি ঘন শ্যাওলায় ঢাকা, গা-ধাক্কাধাক্কি ভিড়ে পথ চলা দায়। গাছ থেকে গাছে লতাগুল্মের নিগূঢ় বন্ধন। বাতাসে শ্যাওলার গন্ধে মিশে আছে মিষ্টি ঝাঁঝালো কদম্বফুলের গন্ধ। বিস্তৃত এই বনানী খ্যাত তার বাসিন্দা হিংস্র পশুদের জন্য। বিশেষত চিতাদের জন্য। শুধুমাত্র চিতার মতো সাহসী যাদের হৃদয়, সেই মানুষরাই এই অটবিব্যূহে ঢোকার সাহস রাখে। জঙ্গলের এক উঁচু গাছের মগডালে আধশোয়া হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল দুর্গা। হাতে কলাপাতায় মোড়া একহাত লম্বা একটা পিঠে। নারকেল কোরা, ক্ষীর ও গুড়ের পুর ভরা।

দুর্গার দৃষ্টি নিবদ্ধ দূরে পশ্চিমে নীলপাহাড়ের সারির দিকে। ওখানেই ব্রঙ্গারাজ্যের সীমান্ত। ওপারে মহিষের এলাকা। অসুরদের ব্রঙ্গা থেকে উচ্ছেদ করার পর ক'দিন রাজ্যজুড়ে চলেছে চরম বিশৃঙ্খলা। খানিকটা হলেও পরিস্থিতি এখন উন্নতির পথে। তাই এই একটা দিনের অবকাশ। কিন্তু সে অবকাশও ভারাক্রান্ত হয়ে আছে একরাশ চিন্তায়। একরাশ দ্বিধায়।

আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, মহিষকে এই ব্রঙ্গাভূমি থেকে উচ্ছেদ করে তবেই আবার পুঁথিপত্রে হাত দেব। তা, সেই লক্ষ্য তো পূরণ হয়ে গেছে। তাহলে কি এখন গুরুকুলে ফিরে গিয়ে লেখাপড়া শুরু করবো?

আর ওরা? ওদেরও কি বলবো, নিজেদের পূর্বজীবনে ফিরে যেতে? সেটাই তো ঠিক কাজ হবে, তাই না?

কিন্তু... পলাতক শত্রুকে কখনো বিশ্বাস করতে নেই। লোকে বলে, আগুন, ঋণ ও শত্রুর শেষ রাখতে নেই।

কিন্তু... সমরশাস্ত্র বলে, শত্রুকে তখনই আক্রমণ করতে হয়, যখন আমার শক্তি শত্রুর থেকে অনেক বেশি। বাস্তব পরিস্থিতি এখন সেরকমটা মোটেই নয়। তাই যুদ্ধে যাওয়ার আগে প্রয়োজন মহিষের শক্তিক্ষয়, অথবা আমাদের শক্তিবৃদ্ধি, অথবা দুটোই।

কীভাবে হবে সেটা?

মহিষ তো ওখনেই রয়েছে, ওই পাহাড়গুলোর ওপরে, তাই না? ওখানে ঘাপটি মেরে বসে কী করছে? নতুন করে দল পাকাচ্ছে? নতুন কোনও ষড়যন্ত্র করছে? আবার ব্রঙ্গা আক্রমণের তোড়জোড় করছে নাকি? মহিষের আক্রমণের প্রতীক্ষা না করে, আগেভাগেই মহিষকে আক্রমণ করা উচিত, তাই না? সমরশাস্ত্র তো তাই বলে।

কিন্তু... আবার আরেকটা যুদ্ধ? তার জন্য যে অস্ত্রশস্ত্র, সৈন্য বা রসদ দরকার, তা পাবো কোত্থেকে?

রাজকুমার দিব্যবল আমাকে সমর্থন করবে। রাজ্যাভিষেকের পর ব্রঙ্গার সেনাবাহিনী দিব্যবলের সম্পূর্ণ অধীনে এসে যাবে।

কিন্তু... ব্রঙ্গার সেনাবাহিনী কি যথেষ্ট, মহিষকে তার নিজের এলাকায় যুদ্ধে হারানোর জন্য? ব্রঙ্গাসেনা নৌযুদ্ধে পটু। এ যুদ্ধ তো হবে বন্ধুর মালভূমিতে।

আমি কি বেশি ভেবে ফেলছি? এসব ভাবা কি আদৌ আমার দায়িত্ব? হয়তো আমার যা করার তা করা হয়ে গিয়েছে। এবার অন্য কেউ দায়িত্ব নেবে। আমি গুরুকুলে ফিরে যাব। যুদ্ধ করতে মোটেই ভালো লাগে না আমার।

কিন্তু... এই যে এত দুঃখী অনাথ হতভাগ্য মানুষ, যারা আমাকে মা বলে ডাকে, তাদের কী হবে? সন্তানকে রক্ষা করতে মা যুগে যুগে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। প্রতিটি মা। জীবনের প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্রে। আমার তাহলে কী কর্তব্য?

পিঠেয় অন্যমনস্ক কামড় বসিয়ে আপন চিন্তায় মশগুল ছিল দুর্গা। হঠাৎ দূর থেকে ভেসে এল ডাক।

'দুর্গা-আ-আ-আ-আ...'

কে?

'দুর্গা-আ-আ-আ...' আবার শোনা গেল। এবার দুর্গা বুঝতে পারলো, কে ডাকছে। ঠোঁটের কোণে দুষ্টুমির হাসি, লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গাছের ডালের ওপর দিয়ে দৌড়তে শুরু করল দুর্গা।

এ জঙ্গলের গাছগুলো এতো কাছাকাছি যে পাশাপাশি গাছের ডালপালাগুলো পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। তার ওপর জড়িয়ে গেছে লতাগুল্মর ঝাড়। সবাই মিলে গাছের মধ্যে দিয়ে তৈরি করেছে অসংখ্য বনপথ, মাটির অনেক ওপরে। তারই পথ ধরে দুরন্ত গতিতে ছুটে চলল দুর্গা। খানিকক্ষণ পরেই দেখতে পেল, দূরে মাতঙ্গী। জঙ্গলের দিকেই এগিয়ে আসছে। চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল দুর্গা। মাতঙ্গী যখন ঠিক ওর নিচে পৌঁছেছে, সিংহনাদের সঙ্গে গাছের ওপর থেকে লাফ দিল দুর্গা, পড়লো গিয়ে মাতঙ্গীর ঠিক পেছনে। ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল মাতঙ্গী। কোমর থেকে ছুরি বের করে এক ঝটকায় পেছন ফিরে দেখল, দুর্গা হাসছে। ছুরি কোষবদ্ধ করে কপট ক্রোধে বলল,

'এটা কী হল?'

'হা-হা-হা-হা' দুর্গার উত্তর।

'ঠাট্টা রাখো' বলল মাতঙ্গী, 'সবাই তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। কখন আসবে তুমি?'

'কোথায় বসেছো তোমরা?'

‘ওই তো, ওই টিলাটার ওপারে, নদীর ধারে।’

‘চলো, যাওয়া যাক।’

দৌড়তে শুরু করল দুজনে।

রুপোলি আলোর বান ডাকিয়ে বড় একটা চাঁদ উঠেছিল, এই একটু আগে। সেটা দেখে ঘরের প্রদীপটা অবহেলায় নিভিয়ে দিয়েছিলাম। আচমকা মেঘের দল হামলা করল আকাশ জুড়ে, চাঁদটা হল অদৃশ্য। তখন থেকেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। সেই অন্ধকারে অন্ধ চোখদুটো অন্ধকার হাতড়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে অবহেলায় পরিত্যক্ত সেই ঘরের প্রদীপটাকে। কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না। জীবনটাও তো অবিকল এরকম, তাই না? ভাবছিল আরক্ত। অসুর-ধর্মগুরু আমি, দানববংশীয় আরক্ত। ক’দিন আগে আমি থাকতাম প্রাসাদোপম এক বাড়িতে। পঞ্চব্যঞ্জনে আহার সারতাম। গোটা ব্রহ্মারাজ্যের সম্ভ্রমের কেন্দ্র ছিলাম আমি। আর আজ? কুঁড়েঘরে ঠাঁই, দিনান্তে খাবার জোটে কী জোটে না। আশ্চর্য কাণ্ড হলো, আজ আমি অনেক বেশি সুখী।

বহুবছর আগেকার কথা। তখন সবে গুরুকুল থেকে স্নাতক হয়ে বেরিয়েছি। অসুধর্ম গ্রহণ করেছি। গুরুকুল থেকে কিছুটা দক্ষিণে নবনির্মিত অসু-উপাসনাগৃহের দায়িত্ব নিয়ে ওখানেই থাকি। সন্নিহিত অঞ্চলের শাসক ছিল যম-উপাসক রাজা নরোত্তম। তার উৎসাহে রাজ্যের যম-মন্দিরগুলি হয়ে উঠেছিল মৃত্যু-সংক্রান্ত যাবতীয় গবেষণা ও জ্ঞানের কেন্দ্র। যম-উপাসক হলেও রাজ্যের প্রতিটি উপাসনাপদ্ধতির ওপরেই সমদর্শী ছিল রাজা। সেই রাজার একমাত্র পুত্র কঠিন এক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী ছিল মাসাধিককাল যাবৎ। দিনকে দিন তার স্বাস্থ্য আরও খারাপ হচ্ছিল। সন্তানের মঙ্গলকামনায় রাজ্যের মন্দিরে মন্দিরে পূজা দিয়ে বেড়াচ্ছিল রাজা। এসেছিল অসু-মন্দিরেও। পুত্রের সম্ভাব্য মৃত্যুর আশঙ্কায় ভীত রাজাকে আমি বলেছিলাম, যম নয়, অসুই মৃত্যুর নিয়ন্ত্রক। অসু তুষ্ট না হলে রাজকুমারের অসুখ ভালো হবে না। আর অসুকে তুষ্ট করার একটাই উপায়, যম-উপাসনা ত্যাগ করে সত্যধর্ম অসুধর্ম গ্রহণ করতে হবে, সপরিবারে। মানেনি রাজা নরোত্তম। তারপর থেকেই রাজকুমারের শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি শুরু হয়। দিন কাটে তো রাত কাটে না। শেষমেশ যখন রাজকুমারের শ্বাসকষ্ট শুরু হলো, রাজা নরোত্তম অসুমন্দিরে এসে আত্মসমর্পণ করল। তারপরই যেন জাদুমন্ত্রে ভালো হয়ে গিয়েছিল রাজকুমার। অসুপিতার দিব্যশক্তির এমন সাক্ষাৎ পরিচয় পেয়ে নবধর্মে মত্ত রাজা নরোত্তম উত্তরাপথের বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে যম-উপাসনার যাবতীয় চিহ্ন মুছে দিয়েছিল। রাজমন্দিরে মৃত্যুর রহস্য সংক্রান্ত বহু পুঁথিপত্র সঞ্চিত ছিল, সেসব পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। রাজা কখনোই জানতে পারেনি, রাজবৈদ্য গোপনে অসুধর্ম গ্রহণ করেছিল বেশ কিছুকাল আগে। সেই রাজবৈদ্য ঔষধির নামে স্বল্পমাত্রায় বিষ প্রয়োগ করত রাজকুমারের ওপর, প্রতিদিন। রাজকুমারের অসুস্থতার একমাত্র কারণ ছিল সেই বিষ।

বিগত ক’দশকে একই পদ্ধতি অনুসরণ করে ভারতবর্ষের বহু প্রভাবশালী ব্যক্তিকে অসুধর্মে দীক্ষিত করেছি আমি। আজ হঠাৎ সেসবের জন্য বড্ড অনুশোচনা হচ্ছে। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ফুলের মতো শিশুদের ওপর বিষ প্রয়োগ করা কি ঠিক হয়েছিল? রাজা নরোত্তমের রাজমন্দিরে যেসব পুঁথি ছিল, তার মধ্যে সঞ্চিত ছিল মৃত্যুর পরের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাত তথ্য। সেগুলোর মূল্য আজ... আজ হঠাৎ করে খুব জানতে ইচ্ছে করছে, মৃত্যুর পরে সত্যিই কী ঘটে। সত্যিই কি অসু স্বর্গদ্বারে প্রতীক্ষা করে আমাদের জন্য? নাকি সম্পূর্ণ অন্যরকম কিছু ঘটে মৃত্যুর পর? জানবার আর উপায় নেই, কারণ সেই জ্ঞান আমি নিজে হাতেই অগ্নিসমর্পণ করেছি।

অসুর-ধর্মগুরু আমি। কশ্যপমুনির গুরুকুলে কাশ্যপপুত্র হিরণ্যকশিপুর প্রিয় ছাত্র ছিলাম আমি। অসুধর্ম প্রচারে প্রাণপাত করেছি। লক্ষ লক্ষ মানুষ আমার কথায় পূর্বজদের পরম্পরা বিস্মৃত হয়েছে, অসুর নাম গ্রহণ করেছে। কিন্তু এত বছরের এত সাফল্যের পর মনে হচ্ছে, কোথাও একটা বড় গলদ রয়ে গেছে। একেশ্বরবাদ যদি সত্যি হয়ে থাকে, তবে সেই সত্যিটা মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়াতে অন্যায় কোথায়? বলেছিল হিরণ্যকশিপু। তখন যুক্তিটা নিখুঁত মনে হয়েছিল। এখন আর সেটা মনে হচ্ছে না।

আমরা সবসময় ভয়ে মরি, পাছে অসুররা তাদের পূর্বজদের ধর্মবিশ্বাসে ফিরে যায়। সেই ভয়ের নিরাকরণ করতে গিয়ে শুধু তো একেশ্বরবাদ নয়, শুধু তো সৃষ্টিকর্তার একটি নাম নয়, তার সঙ্গে একটা সম্পূর্ণ নতুন জীবনপদ্ধতি চাপিয়ে দিতে হয়েছে মানুষের ওপর। পূর্বের প্রতিটি আচার-আচরণই বিষবৎ বর্জনীয়। এছাড়া আর কোনওভাবে পুরনো উপাসনা পদ্ধতির নেশা ছাড়ানো যাবে না, এমনটাই বলেছিল হিরণ্যকশিপু। কিন্তু তার ফল হয়েছে ভয়ংকর। ধারাবাহিকতা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সমাজ থেকে। এই দেশটাকে মহান বানিয়েছে এই দেশের

সভ্যতার ধারাবাহিকতা, তাই না? আগে লোকে ঊর্ধতন চতুর্দশ পুরুষের নাম মনে রাখত। অসুররা আর তা রাখে না। রাখলে তো নিজেদের প্রকৃতিপূজক পূর্বজদের স্মরণ করতে হবে। ফলত অসুররা নিজেদের বংশপরম্পরা সভ্যতা কৃষ্টি সব ভুলে আগাছার মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। সাহিত্য ও শিল্পের চর্চা উঠে যাচ্ছে, কারণ সব শিল্পসাহিত্যই তো প্রকৃতিপূজাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। সমাজজীবনে উৎসব পালন উঠে যাচ্ছে, কারণ যেসব উৎসবের সঙ্গে মানুষের নাড়ির যোগ, সেইসব উৎসব প্রকৃতিনির্ভর। নান্দনিকতা ভুলতে বসেছে সমাজ। লক্ষ বছর ধরে গড়ে ওঠা একটা সংস্কৃতির মূলোচ্ছেদের চেষ্টা করছি আমরা। প্রকৃতিপূজার পরম্পরায় দুষ্ট সবকিছু বাদ দিতে গিয়ে, শেষমেশ সভ্যতার কিছু কি আর বাকি থাকবে? প্রকৃতিপূজকরা প্রকৃতির শক্তির পূজা করতে গিয়ে প্রকৃতিকে ভালোবাসতে, সমীহ করতে শিখতো। জীবনচক্রে প্রতিটি জীবের ভূমিকা আছে। একটি সামান্য জীবের মৃত্যুও সবার জন্য সর্বনাশ হতে পারে। প্রাকৃতিক ভারসাম্যের এই রহস্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে না বুঝেও প্রকৃতিপূজকরা নিজেদের অজান্তেই প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতো। উল্টোদিকে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ অসুর দাসমাত্র— এই ভাবতে ভাবতে অসুররা প্রকৃতিকে তাচ্ছিল্য করতে শিখেছে। প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ শিথিল হয়ে গেছে তাদের। অসুররা আজকাল প্রকৃতিকে ধ্বংস করে আনন্দ পাচ্ছে। নির্বিচারে বন্যপ্রাণী শিকার হচ্ছে, বনানীর মূলোচ্ছেদ হচ্ছে পাইকারি হারে। এরা জানে না, নিজেদের কী সর্বনাশ এরা করছে। ভয় হয়, সম্পূর্ণ সৃষ্টিচক্রই না ধ্বংস হয়ে যায় এদের অবিমৃশ্যকারিতার ফলে। এই জগতের সৃষ্টিকর্তার নাম কী, এই তর্কে অগণিত নরহত্যা হয়েছে। এখন মনে হচ্ছে, সত্যিই কি সৃষ্টিকর্তার নাম অসু? অন্য কিছুও তো হতে পারে? সৃষ্টিকর্তার আদৌ কি কোনও নাম আছে?

সত্যি বলতে কী, অসুবাদ খুবই সাধারণ একটা মতবাদ। যুক্তিতর্ক নেই, সন্ধান নেই, দার্শনিক মীমাংসা নেই, শুধুই একটা বিশ্বাস। গরিব খেটেখাওয়া মানুষদের জন্য এরকম মতবাদই দরকার, বলেছিল হিরণ্যকশিপু। গরিবদের প্রয়োজন একটা বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকা, তর্কবিতর্কের কী প্রয়োজন তাদের? এমনটাই ছিল হিরণ্যকশিপুর মতামত, এখানে রয়েছে সমস্যা। যখনই কোনও অসুর জনগোষ্ঠী শিক্ষিত হয়ে ওঠে, সম্পন্ন হয়ে ওঠে, অসুবাদ তখন আর তাদের তৃপ্ত করতে পারে না। অসুবাদকে কেন্দ্র করে হাজার প্রশ্ন জাগে তাদের মনে। তাই হিরণ্যকশিপু থেকে মহিষাসুর— প্রতিটি অসুর-সম্রাট চেষ্টা করেছে সাধারণ মানুষকে গরিব করে রাখতে। অর্থবান হলেই যে স্বাধীন চিন্তা জাগে! অসুবাদ বদ্ধ জলাশয়, নতুন করে সেখানে তরঙ্গ ওঠবার জো নেই। এ যেন এক জেলখানা। স্বাধীন চিন্তা অসুবাদের জন্য অনিষ্টকর। লোকে হাঁসফাঁস করবে না তো কী করবে? কোনও রহস্য নেই, কোনও দার্শনিকতা নেই, কোনও জিজ্ঞাসা নেই। সেসব বিনে এই জীবনের আর অর্থ কী? একদিন যে পরম্পরাকে ইতিহাসের আবর্জনা ভেবে বিষবৎ পরিত্যাগ করেছিলাম, আজ সেই বিলুপ্ত পরম্পরার সন্ধানে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। অসুধর্ম প্রতিষ্ঠাকল্পে বহু পাপ করেছি। যদি জীবনের পরপারে অসু না থাকেন, তবে এই পাপের বোঝা থেকে কে মুক্তি দেবে আমাকে?

দুর্গা। বিরাট উপকার করেছে ও আমার। ধোঁকার টাটি মাথায় নিয়ে বাঁচছিলাম। ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিদিন একরাশ মিথ্যেকথা বলতে হতো। সেসব শেষ হয়েছে। খুব ভালো হয়েছে। জানি, ধর্মত্যাগের অপরাধে অসুররা আমাকে খুন করতে পারে। করলে করবে। মিথ্যের বোঝা বয়ে চলতে আর পারছি না।

নদীর ধারে এবড়োখেবড়ো পাথরে ঘেরা মণ্ডলাকার ফাঁকা জায়গা, তারই মাঝখানে ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে। দুর্গার দশ বন্ধু সেই অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বসে আছে। স্থানীয় বনবাসীরা ভক্তিভরে অনেক খাদ্যপানীয় রেখে গেছে সেখানে। সেইসব সদ্ব্যবহারের সঙ্গে গল্পগুজব চলছে মন্দলয়ে, নিরুদ্বিগ্ন মনে। দুর্গা গিয়ে বসলো সেখানে। মাতঙ্গী বসলো দুর্গার পাশেই, যেখানে ওর বীণা রাখা ছিল। দুর্গা এক এক করে ওর বন্ধুদের দিকে তাকালো। অনেক ভালোবাসা, অনেক শ্রদ্ধাভরে। নতুন করে চিনতে ইচ্ছে করে ওদের সবাইকে।

কালী। ও তো সবে বয়ঃসন্ধিতে পড়েছে, এখনও ছেলেমানুষী যায়নি। চকচকে ঘনকৃষ্ণ গাত্রবর্ণের পটভূমিতে ওর সফরীসম চোখদুটো, যেন অমাবস্যার রাতের গহনে দীপ্তমান ধ্রুবতারা। কোমরে বাঁধা খড়্গ। অন্ধকারে অদৃশ্য থেকে যুদ্ধ করতে পারে ও। শত্রুর জীবন থেকে নিমেষে সময়কে শুষে নিতে পারে। কালী যেন কালহন্তা। অহংকার-হন্তা। ওর প্রতিভার সামনে সবাইকেই নত হতে হয়। অংহকারীদের জন্য কালান্তক যম, সাধাসিধে মানুষদের জন্য মাতৃস্বরূপা। জন্ম

অসুর

থেকেই ত্যাগী। কিছুতেই কোনও লোভ, কোনও মোহ নেই। ও যেন আমার গতজন্মের ছোট বোন।

কালীর পাশেই বসে আছে ভুবনেশ্বরী। গঙ্গানগরে ওই তো প্রথম আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। মমতাময়ী, সদা-যত্নশীলা, সবার প্রতি ওর স্নেহময়ী দৃষ্টি। এই দলের ও মাতৃস্বরূপা। পাশেই আলগোছে ফেলে রেখেছে অঙ্কুশ, ওর প্রিয় অস্ত্র। ওর উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ, ওর নীল চোখ এরাজ্যে সচরাচর দেখা যায় না। ব্রহ্মার সর্বত্র ওর পরিচিতি। সবার সঙ্গে যোগাযোগ ওর, সবার হাঁড়ির খবর রাখে ও। সবাই ওকে সম্মান করে, ভালোবাসে, ওর কথায় ভরসা করে বিপদে ঝাঁপ দেয়। অসীম ওর পরিচিতির পরিধি।

অগ্নিকুণ্ডের পাশেই রাখা ছিল একটি বীণা, কোলে তুলে নিয়ে তার তন্ত্রীতে অনুরণন তুলল মাতঙ্গী। ঝংকারে আনন্দে শিউরে উঠলো ফুলে ঢাকা বনতল। গুনগুন করে মাতঙ্গী তান ধরলো সন্ধ্যাকালের এক রাগিণীতে।

পোষা দাঁড়কাক কাঁধে, পাশেই বসে আছে ধূমাবতী। দাঁড়কাকটা ডানা ঝাপটাচ্ছে বারবার। ধূমাবতীর টিয়াপাখির মতো লম্বা নাকটা বেঁকে ঠোঁটের ওপর এসে পড়েছে। সে ঠোঁটের ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে তীক্ষ্ণ একসারি দাঁত, কালো মিশিতে মাখা। কালো ঠোঁট ওর, মৃতদেহের মতো ফ্যাকাশে গায়ের রং। ওর বয়স কত? জিজ্ঞেস করলেই রেগে যায়। মুখের ও হাতের বলিরেখা দেখে মনে হয়, শতায়ু ও হয়েছে বহুকাল আগেই। তবুও ধূমাবতী আমাদের সকলের মতোই সুস্থসবল। কখনো কোনও ভালো পরিষ্কার কাপড়চোপড় পরে না। তাপ্পিমারা ময়লা জামাকাপড়েই ওর আনন্দ। ওকে ছাড়া মহিষাসুরের বিরুদ্ধে এই বিজয় কখনোই সম্ভব ছিল না। গুপ্তবিজ্ঞানে ওর দক্ষতা অসামান্য। ভূভারতে এক ব্রহ্মা বাদে রসায়নবিদ্যায় ওর মতো ব্যুৎপত্তি বোধহয় আর কারোর নেই। সাদা চুলের একটা গোছা এসে পড়েছে মুখের ওপর। মুখের চারপাশে একটা ধোঁয়াশা, একটা রহস্য তৈরি করেছে। পরিষ্কার দেখা যায় না মুখটা। সবসময় মনে হয়, ও যেন লুকিয়ে আছে কোনও এক ধোঁয়ার পর্দার আড়ালে। অনামা অখ্যাত অচেনা হয়েই থাকতে চায় ও। খ্যাতির মোহ নেই বিন্দুমাত্র। হয়তো ওই অসুন্দরের মূর্তি ধরে ধূমাবতী সবাইকে একটা শিক্ষা দিতে চাইছে। যেন কেউ বাহ্যিক রূপে না ভুলে তার আড়ালে গিয়ে মানুষকে চেনে।

পাশেই বসে আছে ছিন্নমস্তা। পরনে পোড়ামাটির রঙের কাপড়, বুকের কাছে একটা নীলপদ্ম গোঁজা। ডান কাঁধটাকে আয়েশে জড়িয়ে আছে ওর পোষা সাপটা। বাঁ হাতে আলগোছে ধরে আছে কাটারি, ওর প্রিয় শস্ত্র। দিব্যাস্ত্রের প্রহার নিয়েছিল ও, আমাকে বাঁচাতে। পৃথিবীতে ক'জন এমন করতে পারে, পরের জন্য? কোনও দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়া? প্রাণের ভয় নেই ওর বিন্দুমাত্র। ওর গাত্রবর্ণ আজও টকটকে লাল, রক্তজবার মতো। দিব্যাস্ত্রের প্রভাবে। গলার চারপাশের গভীর কাটা দাগটা লুকিয়ে রাখার কোনও চেষ্টাই ও করে না কখনো। দেখে মনে হয় ওটা যেন ওর অলংকার, ওর গর্ব। আমি ওর একটা ডাকনাম দিয়েছি। বজ্রযোগিনী। ও এমন মেয়ে, যে বজ্রকে নিজের সঙ্গে যুক্ত করেছে।

আর ওই যে কমলা। সোনার বরণ, পরনে ঘন গোলাপি কাপড়, সোনালি পাড় তাতে। সম্পদের অক্ষয় ভাণ্ডার রয়েছে ওর কাছে। সমগ্র জম্বুদ্বীপে ওর চেয়ে ধনী আর কেউ নেই। সম্পদভরা ওর নৌবহর যখন সপ্তসমুদ্রে বাণিজ্য করতে বেরোয়, তখন সম্রাটরাও ঈর্ষাভরা সমীহের চোখে সেদিকে তাকায়। পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে ছাড়িয়ে আছে ওর বাণিজ্যকেন্দ্র, ওর অনুগামীরা। ওই কোমল মুখমণ্ডলের আড়ালে এমন একজন নারী রয়েছে, ধনশাস্ত্র যার চেয়ে ভালো আর কেউ বোঝে না সপ্তসমুদ্রে। লোকে বলে, যার টাকা তারই জোর। ব্রহ্মার বিদ্রোহের যাবতীয় খরচ জুগিয়েছে ও একা, কিন্তু একবারও নিজের জোর ফলানোর চেষ্টা করেনি। নিজের যাবতীয় ধনসম্পত্তিকে সমাজের সম্পদ মনে করে ও, নিজেকে সেই সম্পদের অছিমাত্র।

With Best Compliments From :-

RTS POWER CORPORATION LIMITED

Manufacturers of

E- H - V - GRADE TRANSFORMERS

Power & Distribution Transformers

From 25 KVA to 40 MVA, 132 KV Class

Single Phase Transformers 5 KVA to 25 KVA

Dry Type & Special Type Transformers

Head Office
56, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001
Phones : 2242-6025 / 6054
Fax No, : (033) 2242-6732
E-mail : rtspower@vsnl.net

Howrah Works:
130, Dharamtolla Road
Salkia, Howrah - 711 107
Phone No. : 2655-5376 / 3093-6492

Jaipur Works :
C-174, Vishwakarma Industrial Area, Chomu Road, Jaipur - 302 013
Phone No. : 2330-405 / 2330-269
Fax No. : 0141 2330315
email : rtspower@sancharnet.in

Agra Works :
Mathura Road, P.O. Artoni, Agra - 282 007
Phone No. : (0562) 2641-431

আর ওই বসে আছে ষোড়শী। মাত্র ষোলো বছর বয়স। মাজা রং আর মায়াবী চাহনি, ওর মতো সুন্দরী ত্রিভুবনে আর কেউ নেই। বাহুমূলে জড়ানো দড়ির ফাঁস, ষোড়শীর প্রিয় শস্ত্র। চোখের চাহনিমাত্র দিয়ে সম্মোহিত করার ক্ষমতা আছে ওর। মানবমনের প্রতিটি গলিঘুঁজির খবর রাখে, জানে কিভাবে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। মানবমনের ওপর প্রভাব সৃষ্টিকারী হরেক ঔষধীর খবর রাখে ও। লোকে বলে, সৌন্দর্য ক্ষণভঙ্গুর। না, ষোড়শীর ক্ষেত্রে তেমনটা নয়। বঙ্গাবিদ্রোহের উন্মত্ত রণক্ষেত্রে নির্ভয়ে ঝাঁপ দিয়েছিল ও। একা দানব-প্রহরীদের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল, সবচেয়ে বিপজ্জনক কাজটা তো ওই করেছিল। একবারও বুক কাঁপেনি ওর? ওই অনিন্দসুন্দর রূপ যুদ্ধক্ষেত্রে বিকৃত হয়ে যেতে পারে, সেটা ভেবে ভয়ে পিছিয়ে আসবার ইচ্ছে হয়নি?

ধূমাবতীর খনখনে স্বরে দুর্গার চিন্তাসূত্র ভেঙে পড়ল।

'নাঃ, মিথ্যে বলবো না, এসব খাবার ভালোই। তবে কী জানো বাছা, সত্যিকারের ভালো খাবার তো তোমরা খাওনি কখনো। আমি একদিন রান্না করতে পারি তোমাদের জন্য...'

'শোনো সবাই, শোনো!' বগলামুখী খুশিতে ডগমগ হয়ে বলল, 'বোধহয় আরেকটা নেমন্তন্ন লাভ হচ্ছে আমাদের।'

'আরেকটা চড়ুইভাতি!' বলল তারা।

'আরেব্বাস!' বলল ছিন্নমস্তা।

'নিশ্চয়ই, কেন নয় বাছা?' বলল ধূমাবতী, 'একদিন আমার বাসায় এসো তোমরা সব্বাই। আমার বাগানের টাটকা সবজি দিয়ে তোমাদের শুক্তো আর চচ্চড়ি রেঁধে খাওয়াবো, এই আমি কথা দিলাম।'

'কবে আসবো আমরা?' ভৈরবীর তর সইছে না আর।

'নেমন্তন্ন শুনে নাচছো?' বলল ভুবনেশ্বরী, 'আমার ক'টা কথা আগে শুনে নাও। ধূমাবতীর বাড়ি জলার গভীরে, সেটা কি জানো?'

'তাতে অসুবিধা কোথায়?' বলল তারা।

'হ্যাঁ' বলল ভৈরবী, 'যাবো না হয় জলার গভীরে। আমরা কি ভয় পাই? ভুরিভোজের জন্য যেখানে খুশি যেতে রাজি আছি।'

'নিশ্চয়ই যেতে পারো সেখানে' বলল ভুবনেশ্বরী, 'কিন্তু জলার গভীরে ধূমাবতীর বাড়ির বাগানে কী ফসল ফলে, সেটা জানো তো?'

'কী ফলে?' ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল ষোড়শী।

'কী আবার!' বলল ভুবনেশ্বরী, 'প্যাচপ্যাচে কাদার মধ্যে রকমারি ছত্রাক, শ্যাওলা, আগাছা গজায়। এছাড়া গেঁড়িগুগলি, ব্যাঙ... সেসব দিয়েই শুক্তো আর চচ্চড়ি রাঁধে ধূমাবতী।'

'ওয়াক!' শব্দ করল ষোড়শী। বাকিরা চুপ। নেমন্তন্ন ঘিরে যাবতীয় উৎসাহ মিইয়ে গেল এক লহমায়। ধূমাবতী অবাক।

'ছত্রাক, শ্যাওলা, গেঁড়িগুলি— এগুলো কি খারাপ জিনিস? অনেক পুষ্টিগুণ আছে এসবে।'

'ক্ষমা করো ধূমাবতী' বলল কমলা, 'যতই পুষ্টিগুণ থাকুক, ওসব খেতে পারবো না। তাছাড়া গেঁড়িগুগলি.. আমি তো নিরামিষাশী।'

'নিরামিষাশী! কেন, তুমি ইলিশ মাছ খাও না?' রেগেমেগে বলল ধূমাবতী।

'তুমি বরং অন্য কিছু বানাও না কেন?' বলল বগলামুখী।

'ভালো খাবার কাকে বলে, সে সম্পর্কে তোমাদের কোনো ধারণাই নেই।

যাও, খেতে হবে না।' স্বভাবসিদ্ধ খনখনে গলায় বলে উঠলো ধূমাবতী।

সবাই হো-হো করে হেসে উঠলো, দুর্গাও। আবার দৃষ্টি ফেরলো বন্ধুদের দিকে।

আর ওই যে ভৈরবী, আগুনের অন্যধারে বসে আছে। একহাতে পরশু, অন্যহাত খাদ্য-পানীয়র সৎকারে ব্যস্ত। পরনে বাঘছাল। অসামান্য পেশীশক্তির অধিকারিণী, আমার দেখা সেরা যোদ্ধা ও। অতিমানবী। ভালোর সঙ্গে ভালো, খারাপের সঙ্গে ভয়ংকর। এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে, সেই রাতে রণক্ষেত্রে ওর প্রবেশমাত্র অসুরসেনার কীরকম থরহরি কম্প জেগেছিল। বাঘেদের ওপর অসামান্য নিয়ন্ত্রণ ওর। এমনকী সুন্দরবনের প্রেতসদৃশ জন্ম-নরখাদক বাঘেদেরও এমনভাবে হুকুম দেয় ভৈরবী, যেন তারা ওর পোষা বেড়াল। লোকে বলে, মেয়েরা নাকি দুর্বল। ভৈরবীকে দেখলে সেকথা আর বলবে না। ওর সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধে জিততে পারে এমন পুরুষ ত্রিভুবনে নেই।

বগলামুখী বসে আছে ভৈরবীর পাশেই। দুর্ধর্ষ তিরন্দাজ। বকসদৃশ লম্বাটে গড়নের মুখমণ্ডল। বকের মতোই লম্বাটে ঋজু ওর ওই গ্রীবা যেন প্রকৃতি ধনুর্বিদের উপযোগী করেই গড়েছেন। সবসময় ঠাট্টা-ইয়ার্কি দিয়ে মাতিয়ে রাখে সবাইকে। উজ্জ্বল হলুদ কাপড় গায়ে, হলুদ গাত্রবর্ণের সঙ্গে মানিয়েছে বেশ। দেখেশুনে মনে হয় সাধারণ এক মেয়ে। কিন্তু চোখদুটো দেখলে বেশ বোঝা যায়, এ কোনো সাধারণ মেয়ে হতে পারে না। তীক্ষ্ণ ওই চোখদুটো অন্ধকারে শার্দূলের জ্বলন্ত চোখের ভ্রম জাগায়। ওর তুল্য ধনুর্ধর ত্রিভুবনে আর নেই। এক লহমায় শত্রুকে বোবা করে দিতে পারে ও। যে কোনো সময় যে কোনো যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আছে ওর। শত্রুর ভাষাকে

মূক করতে পারে, জ্ঞানকে অজ্ঞান করতে পারে, জয়কে পরাজয়ে বদলে দিতে পারে ও।

বড় একটা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে ওই বসে আছে আছে তারা। আমার দেখা সেরা চিকিৎসক। ওর পাশে রাখা আছে ওষুধের বাটি আর কাঁচি। ও সবসময়ই তৈরি, যদি কেউ অসুখে পড়ে, বা আহত হয়। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, ওষুধের বাটিটা নরকরোটি দিয়ে তৈরি। সম্ভবত ব্রঙ্গার যুদ্ধে নিহত কোনো অসুরের মাথা থেকে তৈরি ওটা। ওটা দেখিয়ে বোধহয় তারা বলতে চাইছে, ধ্বংস ও সৃষ্টি দুটো আলাদা ব্যাপার নয়। একটির মধ্যে অন্যটির বীজ সুপ্ত থাকে। ওর ঘননীল গাত্রবর্ণ যেন সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্তের আকাশ। মহিষের শাসনে নাজেহাল হয়ে অনেক পেশাদারই ব্রঙ্গা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। তারাও তো চলে যেতে পারতো। কোনো দূর দেশে। হয়তো দূর সেই শুঙ্গভূমিতে। নির্ঝঞ্ঝাট নিষ্কণ্টক আরামের জীবন কাটাতে। যে কোনো সম্রাট ওকে রাজবৈদ্য হিসাবে পেয়ে ধন্য হতো। কিন্তু ও তা করেনি। সবচেয়ে অন্ধকার সময়ে ও ব্রঙ্গাবাসীদের পাশে থেকেছিল। নিজের নিরাপত্তার পরোয়া করেনি। লোকে বলে, পেশাদাররা কখনো কোনো ঝামেলার মধ্যে মাথা গলায় না। তারা কিন্তু নির্দ্বিধায় ঝাঁপ দিয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে। তারার আরেকটি অসামান্য গুণের কথা অনেকেই জানে না। বাগ্মিতায় ওর সমতুল্য খুব বেশি কেউ নেই এই জম্বুদ্বীপে। ব্রঙ্গার বিদ্রোহে নাগরিক-সমিতিগুলিকে পাশে পাওয়া গিয়েছিল, সেটা তারার বাগ্মিতা ও যুক্তির প্রভাবেই।

আর ওই তো মাতঙ্গী। আমার মন্ত্রণাদাত্রী, আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। ওকে আমি সব কথা বলতে পারি, আমার সব কথা ও বোঝে। সব পরামর্শ করতে পারি আমি ওর সঙ্গে। হাতে বীণা, কণ্ঠে স্বর্গীয় রাগিণী। সেই রাগিণীর সুর মিশে আছে চাঁদের জোছনায়, নীল আকাশের পরতে পরতে। জ্ঞানের ভাণ্ডার ও। কত কী যে ও জানে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। তবু নিত্যদিন নতুন কিছু না কিছু শিখে চলেছে। এত গুণ ওর, তবু কেন ও এরকম সাধারণভাবে থাকে? জামাকাপড় অপরিষ্কার, গা-ময় শ্যাওলা, এসব দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই ওর। সবসময় সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে থাকে, যেন ও কেউ নয়। নিজের জীবনের পরোয়া না করে অসুরপুরীতে গুপ্তচর হয়ে কাটিয়েছিল ও এক সপ্তাহ। মহিষাসুরের প্রতিরক্ষাকে ভেতর থেকে ধ্বংস করে দিয়েছিল কারোর বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক না করেই। ও ছাড়া আর কেউ পারতো না এ কাজ। সমাজচ্যুত সেজে সমাজচ্যুতদের মধ্যে মিশে থাকতে ভালোবাসে ও। সমাজের অন্তজদের প্রতি সীমাহীন মমতা ওর। অসামান্য গুপ্তচর, অসামান্য যোদ্ধা। মন্ত্রদ্রষ্টা, সমরবিদ্যায় অপরিসীম ব্যুৎপত্তি। এত সবের পরেও কী সুন্দর গান গায় ও। কী সুন্দর বীণা বাজায়!

ওরা একে অন্যের থেকে কতটা আলাদা। অথচ কত না মিল ওদের কেন জানি না মনে হয়, আমরা এগারোজন একটা সত্তা। ওদের ছেড়ে গুরুকুলে ফিরে গিয়ে বাঁচবো কী করে?

দুর্গা খেয়াল করলো, মাতঙ্গীর চোখদুটো আধবোজা। এখনো বীণা বাজিয়ে চলেছে, কিন্তু ওর মন যেন অন্য কোথাও পড়ে আছে। আশপাশের এতসব কথাবার্তা, কোনোকিছুই যেন ওকে স্পর্শ করতে পারছে না। চড়ুইভাতির এই জায়গাটা ওরই পছন্দের। এতসব সুন্দর সুন্দর জায়গা থাকতে এই জায়গাটাই কেন পছন্দ করলো ও? জায়গাটা ব্রঙ্গার সীমান্তে বলে কি? ও কি আমাদের সবাইকে মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে যে, মহিষাসুর শেষ হয়নি, সে ধারেকাছেই আছে?

কী এত চিন্তা করছো বলো তো?' মাতঙ্গীকে প্রশ্ন করলো দুর্গা, 'দেখেশুনে মনে হচ্ছে, তোমার মাথার মধ্যে বিস্তর পরিকল্পনা ঘোঁট পাকাচ্ছে, সত্যি?'

'কী করে বুঝলে?' মাতঙ্গী বলল, 'মনপড়া শিখছো নাকি, কোনো শক্তিপীঠ থেকে?'

'বাজে কথা রাখো। কী ভাবছো সেটা বলবে?' দুগা অধৈর্য।

'দ্যাখো' বলল মাতঙ্গী, 'গত ক'দিন ধরে তুমি খুব চিন্তায় আছো, সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কিছু বলছো না আমাদের। সেটাই ভাবছিলাম। কোন সে দুশ্চিন্তা তোমাকে ভাবাচ্ছে? আমার মনে হয়, সেটা ধরতে পেরেছি। সে সমস্যার কিছু সমাধানও আমার মাথায় রয়েছে। কিন্তু তার আগে বলো, এই যে দেখছি দিব্যি এত্তবড় একটা পিঠে খাচ্ছো তারিয়ে তারিয়ে, আমার জন্য রাখোনি?'

'পিঠে? সে তো ওই বনবাসীদের গ্রামে গিয়েছিলাম, সেখানে দিয়েছে। এখান থেকে বেশি দূর নয়, এক ক্রোশ হবে। পিঠে খেতে ইচ্ছে হয়েছে, তো সেখান থেকে একটা পিঠে নিয়ে এসো না কেন?'

মুখে দুষ্টুমির হাসি, দুর্গা কিছু বোঝার আগেই ওকে এক ধাক্কা দিল মাতঙ্গী। মাটিতে চিৎ হয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিল দুর্গা। সেই ফাঁকে চিলের মতো ছোঁ মেরে দুর্গার হাত থেকে পিঠেটা কেড়ে নিয়ে দৌড় দিল মাতঙ্গী জঙ্গলের দিকে। লাফিয়ে উঠে দুর্গা পিছু নিল।

'আমার পিঠে ফেরত দে বলছি পোড়ারমুখী।' দুর্গা চেঁচিয়ে বলল, 'নাহলে পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত তোকে ধাওয়া

করবো।'

'পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত ধাওয়া করতে হবে না। বরঞ্চ একটা খেলা খেলি চলো' দৌড়তে দৌড়তে চেঁচিয়ে বলল মাতঙ্গী, 'আমি যদি ফিরে এসে ওই আগুনটাকে ছুঁতে পারি, তাহলে পিঠেটা আমার। আর যদি তুমি তার আগে আমাকে ধরে ফেলো তাহলে পিঠে তোমার। রাজি?'

'ঠিক আছে, ধরছি তোকে এক্ষুনি।' চিৎকার করে বলল দুর্গা।

প্রাণভরে হাসতে হাসতে দুজনে দৌড়লো জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে।

অন্ধকার জঙ্গলের শুঁড়িপথে দূরে দেখা যাচ্ছে মাতঙ্গীকে, যেন হাওয়ায় ভেসে উড়ে চলেছে। লাফিয়ে পার হচ্ছে কাঁটাঝোপ, পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে লতাগুল্মর জটাজালের মধ্য দিয়ে। অনেক চেষ্টা করেও দুর্গা ওকে ধরতে পারল না, দুজনের মধ্যেকার ব্যবধান ক্রমশ বেড়েই চলেছে। দুর্গা বারকতক রাস্তা বদল করে দূরত্ব কমানোর চেষ্টা করল। মাতঙ্গী বারবারই পথ বদলে আবার দূরত্ব বাড়িয়ে নিল। একসময় পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল মাতঙ্গী। মরিয়া হয়ে দুর্গা গাছের ওপরে উঠে পড়ল, উঁচু ডালের ওপর দিয়ে দৌড়তে শুরু করল। দূরে আবার দেখা মিলল মাতঙ্গীর। গাছপালার মধ্যে লুকিয়ে থেকে দুর্গা দেখতে পেল, দৌড়ের মধ্যেই বারকতক মোড় ঘুরলো মাতঙ্গী। তার মানে, একটা বৃত্তাকার পথ ধরেছে ও, যাতে পথের শেষে হঠাৎ করেই ওরা চড়ুইভাতির জায়গাটায় পৌঁছে যায়, দুর্গা বুঝতে পারবার আগেই। আরও কিছুক্ষণ চলল দৌড়। দুর্গা ডালের ওপর দিয়ে, মাতঙ্গী নীচ দিয়ে। তবু দুর্গা নাগাল পেল না মাতঙ্গীর। শেষমেশ দেখতে পেল, চড়ুইভাতির জায়গাটা কাছেই এসে পড়েছে। আগুনের শিখাগুলো নৃত্যবিভঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে আকাশের দিকে, যেন ঠাট্টা করছে দুর্গাকে। মাতঙ্গী তখন আগুন থেকে আর মাত্র হাতবিশেক দূরে, মরিয়া হয়ে দুর্গা ওর কোমরবন্ধ থেকে টেনে বার করল ত্রিশূলাকৃতির একটি ছুরি। নিভুল লক্ষ্যে ছুঁড়ে দিল সেটাকে। মাতঙ্গীর পা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল ছুরিটা। ওকে স্পর্শ করলে না, কিন্তু ওর ঠিক সামনে মাটিতে গেঁথে গেল। সেই ছুরিতে হোঁচট খেয়ে আছাড় খেল মাতঙ্গী। গাছের ওপর থেকে সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল দুর্গা, মাতঙ্গীর হাত থেকে পিঠেটা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করল। পিছলে বেরিয়ে গেল মাতঙ্গী, ডিগবাজি খেয়ে পরমুহূর্তেই ছুঁয়ে ফেলল আগুনের শিখাটাকে। উল্লাসে সবাই উলুধ্বনি দিয়ে উঠল। আয়েশে বসে মাতঙ্গী পিঠেয় বড় একটা কামড় বসালো।

'গেলো, যতখুশি গেলো,' হাল ছেড়ে বলল দুর্গা 'এবার বলবে তো, কী কথা বলবে বলছিলে?'

'নিশ্চয়ই বলবো,' বলল মাতঙ্গী, 'আগে একটু দম ফেলতে তো দাও।'

মুহূর্ত, পল, দণ্ড।

পিত্রালয়ের সামনে স্থানু হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছিল শ্রমণা, অনেকক্ষণ ধরে। কোলে ছ'মাস বয়সের ছোট মেয়েটা। পা আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে ওর বড় মেয়েটা, দু'বছর বয়স। দরজায় করাঘাত করতে হাত উঠছে না। হাতটা যেন সিসের তৈরি, ভীষণ ভারী। আজ তিনবছর পর ও বাপের বাড়ি এল। মাত্র তিন বছর, মনে হচ্ছে যেন তিন যুগ। কিন্তু এ বাড়ির সঙ্গে ওর যে নাড়ির টান। এই আঙ্গিনাতেই তো অর বেড়ে ওঠা। কত স্মৃতি! কত আনন্দ, কত ব্যথা। অথচ আজ এই বাড়িটা কত অচেনা হয়ে গেছে। সব স্মৃতিই যেন কোন সে পরজন্মের স্মৃতি হয়ে রয়ে গেছে।

অন্ধকার রাত। ঝিঁঝি ডাকছে।

এ রাজ্যের অর্ধেক জনসংখ্যা প্রকৃতিপূজক, মূলত অগ্নি-উপাসক। বাকি অর্ধেক অসুর। রাজা জন্মসূত্রে অগ্নি-উপাসক, কিন্তু অসুরদের সঙ্গেই তাঁর অধিক হৃদ্যতা। শোনা যায়, রাজা হওয়ার আগে ছাত্র হিসেবে তিনি যখন কশ্যপমুনির গুরুকুলে ছিলেন, তখন থেকেই তাঁর অসুবাদের প্রতি দুর্বলতা জন্মায়। রাজা হওয়ার পর থেকে তিনি অসুরদের নানাভাবে মদত জুগিয়েছেন। রাজ্যের চারণকবি ও নাট্যকাররা এমন সব নাটক লেখে, এমন সব নাটক মঞ্চস্থ করে, যাতে প্রকৃতিপূজকদের অপরাধপ্রবণ, ক্ষুদ্রমনা, ষড়যন্ত্রকারী ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিসেবে দেখানো হয়। অসুরদের দেখানো হয় উদারমনা বীর হিসেবে। অসুর ধর্মগুরুদের দেখানো হয় সর্বত্যাগী ও পরোপকারী হিসেবে। রাজা এমনটাই চান। কোনো পথনাটিকায় অসুরদের খলনায়ক দেখানো তিনি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। এতে নাকি রাজ্যের শান্তিভঙ্গ হয়। প্রকৃতিপূজকদের খলনায়ক দেখাতে কোনো আপত্তি নেই। অগ্নিমন্দিরের পূজারিদের নিয়ে ব্যঙ্গরসাত্মক নাটিকাগুলো বিশেষ জনপ্রিয় এরাজ্যে। ভাঁড়দের সবসময়ই অগ্নি-পুরোহিতের সাজে সাজানো হয়। রাজ-অনুদানের অধিকাংশই যায় রাজ্যের সেইসব

Mahavir Institute of Education & Research

Affiliated with I. C. S. E.

&

I. S. C.

17/1, Canal Street, Kolkata - 700 014

Ph. No. 2265-5821/22

A School of UKG to Class - XII

(English Medium)

For Boys & Girls

বিদ্যালয়ে, যেখানে গুরুমশাইরা অসুর। ফলে প্রকৃতিপূজকদের দ্বারা পরিচালিত বহু বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে। অধিকাংশ প্রকৃতিপূজক ঘরের ছেলে-মেয়েরা অসুরদের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়েই বিদ্যাশিক্ষার জন্য যায়। শ্রমণাও তাই করেছিল।

ছবি আঁকতে ভালোবাসতো শ্রমণা। হাতের কাজ ভালো পারতো। ছোটবেলা থেকেই মাটির পুতুল গড়তে সিদ্ধহস্ত ছিল। তাই কুম্ভকারদের বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল ও। বিদ্যালয়ের দ্বিতীয়দিনে খণ্ডভুজ যেচে ওর সঙ্গে এসে আলাপ করেছিল। অসুররা বীর, তারা মেয়েদের খুব যত্ন করে, সম্মান করে— এমনটাই জানতো শ্রমণা। তাই খণ্ডভুজকে সন্দেহ করার কোনো কারণ ঘটেনি। প্রধান গুরুমশাইয়ের সঙ্গে খুব ভালো পরিচয় ছিল খণ্ডভুজের। শ্রমণার সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল তাঁর। তার ফলে গুরুমশাই বিশেষ মনোযোগ দিতেন শ্রমণার শিক্ষার ওপর। কতক সেই কৃতজ্ঞতা থেকেই খণ্ডভুজের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো। খণ্ডভুজ পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল ওর বন্ধুদের সঙ্গেও। প্রকৃতিপূজক আর অসুরদের মধ্যে প্রভেদে বিশ্বাস করতো না খণ্ডভুজ। সবাই তো মনুসন্তান, তাহলে কেন এই বিভেদ? এমনটাই বলতো ও। খুব ভালো লাগতো ওর কথাগুলো।

কিছুদিনের মধ্যেই শ্রমণা খেয়াল করেছিল, ওর চারপাশে বন্ধুদের একটা অদৃশ্য বলয় তৈরি হয়েছে বিদ্যালয়ে। সেই বলয়ের সবাই অসুর। প্রকৃতিপূজক ছেলেদের সেখানে প্রবেশের অনুমতি নেই। খেয়াল করলেও সেটা নিয়ে বেশি ভাবেনি শ্রমণা। ধীরে ধীরে দেখল, বিদ্যালয়ের বাইরের অসুররাও এসে জুটেছে সেই বলয়ে। এমনকী রাস্তাঘাটেও একলা চলার উপায় নেই ওর। তখন ব্যাপারটা খারাপ লাগতো না। বরঞ্চ নিরাপদ বোধ হতো। মনে হতো, বেশ গুরুত্ব পাচ্ছে। তারপর একদিন বাড়ি ফেরার পথে খণ্ডভুজ ওকে নিরালা এক উদ্যানে নিয়ে গিয়ে জোর করে সম্ভোগ করল। বাবা মা-কে বলতে পারেনি সেকথা। খুব কেঁদেছিল সেদিন রাতে। মনে হয়েছিল, শরীরটা অপবিত্র হয়ে গেল। সেই অপবিত্রতার অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পেতেই বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিল খণ্ডভুজকে। বাবা মা-র অমতে বিয়ে হয়েছিল অসুমন্দিরে। খণ্ডভুজ আর ওর বন্ধুরাই সব ব্যবস্থা করেছিল। বিয়ের সঙ্গে অসুধর্ম গ্রহণ করতেও বাধ্য করেছিল শ্রমণাকে। ঠাকুরমার দেওয়া 'শ্রমণা' নামটা ছেড়ে একটা নতুন নাম নিতে হলো। প্রতিজ্ঞা করতে হলো, এ জীবনে আর কখনো প্রকৃতিপূজা করবে না। অসু ছাড়া আর কারোর আরাধনা করলে প্রাণদণ্ড স্বীকার করতে হবে, এ প্রতিজ্ঞাও করতে হলো।

'তুমি তো প্রকৃতিপূজক আর অসুরদের মধ্যে বিভেদে বিশ্বাস করো না। তাহলে এসব কেন করাচ্ছো আমাকে দিয়ে?' প্রশ্ন করেছিল শ্রমণা। অসুরদের বিয়ে করতে গেলে নাকি এসব করতে হয়। এমনটাই বলেছিল খণ্ডভুজ। শ্রমণার লেখাপড়ার সেখানেই ইতি হলো। শুরু হল খণ্ডভুজের বাড়িতে বন্দিদশা। মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিল ও খণ্ডভুজকে। ঘিঞ্জি বসতির পুতিদুর্গন্ধময় সেই বাড়ির মানুষগুলো প্রতিদিন ওর ওপর নির্যাতন চালাতো। শারীরিক, মানসিক। ওর পিত্রালয় এবং তাদের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে নিরন্তর ব্যঙ্গবিদ্রূপ চলতো। সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করতো শ্রমণা। শুধুমাত্র খণ্ডভুজের প্রতি ভালোবাসায়। বছর ঘুরতে ঘুরতে বাচ্চা হলো। একটা, তারপর আরও একটা। এই সময় জানতে পারলো খণ্ডভুজ সেই একই বিদ্যালয়ে আরেকটি মেয়ের সঙ্গে প্রেমে লিপ্ত, শিগগিরই নাকি সেই মেয়েটিকে বিবাহ করবে। এর সঙ্গেই শ্বশুরবাড়িতে ওর ওপর অত্যাচার উঠলো চরমে, সেই অত্যাচারে খণ্ডভুজও যোগ দিতে শুরু করলো। দিশেহারা শ্রমণা বুঝে উঠতে পারছিল না, হলোটা কী। এত ভালোবাসা, এত মনোযোগ, সব কীভাবে শুকিয়ে গেল?

একদিন আড়িপেতে খণ্ডভুজের সঙ্গে ওর বন্ধুদের কথোপকথন শুনেছিল শ্রমণা। তার সঙ্গেই জলের মতো সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। জেনেছিল, উত্তরাপথের অসুর-সম্রাট মহিষাসুর নাকি এই রাজ্যটাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে উঠেপড়ে লেগেছেন। তার জন্য প্রয়োজন এরাজ্যে অসুরদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা নিয়েছেন মহিষাসুর। তিনি বিভিন্ন রকম অনুদান দেন অসুর যুবকদের। প্রকৃতিপূজকদের সঙ্গে ব্যবসা না করলে অনুদান পাওয়া যায়। উদ্দেশ্য, যাতে প্রকৃতিপূজকদের ব্যবসায় মন্দা আসে, তাদের আর্থিক সক্ষমতা কমতে থাকে। প্রকৃতিপূজকদের ঘরের নারীদের ধর্মান্তরিত করে বিবাহ করলে প্রচুর অনুদান পাওয়া যায়। সেই অনুদানের লোভে বহু অসুর যুবক প্রকৃতিপূজক নারীদের বিবাহ করাটাই নিজেদের পেশা বানিয়ে ফেলেছে। এরা বিদ্যালয়ে যোগ দেয় শুধুমাত্র প্রকৃতিপূজক ছাত্রীদের সঙ্গে পরিচয় করার জন্য। বিদ্যালয়ের গুরুমশাইরাও এই ষড়যন্ত্রে জড়িত।

অনেক যন্ত্রণা সয়েছে শ্রমণা। সবই ভালোবাসার জন্য। কিন্তু যেদিন জানতে পারলো এটা ভালোবাসা নয়, ভালোবাসার অভিনয়— সেদিন সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে পাপপুরী ছেড়ে পালিয়ে এসেছে ও, একবস্ত্রে। কিন্তু এতদূর এসেও দরজায় ধাক্কা দিতে হাত উঠছে না।

মনের সব শক্তি একজোট করে দরজায় ধাক্কা দিল শ্রমণা। কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করে আরও একবার। এবার বেশ জোরে।

'কে তুমি, বাছা?' দরজা খুলে বেরিয়ে এল মা।

'মা! আমি! চিনতে পারছো না আমাকে?'

খানিকক্ষণ অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল মা। তারপর ওকে জড়িয়ে ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। ঘরের চৌকাঠে বসে শ্রমণাও অনেক কাঁদলো, মাকে ধরে। তারপর চোখের জল মুখে বাচ্চাদুটোকে মা-র কোলে তুলে দিল।

'মা, আমি ভুল করেছি,' বলল শ্রমণা, 'কিন্তু এই বাচ্চাদুটো কোনো ভুল করেনি। এরা অমৃতের সন্তান। এদের তুমি প্রকৃতি-উপাসনার পরম্পরায় পালন করো।'

'কোথায় যাচ্ছিস তুই?' শঙ্কিত গলায় প্রশ্ন করল মা।

'এখানে থাকলে ধর্মত্যাগের অপরাধে আমাকে প্রাণদণ্ড দেবে ওরা। তাই ব্রঙ্গায় যাচ্ছি।'

'ব্রঙ্গা! সেখানে তো শুনেছি গৃহযুদ্ধ চলছে। সেখানে মরতে কেন যাচ্ছিস?'

'শুনেছি দুর্গা নামের একটি মেয়ে থাকে সেখানে। বয়সে সে আমারই মতো, কিন্তু এই বয়সেই সে মহিষাসুরকে যুদ্ধে পরাজিত করেছে। তার কাছে যাচ্ছি। যদি আমার এই নষ্ট জীবন তার কোনো কাজে লাগে। প্রতিশোধ নিতে চাই মা। এই নষ্ট জীবনটাকে সার্থক করতে চাই। আমার ভালোবাসা কিন্তু মিথ্যে ছিল না। প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলাম মানুষটাকে। সেই ভালোবাসাকে সার্থক করতে চললাম। ভালোবাসার মতো পবিত্র ব্যাপারটাকে যারা আগ্রাসনের হাতিয়ার করে তুলেছে, তাদের পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দিতে চাই। যাতে আমার সঙ্গে যা ঘটেছে, আমার মেয়েদের সঙ্গে তা না ঘটে। মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চললাম। জানি না, বেঁচে ফিরবো কিনা। যদি বেঁচে থাকি, তোমার কাছে ফিরে আসবো। এই বাচ্চাদুটোর কাছে ফিরে আসবো। যদি না ফিরি, তুমি ওদের দেখো। দেখো, ওদের পরিণতি যেন আমার মতো না হয়।'

একটু জল, সঙ্গে পিঠেয় আরেকটা কামড়। খানিকক্ষণ পরে মাতঙ্গী বললো, 'দ্যাখো, ব্রঙ্গা থেকে মহিষকে আমরা তাড়িয়েছি, তা সপ্তাহখানেক হলো। তারপর থেকে আমাদের সবার মনেই অনেকরকম ভাবনাচিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। দেখি, সেগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করতে পারি কিনা। আচ্ছা, একটা কথা বলো, মহিষ-বিতাড়ন তো হলো। এখন আমাদের কী করা উচিত?'

'মনপড়ার ক্ষমতাটা আমার নয়, তোমার গজিয়েছে মনে হচ্ছে।' অবাক হয়ে বললো দুর্গা, 'প্রশ্নটা প্রাসঙ্গিক। আমাদের এখন কী করা উচিত? নিজের নিজের জীবনে ফিরে যাওয়া?'

'সেটাই তো যুক্তিসম্মত কাজ হবে, তাই না?' বললো ষোড়শী, 'চিরকাল তো আর যুদ্ধ করা যায় না।'

'আজ জম্বুদ্বীপের বহু মানুষ আমাদের পরিত্রাতা বলে ভাবছে', বললো কালী, 'দেশের পরিস্থিতি ভুলে আমরা যদি নিজেদের জীবনে ফিরে যাই, অনেকেই খুব হতাশ হবে। আশাভঙ্গ হবে তাদের।'

'ঠিক', বললো ভৈরবী, 'আরেকটা ব্যাপারও রয়েছে। যদি মহিষ প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করে? সেই সম্ভাবনাটা কিন্তু প্রবল। যদি সে ফিরে আসে, কী করবো আমরা? তখন নতুন করে সবাইকে একজোট করা খুব কঠিন হবে।'

'ঠিক কথা,' বললো মাতঙ্গী, 'তাই আমার মনে হয়, যে কাজটা আমরা শুরু করেছি, সেটাকে আগে শেষ করা দরকার। মহিষের মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের বিশ্রাম নেই। যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।'

'বলা সহজ, করা কঠিন', খ্যানখ্যানে গলায় বলে উঠলো ধূমাবতী, 'এই অবস্থায় লড়তে গেলে গো-হারান হার কপালে নাচছে।'

'কেন এমন অলুক্ষুনে কথা বলছো?' বললো বগলামুখী।

'কেন?' বললো ধূমাবতী। 'কেন নয়? মহিষের সঙ্গে আছে অসংখ্য পাগল ধর্মান্ধ অসুর। মহিষের কথায় তারা আগুনেও ঝাঁপ দিতে পারে। আমাদের কাছে কী আছে? একটাই জিনিস আমাদের পক্ষে ছিল, আর সেটা হল মহিষের অসতর্কতা। তোমরা কি মনে করো, যদি আমরা দলবল নিয়ে মহিষের গ্রামে হাজির হই, ও গতবারের মতো নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমিয়ে থাকবে?'

'কথাটা ঠিক', বলল কমলা।

'তাই মহিষের সঙ্গে যেমন আছে অসংখ্য পাগল ধর্মান্ধ অসুর', বললো ভুবনেশ্বরী, 'তেমনি আমাদের দরকার প্রতিটি সাধারণ মানুষের সমর্থন, যারা এই পাগল ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে।'

'কিন্তু কেন সাধারণ মানুষ আমাদের সমর্থন করবে?' বললো মাতঙ্গী।

'দেশের পরিস্থিতিটা দ্যাখো একবার। মহিষের হাতে এ

দেশের অসংখ্য শাসক খুন হয়েছে। শাসনতন্ত্র ধ্বংস হয়েছে অধিকাংশ রাজ্যের। ফলে দেশজোড়া এক শূন্যতা তৈরি হয়েছে। জায়গায় জায়গায় ডাকাত গুন্ডা বদমাইশদের রাজত্ব চলছে। ঘটনাচক্রে, এইসব গুন্ডা বদমাইশদের সবাই কিন্তু অসুর নয়। এদের লুঠপাট আর অত্যাচারে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে আজ। মানুষ আজ বুঝতে পারছে না, কে ভালো আর কে খারাপ।'

'ঠিক বলেছো', বললো বগলামুখী, 'আমি যদ্দুর জানি, এইসব ডাকাতদের হাত থেকে বাঁচতে বহু মানুষ মহিষকেই সম্রাট হিসেবে চাইছে। এরা মহিষকে ঘৃণা করে, নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে অসুধর্ম গ্রহণ করার আগে এরা হয়তো আত্মহত্যা করবে, কিন্তু প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন ডাকাতের হাতে অত্যাচারিত হওয়ার অনিশ্চয়তার বদলে এরা মহিষকেই চাইছে। তাই মহিষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এদের সমর্থন তো আমরা পাবো না।'

'ঠিক এখানেই আমাদের সমস্যাটা রয়েছে', বললো মাতঙ্গী, 'সাধারণ মানুষ কী করে আমাদের বিশ্বাস করবে? কী করে তারা জানবে, আমরা ডাকাত নই, বিপ্লবী?'

'তুমি কী বলতে চাইছো, বুঝতে পেরেছি,' বললো দুর্গা, 'আমি তোমার সঙ্গে একমত। স্বৈরাচারী মহিষকে শুধুমাত্র একটা যুদ্ধে হারালেই মানুষের বিশ্বাস পাওয়া যায় না। আর মানুষের বিশ্বাস ছাড়া আমরা স্থায়ীভাবে মহিষকে পরাজিত করতে পারবো না। যদি না সাধারণ মানুষ আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দেয়, এ যুদ্ধের অন্তিম বিজয় আমাদের ভাগ্যে নেই। এটা আমাদের যুদ্ধ নয়, এটা সাধারণ মানুষের যুদ্ধ। কিন্তু কেন ওরা আমাদের ওপর ভরসা করে সর্বস্ব ত্যাগ করে এই যুদ্ধে ঝাঁপ দেবে? আমরাও যে অত্যাচারী নই, সেটা ওরা জানবে কী করে? যদি আমাদের নিয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের উদ্রেক হয় ওদের মনে, ওরা হাল ছেড়ে দিয়ে বসে পড়বে। আর এটাই এই দেশটার মূল সমস্যা। দেশের সাধারণ মানুষ ভাবে, সব শাসকই চোর আর অত্যাচারী।'

'হ্যাঁ', মাতঙ্গী বললো দুর্গাকে, 'আর এই সমস্যাটার সমাধানই আমাদের আগে করতে হবে। তোমার কথা দেশময় ছড়িয়ে দিতে হবে। ওরা যেন জানতে পারে, তুমি রাজত্ব করতে আসোনি। তুমি নিজের লড়াই লড়ছো না, ওদের লড়াই লড়ছো। ওদের ভালোর জন্য প্রাণপাত করছো। দেশসুদ্ধ লোক যেন তোমাকে আপনজন মনে করে। তোমাকে যেন ওরা শৈলসূতে-সিন্ধুসূতে বলে জানে। পাহাড় থেকে সমুদ্র, সবাই যেন তোমাকে তাদের নিজেদের ঘরের মেয়ে মানে। কাজটা কঠিন। কিন্তু যদি এটা করা যায়, দেখবে, এদেশের সাধারণ মানুষ দলে দলে এই লড়াইয়ে যোগ দেবে।'

'যদি সেটাই করতে হয়,' বললো দুর্গা, 'তাহলে তার পেছনে নিখুঁত একটা পরিকল্পনার প্রয়োজন। কাজটা শত্রুর এলাকায় গিয়ে করতে হবে। কেউ বন্দি হলে চলবে না, খুন হলে চলবে না। মাতঙ্গী, এই পরিকল্পনায় তোমার হরির সহায়তা প্রয়োজন হবে। আর একজনকে বিশেষভাবে দরকার। সে হল ব্রঙ্গার ভূতপূর্ব গুপ্তচর-প্রধান বিরূপাক্ষ। গুপ্তচর বিদ্যায় তার মতো ধুরন্ধর এই ভূভারতে আর দ্বিতীয় নেই।

কয়েকদিন পরের কথা।

অক্ষুমুনির আশ্রম এ তল্লাটের সবচেয়ে বড় দ্বীপে। সমুদ্র, মোহনা, খাঁড়ি, নদী— এসবের মাঝখানেই আশ্রম। আজ সেই আশ্রমের সামনে সমুদ্রতীরে উঁচু একটা পাথরের ওপর বসেছিলেন অক্ষুমুনি। সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখা করছিলেন। পায়ের কাছে বসে তাই শুনছিল দুর্গা। ওর পাশেই হাঁটুগেড়ে যুক্তকরে বসেছিল অসুর-ধর্মগুরু আরক্ত। মহিষাসুরের রাজত্বকালে এই আরক্তর ওপরেই ন্যাস্ত ছিল সমগ্র ব্রঙ্গায় অসুধর্ম প্রতিষ্ঠার ভার। স্বভাব-দার্শনিক ও বোদ্ধা, এককালে অসুবাদের সবল প্রবক্তা হলেও সে বিশ্বাসে চিড় ধরেছিল বেশ কিছুকাল আগেই। মহিষাসুরের বিতাড়ানের পর আরক্ত এসে শরণ প্রার্থনা করে মুনির কাছে। তখন থেকেই ও রয়েছে আশ্রমে। মুনি স্নেহভারে ওকে 'আসুরী' বলে ডাকেন। দুর্গার একটা সন্দেহ আছে, এই আসুরীকে হয়ত মহিষই রেখে গেছে এখানে, গুপ্তচরবৃত্তি করার জন্য। তবে যদি সে উদ্দেশ্য থেকেও থাকে, মুনির জ্ঞানসমুদ্রে এই আসুরিক নুনের পুতুলটির দ্রবীভূত হতে বেশি সময় লাগবে না। এ সম্বন্ধে দুর্গা একপ্রকার নিশ্চিত। তবু ও প্রতিনিয়ত শ্যেনদৃষ্টি রাখে আসুরীর ওপর। সূর্যোদয়ের মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত ভাগীরথীর সাগরসঙ্গমে। ভোরের আলোয় কপিলবর্ণ মুনির অবয়ব জ্বলজ্বল করছিল অনন্ত জলধির পটভূমিকায়। মুনি বলছিলেন,

'ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা কে, কী তার নাম, এসব প্রশ্ন অবান্তর। তার চেয়ে বরং বোঝার চেষ্টা করা উচিত, ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ কী। ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ নিহিত রয়েছে দুই প্রাথমিক তত্ত্বের পারস্পরিক ক্রিয়ায়। এর মধ্যে একটি তত্ত্ব সদা-উদাসীন,

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ঃ—

KALA SANGAM

Kolkata

সুখ-দুঃখের অতীত, নিষ্ক্রিয়, নিখুঁত, নির্গুণ। এটাই ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত স্বরূপ— নির্গুণ শূন্যতা। তাহলে ব্রহ্মাণ্ডের এত রূপ রস রং গন্ধ আসে কোত্থেকে? এর কারণ দ্বিতীয় তত্ত্বটি। এটি সদাচঞ্চল, অঘটনপটিয়সী, কম্পনশীল। বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়েই তার প্রকাশ। প্রথমটিকে আমি বলি চৈতন্য, দ্বিতীয়টিকে বলি প্রকৃতি। এই দুই তত্ত্ব যখন একসাথে কাজ করে...'

মুনির চিন্তা বাধাপ্রাপ্ত হলো দূর থেকে আগত কোলাহলে। তাকিয়ে দেখলেন, সহস্রাধিক নারীর একটি দল দ্রুত পদচারণায় এদিকেই এগিয়ে আসছে। স্মিত হেসে মুনি পাথর থেকে নেমে দাঁড়ালেন। দুর্গাকে বললেন, 'মা! কর্মমার্গ শ্রেয় না জ্ঞানমার্গ? এ তর্কের কোনো মীমাংসা নেই। তবে এই মুহূর্তে কর্মমার্গ হেঁটে এসে তোর দোরগোড়ায় উপস্থিত হয়েছে। তাই দর্শনের আলোচনা পরে হবে। চলো আসুরী, আমরা আশ্রমের ভেতরে গিয়ে বসি।'

আগত মেয়ের দল ভিড় করে দুর্গাকে ঘিরে ধরলো। দুর্গা চিনতে পারলো তাদের। মহিষের শাসনকালে দানবরা ব্রঙ্গার বহু মেয়েকে অপহরণ করেছিল। তাদের ব্যবহার করতো প্রতি রাতে, নিজেদের যৌনলালসা চরিতার্থ করতে। মহিষের পলায়নের পর সেইসব বন্দিনীরা মুক্তি পায়। তারা সবাই আজ জড়ো হয়েছে এখানে উঁচু পাথরটার ওপর উঠে বসলো দুর্গা। মেয়েরা ওর চারপাশ ঘিয়ে বসলো। দুর্গার ঠিক সামনে বসেছিল একটি অতীব সুন্দরী মেয়ে। লম্বা গড়ন, দীঘল চোখ। গাত্রবর্ণ গমের মতো, মেয়েটির নাম মালিনী।

'সেদিনটার কথা ভাবলে আজও আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে,' বললো মালিনী, 'আমার বাবা দূর থেকে দেখতে পেয়েছিলেন, দানবসৈন্যরা আমাদের বাড়ির দিকেই আসছে। দেখামাত্র আমাকে বাড়ির পেছনের গোয়ালঘরে লুকিয়ে রেখেছিলেন। লাভ হয়নি তাতে। ওরা এল। কোনো প্রশ্ন করল না। বাবা-মা ভাই— সবাইকে কচুকাটা করল। তারপর সোজা গোয়ালঘরে এসে আমাকে টেনে হিঁচড়ে বার করে নিয়ে গেল। হাত-পা বাঁথলো শিকল দিয়ে, খাঁচাগাড়িতে তুলল। ভেট দিল মহিষকে। তারপর থেকে প্রতি রাতে মহিষ আমাকে সম্ভোগ করতো। পশুর মতো অত্যাচার করতো। মারধর করতো, যন্ত্রণা দিত। প্রতি মুহূর্তে মনে করিয়ে দিত, আমার জীবনটা কত মূল্যহীন।'

'আমাদের সবার কাহিনিই কতকটা এরকমই,' বললো আরেকটি মেয়ে, 'অনেক ব্রঙ্গাবাসী ভাবে, দানবরা অসভ্য, তাই ওরা এরকম যত্রতত্র নারীধর্ষণ করতো। কথাটা মোটেও ঠিক নয়। ওরা আগে থেকে রীতিমতো খবর যোগাড় করতো, কোন বাড়িতে কটা সুন্দরী বয়স্কা মেয়ে আছে। সেই বাড়িতে কী কী অস্ত্রশস্ত্র আছে, কোথায় কোথায় লুকোনোর জায়গা আছে, তারপর আক্রমণ করতো।'

'দিনের পর দিন পশুর মতো পালিয়ে বেড়াতে, লুকিয়ে থাকতে, শিকার হতে...' ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো একটি মেয়ে।

'অসুররা বলে বেড়ায়, ওদের ধর্মে নাকি নারীর স্থান অনেক ওপরে।' বললো আরেকটি মেয়ে, 'তাই ওরা ওদের সমাজের নারীদের ঘরে বন্দি করে রাখে। যেন নারী কোনো মূল্যবান বস্তু, যাকে তালাচাবি দিয়ে রাখতে হয়।'

'যারা আমাদের সঙ্গে এরকম করতে পারে', বললো আরেকটি মেয়ে, 'কোন মুখে তারা নারীর সম্মানের বড়াই করে?'

'দানবরা উপর্যুপরি ধর্ষণ করতো আমাদের,' বললো অরেকটি মেয়ে, 'তারপর শখ ফুরিয়ে গেলে বিক্রি করে দিত অন্য দানবদের কাছে। ভাবতাম, এই দুঃস্বপ্নের কোনো শেষ নেই? কিন্তু সে দুঃস্বপ্ন শেষ হলো, যখন তুমি এলে। আমাদের মুক্ত করলে।'

'কী লাভ এই মুক্তির?' বললো আরেকটি মেয়ে, 'আমাদের বাবা-মা পরিবার পরিজন কেউ আর বেঁচে নেই। কোথায় ফিরে যাবো আমরা? সমাজ কি আর আমাদের ফিরিয়ে নেবে?'

'একবার মনে হয়েছিল আত্মহত্যা করি', বললো মালিনী, 'তারপর মনে হল, এ জীবন তো তোমার দেওয়া। তোমাকেই জিজ্ঞেস করি, কী করবো এ নষ্ট জীবন নিয়ে।'

খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলো দুর্গা। তারপর বললো,

'যেদিন প্রথম গঙ্গানগরে এসেছিলাম, সেদিন আমার চোখের সামনে একটি মেয়েকে ধর্ষিতা হতে দেখেছিলাম। মেয়েটি আমার সামনেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিল। সে রাতটা দুঃস্বপ্নের মতো আজও আমাকে তাড়া করে বেড়ায়। তাই একথা ভেবো না যে, তোমাদের যন্ত্রণা আমি বুঝি না। কিন্তু একটা কথা বলো, তোমরা কি শুধু তোমাদের নিজেদের যন্ত্রণার কথাই বসে বসে ভাববে? আজ এই মুহূর্তে তোমাদের বয়সী অগণিত মেয়ে অসুরদের হাতে অত্যাচারিত হচ্ছে জম্বুদ্বীপের আনাচে কানাচে। ধর্মের নামে ধর্ষিতা হচ্ছে প্রতিরাতে। পশুর মতো খাঁচায় করে প্রদর্শন করা হচ্ছে তাদের। ওদের প্রতি কি তোমাদের কোনো দায়িত্বই নেই? তোমরা নারী, সমাজকে সন্তানজ্ঞানে প্রতিপালন করার দায়িত্ব তোমাদের ওপর ন্যস্ত। সন্তান বিপদে পড়লে বাঘিনী কী করে?'

'আমরা কীই বা করতে পারি?' বললো মালিনী, 'আমরা তোমার মতো নই। আমাদের ক্ষমতা কতটুকুই বা? আমরা

দুর্বল, অশক্ত। তাই তো আমরা এত যন্ত্রণা পেয়েছি, তবু একটা অসুরকেও মারতে পারিনি।'

ঠোঁটের কোণে যন্ত্রণাভরা হাসি, দুর্গা আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো। তারপর বললো,

'একটা গল্প বলি, শোনো। এক শহরে এক জ্যোতিষী ছিল। ছক কেটে অভ্রান্তভাবে লোকের ভূত-ভবিষ্যৎ -বর্তমান বলে দিত সে। শহরের প্রতিটি বণিক বাণিজ্যযাত্রায় বেরোনোর আগে তার কাছে কোষ্ঠীবিচার করতে আসতো। রোজগার ভালোই হচ্ছিল তার। নামডাকও হচ্ছিল অনেক। এসব দেখেশুনে তার পড়শীর হলো বেজায় ঈর্ষা। সে এক মতলব আঁটলো, কী করে জ্যোতিষীকে বদনাম করা যায়। একদিন সকালবেলা যখন জ্যোতিষীর ঘরে শহরের সব বড় বড় বণিকরা বসে আছে, তখন পড়শী এসে বললো, তুমি তো শুনি মস্তবড় জ্যোতিষী, বলো তো আমার হাতের মুঠির মধ্যে যে পাখিটা আছে, সেটা জ্যান্ত না মরা? জ্যোতিষী এক মুহূর্তে মতলবটা বুঝে ফেলল। পড়শী হাতের মুঠোয় একটা জ্যান্ত পাখি ধরে আছে। যদি জ্যোতিষী বলে পাখিটা জ্যান্ত, অমনি পড়শী পাখিটাকে টিপে মেরে ফেলবে। তারপর হাতের মুঠি খুলে বলবে, এই দ্যাখো, পাখিটা মরা। আর যদি জ্যোতিষী বলে পাখিটা মরা, তাহলে পরমুহূর্তেই পড়শী পাখিটাকে ছেড়ে দিয়ে বলবে, এই দ্যাখো, পাখিটা আসলে জ্যান্ত। জ্যোতিষী যাই বলুক না কেন, সবার সামনে ওর গণনা ভুল প্রমাণিত হবেই। কী করা যায় এখন? অনেক ভেবেচিন্তে জ্যোতিষী বললো, পাখিটার প্রাণ তো তোমার হাতে আছে ভাই। তুমি চাইলে ওটা জীবিত, তুমি চাইলে ওটা মৃত।'

গল্প শেষ করে দুর্গা চুপ করলো। তার সঙ্গে সবাই চুপ। বোঝা গেল, গল্পটা নাড়িয়ে দিয়েছে সবাইকে। বেশ খানিকটা সময় পার হয়ে গেল। দূরে বসে ছিল একটি মেয়ে। অনেকক্ষণ পর সে উঠে দাঁড়িয়ে বললো,

'বুঝলাম। আমরা অশক্ত না সশক্ত, দুর্বল না সবল, সেটা আমাদের হাতেই রয়েছে। কিন্তু আমাদের সমস্যা হলো, এখান থেকে ওখানে আমরা যাবো কীভাবে, সেটা জানি না। আমরা কী করবো, সেটা শুধু বলে দাও। তোমার সব কথা আমরা মানতে রাজি আছি। তুমি বললে, আগুনেও ঝাঁপ দিতে রাজি আছি আমরা।'

'নাম কী তোমার, ভাই?' প্রশ্ন করল দুর্গা।

'শ্রমণা', বললো মেয়েটি।

দুর্গা খানিকক্ষণ মেয়েটির পানে তাকিয়ে রইল। দেখেই বোঝা যায়, অনেক ঝড়ঝাপটা গেছে মেয়েটির ওপর দিয়ে। তবু মানসিক দৃঢ়তার তেজে ভাস্বর মেয়েটির চোখমুখ। এরকম মেয়েরই তো দরকার আজ ভারতবর্ষে

'আগুনে ঝাঁপ দিতে হবে না', বললো দুর্গা, 'শুধু তোমাদের চোখের জলকে প্রতিশোধের আগুনে পরিবর্তিত করতে হবে। তোমাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সুযোগ দাও আমাকে। তোমাদের দিয়ে আমি পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম সেনাবাহিনী গঠন করবো। তোমাদের ওই 'নষ্ট' জীবনের চিতাভস্ম থেকে এমন এক অবিনাশী অস্ত্র আমি তৈরি করবো, যা মহিষাসুরের সেনাবাহিনীকে ছারখার করে দেবে। আমরা সবাই মিলে এই জম্বুদ্বীপের প্রতিটি হতভাগিনীকে অসুরদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করবো। আমরা নারী, আদ্যাশক্তি। শক্তি— কথাটার অর্থ কী, সেটা পৃথিবীকে নতুন করে বুঝিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে। তোমাদের অশ্রু, ঘাম ও রক্তের ওপর অধিকার দাও আমাকে। যন্ত্রণা তোমাদের কাছে নতুন কোনো অভিজ্ঞতা নয়। কিন্তু সমরবিদ্যায় প্রশিক্ষণের সঙ্গে যে যন্ত্রণা আসতে চলেছে, তার তুল্য যন্ত্রণা ত্রিভুবনে আর হয় না। নতুন সেই যন্ত্রণার সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্য তৈরি হও। কথা দিচ্ছি, শক্তিস্বরূপিণী চামুন্ডাবাহিনীর অঙ্গভূতা রূপে তোমাদের অক্ষয় কীর্তিলাভ হবে।'

'এইসব আনকোরা ভীতু মেয়েদের দিয়ে তুমি অসুরদের পরাজিত করবে?' অবাক ভৈরবীর প্রশ্ন, 'না পেশীবলে, না যুদ্ধবিদ্যায়, কোনোকিছুতেই এরা দানবসেনার সমকক্ষ নয়। এদের...'

'গায়ের জোরে সব যুদ্ধ জেতা যায় না', ভৈরবীকে থামিয়ে দিয়ে বললো দুর্গা, 'নারী ও পুরুষের আবেগ, দৃষ্টিভঙ্গী, চেতনা— এসবই একটু ভিন্নভাবে ক্রিয়াশীল হয়, এটা নিশ্চয়ই জানো? পুরুষদের তুলনায় একটা গড়পড়তা মেয়ের পেশীবল কম হতে পারে, কিন্তু এর বিপরীতে পুরুষদের তুলনায় আমাদের জীবনীশক্তি বেশি, স্মৃতিশক্তিও বেশি। পরাবিদ্যায় আমাদের স্বাভাবিক ব্যুৎপত্তি রয়েছে। পারিপার্শ্বিক দৃষ্টি আমাদের বেশি ধারালো। নারীর বৈশিষ্ট্যগুলোকে দাবিয়ে নয়, যুদ্ধের ময়দানে সেগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে কীভাবে শত্রুদমন করা যায়, সেটাই এইসব মেয়েদের শেখাতে হবে। মহিষাসুরের সেনা চিরকাল পুরুষদের সঙ্গে লড়ে এসেছে, আমাদের যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যটা বুঝে উঠতেই ওদের বহু সময়

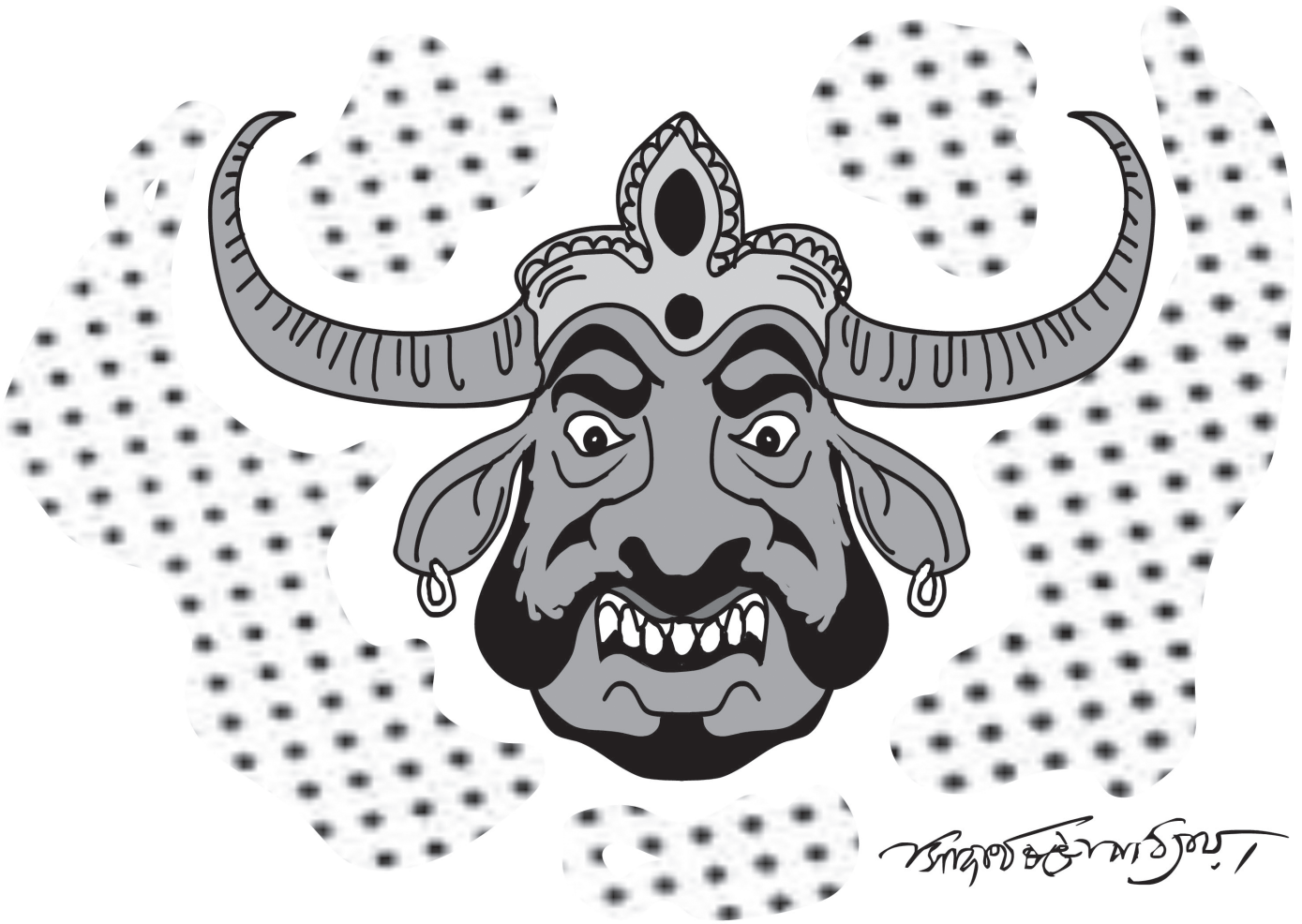

লেগে যাবে। আর সেটাই হবে আমাদের তুরুপের তাস। তুমি আজই এদের সেইমতো প্রশিক্ষণ দিতে লেগে পড়ো। কালী ও বগলামুখী তোমাকে সহায়তা করবে।'

পরবর্তী কয়েকমাস প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে কাটলো। চামুণ্ডাবাহিনীর প্রশিক্ষণ চললো দিনরাত। খবর পেয়ে ভারতবর্ষের নানান প্রান্ত থেকে নিপীড়িতা মেয়েরা এসে জড়ো হতে লাগলো ব্রহ্মায়। একটাই তাদের আকাঙ্ক্ষা, প্রতিশোধ নেওয়ার একাট সুযোগ। চামুণ্ডাবাহিনীর কলেবর দিনে দিনে বাড়তে লাগলো শশীকলার মতো। ধূমাবতী ব্যস্ত রইল তার জলার বাড়িতে খিল এঁটে নতুন নতুন রাসায়নিক অস্ত্রের গবেষণায়। কমলাও ব্যস্ত রইল এক বিশেষ কাজে। ব্রহ্মার প্রতিটি কারিগর-সমিতি, বণিক সমিতি ও মন্দিরের সঙ্গে দফায় দফায় গুপ্ত বৈঠক করতে হল ওকে।

ভুবনেশ্বরী, মাতঙ্গী ও তারা এই ক'মাস ঘুরে বেড়ালো উত্তরাপথের প্রতিটি জনপদে। মকর উপকূল থেকে প্রাগজ্যোতিষ, বিস্তীর্ণ এই ভূখণ্ডের প্রতিটি অসুরবিরোধী বসতিতে পৌঁছে গেল ওরা। মহিষের শত্রু প্রতিটি উপজাতির সঙ্গে ওরা বৈঠক করল। দুর্গার কথা ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে। সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল মহিষের লজ্জাজনক পরাজয় ও পলায়নের কথা। অসুররা চেষ্টা করেছিল, খবরটা চেপে দিতে। জায়গায় জায়গায় রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিল ওরা। নিজেদের গুপ্তচর বাহিনীকে পুরোপুরি নিয়েজিত করেছিল, ওদের তিনজনকে খুঁজে বার করতে। সফল হয়নি। দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল খবরটা। দেশসুদ্ধু লোক যাকে এতদিন অজেয় বলে জানতো, এবার জানলো সে এগারোটি মেয়ের হাতে পরাজিত হয়ে ল্যাজ গুটিয়ে ব্রহ্মা ছেড়ে পালিয়েছে। এত দ্রুত এত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে কী করে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল তা কেউ জানে না। শোনা গিয়েছিল, বিষ্ণু নাকি ওদের সাহায্য করছে। কেউ একজন ভুবনেশ্বরীকে দেখেছিল অতিকায় এক প্রাগৈতিহাসিক পক্ষীর পিঠে চেপে উড়তে। লোকে সে কথা বিশ্বাস করেনি।

আরও কয়েকটা ঘটনা ঘটলো এই ক'মাসে।

সেটা ছিল পূর্ণিমার রাত। একদল ব্রহ্মাহৃদি সেই রাতে জমায়েত হয়েছিল মাতলী নদীর তীরে। গ্রাম ও নগরের সভাগুলোর প্রতিনিধিরা ছিল সেখানে, কারিগর ও বণিক

সমিতির প্রতিনিধরাও ছিল। আর ছিল ব্রঙ্গার প্রতিটি মন্দিরের পূজারিরা। সে যুগে মন্দিরগুলোই ছিল সাধারণ মানুষের ধনভাণ্ডার ও কারিগরদের মূলধনের উৎস। তাই রাজ্য পরিচালনায় তাদের ভূমিকা ছিল অগ্রণী। আর উপস্থিত ছিল কালী। সেই রাতে আকাশে বিরাট একটা চাঁদ উঠেছিল। বছরের সবচেয়ে বড় চাঁদ। জ্যোৎস্নার বান ডেকেছিল মাতলীর বুকে। ব্রঙ্গার গহীন বনভূমি মাতোয়ারা হয়ে গিয়েছিল সেই জ্যোৎস্নার নেশায়। সেখানে অক্ষুমুনি রাজকুমার দিব্যবলের রাজ্যাভিষেক করলেন।

আরও একটা অসামান্য ঘটনার সাক্ষী থেকে গেল সেই কোজাগরীর চাঁদ।

হিমালয়ের গহনে লুকোনো এক দুর্গম উপত্যকায়, মহিষের গুপ্তচরদের শ্যেনদৃষ্টি থেকে অনেক দূরে, সূর্য চন্দ্র অগ্নি বরুণ আদি জম্বুদীপের প্রতিটি প্রকৃতি-উপাসক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা সমবেত হল। বরফে ঢাকা সেই মায়াবী উপত্যকায় দুটো সরোবর ছিল। অথৈ তুষারের রাজত্বে যেন কোন সে মন্ত্রবলে দুটো সরোবরেই জল ছিল তরল। একটি সরোবর অর্ধচন্দ্রাকৃতি, তার জল নোনা। অন্যটি সূর্যাকৃতি, তার জল মিষ্টি। প্রতিনিধি দেবতারা এই দুই সরোবরের মধ্যবর্তী স্থানে মিলিত হলো। সঙ্গে দুর্গা, রুদ্র ও হরি। ব্রহ্মা-সম্প্রদায়ের প্রধানও ছিল উপস্থিত।

মিত্র, অর্থাৎ সূর্য-উপাসকদের প্রধান ছিল অনুষ্ঠানের সভাপতি। নব্বই-উর্ধ্ব এক বিধ্বস্ত হতাশ বৃদ্ধ, লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। মন্দকণ্ঠে বলল,

'একটা যুগ ছিল, যখন 'মিত্র' নামটির সামনে মাথা নত করতো অর্থেক পৃথিবী। সুদূর সুখধারা ও শোনা উপকূলেও আমাদের ভাই-বোনেরা ছিল। পিত্রনগরী থেকে থোর কলবা, সর্বত্রই আমরা প্রভুত্ব করতাম। সে সব আমরা হারিয়েছি আমাদের অহংকারের জন্য। আমরা ভেবেছিলাম, আমরা অন্যদের থেকে জ্ঞানী, অর্থবান। সবদিক থেকে এগিয়ে। সেই অহংকারের বশে আমরা খেয়ালও করিনি, কবে সবকিছু বদলে গিয়েছে। আমাদের শত্রুরা আমাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিতে পেরেছে, তাই আজ আমাদের এই অবস্থা। অনৈক্যই আমাদের মূল সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান আজ আমরা করবো। আজ থেকে আমরা যাবতীয় সিদ্ধান্ত একসঙ্গে বসে নেবো। আজ থেকে দেবতারা সবাই এক স্বরে কথা বলবে। সেই স্বর হবে আমাদের নেতা ইন্দ্রর। আর প্রথম ইন্দ্র হিসাবে যার নাম আমি আজ প্রস্তাব করতে যাচ্ছি, তার নাম শুনে হয়তো আপনারা অবাক হবেন। অবাক হওয়ার কিছু নেই, এটা ঠিক, আমরা অর্থাৎ মিত্র ও বরুণ আজও দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী। কিন্তু সংকটের মুহূর্তে আমরা দেবতাদের নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছি। সেই দুঃসময়ে আমাদের ভরসাকে জীবিত রেখেছিল বজ্র। পবনকে সঙ্গে নিয়ে মাটি কামড়ে লড়াই চালিয়ে গেছে ও। দুরাশার আগুনটাকে নিভতে দেয়নি। বজ্র ও পবনকে আমরা এককালে প্রান্তিক জনজাতির বলে ভাবতাম, অবজ্ঞা করতাম। নিজেদের গুণে ওরা আজ দেবসমাজের নেতৃত্ব অধিকার করেছে। আমাদের প্রথম ইন্দ্র হিসেবে আমি প্রস্তাব করছি বজ্রর নাম। ওর নেতৃত্বে আমরা সংগঠিত হবো, অসুরদের বিরুদ্ধে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে নামবো। যার যার এই প্রস্তাবে সম্মতি আছে, তারা হাত তুলুন।'

অতীতের নেতৃত্ব স্বেচ্ছায় নিজের শাসনদণ্ড নবীন নেতৃত্বের হাতে ছেড়ে দিচ্ছে দেখে আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠল হতাশায় জর্জরিত সমবেত দেবগণ। হৈহৈ করে দুহাত তুলে তারা স্বাগত জানালো প্রস্তাবকে। এর সঙ্গেই শুরু হলো সভার দ্বিতীয় চরণ।

হাতে ত্রিশূল, রুদ্র উঠে দাঁড়ালো। এগিয়ে গেল দুর্গার দিকে। কেন জানি না, হঠাৎ দুর্গা মনে হলো, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, হৃদপিণ্ডের গতিবেগ দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠছে। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করল দুর্গা। এসব কিছুই খেয়াল করল না রুদ্র। নিজের ত্রিশূল দুর্গার হাতে রেখে বলল,

'শুধুমাত্র নিজের চেষ্টায় তুমি ইতিহাসের গতি বদলে দিয়েছ, আমাদের সবার মনে আশা জাগিয়েছ। সামনে রয়েছে অসম্ভব এক কাজ। এ কাজ আমরা একা কেউ করতে পারবো না। কিন্তু হয়তো আমাদের সম্মিলিত শক্তি একাজে সফল হবে। নেতৃত্বদানের অসামান্য ক্ষমতা রয়েছে তোমার। এছাড়াও তোমার কারোর সঙ্গে অতিরিক্ত সখ্য নেই, শত্রুতাও নেই। তুমিই পারবে আমাদের সবার শক্তিকে একত্র করতে। আমার ত্রিশূল আমি তোমাকে দিলাম। যুদ্ধক্ষেত্রে এই ত্রিশূল দেখলেই আমার ভূতগণ তোমাকে অনুসরণ করবে।'

রুদ্রর পরে উঠে দাঁড়ালো হরি। বললো,

'বোন, তুমি আদ্যাশক্তি মহামায়া, জগতের মাতৃস্বরূপা। সপ্তসিন্ধু আজ তোমার জয়গান গাইছে। এই সমাজ, এই রাষ্ট্র আজ নবজীবন পেয়েছে তোমার জন্য। কারোর সাহায্য ছাড়াই তুমি এতকিছু করেছ। আমাদের সবার সাহায্য পেলে তুমি নিশ্চয়ই এই দেশটাকে পাপমুক্ত করতে পারবে। এই নাও আমার সুদর্শন চক্র। এর সঙ্গে বিষ্ণুর সমস্ত শক্তি তোমার অনুসারী হবে, এই অঙ্গীকার আমি করলাম। আমি এও অঙ্গীকার করলাম, সুখেদুঃখে বিপদে আপদে তোমার এই ভাই হরি সবসময় তোমার পাশে থাকবে, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত।'

শ্বেতশুভ্র উত্তরীয় সামলে উঠে দাঁড়ালো ব্রহ্মা। বললো,

'মা, মহিষকে দিব্যাস্ত্রর প্রযুক্তি দিয়ে আমরা বড় ভুল করেছি। বোদ্ধা হওয়ার, সর্বজ্ঞানী হওয়ার অহংকার আমাদের অন্ধ করে দিয়েছিল। আমাদের অস্ত্র দেশজুড়ে যে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে, তা দেখে আমরা সীমাহীন লজ্জিত। সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। এই নাও, আমার কমণ্ডলু। এর সঙ্গে আমার সম্প্রদায়ের সাহায্যের অঙ্গীকার আমি করলাম। আমাদের সেনাবাহিনী নেই, কিন্তু তার চেয়েও বড় শক্তি আছে আমাদের কাছে। তোমার আগামী যুদ্ধের জন্য ভয়ংকরতম সব দিব্যাস্ত্র নির্মাণ করবো আমরা। সেসব দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করে তুমি অসুরসেনাকে ছারখার করে দিও।'

বজ্র, দেবতাদের নবনির্বাচিত ইন্দ্র উঠে দাঁড়ালো। বলল,

'মা, তুমি আদ্যাশক্তি মহামায়া, জগতের মাতৃস্বরূপা। সন্তানকে রক্ষা করতে মা অসাধ্য সাধন করে। আমরা তোমার সন্তান, তুমি আমাদের রক্ষা করো। আমার শায়ক আমি তোমাকে দিলাম। আমাদের সম্প্রদায়ের প্রিয় অস্ত্র এটি। এর সঙ্গে আমার সম্প্রদায়ের দ্বিধাহীন সমর্থনের অঙ্গীকার আমি করলাম। মৃত্যু পর্যন্ত আমরা তোমার সঙ্গে থাকবো।'

এক এক করে বাকি দেবতারাও এগিয়ে এল। বরুণ দিল তার শঙ্খ, অগ্নি দিল তার বর্শা। পবন দিল তার ধনুর্বাণ, বিশ্বকর্মা তার বর্ম ও কুঠার। যম দিল তার কালদণ্ড। সেই রাতে, তুষারমৌলী হিমালয়ের তুঙ্গে পবিত্র সেই উপত্যকায়, পূর্ণচন্দ্র ও কৈলাশ পর্বতকে সাক্ষী রেখে এক অসামান্য ঘটনা ঘটল। ভবিষ্যৎ পৃথিবীর সংরচনা চিরদিন এই ঘটনাটির কাছে ঋণী থাকবে। এই একটি ঘটনা বদলে দিল আগামী যুগের ইতিহাস।

ছ'মাস পরের কথা।

মধ্যভারতের বিস্তীর্ণ মালভূমিতে সমবেত হয়েছে মহিষাসুরের সম্পূর্ণ সেনাবাহিনী। পাঁচ লক্ষ মোষের খুরের ঘর্ষণে আকাশ ধুলোয় মেঘলা হয়ে গেছে। সূর্যের মুখ দেখা যায় না। বহুক্ষণ ধরে এখানে প্রতীক্ষা করছে মহিষাসুর। দিনের দ্বিতীয় প্রহর প্রায় অতিক্রান্ত। এর মধ্যেই তো এসে পড়ার কথা তার। এখনো এসে পৌঁছলো না কেন?

হঠাৎ তুর্যনিনাদে কেঁপে উঠল মাটি। সবুজ পাহাড়ে জাগলো আন্দোলন। জঙ্গল ভেদ করে আবির্ভূত হলো ত্রিশূলব্যূহে সজ্জিত অতিকায় অভূতপূর্ব এক সেনাবাহিনী। সে সেনাবাহিনীর দক্ষিণ বাহুর নেতৃত্ব দিচ্ছেন মহাপক্ষী গরুড়ে আসীন হরি। তাঁর পেছনে সারিবদ্ধভাবে প্রতীক্ষারত বিষ্ণুর বাহিনী। শৃঙ্খলাপরায়ণ, যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ। তাদের শীতল দৃঢ়চেতা দৃষ্টি প্রত্যয়ের আলোয় উদ্ভাসিত। সেনাবাহিনীর বাম বাহুর নেতৃত্ব দিচ্ছেন মহাকায় এক বৃষে আসীন ত্রিশূলপাণি রুদ্র। তাঁর পেছনে সমবেত হয়েছে শিবের প্রথমবাহিনী। তারা প্রেতকল্প, উগ্রতেজা, উগ্রচণ্ডা। মাথায় জটাজুট, শ্মশ্রুগুম্ফে ঢাকা তাদের মুখ। কপালে ত্রিপুণ্ড্রক, ভস্মচ্ছাদিত রুধিররঞ্জিত দেহ। তাদের মুহুর্মুহু রণহুংকার ও আস্ফালনে মৃত্যুর হৃদয়েও ভয়কম্প জাগে। এদের সঙ্গে, জম্বুদ্বীপের প্রত্যেক প্রকৃতি-উপাসক সম্প্রদায় তাদের শ্রেষ্ঠ বীরদের নিয়ে সমবেত হয়েছে বিশাল সংখ্যায়। সমুদ্রের মতো বিশাল তাদের ব্যাপ্তি। বাহিনীর মধ্যভাগ রক্ষা করছে তারা। বিচিত্র তাদের পোশাক, ততোধিক বিচিত্র তাদের অস্ত্রশস্ত্র। এই ব্যূহের সম্মুখভাগ রক্ষা করছে ব্রঙ্গার সেনাবাহিনী। তাদের এক লক্ষ অতিকায় রণহস্তীর ছন্দোবদ্ধ পদক্ষেপে গুরুগুরু কাঁপছে ধরাধাম। হরিহরের যৌথ আহ্বানে সাড়া দিয়ে জম্বুদ্বীপের পূর্ববাহু থেকে, প্রাগজ্যোতিষের ওপারের শুঙ্গভূমি থেকে তিন লক্ষ সেনানী এসেছে এই মহারণে যোগ দিতে। সুদূর ব্রহ্ম, শ্যাম, চম্পা, বরুণ, সুমাত্রা, মহার্লিকা, যবদ্বীপ, কালীমন্থন থেকে এসেছে তারা — জম্বুদ্বীপের অপৌরুষেয় সংস্কৃতিকে সমূহ বিনাশ থেকে রক্ষা করতে। বাহন তাদের খর্বাকৃতি হস্তী। সে হস্তী অশ্বের মতো দ্রুতগামী, ক্ষুরধার বুদ্ধি তাদের। অনায়াসে পাহাড় টপকায়, অবাধে ভেদ করে ঘন বনানী। বাহিনীর অন্তভাগে দুর্ভেদ্য এক অর্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যূহ রচনা করেছে তারা। অভূতপূর্ব এই অতিকায় বাহিনীকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এক অসামান্য তেজস্বিনী নারী, এক অতিকায় সিংহে আরোহিণী। রক্তবর্ণের বস্ত্র পরনে, স্বর্ণরঞ্জিত রক্তবর্ণের মণিবদ্ধ হাতে জড়ানো। তাঁর পেছনে দশজন নারী-যোদ্ধা, দশ মহাবিদ্যা। কালী, ভুবনেশ্বরী, কমলা, ভৈরবী, বগলামুখী, ষোড়শী, মাতঙ্গী, ধূমাবতী, ছিন্নমস্তা, তারা। কেউ বাঘ, কেউ সিংহ, কেউ বা নেকড়ের পিঠে আসীন। প্রত্যেকের হাতে ব্রহ্মা-সম্প্রদায় নির্মিত বিবিধ দিব্য-আয়ুধ। তাদের পেছনে জমায়েত হয়েছে প্রতিশোধ-লোলুপ রণচণ্ডী নারীবাহিনী। এ দৃশ্য যেন ঠিক দুঃস্বপ্নের পরত থেকে উঠে এসেছে। ভয়ে হৃদকম্প জাগলো মহিষের বুকে, গলা শুকিয়ে এল।

'বিদল, পরিস্থিতি কীরকম বুঝছো?' দানববাহিনীর

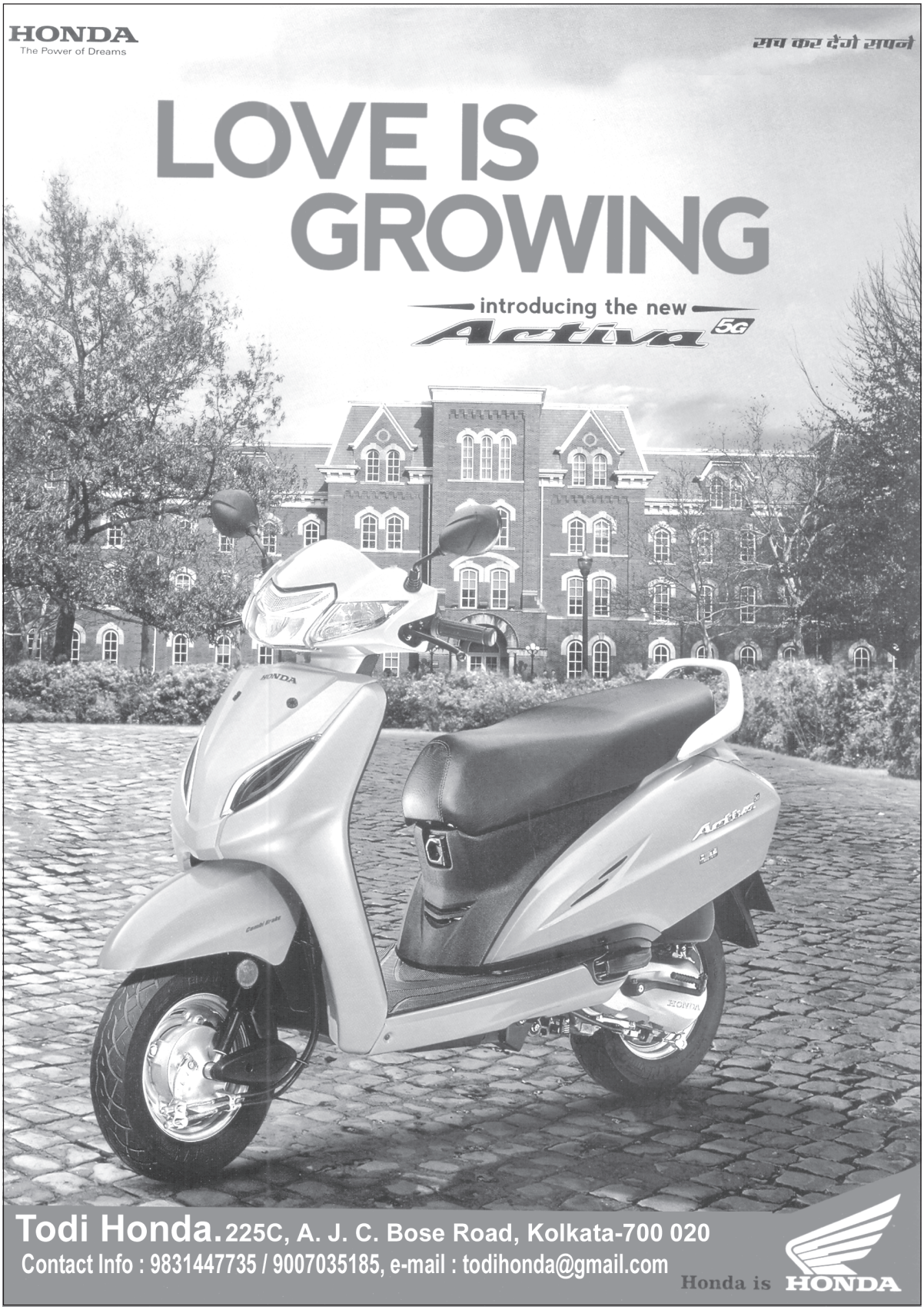
HONDA
The Power of Dreams
सच कर देंगे सपने
LOVE IS GROWING
introducing the new
Activa 5G
Todi Honda. 225C, A. J. C. Bose Road, Kolkata-700 020
Contact Info : 9831447735 / 9007035185, e-mail : todihonda@gmail.com
Honda is HONDA

মহাসেনাপতিকে ডেকে বললো মহিষাসুর।

'সম্রাট', বললো বিদল, 'সত্যি বলতে কী, এত বিপুল সৈন্যসমাবেশ আমি আশা করিনি। কীভাবে আমাদের গুপ্তচররা এতবড় সৈন্য সংগঠনের সংবাদ পেল না, সেটাই আশ্চর্য। সব হিসেব গোলমাল হয়ে গেল।'

'হিসেব যখন গোলমাল হয়ে গেছে', সুদীর্ঘ এক শ্বাস নিয়ে বললো মহিষ, 'তখন নতুন করে হিসেবে কষা যাক। ওদের এক লক্ষ অতিকায় রণহস্তী, আমাদের পাঁচ লক্ষ রণমহিষ। মুখোমুখি সংঘর্ষে কে শেষপর্যন্ত টিকে থাকবে?'

'যদি পাঁচটি মোষ মিলিতভাবে একটি হাতিকে আক্রমণ করে, তবে হাতিকে পরাজিত করতে পারে। কিন্তু...'

'এর মধ্যে কিন্তু কী?' বললো অধৈর্য মহিষাসুর।

'মোষের বুদ্ধি হাতির তুলনায় কম। তার ওপর মোষ যদি হাতি দেখে ভয় পেয়ে যায়, তাহলে কী হবে বলা যায় না।'

'তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? ব্রহ্মাহৃদিদের হস্তীবাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়ানোই কঠিন! এর ওপর এরকমই আরেকটি হস্তীবাহিনী রয়েছে ব্যূহের পেছনে। বাকি বাহিনীগুলোর কথা তো ছেড়েই দিলাম। তাহলে? কোনো আশাই কি নেই?'

'একটা উপায় আছে', বললো বিদল, 'ওদের বাহিনীর মধ্যভাগে ঠিক সম্মুখে আছে নারীবাহিনী। ওটাই ওদের দুর্বলতা।'

'কিন্তু সেই বাহিনীর সামনেও তো আছে একসারি হাতি।'

'তা আছে। কিন্তু এক লক্ষ হাতি সমগ্র সম্মুখভাগে ছড়িয়ে আছে। হিসেব কষে দেখুন, তার মানে ওদের ব্যূহের কেন্দ্রে দশ হাজারের বেশি হাতি নেই। আমরা আমাদের সম্পূর্ণ বাহিনীকে শূলব্যূহে সজ্জিত করে যদি ওদের কেন্দ্রভাগে আক্রমণ চালাই, তাহলে দ্রুত হস্তীবাহিনীর স্তর ভেদ করে ওদের ব্যূহের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারবো।'

'কিন্তু আমাদের বাহিনীর দুই পার্শ্বভাগ সম্পূর্ণ অরক্ষিত থাকবে', বললো মহিষাসুর, 'ওদের ত্রিশূলব্যূহের দুই পার্শ্ববাহু পিষে মারবে আমাদের সৈন্যদের।'

'যদি না তার আগেই ওদের নারীবাহিনীকে আমরা বন্দি করে ফেলতে পারি', বললো বিদল।

'ঠিক আছে। কিন্তু নারীবাহিনীর পেছনেই আছে দেবতাদের বাহিনী। ওরা যাতে নারীবাহিনীর সহায়তা করতে আসতে না পারে, সে ব্যবস্থা করতে ভুলো না'। বললো মহিষাসুর।

দেখতে দেখতে মুখোমুখি এসে পড়লো দুই সেনাবাহিনী। মহিষ ও হস্তীর সংঘর্ষে কেঁপে উঠলো ধরিত্রী। রণহস্তীর পায়ের তলায় থেঁতলে গেল অসংখ্য রণমহিষের দেহ। মোষের শিঙের আক্রমণে ফালাফালা হলো অতিকায় বহু হাতির দেহ। ব্রহ্মাহৃদিদের বিষ তিরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে ধূলিশয্যা নিল অসংখ্য দানবসেনা। কিন্তু মহাসেনাপতি বিদলের পরিকল্পনা ছিল নিখুঁত। দানবদের শৃঙ্খলাবদ্ধতা ছিল প্রশ্নাতীত। অগণিত সংখ্যায় মহিষ ব্রহ্মাহৃদিদের হস্তীবাহিনীর একই বিন্দুতে ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে গেল। এক প্রহরের মধ্যে দেখা গেল, হস্তীবাহিনীর ব্যূহস্তরে ক্ষুদ্র এক ছিদ্র দেখা দিয়েছে। সেই ছিদ্র দিয়ে বন্যার জলের মতো দানবসেনা ঢুকতে শুরু করলো ত্রিশূলব্যূহের মধ্যে। দানববাহিনীর সেই অগ্রণী সেনার নেতৃত্ব দিচ্ছে মহাসেনাপতি বিদল স্বয়ং। ঠিক একই সময় বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠলো মাটি। দেখতে দেখতে চামুণ্ডাবাহিনী ও দেববাহিনীর মধ্যবর্তী স্থানে এক প্রলয়ংকর অগ্নিকুণ্ড জ্বলে উঠলো। আগুনের সে বেড়াজালের পেছনে আটকা পড়লো দেবতারা। প্রমাদ গুনলো রুদ্র। কটিবদ্ধ থেকে পিণাক বার করে তাতে দিল ফুৎকার। বাতাসে ভেসে সেই সংকেত পৌঁছে গেল অন্য বাহিনীগুলির কাছে। ব্যূহের অন্তিম স্তরের খর্বাকৃতি হস্তীসেনা দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়ে দানববাহিনীর পশ্চাদভাগের দিকে যাত্রা করলো। একই সঙ্গে শিব ও বিষ্ণুর বাহিনীদ্বয় দ্রুত ধাবমান হলো দানবদের দিকে। দানববাহিনীকে দু'পাশ থেকে পিষে ফেলতে। কিন্তু দানবদের মনে প্রাণের ভয় নেই। তারা নিশ্চিত লক্ষ্যে এগিয়ে চলল চামুণ্ডাবাহিনীর দিকে। চিন্তার তরঙ্গে বার্তালাপ হল রুদ্র ও হরির।

'পরিস্থিতি ভালো ঠেকছে না', বললো রুদ্র 'আমার হিসেব অনুসারে আগামী কিছুক্ষণের মধ্যেই দানববাহিনী চামুণ্ডাবাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হবে। ওদিকে দেববাহিনী অগ্নিবলয়ের পেছনে আটকা পড়েছে। তাদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য আশা করা যাবে না আপাতত।'

'দানবরা সংখ্যায় অগণিত', বললো হরি 'চামুণ্ডাবাহিনীর তুলনায় ওদের সংখ্যার অনুপাত একে একশো। সরাসরি সংঘর্ষে চামুণ্ডারা ধুলোর মতো উড়ে যাবে।'

'ওদের বাঁচানোর জন্য কিছু একটা করা দরকার। যেভাবেই

হোক দানব্যূহের অভিমুখ উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে। তার সঙ্গেই চামুণ্ডাবাহিনীর কাছে দ্রুত সাহায্য পৌঁছে দিতে হবে।'

'ঠিক আছে', বললো হরি 'আমি গরুড়ের সাহায্যে দ্রুত পৌঁছে যেতে পারি ওদের কাছে। আশাকরি আকাশ থেকে অস্ত্রবর্ষণ করে দানবদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবো কিছুক্ষণ।'

'ততক্ষণে আমি দানববাহিনীর ব্যূহকে পেছনদিক থেকে আড়াআড়িভাবে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করি। যদি দানবদের ব্যূহের পেছনদিকে যথেষ্ট পরিমাণে লোকক্ষয় করতে পারি, তবে হয়তো দানবরা উত্তেজিত হয়ে ব্যূহের অভিমুখ ঘুরিয়ে দিতে পারে', বললো রুদ্র।

মহাবলী বৃষে আসীন হয়ে রুদ্র ঝড়ের মতো ঢুকে পড়লো শত্রুব্যূহর মধ্যে। সঙ্গে বৃষে আসীন এক সহস্র প্রেতকল্প উগ্রচণ্ডা সাধক। বৃষশৃঙ্গের আঘাতে ইতস্তত ছিঠকে পড়তে লাগলো আরোহীসহ মহিষের দেহ। রুদ্রর ত্রিশূল চক্রাকারে ঘুরতে লাগলো, শত্রুর মুণ্ডচ্ছেদ করতে লাগলো। মৃতদেহের পাহাড় জমলো রুদ্রর পথের দুপাশে। দানবব্যূহের পশ্চাদভাগে সৈন্যসংখ্যা কমতে লাগলো। তবু দানবদের আক্রমণের অভিমুখ পরিবর্তন করা গেল না। এইসময় শিব ও বিষ্ণুর বাহিনীদ্বয় দানবদের সন্নিকটে পৌঁছে সাঁড়াশি আক্রমণ শুরু করলো। তিনদিক থেকে ক্রমাগত রক্তক্ষরণ অগ্রাহ্য করেই মহাসেনাপতি বিদলের নেতৃত্বে দানববাহিনীর শূলব্যূহ স্থির অচঞ্চল লক্ষ্যে এগিয়ে চলল। বিদল দেখতে পেল, দূরে দেখা যাচ্ছে নারীবাহিনীর অগ্রভাগকে। অদ্ভুত এক সুরে শঙ্খে ফুৎকার দিল বিদল। দেখতে দেখতে শূলব্যূহের অগ্রভাগ ক্রৌঞ্চব্যূহে রূপান্তরিত হলো।

'নারী! হাঃ! নারী আবার কী যুদ্ধ করবে। আমাদের দেখে এক্ষুনি ওরা পালাতে শুরু করবে। না, পালাতে দেব না ওদের কাউকেই। এই ক্রৌঞ্চব্যূহ দিয়ে ঘিরে ফেলবো ওদের সবাইকে। অর্ধপ্রহরের মধ্যেই ওদের বন্দিনী করে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করে দেব। তারপর ওদের নেত্রীটিকে ভেট দেব মহিষাসুরকে।'

কয়েক মুহূর্ত পার হয়ে গেল। অবাক চোখে আগুয়ান নারীবাহিনীর দিকে তাকিয়ে দেখল বিদল। পালানোর নাম নেই, উল্টে ক্রমশই এগিয়ে আসছে ওরা। ঠিক সেই মুহূর্তে আকাশপথে মহাকায় গরুড়পক্ষীতে আসীন হয়ে উপস্থিত হলো হরি। চামুণ্ডাবাহিনী ও দানবসেনার মাঝামাঝি অবস্থান নিল। আকাশ থেকে অগ্নিবৃষ্টি শুরু করলো হরির সুদর্শন চক্র। দানবসেনার শক্তিক্ষয় শুরু হলো সামনে দিক থেকেও। থমকে দাঁড়ালো দানবদের অগ্রগতি। পরিস্থিতির পরিবর্তন দ্রুত বুঝে নিল বিদল। সেনাদলের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললো,

'অসুর সেনাগণ! ওই দ্যাখো, জয় তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পরোয়া করো না, কে মরলো আর কে বাঁচলো। যে মারা যাবে, অসু তাদের দিব্যাঙ্গনা দিয়ে পুরস্কৃত করবেন। যে বেঁচে থাকবে সে বলপূর্বক অধিকার করবে ব্রহ্মার পৌত্তলিক নারীদের। ওই দ্যাখো, সামনে কত সুন্দরী দাঁড়িয়ে। ওদের অস্ত্র দেখে ভয় পেয়ো না। ওসব অস্ত্র শুধু প্রদর্শনের জন্য। ইতিহাসে কবে কখন নারীরা পুরুষদের সঙ্গে যুদ্ধে জিতেছে? যাও, বলপূর্বক অঙ্কশায়িনী করো ওদের। শুধু দলনেত্রীটিকে ছেড়ে দাও, ওকে বন্দি করে মহিষাসুরকে ভেট করবো।'

বিদলের আহ্বানে কাজ হলো। কামতাড়নার বশবর্তী হয়ে অসুসরা আবার এগোতে শুরু করলো। আকাশ থেকে অগ্নিবৃষ্টি আড়াল করতে নিজেদের আহত ও মৃত সাথীদের দেহ ব্যবহার করলো। বহু অসুর অগ্নিবৃষ্টিতে মারা গেল, তবু ওদের অগ্রগতি থামলো না। ব্যূহরচনা অটুট রইলো।

চিঙ্কার পিঠে সওয়ার দুর্গা দেখলো, দূরে দানববাহিনী ক্রৌঞ্চব্যূহে সজ্জিত হয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে। ব্যূহের সম্মুখভাগের কেন্দ্রে ক্রৌঞ্চপক্ষীর আগ্রাসী ঠোঁটের জায়গায় রয়েছে রথে সওয়ার সেনাপতি চিক্ষুর। বাহিনীর কেন্দ্রে বক্ষস্থলে রয়েছে মহাকায় মহিষে আসীন মহাসেনাপতি বিদল।

'ক্রৌঞ্চর ডানচোখে রয়েছে হাতিতে চড়ে দানব চামর', দূরবীন চোখে দিয়ে বললো ভুবনেশ্বরী, 'বাঁ চোখে রয়েছে মহিষে সওয়ার উদগ্র। ডান ডানায় রয়েছে অসিলোমা, তাম্র ও বাস্কল। বাঁ ডানায় রয়েছে অন্ধক, পরিবারিত ও বিড়ালাক্ষ। সবাই মহিষে সওয়ার।'

'ক্রৌঞ্চব্যূহ ব্যবহার হয় ঝটিকা আক্রমণের জন্য', বললো দুর্গা 'তার মানে দ্রুত আক্রমণে যেতে চাইছে দানবরা?'

'তাই মনে হচ্ছে' বললো ভুবনেশ্বরী।

'ভাবছো জয় খুব সহজ হবে। হুঃ।' এই বলে দুর্গা শঙ্খ হাতে তুলে নিল। সে শঙ্খ বেজে উঠলো বিশেষ এক সুরে। চামুণ্ডাবাহিনীর মধ্যে সঞ্চারণ শুরু হলো। দ্রুত সে বাহিনী পরিবর্তিত হলো গরুড়ব্যূহে। দুর্গা সেই গরুড়ের ঠোঁট। বগলামুখী ও ভৈরবী দুই চোখ। কালী ও ছিন্নমস্তা দুই ডানা।

বিদল দেখতে পেল, সিংহাবাহিনী দলনেত্রী ওর দিকেই এগিয়ে আসছে। নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণ করতে আসছে, ভাবলো বিদল। বাহনকে সংকেত দিল, ব্যূহ ছেড়ে এগিয়ে গেল। পরমুহূর্তেই বিদল দেখল, যেন এক ঝলক সূর্যালোক ঝলসে উঠলো। দেখা দিল হলুদবস্ত্র পরিধান এক নারী, রং তার দ্বিপ্রহরের সূর্যের মতো আগুন ঝরানো, হাতে উদ্যত ধনুর্বাণ।

একটি সুদীর্ঘ তির মরুৎবেগে উড়ে এসে ওর লৌহজালিকে বিদ্ধ করল। বর্ম ভেদ করে হুল ফোটালো চামড়ার অন্তর্বাসে। কোনো ক্ষতি হলো না বিদলের।

'এই তোদের আক্রমণ? ছোঃ!' এই বলে বিদল তিরটাকে লৌহজালিক থেকে টেনে বার করার চেষ্টা করল। পরমুহূর্তেই তিরটার মধ্যে ছোট্ট একটা বিস্ফোরণ হল। আর কিছু বলার বা ভাবার সুযোগ পেল না বিদল। বিস্ফোরণে উড়ে গেল ওর হাত, বক্ষপিঞ্জর সহ অর্ধেক শরীরটা।

রাশি রাশি শাবল, ভিন্দিপাল, মুষল, খড়্গ, কুঠার, পাশ ও পট্টিশ উড়ে এল দানবদের দিক থেকে। বগলামুখীর নির্দেশে একরাশ তির জ্যামুক্ত হলো। দানবদের ছোঁড়া অস্ত্রগুলো লক্ষ্যভ্রষ্টহলো সেই তিরের আঘাতে, বিস্ফোরিত হলো আকাশে। পরমুহূর্তেই আরেকদল তির জ্যামুক্ত হলো চামুণ্ডাদের ধনুক থেকে। অসুরদের অগ্রগামী স্তর সজারুসদৃশ সর্বাঙ্গ বাণবিদ্ধ হয়ে ভূমিশয্যা গ্রহণ করল। এই সুযোগে হা-হা করে অট্টহাসি হাসতে হাসতে বিবিধ হিংস্র বন্যজন্তুতে আরোহী চামুণ্ডাবাহিনী ঈগলের ভঙ্গিতে ঈগলের মতোই ঝটিকাগতিতে ঝাঁপ দিল দানববাহিনীর ওপর। তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো দানব ও চামুণ্ডাবাহিনীর মধ্যে। মেয়েগুলো হাসছে কেন? ভয়ে কি এদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে? অবাক হয়েও তা নিয়ে বেশি ভাবতে পারলো না দানবরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই দানবরা বুঝতে পারলো, মেয়েদের দুর্বল ভেবে তড়িঘড়ি সর্বশক্তি লাগিয়ে এদিকে আক্রমণ করাটা ঠিক হয়নি। এ মেয়েরা প্রাণ দেবে, কিন্তু বন্দি হবে না। আর প্রাণ দেওয়ার আগে হাসতে হাসতে দশজন দানবের প্রাণ নেবে। এ মেয়েদের দানবদের ওপর এত জাতক্রোধ কিসের? দানবদের অনিষ্ট করে যেন ভূমানন্দ লাভ করছে এরা। মেয়েদের হাতে প্রাণ দিলে পরমপিতা অসু কী আদৌ মৃত্যুর পর পুরস্কৃত করবেন? সন্দেহ জেগে গেল অনেকের মনেই।

দুর্গা দেখল, সংখ্যার অনুপাতে দানবরা অনেকটা এগিয়ে। চামুণ্ডাবাহিনী সিংহবিক্রমে যুদ্ধ করছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ যুদ্ধে অন্তে জয় হলেও অসংখ্য নারীযোদ্ধা যে বীরগতিপ্রাপ্ত হবে, তাতে সন্দেহ নেই। দুর্গার নির্দেশে এগিয়ে এলো ধূমাবতী। হঠাৎ দেখা গেল, রাশি রাশি ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে রণক্ষেত্র। শত্রু-মিত্র চেনা যাচ্ছে না। সেই কুজ্ঝটিকার আড়াল নিয়ে নারীবাহিনী উপর্যুপরি প্রহার চালালো দানবদের ওপর। চিক্কা দাবাগ্নির মতো অসুর সৈন্যদের মধ্যে বিচরণ করতে লাগলো। চামুণ্ডাবাহিনীর ত্রিশূল, গদা, খড়্গের আঘাতে বহু অসুর বধ হলো। কেউ খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত হলো, কেই গদাপ্রহারে বিমর্দিত হয়ে ভূতলে নিপাতিত হলো। কেউ বা চামুণ্ডাবাহিনীর বাহনদের উদরসাৎ হয়ে প্রাণত্যাগ করলো। কেউ মুষলে আহত হয়ে রক্তবমন করতে লাগলো, কেউ বা শূলাঘাতে বক্ষস্থল বিদীর্ণ হয়ে ভূপতিত হলো। কারোর বাহু ছিন্ন হলো, কারোর বা ঘাড় ভাঙলো। কেউ মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়ে ধুলোয় গড়াগড়ি খেল, কারোর বা দেহের মধ্যভাগ বিদীর্ণ হলো। তবু দানবরা লড়াইয়ের ময়দান ছাড়ল না। বহু দানব ছিন্নজঙ্ঘা, একবাহু, একচক্ষু, একপদ হয়েও লড়াই চালিয়ে গেল। চিক্কা মহানন্দে কামড়ে তাদের দেহ থেকে প্রাণবায়ু টেনে বার করতে লাগলো। ভগ্ন রথ, হস্তী, মহিষ, অশ্ব ও অসুরদের মৃতদেহের পাহাড় তৈরি হলো। রক্তের নদী বয়ে গেল। কুহেলীর আবরণ ফিকে হয়ে এলে দেখা গেল দানবদের ব্যূহের সম্মুখভাগ প্রভূত ক্ষতির শিকার হয়েছে।

দানব সেনাপতি চিক্ষুর ক্রোধে রক্তজবার মতো লাল হয়ে নিজের ধনুক তুলে নিল হাতে। সারথিকে আদেশ দিল রথ দুর্গার দিকে নিয়ে যেতে। মুহূর্মুহু বাণবৃষ্টি করতে লাগলো চিক্ষুরের ধনুক। চারিদিক আচ্ছন্ন করে ফেলল সেই তিরবৃষ্টি। সামনে যে পড়ল, ঝড়ের মুখে খড়কুটোর মতো উড়ে গেল। দ্রুত চিক্ষুর পৌঁছে গেল দুর্গার সামনে। প্রাথমিক ধাক্কা সামলে নিয়ে দুর্গার ধনুক থেকে পাল্টা শরবৃষ্টি নির্গত হলো। সেই শরবৃষ্টি ঝড়ের মুখে বাদলের মেঘের মতো উড়িয়ে দিল চিক্ষুরের আক্রমণকে। নিরবচ্ছিন্ন শরাঘাতে চিক্ষুরের রথের অশ্ব ও সারথিকে ভূলুণ্ঠিত করলো দুর্গা। চিক্ষুরের রথধ্বজা ছিন্ন হলো, ধনুক ভেঙে দু-টুকরো হলো। বাণবিদ্ধ হয়ে মাটিতে ছিটকে পড়লো চিক্ষুর। ছিন্নধনু, রথশূন্য, অশ্বহীন, সারথিবিহীন ও আহত হয়েও চিক্ষুর লড়াই ছাড়লো না। খড়্গ ও ঢাল তুলে নিয়ে প্রচণ্ড বেগে দৌড়ে এলো। এক লাফ দিয়ে পড়লো চিক্কার ঘাড়ে। যুগপৎ ঢাল দিয়ে চিক্কার মাথায় আঘাত করলো, খড়্গ দিয়ে আঘাত হানলো দুর্গার ওপর। দুর্গার বাম বাহুমূলে লেগে খড়্গ ভেঙে দু-টুকরো হলো। আর্তনাদ করে চিক্কা গড়িয়ে পড়লো মাটিতে, চিক্কার পিঠ থেকে ছিটকে পড়লো দুর্গা। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো ওর বামবাহু থেকে। যন্ত্রণায় অবশ হয়ে এল শরীর। দুর্গাকে ভূপতিত দেখে উৎসাহে চিক্ষুর নিজের ভগ্নরথ থেকে তুলে নিল মহাকায় এক শূল, ছুঁড়ে দিল দুর্গার দিকে। মরুৎবেগে দৌড়ে এলো কালী ও ছিন্নমস্তা। ছিন্নমস্তা নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করলো দুর্গাকে, কালী ওর হাতের শূল ছুঁড়ে দিল আকাশে। সেই শূল নিভুল লক্ষ্যে চিক্ষুর উড়ন্ত শূলকে ভেঙে দু-টুকরো করে চিক্ষুরের বক্ষপিঞ্জর বিদ্ধ করলো।

এগিয়ে এলো চামর, হাতির পিঠে চড়ে। দ্রুত পরিস্থিতির

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না

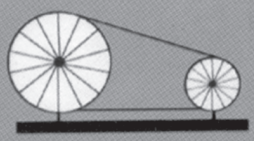

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম

চির পরিচিত
দুলালের®
তালমিছরি

আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে
খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা
লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি
এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান
— দারুণ কাজ দেবে।

ভারত সরকারের R ® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন

দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

পর্যালোচনা করলো ও। এই যুদ্ধে আদৌ হার হতে পারে, সেই সম্ভাবনাটা কিছুক্ষণ আগেও মনের মধ্যে জাগেনি। মেয়েরা আবার কী লড়াই করবে! কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, অনেক অঘটনই ঘটতে পারে আজ। তবু যদি দলনেত্রী ওই মেয়েটিকে মেরে ফেলা যায়, তবে হয়তো বা জিতে ঘরে ফেরা সম্ভব আজ। চামর দেখলো, আহত দুর্গা এখনো মাটিতে পড়ে আছে। চামর ওর তূণীর থেকে বার করে আনলো শক্তিঅস্ত্র।

ব্রহ্মা-সম্প্রদায়ের তৈরি এই তিরের মাথা ক্ষুরধার হীরকখণ্ড দিয়ে তৈরি। কোনো বর্ম চর্ম লৌহজালিক একে প্রতিরোধ করতে পারে না। মাথার পেছনে আছে একটুকরো তেজস্ক্রিয় ধাতব। শরীরের বিন্দুমাত্র সংস্পর্শে এলেও সে ধাতব দ্রুত যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু ডেকে আনবে। কোনো বৈদ্যর ক্ষমতা নেই সেই তেজস্ক্রিয় বিষ শরীর থেকে বের করে রোগীকে বাঁচাতে পারে। যুদ্ধের আগে মহিষাসুর এই অস্ত্র চামরকে দিয়ে বলেছিল, চরম পরিস্থিতি হলে ব্যবহার করতে। তা, এটা যদি চরম পরিস্থিতি না হয়, তাহলে কোনটা চরম পরিস্থিতি? এই ভেবে ধনুকে জ্যা রোপণ করে দুর্গার ওপর শক্তিঅস্ত্র নিক্ষেপ করলো চামর। বহু বছরের প্রশিক্ষিত মন দুর্গাকে বলে দিল, বিপদ ধেয়ে আসছে। মুহূর্তে খড়্গ তুলে নিলো দুর্গা, প্রচণ্ডবেগে ঘোরাতে লাগলো। খড়্গের লোলুপ জিহ্বা দুর্গার চারপাশে দুর্ভেদ্য এক বর্ম সৃষ্টি করলো। পরমুহূর্তেই সেই খড়্গের সঙ্গে সংঘর্ষ হলো শক্তিঅস্ত্রের। শক্তিঅস্ত্র ভূপতিত হলো, ভেঙে দু-টুকরো হলো দুর্গার খড়্গ। নিজের ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ চামর এবার তুলে নিলো শূল, সর্বশক্তি দিয়ে ছুঁড়ে মারলো দুর্গার দিকে। চোখের পলক ফেলতে যতটুকু সময় লাগে, তারমধ্যে দুর্গা হাতে তুলে নিল ধনুক। জ্যামুক্ত বাণের আঘাতে চামরের শূল ভূপতিত হলো। হতাশ ও ক্রুদ্ধ চামর এবার কোমর থেকে তরবারি বার করলো। দুর্গাকে লক্ষ্য করে সে তরবারি ছুঁড়তে যাবে, এমন সময় চিক্কা একলাফে চামরের বাহন হাতির মাথার ওপর চড়ে বসলো। চিক্কার নখদাঁতের আঘাতে রক্তাক্ত হলো হাতি, অন্ধ হয়ে পাগলের মতো দৌড়াতে লাগলো। আরেক লাফে চিক্কা চামরের ঘাড়ে গিয়ে পড়লো। ভীষণ মল্লযুদ্ধ শুরু হলো চামরের সঙ্গে দুর্গার বাহনের। মরণপাশে আবদ্ধ হয়ে হাতির পিঠ থেকে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল দুজনে, যুদ্ধ তবু চলতে লাগলো। শেষমেশ চিক্কা ঝটকা দিয়ে চামরের নাগপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে লাফিয়ে উঠল আকাশে। অনেকটা উঁচু লাফিয়ে বিপুল গতিবেগে নির্ভুল লক্ষ্যে চামরের মাথার ওপর গিয়ে পড়ল। শিরস্ত্রাণ ভেঙে দু-টুকরো হলো, চামরের মাথা থেঁতলে গেল। থাবার আরেক আঘাতে সেই মাথা বিচ্ছিন্ন হলো দেহ থেকে।

ক্রৌঞ্চব্যূহের অন্য চোখ থেকে এগিয়ে এলো উদ্‌গ্র, শূন্যস্থান পূরণ করতে। দুর্গা দেখল, উদ্যত শূল হাতে মহিষে সওয়ার উদ্‌গ্র এগিয়ে আসছে ওরই দিকে। দৌড়ে এলো ভৈরবী। পাশেই ছিল এক ঝাঁকড়া বাবলা গাছ। একটানে শিকড়সুদ্ধু সে গাছ উপড়ে আনলো, ছুঁড়ে দিল উদ্‌গ্রকে লক্ষ্য করে। বাতাসে ঝড় তুলে সেই মহীরুহ উড়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল উদ্‌গ্রর মুখের ওপর। বাবলার কাঁটা চোখে ঢুকে অন্ধ হলো উদ্‌গ্র। তার বাহন ভয়ে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়োতে শুরু করলো। উদ্‌গ্র গড়িয়ে পড়ল পিঠ থেকে, বাহনের পায়ের দলায় পিষে মারা গেল।

ক্রৌঞ্চব্যূহের ঠোঁট ও চোখ বিধ্বস্ত। গলার অংশ অনাবৃত। ব্যূহের দুই ডানা এগিয়ে আসার আগেই আবার ধূমাবতীর কুয়াশায় ঢেকে গেল যুদ্ধক্ষেত্র। এবার দানবব্যূহের কেন্দ্রে সরাসরি আক্রমণ চালালো চামুণ্ডারা। ব্রহ্মার মন্ত্রঃপুত দিব্যাস্ত্রের আগুনে ঝলসে উঠলো মধ্যভারতের কবোষ্ণ বাতাস। শয়ে শয়ে অসুর পুড়ে মরতে লাগলো। প্রাণভয়ে প্রশিক্ষণ ভুলে অসুরদের বাহনরা ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি শুরু করলো। যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে লাগলো দানবরা। ঠিক সেইসময় দেখা গেল, দানবব্যূহের অন্তভাগ চিরে শত্রুসংহার করতে করতে কালান্তক ঝড়ের মতো এগিয়ে আসছে রুদ্র। অন্তভাগ থেকে অগ্রভাগ, দানবদের ব্যূহ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়েছে।

‘বাঃ!’ দুর্গার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললো রুদ্র, ‘কারোর সাহায্য ছাড়াই তুমি দিব্যি সামলে দিয়েছ। আমি মিছেই দুশ্চিন্তা করছিলাম। কিন্তু তোমার এ কী অবস্থা হয়েছে?’

দুর্গার বাম বাহুমূল শক্ত করে ধরল রুদ্র। থরথর করে কেঁপে উঠল দুর্গা। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, সারা শরীর অবশ হয়ে এল। তবু মনে হচ্ছিল, এই সময়টা যেন শেষ না হয়। কটিবন্ধ থেকে একরাশ লতাপাতা বার করে তাই দিয়ে ক্ষতস্থান বেঁধে দিল রুদ্র। সে পাতার উগ্র গন্ধে গা গুলিয়ে উঠল দুর্গার।

‘কী এটা?’ বললো দুর্গা।

‘গঞ্জিকা, এতে রক্তক্ষরণ বন্ধ হবে’, বললো মহাদেব রুদ্র, ‘ক্ষতস্থান বিষমুক্তও হবে।’ দুর্গার হাতের কাঁপন, ওর মুখের

রক্তিম আভা নজর এড়ালো না ওর।

'কিন্তু মহিষ কোথায়?' ক্ষণিকের বিহ্বলতা সামলে উঠে দুর্গার উৎকণ্ঠ প্রশ্ন।

আকাশ থেকে নেমে এল হরি। দুর্গার একই প্রশ্ন তাকেও। মহিষের সেনাবাহিনী বিধ্বস্ত। কেউ নিহত, কেউ বা পলাতক। তাহলে মহিষ কোথায় গেল?

'আমি দেখছি।' এই বলে আবার আকাশে উড়ল হরি।

আগুনের বাধা ডিঙিয়ে পৌঁছাতে অনেকটা সময় লাগলো দেবসেনার, কিন্তু শেষপর্যন্ত এসে পৌঁছালো। লজ্জায় অধোবদন হয়ে ইন্দ্র এগিয়ে এল দুর্গার দিকে।

'আপনারা একাই লড়লেন লড়াইটা। আমরা কোনো সাহায্যই করতে পারলাম না।'

'সেটা তোমার দোষ নয়', বললো দুর্গা, 'তবে সাহায্য করার সময় এখনও ফুরিয়ে যায়নি।'

'কী করতে হবে, আদেশ করুন'। করজোড়ে বললো ইন্দ্র।

'ওই দ্যাখো, তারা হিমশিম খাচ্ছে আহতদের নিয়ে', বললো দুর্গা, 'দ্রুত কয়েকজন বৈদ্য দরকার।'

'নিশ্চয়ই, আমি এখনই অশ্বিনীকুমারদের বলছি, তারাদেবীকে সহায়তা করার জন্য। ওদের সঙ্গে বৈদ্যদের একটি দল রয়েছে। সব ঠিক হয়ে যাবে, আহতদের নিয়ে আপনি কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না।'

'আরেকটা জরুরি কথা', বললো দুগা 'এখানে শক্তিঅস্ত্র ব্যবহার করেছে অসুররা। আপাতত তারা জায়গাটাকে পলাশু দিয়ে ঢেকে রেখেছে। তেজস্ক্রিয়তা যাতে ভবিষ্যতে কারোর ক্ষতি না করতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'আমি এক্ষুনি দেখছি। আর কিছু করতে হবে?'

'মহিষ কোথায় লুকোলো, পারলে সেই খবরটা জোগাড় করো।' দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বললো দুর্গা।

কয়েক প্রহর পার হয়ে গেল।

সন্ধ্যা নামছে মধ্যভারতের বিস্তীর্ণ মালভূমিতে। দলে দলে পাখি বাসায় ফিরছে। ছাইছাই অন্ধকার ঘন হয়ে নীল রং ধরছে। এইমাত্র ফিরলো হরি। যুদ্ধক্ষেত্রে আঁতিপাতি করে খুঁজে ও মহিষকে কোথাও পায়নি।

'এমনও তো হতে পারে যে, মহিষ মারা গেছে?' বললো রুদ্র।

'তাহলে মৃতদেহটা গেল কোথায়?' বললো হরি, 'মৃতদেহ যতক্ষণ না দেখছি, ততক্ষণ মানতে পারছি না যে মহিষ মরেছে।'

'এত অসুরের মৃতদেহ পড়ে আছে যুদ্ধক্ষেত্রে', বললো রুদ্র। 'হয়তো তাদের কারোর নীচে চাপা পড়েছে ওর মৃতদেহটা। তাছাড়া আর কী হতে পারে?'

'নাঃ!' বললো দুর্গা, 'আমি হরির সঙ্গে সহমত। না আঁচালে বিশ্বাস নেই। এতগুলো অসুরকে দেখলাম, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করলাম, মহিষাসুরকে কই কোথাও দেখলাম না তো? যদি মারা গিয়ে থাকে, তবে ওকে মারলো কে? নাঃ, যতক্ষণ না ওর লাশ দেখছি, ততক্ষণ মহিষ জীবিত, এটাই মেনে চলা উচিত। কিন্তু একটা জলজ্যান্ত লোক সবার চোখের সামনে দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেমালুম উবে গেল কী করে? এ কি সমবারি মায়া? গণসম্মোহন?'

যুদ্ধক্ষেত্রের ওপর দূর থেকে দৃষ্টি রেখেছিল মহিষ। যখন দেখল দানববাহিনীর সঙ্গে বীরবিক্রমে লড়ে যাচ্ছে নারীবাহিনী, তখনই মনটা খুঁতখুঁত করে উঠেছিল। মুখে যাই বলুক, মহিষ আদতে ঘোর বাস্তববাদী। নারীযোদ্ধাদের বিক্রম ও দেখেছে ব্রঙ্গার যুদ্ধে। তাই বিদল যেরকম নারীযোদ্ধাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছিল, তেমনটা মহিষ করতে পারেনি। কিন্তু দানবদের উত্থানের পেছনে রয়েছে বিধর্মী নারীদের প্রতি তাচ্ছিল্য, তাই বিদলকে কিছু বলতেও পারেনি তখন। তবে বিদলের যে সাহায্য প্রয়োজন, এটা দ্রুত বুঝে ফেলেছিল মহিষ।

তাড়াতাড়ি অবশিষ্ট সৈন্যদের সংগ্রহ করে বিদলকে সাহায্য করার জন্য এগিয়েছিল মহিষাসুর। ত্রিশূলব্যূহের বেড়াজাল পেরিয়ে বিদলের সঙ্গে নারীসেনার যেখানে প্রলয়ংকরী যুদ্ধ চলছে, সেই স্থানের প্রায় ঢিলছোঁড়া দূরত্বে পৌঁছে গিয়েছিল মহিষ। এইসময় দেখল, কোনো এক মন্ত্রবলে ধোঁয়ায় ঢেকে গেল সবকিছু। তাপরই বিস্ফোরণের শব্দ, সঙ্গে বিদলের প্রাণান্ত আর্তনাদ। এ কোন অলৌকিক মায়া? আশঙ্কায় দুরুদুরু করে উঠলো মহিষাসুরের বুক। বাহনের রাশ টেনে ধরল, অনুগামী বাহিনী নিয়ে পিছিয়ে দাঁড়াল খানিকটা। দেখতে দেখতে মহিষাসুরের চোখের সামনেই দানবদের ব্যূহরচনা ভেঙে পড়ল, যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে লাগলো তারা। পালিয়ে এত উদ্ধত, উগ্রস্থ, উগ্রবীর্য, আরও কত ধুরন্ধর দানবযোদ্ধা। পালাতে গিয়ে শুঙ্গভূমির খর্বাকৃতি হস্তীবাহিনীর হাতে সংহার হলো অধিকাংশ অসুর। সব শেষ। কী হবে এখন?

মহিষাসুরের যোদ্ধা-মন বলছিল, জয় পরাজয় যা হয় হোক, অন্তিম রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়ে যেতে। কিন্তু অন্য একটা মন, যেটা ঘোর বাস্তববাদী, সেটা বলছিল, দানবদের মনোবল ভেঙে গেছে, তাই এ যুদ্ধে জেতা অসম্ভব। মিছিমিছি শক্তিক্ষয় না করে অবশিষ্ট শক্তিটুকুকে বাঁচিয়ে রাখা বেশি প্রয়োজন। তাই পালাতে হবে। কিন্তু কোথায়?

দেশের উত্তর-পশ্চিম জুড়ে দানবদের রাজত্ব। তাই সেখানেই যাওয়া উচিত। কিন্তু সেই রাজত্ব তো এই পাঁচলক্ষ মোষের শক্তির দাপটেই। সেই সেনাবাহিনীর সিংহভাগ বিনষ্ট হয়েছে, এখবর পৌঁছলে উত্তর-পশ্চিম জুড়ে বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী এই সুযোগেরই তো প্রতীক্ষায় রয়েছে বিষ্ণুর দলবল।

তাছাড়া, শত্রুরা নিশ্চয়ই ভাবছে, আমি উত্তর-পশ্চিমে পালাবো। তাদের ধোঁকা দিতে হলে উল্টোদিকে যাওয়াই শ্রেয়। দক্ষিণের রাজারা সরল, সাধাসিধে। বহুযুগ কোনো বড়সড় শত্রুর মুখোমুখি হয়নি ওরা। বিশেষ করে অসুরদের মতো প্রতিপক্ষ তো ওরা কোনোদিনই দেখেনি। বিন্ধ্যর উত্তরে কী ধরনের মাৎস্যন্যায় চলছে, তা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই, তারা সেসব খবরও রাখে না। নিজেদের মধ্যে কখনো বন্ধুত্ব, কখনো বৈরিতা— এই নিয়ে মেতে আছে তারা। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে গত ক'বছরে বহু সংখ্যক রক্তবীজকে গোপনে বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে প্রেরণ করা গেছে। তারা বিভিন্ন ছোট ছোট জনপদে ঘাঁটি গেড়ে লোকচক্ষুর আড়ালে অসুধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িয়ে গেছে। দক্ষিণের রাজারা সেসব খেয়ালও করেনি। আজ তার সুফল পাওয়া যাবে। নিজের দূরদর্শিতার কথা ভেবে মনে মনে উল্লসিত হলো মহিষ।

বহু বছর ধরে মহিষ দক্ষিণাপথ আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেছে। পরিকল্পনাই সার, এগোতে সাহস পায়নি। দণ্ডকারণ্যের পদে পদে বিষ্ণুর অঙ্গীভূত উপজাতিদের বসতি। তারা পাহারা দেয় বিন্ধ্যপর্বতের প্রতিটি গিরিপথ। তাদের নজর

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও
অভিনন্দন :—

ANU
SAREES

13B, Digamber Jain Temple Road, (2nd Floor)
Chini Patti, Kolkata - 700 007
Phone : 2268 2234 / 35 / /36, Email : anusaree@gmail.com

এড়িয়ে নিজের বাহিনীকে অটুট রেখে দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ দুঃসাধ্য কাজ। আজ চতুর্দিক থেক আসা বিপদের কালো মেঘ থেকে রক্ষা পেতে সেই দুঃসাহসিক সিদ্ধান্তটাই নিয়ে ফেলল মহিষাসুর। বাহনের মুখ দক্ষিণদিকে ঘোরালো, সঙ্গে সেনাধ্যক্ষ কৃষ্ণাঙ্গর অধীনে অবশিষ্ট দানবসেনা ও মহারথীরা। দলবল নিয়ে মহিষ চুপিসারে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে ঢুকে পড়লো। নির্দেশ দিল কৃষ্ণাঙ্গকে, সেনার নিষ্ক্রমণের সব চিহ্ন যেন বিনষ্ট করতে করতে যায় ওরা। যাতে শত্রুরা পশ্চাদ্ধাবনের জন্য কোনো সূত্র না পায়।

শুরু হলো দণ্ডকারণ্যের এলাকা। দুর্গম এ জঙ্গলে পথ চিনে চলা দুষ্কর। সাহায্য করতে যেন মন্ত্রবলে আবির্ভূত হলো একদল রক্তবীজ। তারাই গোলকধাঁধার মতো সেই জঙ্গলের গলিঘুঁজির মধ্যে দিয়ে দানবসেনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। কিছুদূর চলার পর সঙ্গে যোগ দিল একদল মহিষ-পালক, সঙ্গে তাদের মহিষরে পাল, জঙ্গলে চরতে বেরিয়েছে। তাদের সঙ্গে মিশে গেল মহিষাসুরের বাহিনী। বাইরে থেকে চেনার উপায় রইলো না, কে সৈনিক আর কে রোখাল। এখন সমস্যা শুধু রসদ নিয়ে। প্রতিটি সেনাবাহিনীর সঙ্গেই ক'দিন পথ চলার মতো রসদ থাকে। শুকনো চনক, গুড়। তারও বরাদ্দ অর্ধেক করে দিল সেনাধ্যক্ষ কৃষাঙ্গ। আধপেটা খেয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম বরাবর পাহাড়ি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নিরন্তর এগিয়ে চলল দানবের দল, দিনরাত। দু'দিন দু'রাত পথ চলার পর দূর থেকে শোনা গেল বহতা নদীর কুলুকুলু শব্দ। তার সঙ্গেই দূরে পাহাড়ের ফাঁকে দেখা গেল মন্দিরের স্বর্ণকলস, রক্তস্বর্ণবর্ণের ধ্বজায় বরুণের কুম্ভচিহ্ন। বিস্মৃতির আড়াল সরিয়ে একরাশ স্মৃতি মহিষের সচেতন মনের স্তরে এসে ঘা দিল। খুব ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে এসেছিল এখানে। অমরকণ্টক, নর্মদা নদীর উৎস। বরুণ সম্প্রদায়ের অতি পবিত্র তীর্থ। মাতামহী দনু এখানেই ওদের সামনে সজ্ঞানে জলসমাধি নিয়েছিলেন। মহামতী দনু, তার নামেই দানবজাতি। অথচ তিনি আমৃত্যু বরুণ-উপাসক ছিলেন। অসুবাদকে কখনোই স্বীকার করেননি। আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন, তাহলে কী হতো? আজ জম্বুদ্বীপের প্রতিটি মানুষ দানবদের সমীহ করে চলে। এই সাফল্যে কী খুশি হতেন মাতামহী? নাকি এই যে দানবরা অসুবাদ গ্রহণ করে অসুর জয়যাত্রার সহায়ক হয়েছে, সেজন্য রুষ্ট হতেন। সেই অপরাধে মহিষকে কি উনি দানবজাতি থেকে বহিষ্কার করতেন? চরমশত্রু এই দুর্গা মেয়েটি ঠিক মাতামহীর মতো দেখতে। নাকি বিবেক এমনটা দেখাচ্ছে? এই বিবেক জিনিসটা উচ্চাকাঙ্ক্ষীর সবচেয়ে বড় শত্রু। পারলে নিজের বিবেকটাকে গলা টিপে হত্যা করতো মহিষ। যদি সম্ভব হতো। অন্যমনস্কভাবে মন্দিরচূড়ার উদ্দেশ্যে প্রণামের হাত উঠেছিল, সামলে নিল। সঙ্গীসাথীরা দেখে ফেললে লজ্জার ব্যাপার হবে। মন্দির ও তৎসংলগ্ন লোকালয় সন্তর্পণে এড়িয়ে যেতে বাহিনীকে আদেশ দিল মহিষ। এই অমরকণ্টকেই আরেকদল রক্তবীজ এসে যোগ দিল ওদের সঙ্গে। অনেককাল রয়েছে তারা এই অঞ্চলে। বিন্ধ্যপর্বতের পরিসর শুরু হয়ে গেছে। পথে পড়লো একের পর এক সংকীর্ণ গিরিবর্ত্ম, শ্বাপদসঙ্কুল ঘন জঙ্গলে ঢাকা। এই বিন্ধ্যাচল বিষ্ণুর খাস এলাকা। স্থানীয় রক্তবীজদের সহায়তা ছাড়া এ পথ পার হওয়া সম্ভব ছিল না। তারাই সবার চোখের আড়াল দিয়ে মহিষকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। আরও পাঁচদিন নিরন্তর পথ চলার পর ওরা পৌঁছলো গোদাবরী নদীর তীরে।

গোদাবরী এখানে অনেকটা চওড়া, আর তেমনি খরস্রোতা। পার হওয়ার জন্য সাবধানে জলে নামতে গেছে, এমন সময় যোদ্ধার স্বভাবজাত সতর্কতা মহিষের পা টেনে ধরলো। সঠিক মুহূর্তে বাহিনীকে জলে নামতে বারণ করলো মহিষ। দেখল, শ'খানেক নৌকার এক নৌবহর পাল তুলে এগিয়ে চলেছে উজান বেয়ে। তাদের মাস্তুলের চূড়ায় বরুণদেবের পতাকা। নদীর তীরবর্তী ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে রইলো দানববাহিনী, যতক্ষণ না নৌবহরের শেষ নৌকাটিও দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। ক্রোধে ফুঁসছিল মহিষ। মনে পড়ছিল অসুর দিক্‌বিজয়ের সেই গৌরবময় দিনগুলোর কথা। লক্ষ মহিষের বাহিনী নিয়ে সিন্ধু ও গঙ্গার অববাহিকায় বসবাসকারী বরুণদেবের ওপর গণহত্যা চালিয়েছিল মহিষ। ইচ্ছে ছিল, গোদাবরী ও কৃষ্ণার বরুণদেরও সেভাবেই সমূলে ধ্বংস করার। সেসব স্বপ্ন ফিকে হয়ে গেল, দুর্গা নামের এই পৌত্তলিক মেয়েটির জন্য। প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছেটা নতুন করে ধমনীতে টগবগ করে ফুটতে লাগলো। লম্বা কয়েকটা শ্বাস নিয়ে জলে নামলো মহিষাসুর।

আরও পাঁচদিন পথ চলার পর কৃষ্ণানদী পার হলো অসুরবাহিনী। কৃষ্ণার দক্ষিণ পাড় থেকে জঙ্গল পাতলা হতে শুরু করেছে। একটা জনপদ চোখে পড়লো সেই পাড়ে।

'সম্রাট', সেনাধ্যক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ এসে বললো, 'সেনাবাহিনীর রসদ ফুরিয়ে গেছে। গত একদিন অভুক্ত অবস্থায় হাঁটছে সেনারা। আপনার প্রতি তাদের নিষ্ঠা সন্দেহাতীত। যতক্ষণ শরীরে প্রাণ আছে, ওরা আপনার সঙ্গেই থাকবে। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? খাবারের ব্যবস্থা না হলে যে আর চলছে না।'

'নদীর ধারের ওই গ্রামটি থেকে কী রসদ সংগ্রহ করা যায়?' অন্যমনস্কভাবে বললো মহিষ।

‘তা হয়তো যায়’, বললো কৃষ্ণাঙ্গ, ‘কিন্তু বিনিময়ে ওদের কী দেবো আমরা? আমাদের স্বর্ণমুদ্রা নেবে এরা?’

‘না’, বললো পথপ্রদর্শক রক্তবীজ, ‘এরা স্বর্ণের বিনিময়ে কিছু দেবে না। স্বর্ণ এদের কাছে মূল্যহীন। তাছাড়া এইসব গ্রামবাসীদের মধ্যে বিষ্ণুর সংগঠন রয়েছে। এদের সঙ্গে বিনিময় করতে গেলে বিষ্ণুর কাছে সংবাদ পৌঁছে যেতে পারে।’

‘সৈনিকরা খালিপেটে মেরেকেটে আরও একদিন হাঁটতে পারবে। তারমধ্যে কী এমন কোনো জনপদ পড়বে, যেখান থেকে স্বর্ণের বিনিময়ে নিরাপদে রসদ সংগ্রহ করা যায়?’ বললো কৃষাঙ্গ।

‘না, না, তার কোনো দরকার নেই’, বললো মহিষ, ‘চুপিসারে গিয়ে গ্রাম আক্রমণ করো। যা দরকার, লুঠ করে নিয়ে এসো। শুধু একটা কথা মাথায় রেখো। প্রতিটি গ্রামবাসীকে হত্যা করে মৃতদেহ নদীর পাঁকে পুঁতে ফেলবে। বিষ্ণুকে খবর দেওয়ার জন্য কেউ যেন বেঁচে না থাকে। বাচ্চা বুড়ো কাউকে বাদ দেবে না।’

স্তম্ভিত কৃষাঙ্গ মহিষের দিকে তাকিয়ে দেখলো একবার। এত নিষ্ঠুর কী কোনো মানুষ হতে পারে? পরক্ষণেই ভাবলো, মহিষ সাক্ষাৎ অসুর দূত। সে কী আর ভুল কিছু করতে পারে? হয়তো এই নিষ্ঠুরতার মধ্যেই পরমপিতা অসুর আশীর্বাণী লুক্কায়িত আছে।

পরবর্তী এক প্রহরে কৃষ্ণার জল লাল হয়ে গেল নিরীহ নিরস্ত্র গ্রামবাসীদের রক্তে। বুভুক্ষু দানবের দল ঝাঁপিয়ে পড়লো শান্ত নির্বিরোধী গ্রামটির ওপর। গণহত্যার জান্তব বীভৎসতার যেন এক স্রোত বয়ে গেল। শিশু, বৃদ্ধ নরনারী কেউই বাদ গেল না। কামক্ষুধা ও উদরক্ষুধা দুইয়ের মধ্যেকার তফাত ভুলে গেল দানবরা। ধর্ষিতা হলো নারী ও শিশুরা, তাদের দেহ ছিঁড়েখুঁড়ে নরমাংসের স্বাদ নিল ক্ষুধিত দানবসেনা। সেনাধ্যক্ষ কৃষাঙ্গ শুধু পালিয়ে বেড়ালো, আড়ালে গিয়ে বমি করলো কয়েকবার।

আরও চারদিন পথ চলার পর মহিষাসুর পৌঁছলো কাবেরী নদীর উত্তর পাড়ে। অন্যপাড়ে মাথা তুলেছে খাড়াই উঁচু এক একলা পাহাড়। সেই পাহাড়কে দু’দিন থেকে বেড় দিয়ে রক্ষা করছে কাবেরী। অন্য দু’দিক ঘন জঙ্গলে ঢাকা। মহিষের অভিজ্ঞ চোখ বলে দিল, আশ্রয় নেওয়ার জন্য, নতুন করে বাহিনী সংগঠিত জন্য উপযুক্ত জায়গা এটি।

‘কে থাকে, ওই পাহাড়ে?’ বললো মহিষ।

‘বনবাসী উপজাতিরা থাকে’, বললো পথপ্রদর্শক রক্তবীজ, ‘সংখ্যায় তারা চার-পাঁচশো-র বেশি নয়। কাঞ্চীপুরমের রাজার এক দুর্গ আছে পাহাড়ের মাথায়। তবে সেই দুর্গে বহুকাল কেউ থাকে না। বনবাসীরাই পাহারা দেয় দুর্গ। পাহাড়টার এক প্রাচীন নাম রয়েছে, মহাবলাচল।’

‘উত্তম!’, বললো মহিষ, ‘বনবাসীদের মেরে ওই পাহাড় আর ওই দুর্গ অধিকার করতে হবে। আজ রাতের জন্য এখানেই বিশ্রাম নেওয়া যাক। ইতিমধ্যে তুমি স্থানীয় অসুরদের সঙ্গে যোগাযোগ করো। শ’খানেক লোক দরকার, যারা এই পাহাড়ের পথঘাট চেনে। তাহলেই আপাতত চলবে। আগামীকাল সূর্যোদয়ের সঙ্গে পাহাড় আক্রমণ করা হবে।’

পরদিন ভোরবেলা সূর্যোদয়ের সঙ্গে বাতাস অভিমুখ পরিবর্তন করলো। সেই বাতাসে ভর করে আগুনের হলকা ছড়িয়ে পড়লো মহাবলাচল পর্বতের আনাচে-কানাচে। আলোয় আলো হয়ে উঠলো গুহাকন্দর গিরিপথ। আগুনের তাপে জঙ্গল গাছপালা সব ঝলসে অঙ্গার হলো। ঝলসে পাথর হয়ে গেল নিদ্রাভিভূত বনবাসীরা, সপরিবারে। কেউ কেউ আগুনের ঘেরাটোপ পার হয়ে জঙ্গল থেকে বেরোনোর চেষ্টা করেছিল। পাহাড় থেকে সমতলে নামবার প্রতিটি গিরিপথের মুখে ওঁত পেতে বসেছিল মহিষের সেনা। যে কেউই পালানোর চেষ্টা করলো, মারা পড়লো। দিবা দ্বিপ্রহরের মধ্যে শ্মশানের রূপ নিল মহাবলাচল। কৃষ্ণার মতোই কাবেরীও দানবদের নৃশংসতার নীরব সাক্ষী হয়ে রইল। মৃত সন্তানদের দুঃখে আকাশ থেকে অঝোরে বৃষ্টি নামলো সন্ধেবেলা। সারারাত ধরে সে বৃষ্টি চলল। পরদিন ভোরবেলা সদলবলে গিরিশীর্ষের দুর্গে প্রবেশ করল মহিষাসুর। সঙ্গে দানব-স্থপতি ময়।

‘এখানে আমার নতুন রাজধানী পত্তন করবো। আমার নামে সে রাজধানীর নাম রাখবো ‘মহীশূর’। এখান থেকেই দানবদের জয়যাত্রা নতুন করে শুরু হবে। তোমার কাজ হলো, আগামী এক পক্ষকালের মধ্যে দুর্গসহ এই পাহাড়টিকে অভেদ্য করে গড়ে তোলা। পারবে তো?’

‘এতবড় কাজের তুলনায় এক পক্ষকাল খুবই কম সময়’, বললো ময়দানব, ‘তবু চেষ্টা করবো।’

‘চেষ্টা নয়, করতেই হবে।’ বললো মহিষাসুর, ‘আমি যে দাক্ষিণাত্যে পালিয়ে এসেছি, এই সংবাদ বেশিদিন চেপে রাখা যাবে না। খবর পেলেই দলবল নিয়ে ওই মেয়েটা এখানে এসে

হাজির হবে। আক্রমণে আক্রমণে নাস্তানাবুদ করবে আমাদের। আবার পালাতে হবে তখন। না, না। সে চলবে না। মনে রেখো, ঠিক এক পক্ষকাল পরে আমি নিজে সম্পূর্ণ ব্যবস্থা পরিদর্শন করবো। কোনো খুঁত থাকলে তৎক্ষণাৎ তোমাকে শূলে চড়াবো। তাই আজ এক্ষুনি কাজে লেগে পড়ো। জনবল বা অর্থবল পেতে কোনো সমস্যা হবে না, যত চাও তত পাবে। কিন্তু কাজ নিখুঁত হওয়া চাই।'

সর্বশক্তি একজোট করে ময়দানব লেগে পড়লো মহীশূর দুর্গ নির্মাণ করতে। প্রতিটি গিরিবর্ত্মে মাথা তুললো উঁচু পাঁচিল। প্রতিটি গিরিসঙ্কটে গড়ে উঠলো সৈন্যদের লুকিয়ে থেকে যুদ্ধ করার উপযুক্ত সুরক্ষিত কক্ষ। দেখতে দেখতে যেন কোনো মন্ত্রবলে ঝলসানো সেই মহাবলাচল পর্বত রূপান্তরিত হলো ত্রিস্তরীয় এক অভেদ্য দুর্গে। সেই দুর্গে অধিষ্ঠান করে মহিষাসুর নতুন করে দানবসাম্রাজ্য বিস্তার শুরু করল।

সিংহাসনে আসীন হয়েই মহিষ নজর দিল দাক্ষিণাত্যে নিজের শাসন নিরঙ্কুশ করতে। মহিষ দেখল, বহু প্রাচীন জনপদ রয়েছে এখানে। রাজারা মূলত সেখানেই থাকে, তার বাইরে সচরাচর বেরোয় না। সুউচ্চ প্রাচীর ও পরিখায় ঘেরা এইসব শহর এক এক করে জয় করতে হলে প্রভূত শক্তিক্ষয় হবে, বহু বছর কেটে যাবে। তাই মহিষ অন্য পথ নিল।

প্রাচীন ভারতবর্ষে মন্দিরগুলো ছিল সামাজিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার কেন্দ্র। ঘরে টাকাপয়সা রাখা নিরাপদ নয়, তাই দেশের সাধারণ মানুষ তাদের সঞ্চিত ধনরাশি গচ্ছিল রাখতো স্থানীয় মন্দিরে। মন্দির কর্তৃপক্ষ সেই টাকা ধার দিত কারিগর সমিতিগুলোকে। সেই অর্থ ব্যবহার করে দেশের কারিগররা উৎকৃষ্ট সব পণ্য নির্মাণ করত। বণিকরা সেইসব পণ্যে জাহাজ বোঝাই করতো, মৌসুমি বায়ুতে ভর করে বাণিজ্যযাত্রায় বেরোতো। ভারতের শিল্পীদের তৈরি পণ্য বিদেশের বাজারে দেদার বিকোতো চড়া দামে। ফিরতি মৌসুমি বায়ুতে ভর করে বণিকরা দেশে ফিরত, সোনাদানায় জাহাজ ভর্তি করে। বছর ঘুরতে মন্দিরের ধার দেওয়া টাকা অনেকগুণ হয়ে ফেরত আসতো মন্দিরগুলোর কাছে। সেই লাভের টাকার অংশে মন্দিরের খরচ চলতো, সঙ্গে নানাবিধ সামাজিক উন্নয়ন হতো মন্দিরকে ঘিরে। নতুন মন্দির ও অতিথিশালা নির্মাণ, পুষ্করিণী খনন, অন্নসত্র ও জলসত্র চালানো, পাঠশালা চালানো— এইসবেরই উৎস ছিল সেই লাভের টাকা। বণিকদের কাছ থেকে লাভে টাকার আরেকটা অংশ যেত রাজার কাছে, রাজকর স্বরূপ। সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষার খরচ মূলত সেভাবেই সংগৃহীত হতো। মন্দিরে রাশিরাশি ধনসম্পদ সঞ্চিত আছে, সেটা সবাই জানতো। তবু জঘন্যতম তস্করও মন্দিরের ধনরাশি লুঠ করার কথা স্বপ্নেও ভাবতো না। মন্দিরের টাকা জনসাধারণের টাকা, সে টাকা লুঠ করা তো মহাপাপ। কে সেধে সেই পাপ মাথায় নিতে চাইবে? মরিয়া হয়ে মহিষ সেই পথই বেছে নিলো। পাপের পরোয়া মহিষাসুরকে কোনোদিনই বিচলিত করেনি। ওর স্থির বিশ্বাস, ও যাই করে সেটা পুণ্য, কারণ সেটা ও করে অসুধর্মের উন্নতির জন্য।

ঝটিকা আক্রমণে একটার পর একটা মন্দির ধ্বংস করে তার ধনরাশি লুঠ করে মহিষাসুর জড়ো করতে লাগলো মহীশূরে। এর ফলে একদিকে যেমন মহিষ ক্রমশ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগলো, অন্যদিকে হাহাকার পড়ে গেল গোটা দাক্ষিণাত্যে। অর্থতন্ত্র ধ্বসে পড়লো। কারিগরদের হাতে কাজ নেই, বণিকদের কাছে বিক্রি করার মতো পণ্য নেই। রাজকর অনাদায় পড়ে থাকছে। দাক্ষিণাত্যের একের পর এক রাজা সেনাবাহিনী পাঠালো মহীশূর আক্রমণ করতে। প্রতিটি অভিযানই ব্যর্থ হলো। যাত্রাপথে প্রতিটি বাহিনী অন্তর্ঘাতের শিকার হলো। রক্তবীজদের নেতৃত্বে স্থানীয় পুণ্যলোভাতুর নব্য অসুরের দল অন্তর্ঘাত চালালো নিজেরই রাজ্যের সৈনিকদের ওপর। যদি বা কোনো একটা দল মহীশূর এসে পৌঁছালো, পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা হলো না তাদের। তার আগেই মারা পড়লো তারা। শুধু শক্তিক্ষয়ই সার, কেউ ভেদে করতে পারলো না সেই অভেদ্য কেল্লা। অর্থতন্ত্র ধসে পড়বার ফলে লক্ষ লক্ষ যুবক কর্মহীন হলো, টাকা ছড়িয়ে তাদের বশীভূত করে ফেললো মহিষ। দেখতে দেখতে দাক্ষিণাত্যের একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে দাঁড়ালো মহিষাসুর। দাক্ষিণাত্যের সীমান্তে বসে ধীরে ধীরে নিজের ক্ষমতা বাড়াতে শুরু করলো উত্তর ভারতেও। বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিমে, যেখানে আগে থেকেই দানবদের প্রভুত্ব ছিল। গৃহযুদ্ধ শুরু হলো দেশজুড়ে। মহিষের অর্থবল লোকবল সবই বেশি। লাগাতার খণ্ডযুদ্ধে দেবতারা ক্রমশ কোণঠাসা হতে লাগলো ভারতবর্ষের সর্বত্র। বহু বছর কেটে গেল এইভাবে।

With the best Compliments from :

Phone : 2237-5919
2237-2090
2237-2822
Fax : 2237-0269
E-mail : kolkata@allindatpt.com
Web-site : www.allindiatpt.com

ALL INDIA ROAD TRANSPORT AGENCY
AIRTA LOGISTICS PRIVATE LIMITED
ALL INDIA PACKERS & MOVERS

H.O. : 28, BLACK BURN LANE,
KOLKATA-700 012

Time Guaranteed delivery. Transporters for all over India, Marine type ISO Container trucks available. Bank-approved specialists in ODC Cargoes by heavy duty Trucks & Trailers. Specialists in packing of household goods & Transpotation. Branches & Association all over India.

শারদীয়ার শুভ মুহূর্তে সকলকে জানাই প্রীতি,
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

—ঃ সৌজন্যে ঃ—

মনমোহন চৌধুরী

মধ্যরাত। পাথরের দেওয়ালে স্থানে স্থানে কুলুঙ্গিতে প্রদীপ জ্বলছে। আলো-আঁধারের পুনরাবৃত্তি আলোছায়ায় ডোরাকাটা চাদর বিছিয়েছে ঘর জুড়ে। বিশাল এই ভূগর্ভস্থ কক্ষে বাইরে থেকে আলোবাতাস প্রবেশের পথ নেই। তবু টাটকা বাতাস বইছে মৃদুমন্দ। কীভাবে, তা ব্রঙ্গার স্থপতিরাই জানেন।

ব্রঙ্গার রাজপ্রসাদে গোপন মন্ত্রণাকক্ষে বৈঠক বসেছে। দুর্গার সঙ্গে রয়েছে কালী, মাতঙ্গী ও ভুবনেশ্বরী। রয়েছে দেবরাজ ইন্দ্র, সঙ্গে পবন। রয়েছে হরি ও রুদ্র। আর রয়েছে ব্রঙ্গারাজ দিব্যবল ও ব্রঙ্গার গুপ্তচর প্রধান বিরুপাক্ষ।

'এতগুলো বছর পার হয়ে গেল, তবু মহিষ আজও অধরা', বলছিল ক্ষুব্ধ দুর্গা, 'দু-দুবার আমরা মহিষকে যুদ্ধে হারিয়েছি। অথচ আজ সে আগের থেকেও অনেক বেশি শক্তিশালী। কোথায় ভুল হচ্ছে আমাদের?'

'উত্তরাপথের প্রতিটি রাজন্যবর্গকে আমি মিত্রতার প্রস্তাব পাঠিয়েছি', বললো দিব্যবল, 'মহিষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তাদের আহ্বান জানিয়েছি। তারা কেউই আমার ডাকে সাড়া দেয়নি, মহিষের শক্তিকে তাদের এতটাই ভয়।'

'মধ্য ভারতের যুদ্ধের আগে আমরা উত্তরাপথের প্রতিটি জনপদে গিয়েছিলাম', বললো ভুবনেশ্বরী, 'বিদ্রোহের বার্তা পৌঁছে দিতে। ফলত, উত্তরাপথের প্রায় প্রতিটি বনাঞ্চল, প্রতিটি গ্রাম মহিষের শাসনকে অস্বীকার করেছে। কিন্তু শহরগুলো আজও মহিষের করায়ত্ত। এর একটা কারণ শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে অসুবাদের প্রভাব, গুরুকুলগুলোতে অসুবাদীদের প্রতিপত্তি। অন্য কারণটি হলো, উত্তরাপথের অধিকাংশ রাজাই ভীরু ও অক্ষম। মধ্যভারতের যুদ্ধে মহিষের হারের সুযোগ নিয়ে এরা নিজেদের স্বাধীন ঘোষণা করবে, এমনটাই আমরা আশা করেছিলাম। কিন্তু শরীরের শৃঙ্খলমোচন সহজ, মনের শৃঙ্খলমোচন কঠিন। এইসব রাজন্যবর্গ ভয়ে মরে আছে। নিজেদের বিলাসব্যসনটুকু জুটে গেলেই এরা খুশি। স্বাধীনতা এদের কাছে কোনো বিশেষ গুরুত্ব রাখে না। দানবরা চটে গেলে পাছে এদের আরামের ক্ষতি হয়, এই আশঙ্কাতেই এরা দানবদের বিরুদ্ধাচরণ করে না।'

'তা হবে নাই বা কেন?' বললো বিরুপাক্ষ, 'এদের অনেকেই কোনো না কোনো সময় মহিষের দাসত্ব স্বীকার করেছিল। সত্যিকারের স্বাধীনচেতা রাজারা সবাই বহুকাল আগেই অসুরদের হাতে খুন হয়েছে।'

'সমস্যাটাকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা দরকার', বললো হরি, 'আমরা ভাবছি, এইসব রাজারা কেন মহিষের বিরুদ্ধাচারণ করছে না, কেন এরা বিদ্রোহ করছে না। কিন্তু এইসব রাজ্যের প্রতিটিতেই বহুল সংখ্যায় রাজবিদ্রোহীরা রয়েছে। তাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি দেওয়া দরকার।'

'এইসব বিদ্রোহীরা অনেকেই স্বার্থসর্বস্ব ডাকাত বিশেষ', বললো ভুবনেশ্বরী, 'স্বার্থসিদ্ধির সামান্য সুযোগ পেলেই এরা মহিষের দলে ভিড়ে যাবে।'

'সবাই এরকমটা নয়', বললো হরি, 'এদের মধ্যে অনেকেই লোভে নয়, দেশজোড়া মাৎস্যান্যায়ের কারণে ডাকাত হয়েছে। দেশের সমস্যাটা এরা বোঝে। এরা ভুক্তভোগী। ডাকাতের দল গঠন করতে পেরেছে, তার মানে এদের মধ্যে নেতৃত্ব দেবার গুণ আছে। রাজাদের ওপর অযথা সময় নষ্ট না করে এদের সংগঠিত করলে আখেরে কাজে দেবে। সামান্য মদত পেলে এরাই স্বাধীন রাজা হয়ে বসবে। সমগ্র উত্তরাপথে মহিষের প্রতি আনুগত্যকে চুরমার করে দেওয়া যাবে এভাবে।'

'আমি সহমত', বললো বিরুপাক্ষ, 'সামাজিক প্রতিষ্ঠার অহংকারে এদের অন্তজ বলে দূরে সরিয়ে রাখলে ভুল করা হবে। ক্ষাত্রগুণে এরা সিংহাসনে বসে থাকা বহু রাজার থেকে যোগ্যতর।'

'আরও একটা ব্যাপার', বললো মাতঙ্গী, 'মহিষাসুর এদেশের সামগ্রিক সমস্যার একটা অংশমাত্র। আমার শিশুকাল কেটেছে গ্রামের অবস্থাপন্নদের বাড়িতে এঁটো বাসন মেজে। আমাদের মতো মেয়েরা যে কী কষ্ট করে লেখাপড়া শেখে, কত গরিব ঘরের প্রতিভাময়ী কন্যাসন্তান সংসারের চাপে লেখাপড়া ছেড়ে দেয়, তা কি এইসব শাসকরা জানে? নিপীড়িত দেশবাসীর জীবনে যদি পরিবর্তন না আনতে পারলাম, তবে এত উদ্যোগ সব মিথ্যে। এইসব শাসকরা, যারা পুরুষানুক্রমে আমাদের মতো গরিবদের হেয় করে এসেছে, তাদের কাছ থেকে পরিবর্তনের আশা করা বৃথা। সেদিক থেকে এইসব বিদ্রোহীরা সঠিক দিশানির্দেশ পেলে সমাজে স্থায়ী পরিবর্তন আনতে পারে।'

'ব্রঙ্গায় মহিষের শাসনকালে আমিও কিছুকাল বিদ্রোহীর জীবন কাটিয়েছি', বললো দিব্যবল, 'মা দুর্গার সহায়তা না পেলে সারাটা জীবন আমিও ডাকাত হয়েই কাটিয়ে দিতাম। তাই এইসব ডাকাতদের মানসিকতা আমি বুঝি। এদের অনেকের সঙ্গে সেইসময় আমার যোগাযোগও ছিল। আমি

With best compliments from: -

PIONEER PAPER CO.

(Quality Ex-Book Manufacturer with latest technology & Exporter)

REGD OFFICE & WORKS:

74, BELIAGHATA MAIN ROAD
KOLKATA-700 010
PHONE: 2370-4152, FAX: 91-33-2373-2596

Email: pioneerpaperco@gmail.com

Visit Our Website: - www.pioneerpaper.co

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

বেনারসী, সিল্ক, তাঁত শড়ীর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

প্রিয় গোপাল বিষয়ী ®

স্থাপিত - ১৮৬২

বড়বাজার ঃ ৭০, পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রীট (খেংড়াপট্টী), কোলকাতা - ৭,
ফোন ঃ ২২৬৮ ৬৪০২, ২২৬৮-২৮৩৩
২০৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা - ৭, ফোন ঃ ২২৬৮ ৬৫০৮

গড়িয়াহাট ঃ ১১৩/১এ, রাসবিহারী এভিনিউ, ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের বিপরীতে,কোলকাতা - ৭০০ ০২৯, ফোন ঃ ২৪৬৫-৮২৪৬

কাঁচড়াপাড়া ঃ ৬৯/ডি, বাগ স্টেশন রোড, বাগ মোড়, কাঁচড়াপাড়া-৭৪৩ ১৪৫
ফোন ঃ ৭০৪৪০৬২০০০, ২৫৮৫ ৩৩৩৩

এছাড়া আমাদের আর কোনো শাখা নেই

আবার তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। ওরা আমাকে জানে। আমাকে বিশ্বাস করবে।'

'খুবই উত্তম প্রস্তাব', বললো হরি, 'আরেকটা কাজ করা যাক। এইসব রাজ্যের স্থানীয় যুবকদের আমি অনুরোধ করবো, স্বীয় রাজাদের সেনাবাহিনীতে বহুল সংখ্যায় যোগ দিতে। রাজসেনার মধ্যে মিশে থেকে এরা সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহের ভিত্তি তৈরি করতে থাকবে। তারপর ঠিক সময়ে যুগপৎ সেনাবিদ্রোহ ও বিদ্রোহীদের আক্রমণ আমাদের কাজ সরল করে দেবে।'

'ভালো পরিকল্পনা', বললো দুর্গা, 'দেখা যাক, এইভাবে উত্তরাপথে মহিষের সমর্থনের ভিত্তি নাড়িয়ে দেওয়া যায় কিনা। একটা বড় সমস্যার সমাধান হবে তাতে। রাজকর থেকে শক্তি সংগ্রহ করতে পারবে না আর দানবরা।'

'দাক্ষিণাত্যের রাজাদের সমস্যাটা আবার অন্যরকম', বললো ইন্দ্র, 'উত্তরাপথ জুড়ে মহিষ যখন ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল, তখন এরা সাবধান হয়নি। আজও এরা সমস্যাটাকে স্বীকার করতে চাইছে না। মহিষ এদের ঘাড়ের ওপর চড়ে বসে ক্রমাগত শক্তিসঞ্চয় করে চলেছে, আর এরা ভাবছে, অসুররা শিগগিরই চলে যাবে। জোট বেঁধে মহিষকে মহীশূর থেকে তাড়ানোর কোনো চেষ্টাই নেই এদের মধ্যে। তাই সেখানেও বর্তমান রাজশক্তিকে অপসারিত করে নবীন রাজশক্তিকে শাসনক্ষমতায় আনা দরকার।'

'এর থেকেও বড় সমস্যা হলো রক্তবীজ', বললো রুদ্র, 'যখনই মহিষ বিপদে পড়ে, কোন এক জাদুমন্ত্র বলে এরা এসে হাজির হয়, মহিষকে বাঁচিয়ে নিয়ে যায় চরমতম বিপদ থেকেও। আরও মুশকিল হলো, যতই আমরা এদের হত্যা করি, ততই আরও বেশি সংখ্যায় এরা ফিরে ফিরে আসে। যতদিন না রক্তবীজদের শাসন করা হচ্ছে, ততদিন মহিষকে পরাজিত করা অসম্ভব।'

'আমি সহমত', বললো দুর্গা, 'রক্তবীজের অস্তিত্ব আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা। কিন্তু কী করা যায় এব্যাপারে?'

'মারলে ওরা বেঁচে ওঠে', অনেকটা স্বগতোক্তির ঢঙে বললো কালী, 'বাঁচিয়ে তুললে কি ওরা মরে যাবে?'

'কী বললে?' চমকে উঠলো দুর্গা।

'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে', বললো কালী, 'রক্তবীজদের বংশ কী করে ধ্বংস করা যায়, তাই নিয়ে।'

'কী করে করা যায় সেটা?' বললো হরি।

'বিস্তারিত বলার সুযোগ নেই এখন', বললো কালী, 'তবে এটুকু বলছি, রক্তবীজদের ফিরে ফিরে আসার রহস্যতেই নিহিত আছে ওদের মরণবাণ। যদি আমার পরিকল্পনা সফল হয়, রক্তবীজদের নিয়ে আর কারোর কোনো চিন্তা থাকবে না।'

'সংসাধন কী কী লাগবে?' প্রশ্ন করলো দুর্গা।

'চামুণ্ডাবাহিনীর শ্রেষ্ঠ একশো যোদ্ধাকে নিয়ে একটি দল তৈরি করতে হবে', বললো কালী। 'এরা সর্বক্ষণ আমার সঙ্গে থাকবে। কতকাল তার কোনো ঠিক নেই। কাজ সমাধা না হওয়া পর্যন্ত এরা ঘরে ফিরবে না। এমনকী এরা আদৌ ঘরে ফিরতে পারবে কিনা, সেটাও নিশ্চিত নয়। এই যোদ্ধাদের সেইভাবেই মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে বেরোতে হবে।'

'উত্তম', বললো দুর্গা, 'তুমি আজ থেকেই কাজে লেগে পড়ো। নিজে বেছে নাও কোন কোন যোদ্ধা তোমার এই দলে যোগ দেবে। আর কী চাই বলো।'

'আর প্রয়োজন একটি বিশেষ শক্তিপীঠের সহায়তা', বললো কালী।

'কোন শক্তিপীঠ?', দুর্গার চোখে আশঙ্কার ছায়া। শক্তিপীঠদের কাছ থেকে সহায়তা আদায় করা অত্যন্ত কঠিন। হয়তো বা অসম্ভবও। বিশেষ করে যুদ্ধপ্রচেষ্টায়।

গাছের ফাঁকে ফাঁকে পেঁজা তুলোর মতো কুয়াশা আটকে রয়েছে। ঘন বনের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে হাতির পায়ে-চলা পথ। পূর্ণচন্দ্রের ঝিকিমিকি আলো ঘন পাতার চাঁদোয়ার ফাঁক গলে টাপুর-টুপুর ঝরে পড়ছে, কুয়াশার সঙ্গে মিশে অপার্থিব এক মায়াজগতের রচনা করছে বনপথের বাঁকে বাঁকে। একটু এগিয়ে সেরকমই এক বাঁকের মুখে দেখা মিলল নিশানদিহি খাম্বার। চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় ঝলমল করছে, পালিশ করা শরীর থেকে আলো ঠিকরোচ্ছে। লম্বায় প্রায় এগারো হাত, খাড়াই কাঠের স্তম্ভ। একটাই গাছের গুঁড়ি থেকে তৈরি, কোথাও কোনো জোড় নেই। গায়ে সর্বত্র করোটির চিহ্ন খোদাই করা। কুকুর, শেয়াল, মোষ, সাপ, মানুষের করোটি। সেই খাম্বার কাছে এসেই জঙ্গলটা হঠাৎ ফুরিয়ে গেল।

গহন বনের আস্তরণ ভেদে করে বেরিয়ে এসেছে দিগন্তব্যাপী ছাই-ঢাকা এক উলঙ্গ প্রান্তর, পোড়া ঘাসে ঢাকা। চাঁদের রুপোলি আলোয় মৃত্যুর মতো সাদা। অনেক বড় বড় পাথর ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। দেখে মনে হয় জীবন্ত, স্থির

अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो
जान लेवा हो सकता है ।

SHREE
ULTRA
RED-OXIDE

जंग रोधक सीमेंट

SHREE CEMENT LIMITED

Registered Office :
Bangur Nagar, Beawar, Dist. Ajmer
(Rajasthan) 305 901
Phs. : +91 01462 228101-106
Fax : 01462 228117/119
e-mail : scibwr@shreecementltd.com

Corporate Office :
21 Strand Road, Kolkata 700 001
Phs. : +91 33 2230 9601-04
Fax : +91 33 2243 4226
e-mail : scical@shreecementltd.com

Marketing Office :
1 Bahadur Shah Zafar Marg
122/123, Hans Bhawan, New Delhi 110 002
Ph. : 09313565826
Fax : +91 11 22370499
e-mail : scidel@shreecementltd.com

website: www.shreecementltd.com

শারদীয়ার অভিনন্দন সহ—

Usha
Kamal

Kasat Marbles

19, R. N. Mukherjee Road
2nd. Floor, Kolkata - 700 001

Ph. No. Office : 2248-9947

Deals in : Marble, Granites Tiles,
Ceramic Tiles, Stone etc.
Authorised Dealer of

KAJARIA CERAMICKS LTD.
'NAVEEN' brand tiles
REGENCY CERAMICES LTD.
BELLS CERAMICES LTD.
ORIENT TILES

Showroom :
32A, Tollygunge Circular Rd. kolkata - 53
Show Room - 24004154 / 24002858

Godown :
3, Tarpan Ghat Road. Kolkata - 53
(Mahabirtala, B. L. Saha Road)
Godown : 2403-4014

With Best Compliments From :

Wadhwana

"Park Center"
24, Park Street,
Kolkata - 700016
Phone :2229-8411/1031/4352
Fax : 91 33 2229-0492
e-mail : wadhwana@vsnl.com

অচঞ্চল দাঁড়িয়ে আছে না-জানি কিসের প্রতীক্ষায়। সেই তেপান্তরের মাঠের ঠিক মাঝখানে বিশাল এক বটগাছ, বয়সের গাছপাথর নেই তার। ঝুরি নেমেছে সর্বত্র। গাছের নীচে ধুনি জ্বলছে। ধুনির সামনে পঞ্চমুণ্ডির আসন, পাঁচরকম পশুর করোটি দিয়ে তৈরি। তার ওপর শায়িত একটি মৃত মানবদেহ। অনাবরণ সেই মৃতদেহের বুকের ওপর পদ্মাসনে বসে আছে বলিষ্ঠ এক কাপালিক। পরনে রক্তবস্ত্র, গোঁফ-দাড়িতে ঢাকা মুখ। দু-চোখ বোজা, মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বরে অদ্ভুত সব শব্দ অনর্গল উচ্চারণ করে চলেছে। কাপালিকের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো কালী। পায়ের শব্দে চোখ খুলল কাপালিক। কালীর দিকে খানিকক্ষণ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। তারপর হেসে উঠলো হা-হা করে।

‘এই কচি বয়সেই এতসব কাণ্ড করে ফেলেছিস?’ বললো কাপালিক, ‘বাঃ, বাঃ বেশ। কিন্তু ভোগ শুরুর আগেই ত্যাগ? এ কি অন্যায়। আয় তোকে আমি ষড়ৈশ্বর্য ভোগের উপায় বলে দেব। আয়, আয়।’

কালী কোমরবন্ধ থেকে ওর খঙ্গাটাকে খুলে হাতে তুলে নিল, শক্ত করে আঁকড়ে উঁচিয়ে ধরলো।

‘এতবড় আস্পর্ধা তোর?’ রাগে ফেটে পড়লো কাপালিক। ‘আমাকে অস্ত্র দেখাস?’

মুহূর্তে কালীর সামনে আবিভূত হলো ভয়ংকর এক পিশাচ। লম্বায় সাত হাত, কঙ্কালসার। ভাঁটার মতো চোখদুটো, বড় বড় নোংরা নখ হাতে। পুতিদুর্গন্ধময়, সারা শরীর থেকে পুঁজ গড়াচ্ছে। হাতদুটো বাড়িয়ে পিশাচ তেড়ে এলো ওর দিকে। বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে কালী খঙ্গা দিয়ে আক্রমণ করল পিশাচকে। খঙ্গোর এক আঘাতে দু-টুকরো হলো পিশাচ। অবাক কাণ্ড! যেমন করে একটা জলের বুদবুদ ভেঙে দুটো বুদবুদ হয়, এক পিশাচ ভেঙে দুটো পিশাচ হলো। দুজন মিলে আক্রমণ করলো কালীকে। আবার খঙ্গোর প্রহার। টুকরো হলো পিশাচদুটো, প্রতিটা টুকরো থেকে আরেকটা নতুন পিশাচের আবির্ভাব হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই পিশাচদের ভিড় জমে গেল কালীর সামনে। হতাশ কালী থমকে দাঁড়ালো কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপরই দুপা পিছু হটে নির্ভুল লক্ষ্যে হাতের খঙ্গা ছুঁড়ে মারলো কাপালিকের দিকে। খঙ্গোর স্পর্শমাত্রই কুয়াশার মতো অন্তর্হিত হলো কাপালিক, পঞ্চমুণ্ডির আসন। অন্তর্হিত হলো পিশাচের দল। কালী দেখল, বটগাছের নিচে

শারদীয়ার শুভ মুহূর্তে সকলকে জানাই প্রীতি,
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

With Best Compliments from :

C. S. SALES (INDIA) PVT. LTD.

18, Amratala Street, 1st Floor
Kolkata - 700 001

ধুনি জ্বলছে, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ও একা। কেউ কোথাও নেই। দূরে কোথাও কায়াহীন কেউ বুকফাটা স্বরে ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠলো— হা-আ-আ-আ...

ধুনি থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিলো কালী, বটগাছের গুঁড়ির শুকনোর একটা ফোকরে গুঁজে দিল সেটা। পটপট শব্দ জ্বলে উঠলো শুকনো কাণ্ড, ডালপালা। তীব্র এক আর্তনাদ ভেসে এলো ওপর থেকে। কালী দেখলো, অনেক উঁচুতে ঘন পাতার আড়াল থেকে উঁকি মারছে হেঁটমুণ্ডু একটা শরীর। সেই কাপালিক, গাছের ডালে পা আটকে উল্টে ঝুলছে।

'অ্যাই পাগলি?' চিৎকার করে উঠলো কাপালিক, 'করছিস কী?'

'অনেক রসিকতা হয়েছে, আর নয়।' জ্বলন্ত চ্যালাকাঠটাকে গাছের ফোকর থেকে টেনে বার করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো কালী, 'নীচে নেমে আসুন, কথা আছে।'

অসংখ্য পাখির কিচিরমিচিরের সঙ্গে জঙ্গলে ভোর হলো। বনের প্রান্তে তেপান্তরের মাঠে বটগাছতলায় আজ জনাত্রিশেক লোক জড়ো হয়েছে। তারমধ্যে একজন গতরাতের সেই কালালিক, তার নাম তারক। সেই প্রথম কথা বললো,

'মা, ব্যাপারটা বুঝে দ্যাখ। বাইরের লোকের প্রবেশ নিষেধ এই শক্তিপীঠে। তার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তাই এইভাবে জোর করে দেখা করার চেষ্টা করে ভালো করিসনি।'

'জোর না করলে কি দেখা করতেন আপনারা?'

'ও কথা থাক, 'সমবেত লোকেদের মধ্যে থেকে একজন বললো, 'এখন বলুন, আমাদের সঙ্গে দেখা করার কী এত জরুরি দরকার পড়লো?'

'বলছি', বললো কালী, 'তার আগে বলুন, বিগত দশ বছর ধরে মহিষাসুরের সঙ্গে আমাদের যে যুদ্ধ চলছে, সে বিষয়ে আপনারা কী জানেন?'

'এটুকু নিশ্চয়ই জানি', বললো আরেকজন, 'দুর্গা নামের ওই মেয়েটি পরপর দুবার মহিষাসুরকে পরাজিত করেছিল। প্রথমবার ব্রহ্মায়, দ্বিতীয়বার মধ্যভারতের মালভূমিতে। দুবারই মহিষ রক্ষা পায় রক্তবীজের সাহায্যে। রক্তবীজ নিজের প্রাণ দিয়ে মহিষের প্রাণ রক্ষা করেছিল। মহিষ তাই আজও অজেয়।'

'ঠিক ধরেছেন। তা, বলুন তো, তৃতীয়বারের আক্রমণেও কি দুর্গা সফল হবে?' প্রশ্ন করলো কালী।

'হবে না', বললো কাপালিক তারক, 'এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, যতদিন রক্তবীজ-প্রথা জীবিত আছে, ততদিন কারোর পক্ষেই মহিষাসুর-দমন সম্ভব হবে না।'

'আর ঠিক সেজন্যই আপনাদের কাছে আসা', বললো কালী।

'আমাদের কাছে কেন?'

'রক্তবীজকে পরাজিত করতে হলে আপনাদের সহায়তা প্রয়োজন। আপনারা ছাড়া আর কেউ এ কাজ করতে পারবে না।'

'সেটা কীভাবে?'

'বলছি', বললো কালী, 'তার আগে বলুন, রক্তবীজের জীবনীশক্তির রহস্য কী? অগণিত রক্তবীজকে হত্যা করেছি আমরা বারংবার। প্রতিবারই ওরা আরও বেশি সংখ্যায় ফিরে আসে। আপনাদের কি মনে হয়, কেন রক্তবীজের প্রতিটি রক্তবিন্দু ভূমিস্পর্শ করা মাত্র আরেকটি রক্তবীজ জন্ম নেয়?'

'এবিষয়ে আমাদের কোনো ধারণা নেই', বললো কাপালিক, 'কেনই বা থাকবে? আমরা লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে থেকে প্রকৃতির রহস্যের অনুসন্ধান করে বেড়াই। শহুরে রাজনীতি নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই।'

Best Compliments

from-

A
Well
Wisher

‘তাহলে আমি বলি’, বললো কালী, ‘অসুরদের শক্তির উৎস ওদের পরলোকে অন্ধ বিশ্বাস। অসুরদের বিশ্বাস, অসুধর্মে অবিশ্বাসী অর্থাৎ প্রকৃতিপূজকদের হত্যা করতে গিয়ে যদি ওরা প্রাণ দেয়, তবে মৃত্যুর পরে ওদের স্থান হবে এমন এক কল্পিত স্বর্গলোকে, যেখানে অনন্তকাল ধরে ওরা ইচ্ছামতো সুখভোগ করতে পারবে। অসু ধর্মগুরুরা পিশাচ স্বভাবের লোকেদের উপযোগী করে সে স্বর্গের বর্ণনা করে। এমন সব সুখের খুড়োর কল ঝুলিয়ে দেয়, যা শুধু পিশাচদেরই প্রলুব্ধ করে। যে অসুররা এসব কথা অন্ধের মতো বিশ্বাস করে ফেলে, তারাই হয়ে ওঠে রক্তবীজ।’

‘ঠিক বুঝলাম না’, বললো কাপালিক, ‘বিরোধীদের হত্যা করলেই অক্ষয় স্বর্গলাভ? এসব কথা ধর্মগুরুরা প্রচার করছে?’

‘ঠিক তাই’, বললো কালী, ‘এরা বলছে, প্রকৃতিপূজকদের হত্যা করলেই নিশ্চিত স্বর্গবাস হবে। এরা বিশ্বাস করে, অসুধর্মে অবিশ্বাসী কারোর সঙ্গে যুদ্ধে যদি এদের কারোর প্রাণ যায়, তবে সেই অসুরের প্রথম রক্তবিন্দু মাটিতে পড়ার মুহূর্তেই সে সেই সর্বসুখের উৎস পরলোকের দর্শন পাবে। স্বয়ং অসু তাকে অভ্যর্থনা করবে, দিব্যাঙ্গনা বারাঙ্গনাদের দিয়ে হাতেনাতে পুরস্কৃত করবে। পিশাচস্বভাব অর্ধশিক্ষিত অসুর পুরুষরা এইসব মনগড়া প্রতিশ্রুতি সত্যি বলে বিশ্বাস করছে। দলে দলে জড়ো হচ্ছে অনর্থক প্রাণ দিতে, মিথ্যে এক পরলোকের প্রতিশ্রুতিতে ভুলে। আর আমরা অসহায়ের মতো এসব দেখে যাচ্ছি। এতবড় মিথ্যে প্রতিশ্রুতি, অথচ সেটাকে মিথ্যে প্রমাণ করার কোনো উপায় নেই আমাদের কাছে। কারণ...’

‘কারণ’, বললো তারক, ‘মৃত্যুর পরে কী হয়, সেটা কেউ জানে না। মরণের ওপার থেকে কেউ তো আর ফিরে আসে না, নিজের অভিজ্ঞতা বলার জন্য কে বলবে, ওপারে স্বর্গ আছে, না নরক আছে, নাকি অন্য কিছু আছে।’

‘শুধু আপনারা ছাড়া’, ‘বললো কালী, ‘আর সেখানেই আপনাদের সাহায্য প্রয়োজন।’

‘তার মানে?’ ক্রুদ্ধ কঠিন স্বরে বললো তারক, ‘পরিষ্কার করে বল মেয়ে, আমাদের কাছ থেকে কী সাহায্য আশা করিস?’

‘এ-এ অসম্ভব’, জোরে মাথা নেড়ে বললো তারক, ‘না, না। এ আমরা করতে পারি না।’

‘কেন করতে পারেন না?’ বললো কালী, ‘এ বিদ্যা কি আপনাদের আয়ত্তের বাইরে?’

‘বলিস কি, আয়ত্তের বাইরে?’ ক্রুদ্ধস্বরে হুংকার দিয়ে উঠলো তারক, ‘এই ভূভারতে একমাত্র এই শক্তিপীঠেই এই বিশেষ বিদ্যাটির চর্চা ও গবেষণা হয়। এ বিষয়ে আমরা যতটা জানি, পৃথিবীর আর কেউ ততটা জানে না।’

‘তাহলে অসম্ভব বলছেন কেন’, বললো কালী।

‘অসম্ভব বলছি, কারণ গুরুপরম্পরায় আমাদের ওপর নিষেধ রয়েছে, শুধুমাত্র জ্ঞানচর্চা ভিন্ন এই বিদ্যার প্রয়োগ করতে পারি না আমরা। তাছাড়া, এই বিদ্যা ছেলেখেলার জন্য নয়। প্রয়োগের সামান্য ভুল সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে।’

‘ছেলেখেলা করতে আমি এতদূর আসিনি’, বললো কালী, ‘অন্য কোনো উপায় থাকতে এ অনুরোধ করতাম না। কিন্তু এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।’

‘দ্যাখ মেয়ে’, বললো তারক, ‘আগেই বলেছি, আমরা নিরালায় বিজ্ঞানচর্চা নিয়ে ব্যস্ত থাকি। মহিষ জিতলো, কী তোরা জিতলি, তাতে আমাদের কী আসে যায়? কেনই বা আমরা তোদের জেতাতে আমাদের গুরুর নিষেধ লঙ্ঘন করবো?’

‘হুঁঃ’, দুঃখের হাসি হাসলো কালী, ‘জানেন তো, আপনাদের কাছে যেটা নিরালায় বিজ্ঞানচর্চা, অসুরদের কাছে সেটা ব্যভিচার। মাত্র ছ-মাসের শাসনে ব্রহ্মার অধিকাংশ শক্তিপীঠ ধ্বংস করেছিল মহিষ। নির্বিচারে হত্যা করেছিল সেখানকার তপস্বী সাধকদের। সেখানকার যাবতীয় অর্জিত জ্ঞান আজ লুপ্ত। আর আজ সেই মহিষ আপনাদের দোরগোড়ায় উপস্থিত। এখান থেকে মাত্র একদিনের দূরত্বে ঘাঁটি গেড়েছে সে। পাহাড়ের ওপর নগর পত্তন করেছে। তার নজরে আপনারাও আছেন। যে কোনোদিন সে আক্রমণ করতে পারে এই পীঠস্থান। কী করবেন তখন? ওইসব সমবারি মায়া দেখিয়ে তাকে ভোলাতে পারবেন না। শুনেছি মায়ায় সেও সিদ্ধহস্ত। এই বটবৃক্ষের অস্তিত্ব সে নাও জানতে পারে, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। বটগাছ শুদ্ধ গোটা জঙ্গলটাকেই অগ্নি-সমর্পণ করবে মহিষ।’

‘আমাদের একটু ভাববার সময় দে মা’, কাপালিকের গলায় দ্বিধার সুর।

‘ভাবুন, ভাবুন’, বললো কালী, ‘শুধু এটুকু বলে রাখছি, বেশি সময় নেই হাতে। দীর্ঘকালব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরিণামে মহিষ আজ উত্তরাপথ থেকে বিতাড়িত হয়ে এই দুর্গম পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে বসে সে শক্তিসঞ্চয় করছে, রক্তবীজের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। খুব শিগগিরই সে নববলে

বলীয়ান হয়ে পুনরায় আমাদের আক্রমণ করবে। বহু বছর ধরে যুদ্ধ করে আমরা ক্লান্ত, বহুলাংশে হীনবল। যেদিন মহিষ আবার আক্রমণ করবে, সেদিন আমরা তাকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হতে পারি। তারপর কী হবে? তখন যেন হাত কামড়াবেন না, সময় ছিল, সুযোগ ছিল, শুধু সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি বলে এত প্রাচীন এক শক্তিপীঠ ধ্বংস হয়ে গেল!'

সূর্যদেব এইমাত্র অস্ত গেলেন সিন্ধুসাগরে। তাঁর সিঁদুরলেপা যাত্রাপথে এখনো একটু রঙের আভাস রয়ে গেছে। সিন্ধুসাগর ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালার মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে এই ধীবরপল্লী। সমুদ্রের ধার ধরে ছড়ানো গ্রামটা। গ্রামের ঠিক মাঝখানে মা আপার থান (আপা মনে অপঃ, জল, অর্থাৎ বরুণী)। আজ নিকটবর্তী জঙ্গল থেকে কাঠকুটো জড়ো করা হয়েছে দেবতার থানের সামনে। ধীবরপল্লীর সবাই কাজ সেরে একে একে এসে জড়ো হচ্ছে সেখানে। আজ পূর্ণিমা, সহভোজের দিন। আগুনের ধারে অনেক রাত পর্যন্ত নাচগান হবে। তালগাছের রস সংগ্রহ করে আসব তৈরি হয়েছে গত একমাস ধরে, এই দিনটার জন্য। ভর্জিত মৎস্যাণ্ড সহযোগে সেই আসব পান করবে সবাই। এই সামান্য আনন্দটুকুর আশায়ই তো এ গ্রামের জেলেরা হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে প্রতিদিন।

দুটো চকমকি পাথর পরস্পর ঠুকে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করছিল গ্রামপ্রধান চুচুক। সবেমাত্র আগুন ধরেছে, এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে সেখানে এসে হাজির হলো গ্রামের এক যুবক।

'হুলা যে, কী ব্যাপার?' বললো চুচুক, 'এত হন্তদন্ত হয়ে কোত্থেকে আসছিস?'

'খারাপ খবর আছে মোড়ল', বললো সেই যুবক, 'অসুররা আমাদের গ্রাম আক্রমণ করতে আসছে।'

'তুই জানলি কী করে?' চুচুক অবাক।

'আমি উত্তরের জঙ্গলে গেছিলাম, চন্দনকাঠের সন্ধানে। কাঠ কেটে ফিরছিলাম। দেখি এক জায়গায় পথের ধারে অনেক অসুর-সৈন্য বিশ্রাম করছে। আড়ি পেতে শুনলাম ওদের কথাবার্তা। ওরা এই তল্লাটের সব জেলেদের জবরদস্তি অসুধর্মে দীক্ষা দেবে ঠিক করেছে। আমাদের গ্রাম ওদের ঘাঁটি থেকে সবচেয়ে কাছে। ওদের সেই নতুন শহর থেকে রাস্তাটা তো উত্তরের জঙ্গল হয়ে সোজা এই গ্রামেই এসেছে। তাই প্রথম কোপ আমাদেরই ওপর পড়বে।'

স্তম্ভিত চুচুকের হাত থেকে চকমকি পাথরদুটো পড়ে গেল।

'এখন কী হবে মোড়ল?' বললো হুলা।

'ওরা সংখ্যায় কত?' চুচুক জিজ্ঞেস করল।

'আন্দাজ পাঁচশো। বেশিও হতে পারে।'

মনের মধ্যে দ্রুত পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে নিল চুচুক। গ্রামে জনাচল্লিশেক জেলের বাস। তার মধ্যে বুড়োবুড়ি আছে, বাচ্চাকাচ্চা আছে। এরা কী করে পাঁচশো সেনার মোকাবিলা করবে?

'লড়াই করে অসুরদের সঙ্গে জেতা যাবে না', বললো চুচুক, 'তাই মাত্র দুটো রাস্তা খোলা আছে আমাদের জন্য। এক, আত্মসমর্পণ। তার মানে, আমাদের পরম্পরা সব ভুলে গিয়ে ওদের নিয়ম মেনে চলা, ওদের ঠাকুরকে পুজো করা।'

অসম্ভব!' চিৎকার করে উঠলো গ্রামের মেয়েরা, 'মা আপা ছাড়া আর কারোর পুজো করবো না আমরা। যুগ যুগ ধরে মা আপা সমুদ্রের ঝড়ে আমাদের রক্ষা করেছেন। মাছ জুগিয়েছেন, তাল আর নারকেল জুগিয়েছেন। আজ বিপদের মুখে তাঁকে ভুলে যাবো? কখনো নয়। তার বদলে মরে যাওয়াও ভালো।'

'তাহলে আরেকটাই পথ রয়েছে', বললো চুচুক, 'পালাতে হবে।'

'কোথায় পালাবো?', বললো একজন বৃদ্ধ।

'হাতে কতটা সময় আছে?' চুচুক প্রশ্ন করল হুলাকে।

'এক প্রহরের বেশি নয়। চন্দনের জঙ্গলের যেখানটায় ওরা বিশ্রাম নিচ্ছে, সেই জায়গাটা এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়।'

'তার মানে সবাইকে একসঙ্গে পালাতে হবে। জঙ্গলে পালিয়ে লাভ নেই, ওরা ধরে ফেলবে। পালাতে হবে সমুদ্রে। অথচ সবাইকে নেওয়ার মতো যথেষ্ট সংখ্যায় নৌকো নেই আমাদের কাছে।'

আঙ্গুল উঁচিয়ে হুলা পশ্চিমে অনতিদূরে জলের ওপর মাথা উঁচিয়ে থাকা ডুবোপাহাড়টার দিকে ইঙ্গিত করল, 'যদি আমরা ওই জলটুঙ্গিটাতে গিয়ে লুকিয়ে থাকি? এখান থেকে ওখানে যেতে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না। তিনবার এপার-ওপার করলেই সবাইকে পৌঁছে দেওয়া যাবে।'

'যদি ওরা জানতে পারে, আমরা ওখানে লুকিয়ে আছি?'

'জানতে পারলেও নৌকো জোগাড় করে ওখানে পৌঁছানো সহজ হবে না। ততক্ষণে অন্য কোনো একটা উপায় ভাবা যাবে।'

'ঠিক আছে, তবে তাই হোক।' বললো চুচুক।

দেখতে দেখতে সবাই নৌকো নিয়ে ভেসে পড়ল সমুদ্রে। সঙ্গে দেবীর সিঁদুরলেপা মূর্তি ও সামান্য কিছু খাবারদাবার। পেছনে পড়ে রইল গ্রাম, খালি দেবস্থান। পড়ে রইল পূর্ণিমার উৎসব, খেটেখাওয়া জেলেদের একটা রাত আনন্দ করার সাধ। সাগরপাড়ের দেবস্থানের সামনে জ্বালানো উৎসবাগ্নি তবু জ্বলতেই থাকলো।

জঙ্গলের মাথা ছাড়িয়ে গোল রুপোলি থালার মতো মস্তবড় একটা চাঁদ দেখা দিল আকাশে। গা থেকে তার টপটপ করে রুপো ঝরে পড়ছে। চাঁদের গুঁড়ো ভাসছে সাগরের শ্যাওলা সবুজ ঢেউতে। মায়াবী সেই রাতে মূর্তিমান দুঃস্বপ্নের মতো অসুরের দল এসে পড়লো সমুদ্রতীরে।

এত নিরালা কেন? গ্রামের লোকেরা হৈচৈ চিৎকার কান্নাকাটি করছে না কেন? সবাই কি ঘরে খিল তুলে দিয়ে লুকিয়ে বসে আছে? রক্তবীজের নির্দেশে গ্রামে আগুন লাগিয়ে দিল অসুরবাহিনী। প্রতিটা কুটিরে ঢুকে বাসিন্দাদের টেনে বার করতে অনেক সময় লাগবে, তার চেয়ে এই ভালো। আগুনের জ্বালায় নিজেরাই বাপ-মা বলে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসবে।

অর্ধদণ্ড পার হয়ে গেল। অবাক হয়ে রক্তবীজ দেখলো, জ্বলন্ত গ্রাম থেকে কেউ বেরিয়ে এলো না। তবে কি সবাই আগেভাগেই পালিয়ে গেছে? রাগে হতাশায় চিৎকার করে উঠলো রক্তবীজ।

'এত তাড়াতাড়ি কী করে উধাও হয়ে গেল এতগুলো লোক? এ কি জাদু নাকি?'

'নিশ্চয়ই ওরা জঙ্গলে পালিয়েছে।' বললো এক পার্শ্বচর, 'আমরা এসেছি উত্তরদিক থেকে, তার মানে ওরা দক্ষিণদিকের জঙ্গলে ঢুকেছে।'

'ঠিক বলেছো, তাই হবে', বললো রক্তবীজ, 'অ্যাই, চলো সবাই। লোকগুলোকে ছেড়ে দিলে চলবে না। প্রত্যেকটাকে ধরতে হবে। মেয়ে-বুড়ো বাচ্চা কাউকে বাদ দিলে চলবে না। এটা মহিষাসুরের সম্মানের প্রশ্ন।'

জ্বলন্ত গ্রাম ছেড়ে অসুরসেনা দৌড়লো দক্ষিণের জঙ্গলের দিকে। এদিককার পথঘাট জলজঙ্গল অনেকটাই উত্তরাপথ থেকে আসা অসুরদের অচেনা। উত্তরের চন্দনের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে প্রশস্ত পথ আছে, কিন্তু দক্ষিণের জঙ্গলের মধ্যে কোনো পথ নেই, সেটা ওদের জানা ছিল না। নিজেদের অজান্তেই অসুররা পা বাড়ালো মরণের ফাঁদে। দক্ষিণের ঘন জঙ্গল, অজস্র নাম না-জানা গাছ সেখানে এঁকেবেঁকে আকাশের দিকে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সে গাছেদের ব্যূহ ভেদ করে দেখা যায় না ওদিকে কী আছে। পথ চলা যায় না, পা জড়িয়ে যায় বুনো লতায়। একেক জায়গায় দুটো গাছের মঝে একটা মানুষ গলে যাবার মতো যথেষ্ট পরিসর নেই। সেখানে ঘন অন্ধকারের মধ্যে যেন ভোজের বাজি শুরু হলো। নিঃশব্দে এক এক করে অসুররা অদৃশ্য হতে লাগলো। প্রায় একদণ্ড পথ চলার পর রক্তবীজ খেয়াল করলো, এখনো একটাও গ্রামবাসীর দেখা পাওয়া যায়নি। আর তখুনি মশালের আলোয় দেখতে পেল, সামনে একটা লোকের মৃতদেহ পড়ে আছে।

কে ওটা? কোনো জেলে ব্যাটা নিশ্চয়ই। পালাতে গিয়ে পিছলে পড়ে কী সাপের কামড়ে মরেছে!

কাছে গিয়ে মশালটা উঁচিয়ে ধরল রক্তবীজ। মেরুদণ্ড দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। জেলে তো নয়, মৃতদেহটা ওরই সঙ্গী একজন অসুরসেনানীর। একটু আগেও তো লোকটা জ্যান্ত ছিল। আর এখন? কে যেন অসীম শক্তিতে লোকটার ঘাড় মুচড়ে ভেঙে দেহটা অবহেলায় ফেলে রেখে গেছে। চারপাশে তাকিয়ে দেখলো রক্তবীজ। যাত্রা শুরু হয়েছিল পাঁচশো অসুর নিয়ে। এখন ওর সঙ্গে মাত্র জনা পঁচিশেক রয়েছে। বাকিরা কোথায় গেল? জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছে? নাকি ভূতপ্রেত ঘাড় মটকে খেয়ে ফেলেছে ওদের?

'এই, শোনো সবাই' হেঁকে বললো রক্তবীজ, 'আর জঙ্গলের মধ্যে খুঁজে লাভ নেই। ওই গ্রামটাতে ফিরে চলো। আর শোনো, সবাই পথ খুব সাবধানে চলবে। কিছু একটা গোলমাল রয়েছে এখানে।'

রক্তবীজের সাবধানবাণীতে খুব একটা লাভ হলো না। অন্ধকারের ভোজবাজি চলতেই থাকলো। আরও এক প্রহর পরে রক্তবীজ যখন বহ্নিমান গ্রামে ঢুকলো, তখন ওর সঙ্গে মাত্র দু'জন। বাকি সবাই উধাও হয়েছে।

গ্রামে ঢুকতেই বন্দি হলো রক্তবীজ ও তার দুই সঙ্গী। যারা ওদের বন্দি করলো, তারা রক্তবীজের অচেনা নয়। কোনো

AVIMA EXPORTS (P) LTD.

Exporters of Quality Jute Goods & Rice

91A/1, Park Street, Office No - 2
Kolkata-700 016
Phone : 40050050 / 51
Fax : 2243 2659, 40050071
e-mail : info@juteonline.com

With Best Compliments From-

S. K. KAMANI

অসুরসেনারই অপরিচিত নয় এরা। এরা হলো চামুণ্ডাবাহিনী। সম্পূর্ণরূপে নারীযোদ্ধাদের নিয়ে সংগঠিত এক সুশৃঙ্খল ভয়ংকর রণচণ্ডী বাহিনী। গত দশ বছরে এদের হাতে নাস্তানাবুদ হয়েছে অসুরসেনা।

চামুণ্ডাবাহিনীর সেনানীরা রক্তবীজ ও তার সঙ্গীদের হাজির করলো তাদের দলনেত্রীর সামনে। রক্তবীজ ভালো করে তাকিয়ে দেখল সেই নেত্রীর দিকে। সদ্যযুবতী, দীর্ঘদেহিনী। অমামান্য সুন্দর মুখমণ্ডল। একঢাল কালো কোঁকড়া চুল পিঠ গড়িয়ে নেমেছে। যেন কালো পাথর কুদে বানানো শরীর, চিতাবাঘের মতো ঋজু ও সবল। পরনের কালো পোশাক শরীরের সঙ্গে মিশে গেছে। গলায় সদ্যোমৃত অসুরদের মুণ্ডমালা। ঠোঁটের কশ গড়িয়ে রক্তের ধারা নামছে। হাতে রক্তমাখা খড়্গ।

'কে তুমি?' প্রশ্ন করলো রক্তবীজ।

'কালী।'

কালী! নামটা শুনেই রক্তবীজের হাত-পা কাঁপতে শুরু করলো। দানবদের কাছে অপরিচিত নয় নামটা। তবু জোর করে মনে সাহস এনে বললো,

'আমাদের মেরে তোমার কোনো লাভ হবে না। আমাদের মৃত্যুর খবর শুনে আরও অনেক অসুর প্রাণ দিতে এগিয়ে আসবে। আমরা রক্তবীজ।'

'ঠিক সেজন্যই তোমাকে এখানে টেনে এনেছি', বললো দলনেত্রী।

'তার মানে?' অবাক হলো রক্তবীজ। এরকম একটা কথা ও প্রত্যাশা করেনি।

'শোনো তবে, কেন তোমাকে বন্দি করেছি। আচ্ছা, এই যে তোমাদের একজন মরলে আরেকজন জন্মায়, সেটা তো এই আশা থেকেই, যে আমাদের সঙ্গে লড়াই করে মরলে তোমরা তৎক্ষণাৎ স্বর্গে যাবে। তাই না?'

'হ্যাঁ', বললো রক্তবীজ, 'আজ যদি তুমি আমাকে হত্যা করো, তাহলে আমার শরীরের প্রথম রক্তবিন্দু মাটি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি স্বর্গ দেখতে পাবো। সেখানে পরমপিতা অসু আমার জন্য...'

'হয়েছে হয়েছে', বাধা দিল কালী, 'আর বর্ণনা দরকার নেই। তা, এসব কথা তোমরা সবাই বিশ্বাস করো তো?'

'নিশ্চয়ই', বললো রক্তবীজ, 'এটা হলো প্রতিটি অসুরের কাছে আমাদের পরমপিতা অসু-র অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকার আমাদের অসুধর্মের মূল ভিত্তি।'

'বাঃ, খুব ভালো', বললো কালী, 'এসো, আজ তোমাদের বিশ্বাসের এই ভিত্তিটাকে একটু ঘেঁটি ধরে নাড়িয়ে দেওয়া যাক। তোমার এই দুই সঙ্গী তার সাক্ষী থাকবে। এই নাও, তোমার অস্ত্র তুলে নাও।'

এক পা এগিয়ে এসে মাটি থেকে তরবারি কুড়িয়ে হাতে তুলে নিল রক্তবীজ। হুংকার দিয়ে লাফিয়ে পড়লো কালীর ওপর। কালী অবলীলাক্রমে এক পা পাশে সরে গিয়ে সেই আক্রমণ এড়িয়ে গেল। রক্তবীজকে সামলানোর সুযোগ না দিয়ে পদাঘাতে ভূলুণ্ঠিত করলো তাকে। ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালো রক্তবীজ। কালীর সঙ্গে রক্তবীজের এক ভয়ংকর দ্বৈরথ শুরু হলো।

ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরোলো, সে রক্তে ভিজে গেল মাটি। হাত দিয়ে কণ্ঠা চেপে ধরে খানিকক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো রক্তবীজ। বারকতক কেঁপে উঠলো, তারপর নিথর হয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়লো। নিজের কাপড়ে রক্ত মুছে হাতের খড়্গ কোমরবন্ধে বন্দি করলো কালী।

'কী মনে হয়, তোমাদের সর্দার কী এতক্ষণে স্বর্গে পৌঁছেছে?' কালী প্রশ্ন করলো রক্তবীজের সঙ্গীদের।

'নিশ্চয়ই', রাগে টগবগ করে ফুটতে ফুটতে এক সঙ্গী বললো, 'ওর রক্ত মাটিতে পড়েছে, তার মানে ও স্বর্গে পৌঁছে গেছে। এবার দেখবে, ওর স্বার্গারোহণে উদ্বুদ্ধ হয়ে আরও কত রক্তবীজ জন্মায়।'

'আর সেটাই তোমাদের মূল বিশ্বাস, তাই তো?'

'নিশ্চয়ই'।

'এক কাজ করো। ওর হৃদস্পন্দন, ওর নাড়ি পরীক্ষা করে দেখো, ও সত্যিই মরেছে কিনা। কোনো সন্দেহের অবকাশ রাখার দরকার কী?'

রক্তবীজের দুই সঙ্গী অবাক হয়ে কালীর দিকে তাকালো। ব্যাপারটা কী ঘটেছে? মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

'কী হলো!', ধমক দিল কালী, 'যা বলছি, তাড়াতাড়ি করো।'

ওরা দুজন গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে এসে হাঁটুগেড়ে বসলো রক্তবীজের দেহের পাশে। নাড়ি ও হৃদস্পন্দন পরীক্ষা করে দুজনেই মাথা নাড়লো।

চমৎকার! ভালো করে দেখেশুনে নিয়েছ, পরে কিন্তু বলবে না এসব মায়া।' বললে কালী, 'এবার তোমাদের আজগুবি বিশ্বাসটা সত্যি না মিথ্যা, সেটা যাচাই করে নেওয়া যাক। এখন সরো এখান থেকে, দূরে গিয়ে বসো।'

রক্তবীজের সঙ্গীরা সরে যেতেই যেন মন্ত্রবলে অন্ধকারের মধ্যে থেকে আবির্ভূত হল কাপালিক তারক। দ্রুত রক্তবীজের ক্ষতস্থান ঔষধি পট্টি দিয়ে বেঁধে ফেললো। পায়ের দুটো বুড়ো আঙুল বেঁধে ফেললো একসঙ্গে। রক্তবীজের পরনের সব বস্ত্র ছিঁড়ে ফেলে দিল, সারা শরীর বিশেষ এক ভেষজের প্রলেপ দিয়ে ঢেকে দিল। ঠোঁট ফাঁক করে মুখের মধ্যে ঢেলে দিল দুর্গন্ধময় এক আরক। শুরু হলো নানান তান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও তার সঙ্গে উচ্চস্বরে মন্ত্রোচ্চরণ। প্রায় দু'দণ্ড পর মন্ত্রোচ্চারণের ছন্দে রক্তবীজের মৃতদেহে কম্পন জাগলো। রুদ্ধশ্বাসে আরও কয়েকটি পল পার হয়ে গেল। রক্তবীজের মৃতদেহ হঠাৎ চোখ খুললো।

'এ-এ-এ অসম্ভব!' আতঙ্কে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো রক্তবীজের সঙ্গীরা।

'ভয় পাওয়ার কিছু নেই', বললো কালী, 'তান্ত্রিক পদ্ধতিতে মৃত্যুর পর অর্ধদিবস পর্যন্ত মৃতকে জীবিত করা যায়। যাও, দেখো ওর হৃদপিণ্ড চলছে কিনা, ওর নাড়ি সচল কিনা। তারপর ওকে জিজ্ঞেস করো, মৃত্যুর পর ও কোথায় গিয়েছিল। কথামতো ওর শরীরের প্রথম রক্তবিন্দু মার্টি স্পর্শ করামাত্র ও স্বর্গ দেখতে পেয়েছিল কিনা। সেখানে অসুপিতার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কিনা। স্বর্গের এতসব সুখভোগ ছেড়ে ফিরেই বা এল কেন ও। সবকিছু খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করো ওকে।'

হতভম্ব দুই অসুর রক্তবীজের পাশে গিয়ে বসল। রক্তবীজ ততক্ষণে উঠে বসেছে। ফিসফিস করে কথাবার্তা শুরু করলো ওরা। তিনজনেরই বিশ্বাসের ভিত্তি নড়ে গেছে আজ।

'মনে রেখো, আজ যা দেখলে জানলে, তা সবাইকে বলে বেড়াবে', বললো কালী, 'নাহলে কিন্তু আমি আবার ফিরে আসবো।'

কিংকর্তব্যবিমূঢ় তিন অসুরকে পেছনে ফেলে রেখে কালী অন্তর্হিত হলো জঙ্গলে। সঙ্গে কাপালিক তারক ও শক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা। সেদিন থেকেই এরকম চোরাগোপ্তা আক্রমণ শুরু হলো অসুরদের ওপর। মেরে ফেলা, বাঁচিয়ে তোলা। তার সঙ্গেই, ইতিহাসে প্রথমবার রক্তবীজদের সংখ্যা কমতে শুরু করলো।

স্বর্গ নেই? অসু সেখানে আমাদের পুরস্কৃত করার জন্য পরীক্ষা করছে না? তাহলে অসুবাদ প্রতিষ্ঠাকল্পে এই যে এত

পাপ করেছি সারা জীবনভর, তার কী হবে? রক্তবীজদের অনেকেই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পাগল হলো, অনেকে আত্মহত্যাও করলো। কেউ বা অসুবাদ ও অসুরদের সব সংশ্রব ছেড়ে ঘোর সংসারী হয়ে পড়লো। কেউ বা আবার ধর্মত্যাগের অপরাধে অন্য অসুরদের হাতে খুন হলো। কিছু রক্তবীজ জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজতে খুঁজতে ফিরে এলো কালীর কাছে।

'মা', বললো রক্তবীজের দল, 'আমাদের রক্ষা করো। স্বর্গের লোভে সারাজীবন অগণিত পাপ করেছি। কর্মফলের চিন্তা আমাদের দিনরাত তাড়া করে বেড়াচ্ছে। কী করে এর থেকে মুক্তি পাবো?'

'মুক্তির একটাই উপায়', বললো কালী, 'প্রায়শ্চিত্ত'।

'কী করে প্রায়শ্চিত্ত করবো, বলে দাও মা।'

'যেসব গালগল্প লোকেদের শিখিয়েছো, যেসবের জন্য এত অশান্তি, সেগুলোকে ভোলাতে হবে।'

'সেটা কীভাবে সম্ভব? যদি আমরা অসুরদের মধ্যে ফিরে যাই, অসুধর্মের বিশ্বাসগুলোর বিরুদ্ধে কথা বলি, তবে সেই মুহূর্তেই ওরা আমাদের হত্যা করবে। অসুরদের সেটাই রীতি।'

'বলবার দরকার তো নেই যে, তোমরা অসুধর্ম ত্যাগ করেছো। শুধু বলবে, যে অসু সেই ঈশ্বর, দুই-ই সমান। বলবে, প্রাকৃতিক শক্তিগুলো সবাই সেই সর্বশক্তিমান অসুর বিভিন্ন রূপ, তাই তাদের অসুজ্ঞানে ভক্তি করতে হয়। আর এটা তো মিথ্যে কথা নয়। কশ্যপপুত্র আদিত্যর তো এটাই বক্তব্য ছিল। অসুরদের বলবে, অসুবাদী ও প্রকৃতি-উপাসকদের মধ্যে বিভেদ না করতে। পরকালের ওইসব গল্পগুলো যে মিথ্যে, সেটা জোর দিয়ে বলবে। কেউ না মানলে আমি আসবো তাকে বোঝাতে। ওদের বলবে, প্রকৃতিপূজক পূর্বজদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে। আর বলবে, সামাজিক উৎসবগুলোতে যেন উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে সবাই। মেয়েদের অসম্মান করা, তাদের ওপর খবরদারি যেন বন্ধ হয়। তারা তাদের যা ইচ্ছে তাই করবে, ধর্মের নামে তাদের ওপর নিজেদের ইচ্ছে চাপিয়ে দেওয়া চলবে না। প্রকৃতিনির্ভর শিল্প-সাহিত্য নান্দনিকতার চর্চা যেন নতুন করে শুরু হয়। প্রকৃতিকে, এই ভূমিমাতাকে, এই মাতৃভূমিকে মাতৃজ্ঞানে ভক্তি করা শেখাবে অসুরদের। অসুবাদী বলেই অন্যরকম নাম রাখতে হবে, এমন তো কোনো মানে নেই। সবাই যেন নিজের সন্তানের নাম রাখে স্বীয় অঞ্চলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে। পোশাক-আশাক গৃহসজ্জায় স্বাতন্ত্র্য রাখার চেষ্টা বন্ধ করতে হবে। অবিলম্বে লেগে পড়ো, এই বাণী প্রচার করো অসুরদের মধ্যে। ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ ভূভাগ, জনগোষ্ঠীর বিশাল অংশ আজ কেমন যেন অচেনা হয়ে গেছে। তাদের ভারতবর্ষে ফিরিয়ে আনতে হবে। এটা তোমাদের দায়িত্ব। অর্থের অভাব তোমাদের কাজে বাধা হবে না। আগে মহিষাসুর তোমাদের ভরণপোষণ চালাতো, এখন তোমাদের ভরণপোষণ চালাবে আমার বন্ধু কমলা। নিশ্চিন্তমনে কাজে লেগে পড়ো। দেশের যে ক্ষতি করেছ, যত দ্রুত সম্ভব তা পূরণ করো। মনে রেখো, আমি কিন্তু সর্বক্ষণ তোমাদের ওপর নজর রাখছি।'

পরবর্তী বছরগুলো মহিষের জন্য মোটেই ভালো কাটল না। বিশ্বাসীদের খুনোখুনিকে পুরস্কৃত করার জন্য মরণের ওপারে অসু প্রতীক্ষা করছেন, এই স্থির বিশ্বাস দিকে দিকে ভেঙে পড়তে লাগলো। নতুন করে দানববাহিনীতে আর কেউ যোগ দিতে আসে না। এর সঙ্গেই, আরামপ্রিয় স্থানু ক্ষয়িষ্ণু রাজশক্তিগুলোকে সরিয়ে দিয়ে ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে নবীন রাজশক্তি রাজনীতির পরিসর দখল করলো। ভূমি থেকে উদ্গত নবীন এই রাজশক্তি প্রথম সুযোগেই মহিষাসুরের প্রাধান্য অস্বীকার করলো। মহিষের রাজকর আদায়ে ঘাটতি দেখা দিল। খণ্ডযুদ্ধের সংখ্যা আরও বেড়ে গেল। কিন্তু এবার দানবদের পিছু হটার পালা। বাড়তে লাগলো দানববাহিনীতে পলাতকের সংখ্যা। দানব প্রাধান্য সঙ্কুচিত হতে হতে শেষমেশ মহীশূরের আশপাশেই শুধু রয়ে গেল। দুর্গা বুঝলো, অন্তিম প্রহারের সময় সমাপন্ন।

বর্ষাকাল, ভারতবর্ষে যুদ্ধযাত্রার জন্য উপযুক্ত সময় নয়। বৃষ্টিতে রাস্তা ভেসে যায়, চলাচলের অযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়। বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে সৈন্য রসদ বাহন শকট সবকিছুকেই। তাই বর্ষার সময় সব নৃপতিরাই দুর্গে নিজেদের অবরুদ্ধ করে ফেলে। বিশ্রাম নেয়, প্রস্তুতি নেয় পরবর্তী যুদ্ধের জন্য। ঠিক এই সুযোগটাই নিল দুর্গা। ভরা বাদলে সবার নজর এড়িয়ে সম্পূর্ণ সেনাবাহিনী জড়ো হলো গঙ্গানগরে। সেখান থেকে দুই হস্তীবাহিনী মিলিত হয়ে রওনা হলো দক্ষিণের পথে। বাকিরা পৌঁছলো ব্রঙ্গার সমুদ্রবন্দরে। ইতিমধ্যে ব্রঙ্গার সবকটি রণতরী এসে জড়ো হয়েছিল বন্দরে। সঙ্গে যোগ দিল কমলার বাণিজ্যপোতগুলো। সেনাবাহিনী, রসদ, অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়া— সবকিছু তোলা হলো জাহাজগুলোতে। মাঝখানে বাণিজ্যপোত, তাদের ঘিরে রাখলো রণতরী— মণ্ডলব্যূহ রচনা করে

Saraogi

Saraogi Udyog Private Limited

Importer & Merchants for Coal and Coke

21, Hemant Basu Sarani "Centre Point" Suit No. 212
2nd Floor, Kolkata - 700 001
Fax : +91-33-22435334, +91-33-22138782
Phone : +91-33-22481333 / 0674, +91-33-2213 8779/80/81
Email : saraogiudyog@eth.net
www.saraogiudyog.com

With Best Compliments From

A Well Wisher

S. N, Kejriwal

ব্রহ্মাসাগরে পাড়ি দিল জাহাজগুলো। উপকূল ধরে জাহাজ চালিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই পৌঁছে গেল কাবেরী নদীর মোহনায়। সেখানে ব্যূহের পরিবর্তন হলো। সূচিব্যূহ রচনা করে নৌবাহিনী প্রবেশ করলো কাবেরী নদীতে। খরস্রোতা কাবেরীর উজান বেয়ে শেষমেশ পৌঁছলো মহাবলাচল পাহাড়ের সন্নিকটে। হস্তিবাহিনী ততদিনে পৌঁছে গেছে সেখানে। বর্ষাকাল শেষ হয়েছে। পরদিন সকালে সমগ্র বাহিনী পূর্বজদের উদ্দেশ্যে স্মৃতিতর্পণ করলো কাবেরীর জলে। শেষবিদায় চেয়ে নিল পূর্বজদের কাছ থেকে। মহাবলাচল পাহাড়ের দু-দিকে রয়েছে কাবেরী ও তার শাখানদী। নদীর অপর পাড়ে দেবতাদের পদাতিক বাহিনীদের মোতায়েন করলো দুর্গা। যে দুদিকে নদীর বেষ্টনী নেই, সেই দুদিকে দুই হস্তীবাহিনী মোতায়েন হলো। মহীশূরকে চারদিক থেকে অবরুদ্ধ করে দুর্গা যুদ্ধ ঘোষণা করলো।

শরৎ হেমন্ত পেরিয়ে শীতকাল এলো। সঙ্গে আবার নামলো বর্ষা। দুর্গ ছেড়ে বেরোনোর নাম নেই মহিষের। আর কতকাল এভাবে খোলা আকাশের তলায় দিন কাটবে? অস্থির হয়ে উঠলো দুর্গার সেনাদল। মরিয়া হয়ে কয়েকবার ঝটিকা আক্রমণ চালালো মহীশূরে দুর্গের ওপর। প্রতিবারই দুর্গপ্রাকারের উঁচু দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে নিরস্ত হতে হলো। ত্রিস্তরীয় দুর্গের প্রথম স্তরও ভেদ করা গেল না। এই দুর্গ কি সত্যিই অভেদ্য?

'নিঃসন্দেহে', বললো ভৈরবী। দুর্গপ্রাকার ভেদ করতে প্রতিটি প্রচেষ্টারই নেতৃত্ব দিয়েছিল ও। হতাশা ওরই সবচেয়ে বেশি।

'বিস্ফোরক দিয়ে দুর্গপ্রাকার ভাঙা যায় না?' মাতঙ্গী প্রশ্ন করলো ধূমাবতীকে।

'নাঃ', বললো ধূমাবতী, 'যেই বানিয়ে থাকুক, বাইরের পাঁচিলগুলো বানিয়েছে জব্বর। এদিক থেকে ভাঙা যাবে না। ভেতরদিক থেকে চেষ্টা করলে হলেও হতে পারে।'

'কে যাবে ভেতরে?' বললো মাতঙ্গী।

'আমি যেতে পারি', বললো ভুবনেশ্বরী, 'গরুড়পক্ষীতে চড়ে প্রাকারের উল্টোদিকে নামতে পারি।'

'মনে হয় এই দুর্গের স্থপতি সেই সম্ভাবনাটাও ভেবে রেখেছে', বললো ভৈরবী, 'প্রতিটি প্রাচীরের ঘাড়ের ওপর প্রহরাকক্ষ বানিয়ে রেখেছে। দানবরা উড়ন্ত গরুড়পক্ষী সহ তোমাকে চাঁদমারি করে ফেলবে, জ্যান্ত মাটিতে নামতে দেবে না।'

'তাহলে কী করা যায়?' বললো দুর্গা।

'যদি জোরদার একটা ভূমিকম্প হতো এখানে, তাহলে খুব ভালো হতো', বললো কালী।

'কেন?' হঠাৎ যেন নিজের মস্তিষ্কের মধ্যে আলোর এক ঝলকানি দেখতে পেল দুর্গা, 'একথা কেন বললে?'

'দেখতে পাচ্ছো না', দূরে মহাবলাচল পাহাড়ের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললো কালী, 'কতটা খাড়াই পাহাড়? তার ওপর বর্ষায় ভিজে পাথরগুলো নিশ্চয়ই আলগা হয়ে আছে। যদি ভূমিকম্প হয়, পাহাড় গড়িয়ে পাথরের ঢল নামবে। তাতে বাইরের প্রাকারের কিছুটা অংশ নিশ্চয়ই ভেঙে পড়বে। কিন্তু এসব ভেবে কী হবে? ভূমিকম্প কী আর আমাদের ইচ্ছেমতো হবে?'

'কেন হবে না?' বললো দুর্গা, 'ধূমাবতী, তোমার কী মতামত? ইচ্ছেমতো ভূমিকম্প ঘটানো যায় না কি?'

'কেন যায় না বাছা?' বললো ধূমাবতী, 'পাহাড়ের নীচে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে ঠিক ঠিক জায়গায় বিস্ফোরক পুঁতে ফেলতে হবে। সেইসব বিস্ফোরক একসঙ্গে ফাটলে ভূগর্ভে এক আলোড়ন সৃষ্টি হবে। তাতে যে পাথরের স্তরের ওপর পাহাড়টা দাঁড়িয়ে আছে, সেটা নড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।'

'তাহলে ধূমাবতী', বললো দুর্গা, 'সেই চেষ্টাই করা যাক।'

'নিশ্চয়ই করবো বাছা', বললো ধূমাবতী, 'খুব মজার ব্যাপার হবে। কৃত্রিম ভূমিকম্প, পুঁথিপত্রে পড়লেও কখনো দেখিনি। তবে একটু সময় লাগবে। জরিপ করতে হবে জায়গাটা। তাছাড়া এই উল্টো বর্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিস্ফোরক নিয়ে কাজ করা যাবে না।'

'সময় লাগে লাগুক', বললো দুর্গা, 'তুমি কাজে লেগে পড়ো।'

শীত গড়িয়ে বসন্ত এলো। ফুলের বান ডাকলো কাবেরী নদীর দুই তীরে। কদম্বফুলের মিষ্টি গন্ধে মাতোয়ারা রাতের আকাশ। আজ আকাশে চাঁদ নেই। অনন্ত অন্ধকারে ডুবে আছে মহাবলাচল পর্বত। অধীর পদক্ষেপে পায়চারি করছিল দুর্গা। রুদ্রকে এদিকেই আসতে দেখে থমকে দাঁড়ালো।

'সময় তো হয়ে এলো। তাই না?' বললো রুদ্র।

'হ্যাঁ', বললো দুর্গা। অনুভব করলো, গলা শুকিয়ে আসছে ওর।

'দুর্গা', খুব কাছে এসে ডাকলো রুদ্র। আজ রুদ্রর স্বরে অচেনা এক আর্দ্রতা।

'বলো', কম্পিতস্বরে বললো দুর্গা। মনে হলো, পা-দুটো খুব দুর্বল হয়ে গেছে।

'আগামীকাল কী হবে জানি না', বললো রুদ্র, 'শুধু অনুরোধ, চেষ্টা করো বেঁচে ফিরে আসবার।'

'কেন বলছো একথা', অবরুদ্ধ স্বরে বললো দুর্গা।

'স্বার্থপরের মতো বলছি', বললো রুদ্র, 'এ যুদ্ধের শেষে কী হবে, কেউ জানে না। কিন্তু কোনো মূল্যেই তোমাকে হারাতে চাই না।'

দুর্গা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, ওকে চুপ করিয়ে দিয়ে রুদ্র মহাদেব বললো,

'আজ এসব কথা কেন বলছি, জানি না। আমি জীবন্মুক্ত সাধক, চিত্তচাঞ্চল্য আমার শোভা পায় না। কিন্তু আজ বারবার মনে হচ্ছে, এই যুদ্ধের অবসানে তুমি ধরাধামে নাও থাকতে পারো। সেই আশঙ্কা আমাকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না।'

সুদীর্ঘ এক শ্বাস নিলো দুর্গা। মনের সব শক্তি একজোট করে রুদ্রর বাম বাহুমূল চেপে ধরলো নিজের দক্ষিণ বাহু দিয়ে। আকাশের দিকে দৃষ্টিনির্দেশ করে বললো,

'ওই যে দেখছো ওই উজ্জ্বল নক্ষত্রটি, ওটি বস্তুত দুটি নক্ষত্র। অনন্তকাল ধরে দু-জনে একে অপরকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। বনবাসীদের মধ্যে প্রথা আছে, বর-বধূ পরস্পরের হাত ধরে ওই নক্ষত্রযুগলের ধ্যান করে, সেটাই ওদের বিবাহ।'

অস্ফুটস্বরে কিছু বলার চেষ্টা করলো রুদ্র। সে কথা শেষ না করতে দিয়ে দুর্গা বললো,

'মনে রেখো— এই জন্ম, এই জীবন দেশের জন্য, সমাজের জন্য উৎসর্গীকৃত। কিন্তু জন্মজন্মান্তরে আমি তোমার, তুমি আমার।'

পরস্পরের আলিঙ্গনে অনৈসর্গিক এক তৃপ্তিতে ভরে গেল যুগলের মনপ্রাণ। দূর হয়ে গেল সব আশঙ্কা, সব ভীতি। কয়েক মুহূর্ত পার হয়ে গেল। হঠাৎ দুরুদুরু কেঁপে উঠলো মাটি। দূর থেকে ভেসে এলো ধূমাবতীর খনখনে গলায় উল্লাস। গুড়গুড় শব্দের সঙ্গে পাথরের স্রোত গড়িয়ে নামতে শুরু করলো পাহাড়ের গা বেয়ে। প্রথমে ছোটো ছোটো পাথর, তারপর বড় পাথর। শেষে তুমুল শব্দ করে হিমানীসম্প্রপাতের মতো পাথরের ঢল নামলো। যখন সে ঢল থামলো, দেখা গেল, জায়গায় জায়গায় দুর্গের প্রাচীর ভেঙে পড়েছে। ভেঙে পড়েছে সৈন্যাবাস, প্রহরাকক্ষ। পাথরে চাপা পড়ে মারা গেছে অসংখ্য দানবসেনা। দ্রুত দুর্গার প্রতিটি বাহিনী সমবেত হলো পর্বতের পাদদেশে।

'বন্ধুরা', কম্বুকণ্ঠে দেবতাদের বাহিনীর উদ্দেশ্যে বললো দুর্গা, 'দুর্গভেদের সময় সমাগত। মহিষাসুর তোমাদের ভাই-বোনদের ওপর যে অকথ্য নির্যাতন করেছে, স্মরণ করো সেসব কথা। চলো, আজ আমরা মহিষাসুরের অত্যাচারের পরিসমাপ্তি করি।'

বেজে উঠলো দুন্দুভি, বাজলো কাড়া-নাকাড়া। উদ্যত খড়্গ হাতে দুর্গা দৌড়লো দুর্গের দিকে। সঙ্গে ভৈরবী, কালী ও ষোড়শী। পেছনে দেবতাদের সুবিশাল বাহিনী। ভাঙা পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়লো দেবসেনা। বন্যার জলের মতো ছড়িয়ে পড়লো দুর্গের প্রথম স্তরের সর্বত্র। ভগ্ন দুর্গের অলিন্দে প্রলয়ংকর এক যুদ্ধ শুরু হলো। শস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ, শস্ত্র হারালে হাতাহাতি যুদ্ধ। প্রতিটি পদক্ষেপে দানবসেনা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দিলো দেবতাদের সঙ্গে। কিন্তু দেবতারা সংখ্যায় অগণিত। প্রতিশোধ গ্রহণের এই সুযোগের প্রতীক্ষায় তারা ছিল বহুদিন। দানবদের মেরে একটু একটু করে দেবতারা পরিসর দখল করতে লাগলো। পাঁচদিন যুদ্ধ চলার পর সূর্যাস্তের সঙ্গে দ্বিতীয় প্রাকার ভেঙে দুর্গের দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ করলো বাহিনী।

আরেকটা খণ্ডযুদ্ধের জন্য তৈরি হয়েই দেবতারা ঢুকেছিল দ্বিতীয় স্তরে। অবাক হয়ে দেখলো, ময়দান ফাঁকা। কোথায় গেল দানবরা? পরমুহূর্তেই দেবতারা দেখলো, সাঁঝের আঁধারে হাজার হাজার খ্যাপা মোষ শিং উঁচিয়ে তেড়ে আসছে ওদের দিকে। প্রাণভয়ে পালাতে লাগলো দেবতারা। অবাক হয়ে দুর্গা দেখলো, দেবতারা পালিয়ে যেতেই মোষের পাল যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

পালিয়ে গিয়ে দুর্গের দ্বিতীয় প্রাকারের ঠিক বাইরে জড়ো হয়েছিল দেবতারা। দুর্গা পৌঁছলো সেখানে। এক্ষুনি কী দেখেছে, তা বললো ইন্দ্রকে।

'বাতাসে মিলিয়ে গেল', আশ্চর্য হলো ইন্দ্র, 'হয়তো আপনার চোখের ভুল!'

'পাহাড়ের এত উঁচুতে এত বিশাল সংখ্যায় মোষ কীভাবে জড়ো হলো? সন্দেহ হচ্ছে না তোমার?' বললো দুর্গা।

'হয়তো এসব দানবদের পোষা মোষ।' বললো ইন্দ্র।

'এত বিশাল সংখ্যায়?' বললো দুর্গা, 'এই অবরোধের মধ্যে তাদের খাইয়ে পরিয়ে রেখেছে গত ছ-মাস ধরে? সেটা কী আদৌ সম্ভব? আমি বলছি, এ আর কিছুই না, এ হলো মায়া। অন্ধকারে আলোর প্রতিফলন ব্যবহার করে এক মহিষকে একশত দেখাচ্ছে ওরা। বিস্তর বোকা বানিয়েছে মহিষাসুর।

চলো, আবার আক্রমণ করা যাক।'

দুর্গার নেতৃত্বে আবার দেবতারা আক্রমণ করলো। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। এবার তো দেবতারা জানে এ সবই মায়া, তবু রণোন্মত্ত মোষদের তেড়ে আসতে দেখলেই প্রাণভয়ে পালাচ্ছে দেবতারা। যেন জগতের সব ভয় একসঙ্গে ভর করেছে ওদের শরীরে। বারংবার আক্রমণ ও পলায়ন, আরও দুদিন কেটে গেল এই করে। দুর্গের প্রথম স্তরেই সীমাবদ্ধ রইল দুর্গার বাহিনী। উল্টে এবার দুর্গের তৃতীয় স্তর থেকে অস্ত্রবর্ষণ শুরু হলো। বহু সংখ্যক দেবতা প্রাণ হারালো। সবার ক্ষতস্থান মেরামতের পর মাঝরাতে জরুরি বৈঠক ডাকলো দুর্গা।

'ভেবেছিলাম প্রথম দুর্গপ্রাকারের পতন হলেই কেল্লাফতে হবে', বললো দুর্গা, 'আজ অষ্টম দিন। গত আটদিন ধরে দুর্গপ্রাকার একপ্রকার অরক্ষিত। তবু আমরা মহিষকে হারাতে পারিনি। নিজের সৈন্যবল অটুট রেখে ক্রমাগত আমাদের শক্তিক্ষয় করে চলেছে সে। এভাবে চললে আমাদের পরাজয় নিশ্চিত।'

'আমার সেনার আচরণে আমি অতীব লজ্জিত', বললো ইন্দ্র, 'এরা সবাই জাত যোদ্ধা। বহু ভীতির সম্মুখীন হয়েছে এরা জীবনে। কিন্তু এখানে এসে বারবার কেন এরা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাচ্ছে, সেটা আমার বোধগম্য হচ্ছে না।'

'কী এই সমবারি মায়া?' বললো রুদ্র, 'এর উৎস কী?'

'একটা ব্যাপার', বললো দুর্গা, 'মোষের পালকে দৌড়ে আসতে আমিও দেখেছি। কিন্তু সেটা যে মায়া, তা বুঝতে আমার দেরি হয়নি। সেটা বুঝতে পারলাম, কারণ আমি ভয় পাইনি। অথচ দেবতারা ভয়ে কাণ্ডজ্ঞান হারাচ্ছে। কেন? এ কী অদ্ভুত ধাঁ-ধা!'

'বাছা', বললো ধূমাবতী, 'তোমার সঙ্গে ভৈরবী ছিল, ষোড়শী ছিল, কালী ছিল। ওরাও কি ভয় পেয়েছিল?'

'আমি কোনো কিছুকেই ভয় পাই না'। গর্বভরে বললো ভৈরবী।

'আমি বিস্তর পাই', বললো ষোড়শী, 'কিন্তু তখন পাইনি। ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার হচ্ছে এখন। মনে হচ্ছে, ওরা আমাদের অস্ত্র আমাদেরই ওপর প্রয়োগ করছে।'

'তার মানে?' বললো কালী।

'মনে আছে তো', বললো ষোড়শী, 'ব্রঙ্গার যুদ্ধে দানবদের ওপর এক বিশেষ রসায়ন প্রয়োগ করেছিলাম আমরা। যার প্রভাবে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিল ওরা। সেই একই রসায়ন ওরা এবার আমাদের ওপর প্রয়োগ করেছে।'

'কিন্তু সে তো... মাতঙ্গী রাঁধুনী সেজে ওদের মধ্যে ঢুকে ওদের খাবারে সেই রসায়ন মিশিয়েছিল। এক্ষেত্রে...'

'সেই একই রসায়ন কিঞ্চিৎ পরিবর্তনের মাধ্যমে হয়তো বায়বীয় পদার্থে রূপান্তরিত করা যায়। মহিষের লোকেরা সেই রসায়ন দুর্গের চূড়া থেকে ছড়িয়ে দিয়েছে। বাতাসে ভেসে সে রসায়ন নেমে এসেছে নীচের দিকে। রসায়নে সম্পৃক্ত হয়ে ভয় পেয়েছে দেবতারা।'

'কিন্তু আমাদের ওপর সেই রসায়নের প্রভাব সেভাবে হলো না কেন?' কালীর প্রশ্ন।

'নারী ও পুরুষের শরীরে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলোর কাজ অনেকটাই ভিন্ন', বললো ষোড়শী, 'মনে করে দ্যাখো, সেই ব্রঙ্গার যুদ্ধের সময়েই আমি বলেছিলাম, এই রসায়নের প্রভাব শুধু পুরুষদেরই ওপর পড়বে। নারী শরীরের ওপর এই রসায়নের প্রভাব খুবই সীমিত।'

'এতক্ষণে রহস্য পরিষ্কার হলো', বললো দুর্গা, 'তা, এই রসায়নের কোনো প্রতিষেধক বানাতে পারবে তুমি?'

'ব্রঙ্গায় থাকলে হয়তো পারতাম', বললো ষোড়শী, 'এখানকার জঙ্গল আমার অচেনা। এখানে কোন জঙ্গলে প্রতিষেধক উদ্ভিদ খুঁজে বেড়াবো?'

'তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে যে', বললো দুর্গা, 'একমাত্র মেয়েরাই দুর্গ আক্রমণ করতে পারবে। খুব ভালো। তাহলে চামুণ্ডাবাহিনীই পরবর্তী আক্রমণে যাবে।'

'আমার ভূতপ্রেতের দলও যেতে পারে সঙ্গে', বললো রুদ্র, 'তারা জীবন্মুক্ত সাধক, গ্রন্থির নিঃসরণ তাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে। উপরন্তু প্রমথরা গঞ্জিকাসেবনে অভ্যস্ত। এই রসায়ন তাদের ওপর খুব বেশি প্রভাব ফেলতে পারবে না।'

'তবে তাই হোক', বললো দুর্গা, 'আজ যুদ্ধের অষ্টম দিন শেষ হলো। আগামীকাল নবমী। আগামীকাল আমরা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়েই ছাড়বো। ভৈরবী, এই যুদ্ধে তুমিই হবে সেনাধ্যক্ষা। তুমি চামুণ্ডাসেনাকে প্রস্তুত করো। আগামীকাল সূর্য ওঠার সাথেই আমরা আক্রমণ করবো।'

অষ্টমীর শেষ প্রহর। ময়লা একটা চাঁদ পশ্চিম আকাশের দিকে গুটিগুটি এগোচ্ছে। তার আলোয় আলো কম, আঁধার বেশি। কাবেরী নদীর তীরে উঁচু একটি পাষাণ-বেদিকা বেছে নিয়ে তার ওপর ধ্যানে বসলো দুর্গা। চোখ বন্ধ করার সঙ্গেই

With Best Compliments From -

W&L

Willowood Chemicals Private Limited

MK Point
AT 27, BENTINCK STREET,KOLKATA

AGRAWAL & AGRAWAL
Architects Planners Interior Designer

A World-class (B+G+7 Storied) office building, in the heart of the central business district, on 27, Bentinck Street, Kolkata- 700 001

By

M K GROUP

Contact no. 033-32901999

www.mkpoint.in

একরাশ অন্ধকার দৌড়ে এলো দশদিক থেকে। সেই আঁধারে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়ে ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করলো দুর্গা। পেঁজা তুলোর মেঘের মতো চিন্তার স্রোত বয়ে এলো, চলে গেল। মন্ত্র জপের সঙ্গে ফিকে হয়ে এলো সেই মেঘের ঝাঁক। শেষে রয়ে গেল অসীম এক শূন্যতা। ধীরে ধীরে সেই শূন্যতায় জাগলো অলৌকিক এক আলোর আভা। দুর্গা দেখলো, অনন্ত চিদাকাশে নিরলম্ব অবস্থায় বসে আছে ও। সামনে ধ্যানাসনে নিমীলিত চক্ষে যোগিনী। দুর্গার তন্ত্রগুরু। যোগিনী চোখ খুললো।

'তুমি কি সত্যিই এখানে', 'দুর্গা প্রশ্ন করলো, 'নাকি এটা আমার কল্পনা?'

'স্বপ্নের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণ একটা জগৎ সৃজন করি। সেটা সত্যি, না কল্পনা?'

'সেটা কল্পনা।'

'কল্পনা? তাহলে তুই দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পাস কেন? নিজের কল্পনাকেই ভয়? এ কেমনধারা বাস্তব?

দুর্গা নিরুত্তর।

'মায়াজাল ছিন্ন করার উপায়', বললো যোগিনী, 'বস্তু যে মায়া, সেটা উপলব্ধি করা।'

'নদীতে যে ছায়া পড়ে, সেটাও তো মায়া। কিন্তু যতই ভাবি ওটা প্রতিবিম্ব, সে প্রতিবিম্ব তো আর উধাও হয়ে যায় না। দর্পণে সূর্যালোক প্রতিফলিত হয়ে চোখ ঝলসে দেয়। দর্পণের সেই সূর্য যে মায়া, সেটা উপলব্ধি করলেই কি আমি নিরাপদ থাকবো? চোখ ঝলসাবে না?' প্রশ্ন দুর্গার।

'প্রতিবিম্বের মায়াকে বিনষ্ট করতে গেলে দর্পণকে চূর্ণ করতে হবে', বললো যোগিনী, 'তাহলেই প্রতিবিম্ব বিলীন হবে। মৃৎপাত্র মায়া। তাকে ভেঙে ফেললেই জানা যায়, মৃৎপাত্র মৃত্তিকা বই আর কিছু নয়। মনে রাখিস, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো প্রতিনিয়ত আমাদের সঙ্গে ছলনা করে। বিশ্বাস করিস না তাদের।'

'সেটা কী রকম?' প্রশ্ন করলো দুর্গা।

'ইন্দ্রিয়ের ভূমিকা হলো, জীবনরক্ষা। শিকার করা, শিকার হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া। ইন্দ্রিয়রা এর বাইরে আর কিছু বোঝে না। বুদ্ধিমান কেউ যদি ইন্দ্রিয়দের এই দুর্বলতাটুকু বুঝে ফেলে, তাহলে সে তোর ইন্দ্রিয়কেই তোর বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারবে।'

'ঠিক যেমন মহিষ রসায়ন ব্যবহার করে দেববাহিনীকে ভয় দেখিয়েছে।'

'ঠিক তাই। জেনে রাখিস, ইন্দ্রিয়রা যখন বিশ্বাসঘাতকতা করে, তখন জীবনরক্ষার জন্য ইন্দ্রিয়দের ভোঁতা করে দিতে হয়।'

'সেজন্যই কি শিবপ্রমথরা গঞ্জিকাসেবন করে?'

অপার্থিব আলো শেষরাতের অন্ধকারে বিলীন হলো। চিদাকাশ হলো অন্তর্হিত। চোখ খুললো দুর্গা। চাঁদ ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে। ঝাপসা আঁধারে প্রকাণ্ড এক মহিষের মুকুটের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে মহাবলাচল পর্বত। দুর্গার সামনে দাঁড়িয়ে ভৈরবী, সঙ্গে চামুণ্ডাবাহিনী। ধ্যানাসন থেকে উঠে দাঁড়ালো দুর্গা। কটিবদ্ধ থেকে খড়্গ খুলে রাখলো পাষাণ-বেদিকার ওপর। ভৈরবী ওর কুঠার রাখলো তার পাশে। একে একে বাহিনীর প্রত্যেকে তাদের আয়ুধ জড়ো করলো সেখানে। সিঁদুর মাখানো হলো সেগুলোতে। গম্ভীর কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করলো দুর্গা। পাপসংহারে জেগে ওঠার জন্য আহ্বান করলো আয়ুধের অন্তর্নিহিত শক্তিকে। দুর্গার সঙ্গে গলা মেলালো বাহিনীর মেয়েরা। পুজো যখন শেষ হলো, অষ্টমী তখন শেষ হয়ে নবমীতে পড়েছে। একে একে বাহিনীর সবাই নিজ নিজ আয়ুধ ধারণ করলো। তারপর বেরিয়ে পড়লো শেষ যুদ্ধ জয় করতে।

দুর্গের দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ করলো দুর্গা। সঙ্গে চামুণ্ডাবাহিনী ও শিববাহিনী। দেখলো, দানববাহিনী প্রতিরোধ-ব্যূহ রচনা করে প্রতীক্ষা করছে সেখানে। দানবদের নেতৃত্ব যারা দিচ্ছে, তারা অনেকেই মধ্যভারতের যুদ্ধে চামুণ্ডাদের হাতে বিধ্বস্ত হয়েছিল। উদ্ধত, উগ্রস্ব, উগ্রবীর্য, মহাহনু, করাল ইত্যাদি। এবার আর মায়াজাল নয়, এবার সরাসরি যুদ্ধ। হা-র-র-র হুংকারের সঙ্গে চামুণ্ডাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়লো দানবদের উপর। সারাদিন ধরে চললো সেই প্রলয়ংকর যুদ্ধ। এক এক করে দানবদের নেতৃবর্গ মৃত্যুক্রোড়ে ঢলে পড়তে লাগলো। ভৈরবী তার মুষ্টিপ্রহারে দানব করালের করোটি ফাটিয়ে দিল। গদাঘাতে তারা ধরাশায়ী করলো উদ্ধতকে। ভুবনেশ্বরীর অঙ্কুশের আঘাতে উগ্রাস্যর মস্তক দেহচ্যুত হলো। ছিন্নমস্তার কাটারির ফলা উগ্রবীর্য ও মহাহনুর কণ্ঠা চিরে ফেললো। কালী ভিন্দিপালের আঘাতে বাস্কলকে, বগলামুখী বাণপ্রহারে তাম্র ও অন্ধককে বধ করলো। মাতঙ্গীর অসির প্রহার বিড়ালাক্ষর মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করলো। দুর্গা বাণের আঘাতে দুর্ধর ও দুর্মুখকে হত্যা করলো। অসিলোমার দুই চোখ ঠুকরে খেলো ধূমাবতীর

Best Compliments
from-

A
Well
Wisher

LIL

An ISO 9001 : 2008 Certified Company

Alloy Group

UTSAV INDUSTRIES PVT. LTD.

AIM TECHNOLOGIES PVT. LTD.

RAJ ALUMINIUM PVT. LTD.

Aluminium & Hardware People

HINDALCO INDUSTRIES LIMITED | AN ISO 9002 COMPANY HINDAL ALUMINIUM LIMITED | NALCO Aluminium Sheet Coil | ALOM Aluminium Extruded Section

503, **Kamalalaya Centre,** 156/A, Lenin Sarani, Kolkata-700 013. INDIA

Phone : 4050 3400

E-mail : info@alloyindia.com **Website :** www.alloyindia.com

দাঁড়কাক। পরিবারিত নিহত হলো ষোড়শীর নাগপাশের দংশনে। প্রতিটি দানবকে খুঁজে খুঁজে বার করে হত্যা করলো চামুণ্ডারা। দুর্গের দ্বিতীয় স্তরের পতন হওয়ার সঙ্গেই সূর্যদেব অস্ত গেলেন পাহাড়ের ঢালে। সন্ধ্যা নামলো।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের মাঝখানে ছিল ধাতুনির্মিত এক দরজা। বগলামুখীর বিস্ফোরক-বাণে চূর্ণ হলো সেটা। দুর্গের অন্তিম স্তরে প্রবেশ করলো দুর্গা। সঙ্গে চামুণ্ডা ও প্রমথ বাহিনীদ্বয়। তাদের এক হাতে উদ্যত আয়ুধ, অন্যহাতে জ্বলন্ত মশাল। অন্ধকারে ডুবে আছে মহাবলাচল পর্বতের চূড়ায় বিধ্বস্ত দুর্গের ধ্বংসস্তূপ। ইতস্তত ছড়িয়ে আছে বিরাট সব পাথরের টুকরো। ভাঙা দেওয়াল, হেলে পড়া খাম্বা। সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে মুখোমুখি দাঁড়ালো দুর্গা ও মহিষাসুর। ওদের চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়ালো চামুণ্ডার দলবল। দুর্গা অবাক হলো একাকী মহিষাসুরকে দেখে। চোখের কোণে কালি, মুখে ক্লান্তির ছাপ। এই কি সেই বিশ্বত্রাস দানব? আজ একলা এসেছে নিজের ভবিতব্যের মুখোমুখি হতে? হা-হা করে হেসে উঠলো দুর্গা। ডেকে বললো,

'তোর জন্য আমার করুণা হচ্ছে। সারাজীবন তুই নারীদের অবজ্ঞা করেছিল, অশ্রদ্ধা করেছিস। তোর কী দুর্দৈব দ্যাখ, আজ তোর সামনে তোর কালান্তক যমরূপ উপস্থিত তোর চেয়ে শক্তিশারী এক নারী। কী করে বাঁচবি তুই আমার হাত থেকে? একমাত্র আশা ছিল তোর ওই সমবারি মায়া। কিন্তু এখানেও তোর ভাগ্য তোর সঙ্গে পরিহাস করেছে। তোর ওই মায়ার প্রভাব মেয়েদের ওপর পড়ে না। কী করবি এখন?'

'সমবারি মায়াই একমাত্র মায়া নয়', বললো মহিষাসুর। হঠাৎই যেন অস্বাভাবিক রকমের শান্ত শোনালো ওর কণ্ঠস্বর। 'আরও অনেকরকম মায়া রয়েছে। সম্মোহন, অভিভাবন, মনোযোগ হরণ, যন্ত্রের ব্যবহার। আজ সেইসব নিয়েই আমি যুদ্ধে নামবো। গত ছ'মাস নির্বাসনে বসে মায়া নিয়েই তো আমি গবেষণা করে গেছি। জানতাম, একদিন না একদিন ব্রহ্মাহ্নদিদের মায়াজালের মুখোমুখি হতে হবে আমাকে।'

আচমকা পেছন ফিরল মহিষাসুর। মহিষের ভঙ্গিতে তেড়ে গেল চামুণ্ডাদের দিকে। মহিষের মতোই শিঙের মুকুটের সাহায্যে আক্রমণ চালালো। লাফিয়ে উঠে পায়ের আঘাতে ভূতলশায়ী করলো একসঙ্গে একাধিক যোদ্ধাকে। ঠিক যেমন মহিষ তার পেছনের পা ব্যবহার করে আক্রমণ করে। পরমুহূর্তেই অন্ধকারের গর্ভ থেকে উঠে এলো মহাকায় এক মহিষ। লাফিয়ে তার পিঠে আরোহী হলো মহিষাসুর। মহাকায় সেই মহিষের শরীর পুরু ধাতব বর্মে ঢাকা। অদ্ভুত সে বর্ম। রাশি রাশি ছিদ্র সেই বর্মে। বর্মে ছিদ্র কেন? ভেবে কুলকিনারা পেলো না দুর্গা। দেখতে দেখতে মহিষ চড়াও হলো চামুণ্ডাবাহিনীর ওপর। তীব্র আর্তনাদ করে উঠলো বাহিনীর যোদ্ধারা, ভয়ে পালাতে লাগলো। দুর্গা দেখলো, মহিষ-বাহনের বর্মের ছিদ্রপথ থেকে তেজঃপুঞ্জ নির্গত হচ্ছে অবিরল। যেখান দিয়ে মহিষের বাহন দৌড়ে গেল, তেজাবদগ্ধ মৃতদেহের স্তূপ ছড়িয়ে পড়লো সেই পথের দুপাশে। মহিষাসুর ও তার বাহন পলায়নরত চামুণ্ডাদের ক'জনকে মুখাঘাতে, কাউকে খুরাঘাতে, কাউকে বা শৃঙ্গদ্বারা বিদীর্ণ করলো। তাড়া করে ভূতলশায়ী করলো অনেককে। চামুণ্ডাদের বাঁচাতে দৌড়ে এলো প্রমথরা, হুংকারে আকাশ বিদীর্ণ করে একজোটে ঝাঁপিয়ে পড়লো মহিষের ওপর। কেউ আগুনে পুড়ে মরলো, কেউ বা মহিষ ও তার বাহনের শিং বা খুরের আঘাতে। তবু লড়াই চালিয়ে গেল শিববাহিনী। একজন মরলে আরেকজন তার জায়গা নিল। প্রমথদের প্রতিরোধে সাহস পেয়ে চামুণ্ডারাও নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ক্রমাগত আঘাতের ফল ফলল এবার। শ্রমনার ছোঁড়া তির বর্মের ফাঁক ভেদ করে আঘাত করলো বাহনের পায়ে।

ক্রোধে খুর দিয়ে ভূতল বিদীর্ণ করে সেই মহিষ শৃঙ্গের আঘাতে রাশি রাশি পাথর ছুঁড়তে লাগলো চারিদিকে। কিন্তু পায়ে আঘাত লেগেছিল মোক্ষম। ক্রমে মহিষের গতি স্লথ হয়ে পড়লো। এই সুযোগে উদ্যত ছুরিকা হাতে মালিনী ঝাঁপিয়ে পড়লো মহিষের ওপর। নিজের ভূতপূর্ব অঙ্কশায়িনীকে দেখে অবাক মহিষাসুর আর্তনাদ করে উঠলো। মুহূর্তে আগুনে ঝলসে গেল মালিনীর শরীর। কিন্তু তার আগেই ওর হাতের ছুরিকা বাহনের বামচক্ষু বিদীর্ণ করলো। যন্ত্রণায় পাগল হয়ে খুরের আঘাতে ধুলোর ঝড় তুলে মহিষের বাহন খোঁড়াতে খোঁড়াতে দৌড়লো দুর্গার অভিমুখে। ধূমাবতী ছুঁড়ে দিল ওর মন্ত্রঃপূত ধুলো। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর আড়ালে অদৃশ্য হলো দুর্গা। সেখানে আবির্ভূত হল ষোড়শী, ওর হাতের নাগপাশ ছুঁড়ে দিল বাহনের দিকে। হোঁচট খেয়ে উল্টে পড়লো বাহন। বাহনকে ত্যাগ করে মহিষাসুর উঠে দাঁড়ালো।

মাটি কেঁপে উঠলো সিংহনাদে। অবাক হয়ে দুর্গা দেখলো, চিক্কার থেকেও বিশালাকৃতি এক সিংহ আবির্ভূত হয়েছে রণাঙ্গনে। গা থেকে দাউদাউ আগুন ছুটছে তার। সিংহ! আমার চিক্কার মতোন একটা সিংহ! আক্রমণে হাত উঠলো না দুর্গার। অলৌকিক এই সিংহ এখানে কোত্থেকে এলো? ভাবতে গিয়েই দুর্গা হঠাৎ খেয়াল করলো, এতবড় একটা সিংহ দেখেও চিক্কা নির্বিকার। ব্যাপারটা কী? দুর্গা দেখলো, সে সিংহ সোজা দৌড়েছে ষোড়শীর দিকে। পরমুহূর্তে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর পেছনে

অন্তর্হিত হল ষোড়শী, তার জায়গায় দেখা দিল ভৈরবী। রণকুঠারের আঘাতে বিদীর্ণ হলো সিংহের করোটি, কুঠার আটকে গেল করোটিতে। স্তম্ভিত ভৈরবী দেখলো, সিংহচর্মের আড়াল খসে পড়লো, বেরিয়ে এলো হাড়-জিরজিরে সামান্য এক মহিষ। বোঝা গেল, সিংহচর্মের ওপর বিশেষ এক রসায়নের প্রলেপ ছিল, মশালের আলো যার গায়ে প্রতিফলিত হয়ে আগুন-সিংহের রূপ নিয়েছিল। অবাক হওয়ার সেই ঘোর কাটতে না কাটতে অন্ধকারের মধ্যে থেকে আবির্ভূত হলো মহিষাসুর। সিংহেরই ভঙ্গিতে নখ ও দাঁতের সাহায্যে লড়াই চালালো। ভৈরবীর পদাঘাতে ছিটকে পড়লো সিংহরূপী মহিষ। পরমুহূর্তেই দ্বিগুণ শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো নিরস্ত্র ভৈরবীর ওপর, হাতে খড়্গ ও ঢাল। ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে উঠলো, ভৈরবীর স্থলে আবির্ভূত হল বগলামুখী। বাণবর্ষণের ঝড় উঠলো, সেই ঝড়ে উড়ে গেল মহিষাসুরের খড়্গ ও ঢাল। লৌহজালিকের জন্য সে বাণ মহিষের অঙ্গভেদ করতে পারলো না, কিন্তু সজারুর মতো হয়ে দাঁড়ালো মহিষাসুরের বর্ম, ঝড়ের আঘাতে ছিটকে পড়লো মাটিতে। স্তম্ভিত মহিষাসুর ভাবলো, এই মেয়েটির কি দশটা হাত? দশ হাতে দশ অস্ত্র? মনে হচ্ছে, দশটি মানুষের শক্তি নিয়ে একযোগে আক্রমণ করেছে একজন। মহিষাসুর দেখলো, ধনুর্বাণের বদলে গদা হাতে তুলে নিয়েছে মেয়েটি। যেন কালান্তর যম হাতে যমদণ্ড নিয়ে সংহারে উদ্যত। ভয়ে কেঁপে উঠলো ওর অন্তরাত্মা।

দুর্গা দেখলো, পাহাড়প্রমাণ এক মত্তহস্তী দৌড়ে যাচ্ছে বগলামুখীর দিকে। ব্রহ্মার হস্তী। শিশুকাল থেকেই তো হস্তীশাবকদের সঙ্গে খেলা করে বেড়ে ওঠা। আবার মমতা ওর হাত টেনে ধরলো। কিন্তু আকারে এ তো ব্রহ্মার হাতিদেরও চতুর্গুণ। কোত্থেকে এল এই প্রাগৈতিহাসিক হস্তী? পরমুহূর্তে বগলামুখীর জায়গায় আবির্ভূত হলো মাতঙ্গী। হাতির শুঁড় ধরে মারলো টান। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো যন্ত্রচালিত হাতির কাঠামো। তার আড়াল থেকে দেখা দিল মহিষাসুর। শান্ত, হতাশ, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো, মহিষ বোধহয় আত্মসমর্পণ করবে। পরমুহূর্তেই ওর চারপাশে আবিভূত হলো কুণ্ডলীকৃত কুজ্ঝটিকার এক বলয়। তার অন্তরালে অন্তর্হিত হলো মহিষাসুর।

কোথায় গেল মহিষ? চিঙ্কা বাতাসে নাক তুলে বারবার গন্ধ শুঁকলো। তারপর হতাশায় মাথা নেড়ে নিষ্ফল গর্জন করে উঠলো। নেই, কোথাও নেই। যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে সে। কী হলো? আবার পালিয়ে গেল মহিষ? এত পরিশ্রম, এত বলিদান, সব ব্যর্থ? কোথায় পালিয়ে গেল? কীভাবে পালিয়ে গেল? এক মুহূর্ত আগেও তো সে এখানেই ছিল!

'ভিন্ন সময়ের মাত্রা।'

'কী? কী বললে?' চমকে উঠে দুর্গা দেখলো, মহিষ যে বিন্দুতে অন্তর্হিত হয়েছে, কালী দাঁড়িয়ে আছে ঠিক সেইখানে। হাতদুটো সামনে বাড়ানো, চোখ কপালে উঠে গেছে ওর। দরদর করে ঘামছে, শরীর থরথর করে কাঁপছে।

'ভিন্ন সময়ের অন্তরালে লুকিয়েছে মহিষ!' বললো কালী, এই বলেই বিড়বিড় করে কীসব মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করলো। এলোমেলো পদক্ষেপে সম্মোহিতের মতো এগিয়ে এলো ছিন্নমস্তা, নিজের বামহাত দিয়ে কালীর ডানহাত আঁকড়ে ধরলো। পরমুহূর্তেই ডানহাত দিয়ে নিজের বক্ষমূলে আঘাত করলো। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোলো। শরীর থেকে বেরিয়েই সেই রক্তস্রোত রূপ নিল শুভ্রবর্ণ এক আলোকচ্ছটার। সেই মুহূর্তেই কালীর শরীর ভাস্বর হলো কৃষ্ণবর্ণ এক শক্তিপুঞ্জে। দুই শক্তি মুখোমুখি সংঘর্ষে রূপ নিল ঘূর্ণিঝড়ের।

'দুগা!' চিৎকার করে উঠলো কালী।

দুর্গা লাফিয়ে চড়ে বসলো চিঙ্কার পিঠে। চিঙ্কা ঝাঁপ দিল ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্র অভিমুখে। বাহনসহ দুর্গা অদৃশ্য হলো অন্ধকারের অতলে।

যেন এক অনন্ত সুড়ঙ্গ। তার মধ্যে দিয়ে দৌড়ে চললো চিঙ্কা, অনন্তকাল ধরে। সে সুড়ঙ্গের দশদিকে অগণিত রঙের মেলা, অজস্র জ্যামিতিক আকৃতি। আকৃতিগুলো ভাঙছে, জুড়ছে। নতুন আকৃতি, নতুন রঙের সৃষ্টি করছে। এ যেন এক ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ঘূর্ণি, যার আদি নেই, অন্ত নেই। সম্পূর্ণ চেতনা পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে অতিজাগতিক সংগীতে। সে সংগীতের মূর্ছনা, তার অনুরণন, অশ্রুতপূর্ব সে, জাগতিক কোনো সংগীতের সঙ্গে তুলনা নেই তার। হঠাৎ সে সংগীত ফিকে হয়ে এলো, সব রঙ ঝাপসা হয়ে গেল অসীম অন্ধকারে। শরীরের সমস্ত রোমকূপ জুড়ে ভয়ে শিহরণ খেলে গেল দুর্গার। সূক্ষ্ম শরীর নয়, সুক্ষশরীরের প্রতিটি তন্ত্রী কেঁপে উঠলো অজানা আশঙ্কায়। দূরে আবছায়া একটা আলো দেখা দিল। দুর্গা দেখলো, রক্তচক্ষু এক মহিষ শিং উঁচিয়ে দৌড়ে আসছে ওর দিকে। ভয় সামলে উদ্যত খড়্গ দিয়ে সবলে আঘাত হানলো দুর্গা। বুদবুদের মতো মিলিয়ে গেল মহিষ, তার জায়গায়

আবির্ভূত হলো এক বাঘ। আবার আঘাত হানলো দুর্গা। বাঘ পরিবর্তিত হলো বন্য বরাহে। বরাহ থেকে সিংহ। সিংহ থেকে খড়্গচর্মধারী পুরুষ, তার থেকে হাতি, হাতি থেকে আবার মহিষ। চারদিক থেকে বারংবার আক্রমণ, প্রতিহত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লো দুর্গা। মাথার মধ্যে কিলবিল করছে একরাশ অশরীরী। সবকটা ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হয়ে বলে চলেছে— বিপদ! বিপদ! কিন্তু শরীর যে আর লড়তে পারছে না। লড়াই করেই বা লাভ কী হবে? ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে কে কবে জিতেছে? ক্লান্তি ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীর জুড়ে অসংখ্য ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাত হচ্ছে অবিরাম। মনসংযোগ করার ক্ষমতাটাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ কী অদ্ভুত মায়াজাল! হতভম্ব একরাশ চিন্তার জটাজালে আবদ্ধ দুর্গার মনে পড়লো, তন্ত্রে সূক্ষ্মশরীর নিয়ন্ত্রণের তিনটি স্তর রয়েছে। নিজের সূক্ষ্মশরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ, অন্যের সূক্ষ্মশরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ, আর

নিরালম্ব সূক্ষ্মশরীর অর্থাৎ প্রেতের ওপর নিয়ন্ত্রণ। মহিষাসুর এর কোনটা নিয়ে খেলা করছে এখানে? কী এই স্থির সময়ের মাত্রা, যেখানে আটকা পড়েছে ও?

দূর থেকে ভেসে আসছে মহিষাসুরের হাঃ হাঃ অট্টহাসি। ইন্দ্রিয়গুলো আরও উত্তেজিত হয়ে উঠছে। না, ইন্দ্রিয় নয়, ইন্দ্রিয়ের পরপারে যেতে হবে। সুদীর্ঘ এক শ্বাস নিয়ে চোখ বুজলো দুর্গা। কোমরবন্ধ থেকে টান মেরে বের করে আনলো স্ফটিক-নির্মিত একটি পাত্র, মুখ তার কষে বন্ধ করা আছে কাঠের টুকরো দিয়ে। ছিপি খুলতেই বিশুদ্ধ কোহলের তীব্র গন্ধে নাক জ্বলে গেল। একঢোঁক খেতেই শরীর জুড়ে যেন কোনো এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতির স্রোত বয়ে গেল। চারদিকের এত উত্তেজনা, এত উস্কানি, সব ঝাপসা হয়ে এলো। আর এক ঢোঁক খেলো দুর্গা। কানে এল মহিষাসুরের অট্টহাসি। পাল্টা প্রমত্তের মতো অট্টহাসি হেসে উঠলো দুর্গা। বললো,

'হেসে নে, যত পারিস হেসে নে। যতক্ষণ আমার হাতে এই পানপাত্র আছে, ততক্ষণই তোর জীবন আছে। ততক্ষণ তুই যা পারিস কর।'

মহিষ দেখলো, স্থির সমাহিত দাঁড়িয়ে আছে দুর্গা, যেন কোনো কিছুতেই ওর কিছু আসে যায় না। তৃণের শেষ তিরটাও হারিয়ে অমঙ্গলের আশঙ্কায় কেঁপে উঠলো মহিষের বুক। দুর্গার স্থৈর্য ভঙ্গ করতে একটার পর একটা পাথর ছুঁড়ে মারতে লাগলো। নিমীলিত নেত্র দুর্গার একহাতে ভৃঙ্গার, অন্যহাতের খড়্গ। মুহুর্মুহু প্রহারে সেইসব পাথর চূর্ণ করতে লাগলো। হতাশ হয়ে নিরস্ত হলো মহিষাসুর। আরেক ঢোঁক কোহল পান করে স্ফটিকের পাত্র ছুঁড়ে ফেলে দিল দুর্গা। চোখ বন্ধ, ইন্দ্রিয় সুপ্ত, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সর্বোচ্চ স্তরে সজাগ। মহিষ দেখলো, দুর্গার কপালের মধ্যিখানে দপ্ করে জ্বলে উঠলো আলোর এক স্ফূলিঙ্গ। দেখতে দেখতে সেই আলো ছড়িয়ে পড়লো ওর দেহ জুড়ে। মহিষ উপলব্ধি করলো, অন্তিম সময় সমাপন্ন। এবার এসবার কী ওসপার।

বাহনে আসীন হয়ে মহিষাসুর শেষবারের মতো সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ করলো দুর্গাকে। দিব্যালোকের ঝলকে আলোকিত হয়ে গেল অন্ধকার সুড়ঙ্গ। আয়ুধকলা, মনোদূরসঞ্চালন ও সূক্ষ্মশরীর নিয়ন্ত্রণের একযোগে ব্যবহারে অদ্ভুত এক দ্বৈরথ শুরু হলো। দুর্গার স্থূলশরীর ও সূক্ষ্মশরীর যুগপৎ ক্রিয়াশীল হয়ে মুহুর্মুহু মহিষের প্রতিটি আক্রমণকে ব্যর্থ করতে লাগলো। মানসিক শক্তির প্রয়োগে মহিষ রাশি রাশি অতিকায় প্রস্তরখণ্ড চতুর্দিক থেকে উড়িয়ে নিয়ে এসে দুর্গার ওপর বর্ষণ করতে লাগলো। দুর্গা পাল্টা মানসিক শক্তির প্রয়োগে সেইসব প্রস্তরখণ্ডকে আকাশেই রেণু রেণু করে ভস্মীভূত করে দিল। প্রতিটি ব্যর্থ আক্রমণের সঙ্গে মহিষ আরও অধৈর্য, আরও মরিয়া হয়ে উঠল। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে উপর্যুপরি আক্রমণ চালিয়ে গেল দুর্গার ওপর। অন্ধ ক্রোধে আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তিও বিস্মৃত হলো মহিষ। এরকমই এক মুহূর্তে দুর্গার ডানহাত থেকে সূক্ষ্মশরীর নির্মিত এক আলোকচ্ছটা নির্গত হয়ে নির্ভুল লক্ষ্যে আঘাত হানলো মহিষাসুরের বাহনের কণ্ঠায়। শিরশ্ছিন্ন হয়ে বাহন এলিয়ে পড়লো মাটিতে। তার নীচে চাপা পড়লো শ্রান্ত মহিষাসুর।

ঝাপসা চোখে মহিষ দেখলো, তেজপ্রভায় দশদিক উদ্ভাসিত করে ওর দিকে ধেয়ে আসছে অতিকায় সিংহে আরোহিণী রক্তবস্ত্র পরিধান এক অসামান্যা তেজস্বিনী নারী। সে নারী অবিকল মাতামহী দনুর মতো দেখতে। মেরুদণ্ড বরাবর তীব্র এক হিমশীতল স্রোত বয়ে গেল। তীব্র ভয় জাগলো মহিষাসুরের মনে।

'মা! রক্ষা করো মা!!!'

ত্রিশূল হাতে দুর্গা হুংকার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো মহিষাসুরের ওপর।

একই সঙ্গে ঝাঁপ দিলো চিক্কা। শরীর অবশ, আত্মরক্ষার্থে শিথিল হাত উঠেও উঠলো না। চিক্কা মহিষের গলা টিপে ধরলো, দুর্গার ত্রিশূল বিদ্ধ করলো মহিষের বক্ষ। চোখের সামনে দিয়ে জীবনের প্রতিটি ঘটনা দ্রুত ছায়াচিত্রের মতো বয়ে গেল মহিষাসুরের। ছোটবেলার ছোটো ছোটো ঘটনা, যেগুলো ও ভুলেই গিয়েছিল, সবাই এসে ভিড় করলো একসঙ্গে। ঠাকুমা দনুর স্নেহ। বরুণ উপজাতিদের সঙ্গে বেড়ে ওঠা। তাদের স্নেহ, ভালোবাসা। তাদের বন্ধুত্ব। অগ্নিদেবের করুণা। পিতা রম্ভকে তিনিই বাঁচিয়েছিলেন অগ্নিপ্রবেশ থেকে। বুকেপিঠে করে মানুষ করেছিলেন বাপ-মা হারা অনাথ ছোট্ট মহিষকে। তার প্রতিদান আমি কীভাবে দিয়েছি?'

ঝাপসা হয়ে এলো চোখ। সময় হয়ে এল। ওপারে কি সত্যিই অসু নামের কেউ প্রতীক্ষা করে আছে? আমি স্বর্গদ্বারে পৌঁছলেই যে আমাকে দিব্যাঙ্গনা বারবণিতাদের উপহারে পুরস্কৃত করবে? সত্যিই কী? আজ আর সেসব বিশ্বাস হচ্ছে না। সবচেয়ে বড়ো কথাটা হলো, দিব্যাঙ্গনাদের আজ আর তেমন আকর্ষণীয় লাগছে না। জগতের কোনো ভোগই আর আকর্ষণীয় লাগছে না। অলীক এক অসুবাদ, তার গাঁজাখুরি গালগল্প ও তার অলীক স্বর্গের মিথ্যে প্রতিশ্রুতিতে ভুলে আমার পরমাত্মীয়দের আমি হত্যা করেছি। ধ্বংস করেছি আমার নিজেরই সমাজ ও সভ্যতাকে। পরকালের স্বর্গের লোভে ইহকালটাকে করে

তুলেছি নরকসদৃশ। শুধু আমার নয়, সমস্ত দেশবাসীর ইহকাল।

হাত থেকে খড়্গ ও ঢাল খসে পড়লো। শরীরের শেষ শক্তি একজোট করে মহিষাসুর হাতদুটোকে মাথায় ঠেকালো, দুর্গার উদ্দেশ্যে অন্তিম প্রণাম রেখে গেল।

'মা! তোমাকে আমি চিনতে পারিনি। আমি মহাপাপী। স্বর্গ নয়, পরকালের সুখ নয়, যন্ত্রণাময় মৃত্যুই আমার উপযুক্ত পাওনা। মা, জগজ্জননী মা আমার, তোমার এই অধমতম সন্তানকে পারলে ক্ষমা করো মা।'

অন্ধকার দ্রুত ঘনিয়ে এলো দুচোখে। অন্তহীন অন্ধকার...

সময়ের কুজ্ঝটিকা মিলিয়ে গেল বাতাসে। কালী দেখলো, ঘূর্ণির অন্তরাল থেকে ভেসে উঠছে সিংহবাহিনী দুর্গার রক্তস্নাত অবয়ব। পদতলে মর্দিত হচ্ছে সবাহন মহিষাসুর। দূরে কোথা থেকে জানি, ভেসে আসছে ঢাকের বাদ্য।

যুদ্ধ শেষ হলো। তার সঙ্গে সমাপ্ত হলো ইতিহাসের এক অন্ধকার অধ্যায়। হিরণ্যকশিপুর পুত্র বিষ্ণুনিষ্ঠ প্রহ্লাদের প্রভাবে দৈত্যরা আজ অনেকটাই শান্ত। আজকের মূল সমস্যা ছিল দানবদের নিয়ে। কথায় বলে, বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। নব্য-ধর্মান্তরিত দানবরা দৈত্যদের কাছে নিজেদের অসুনিষ্ঠা প্রমাণ করতে গিয়ে অসুধর্ম প্রচারকে একটা পাগলামির পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল। সেই পাগলামির মূল হোতা ছিল মহিষাসুর। আজ সেই পাগলামির অন্ত হলো। নেতৃত্বহীন দানবরা বেশিদিন নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারবে না। দেশ থেকে দানবাতঙ্ক মুছে গেল। কিন্তু তবু দুর্গার মন আজ ভারাক্রান্ত। বারবার মনে হচ্ছে, অনেক গুণও তো ছিল মহিষাসুরের। কুশলী যোদ্ধা, সফল সেনানায়ক। পরাবিদ্যায় দক্ষ। কুশল প্রশাসক। সামান্য এক মহিষ-উপজাতিকে সম্বল করে দেশব্যাপী সাম্রাজ্য তৈরি করেছিল। আগামী যুগে একথা কি কেউ বিশ্বাস করবে? এত ক্ষমতা, জগতের কত মঙ্গলে লাগতে পারতো। এত গুণের মধ্যে একটা দোষ সবকিছু নষ্ট করে দিল। নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষাই ছিল ওর কাছে সবকিছু। মহিষাসুর ভুলে গিয়েছিল ভারতবর্ষের রাজনীতির শাশ্বত সত্যটা। এদেশে রাজনীতি উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের মাধ্যম নয়, রাজনীতি স্বর্গে যাওয়ার সিঁড়িও নয়। এদেশে রাজনীতির একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, দীন-দুঃখী মানুষের দুঃখ নিবারণ। দুর্গা দেখলো, আনন্দে মেতে উঠেছে চামুণ্ডাবাহিনী। দানবদের রক্ত দিয়ে হোলিখেলা খেলছে। পাগলের মতো হা-হা করে হাসছে। ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে। দানবদের ছিন্নমুণ্ড দিয়ে লোফালুফি করছে। দুর্গা একবার ভাবলো, ওদের এসব করতে বারণ করবে। শত্রু যেই হোক, মৃত্যুর পর তার দেহকে অসম্মান করার অধিকার কারোর নেই। তারপর ভাবলো, এই মেয়েরা কী অকথ্য অত্যাচারই না সহ্য করেছে। আজ এরা নিজেদের হাতে সেই অত্যাচারের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। প্রতীকী হলেও সেই মুক্তির উপলব্ধিকে উদ্‌যাপন করতে দিতে হবে।

ঠিক সামনে শ্যামলাবরণ একটি মেয়ে আগুন হাতে নিয়ে উন্মত্তের মতো নাচছিল। দুর্গা এগিয়ে গিয়ে মেয়েটির কপালে গালে আলতো করে ছোঁয়ালো নিজের রক্তস্নাত হাতদুটো। অবাক হয়ে দুর্গার দিকে চোখ তুলে চাইলো মেয়েটি। তারপর আগুনের মালসা ফেলে দিয়ে দুর্গার হাতদুটো নিজের গালে চেপে ধরে ঝরঝর করে কেঁদে উঠলো।

'ভালো থাকিস, মেয়ে!' বললো দুর্গা, 'দুঃস্বপ্ন শেষ হয়েছে। এখন আর দুঃস্বপ্নের স্মৃতি বয়ে বেড়াস না।'

হাঁটু গেড়ে দুর্গার পা-দুটো জড়িয়ে ধরলো মেয়েটি। চোখের জলে ধুইয়ে দিল দুর্গার রাঙা চরণযুগল।

তান্ত্রিক পদ্ধতিতে দীর্ঘ এক প্রহরের প্রচেষ্টায় মহিষাসুরকে বাঁচিয়ে তুললো কালী। চোখ মেলে শয্যাপার্শ্বে দুর্গাকে দেখে ধড়মড়িয়ে উঠে বসতে গেল। তারা ওকে জোর করে শুইয়ে দিল। দু-চোখ দিয়ে দরদর করে অশ্রু বয়ে চলেছে, ডুকরে কেঁদে উঠলো বিশ্বত্রাস দানব। দু-হাত জড়ে করে দুর্গাকে বললো,

'যে সত্য তুমি রক্তবীজকে দেখিয়েছিলে, সেই সত্য আমিও দেখে এলাম। মাগো, সারাজীবন আমি শুধু ভুলের গোলকধাঁধায় ঘুরে মরেছি। জঘন্য পাপী আমি। আমার জীবনটাই ব্যর্থ। কী করে এই পাহাড়প্রমাণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি করবো, জানি না।'

'ভুল তো তুই সত্যিই করেছিস', বললো দুর্গা, 'আর সে ভুলের খেসারত দিচ্ছে গোটা দেশ। কিন্তু আজ এই যে তোর মনে প্রায়শ্চিত্তের ইচ্ছে জেগেছে, এতেই আমি খুশি।'

'বাঁচার আর কোনো ইচ্ছে নেই আমার। এই জীবনটা নিয়ে

KALI PIGMENTS PVT. LTD.

Manufacturers of Red Lead, Litharge & Lead Sub-Oxide

1/4C, Khagendra Chatterjee Road
Kolkata - 700 002, W.B. India
Mobile : 98367 98663, Email : rinku_kej@yahoo.com
E-mail : kamal.kishore64@yahoo.com

Kedia Fabrics

Kamal Kumar Kedia

Mfg. & Dealer of Fancy Sarees

160, Jamunalal Bazaz Street, 2nd Floor,

Kolkata-700 007 (s) 2272-5487

Mob : 9331105467

আমি কী করবো, বলে দাও মা।'

'সেটাই তোকে বলছি, শোন। এই দেশে তোর থাকা আর ঠিক নয়। যদি তুই মারা যাস, তবে তোকে শহিদ বানিয়ে নতুন করে রাজনীতি শুরু হবে। শোনা যাচ্ছে তোর স্ত্রী মহিষী সেই চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে। সেটা হতে দেওয়া যায় না। আর যদি তুই জীবিত অবস্থায় এই দেশে থেকে যাস, তাহলে তোকে ঘিরে দানবরা আবার দল বাঁধবার চেষ্টা করবে। ওদের চাপে পড়ে তোরও মতিভ্রম হতে পারে আবার। আমি চাই, পরাজিত দানবরা দেশের সাধারণ জনগণের সঙ্গে মিশে যাক। দানব বলে তাদের আলাদা কোনো পরিচয় যেন আর না থাকে এদেশে। আর তারই স্বার্থে তোকে নির্বাসনে যেতে হবে। কমলার বাণিজ্যপোত পশ্চিমে রোমকপুরী পর্যন্ত যায়। ওর নাবিকরা বলেছে, রোমকপুরীর উত্তরে এক মনুষ্যবিহীন শস্যশ্যামল দেশ আছে। সেটাই নাকি পৃথিবীর উত্তর সীমান্ত। ব্রঙ্গার নৌসেনার প্রহরায় কমলার বাণিজ্যপোত তোকে আর তোর অনুগামীদের সেখানে পৌঁছে দেবে। সেখানে নতুন করে বসতি স্থাপন করিস। এদেশে ফেরার চেষ্টা কখনো করিস না। সে চেষ্টা করলে পরিণাম ভয়ংকর হবে। এছাড়া আর কোনো উপায় নেই রে। আমি কিন্তু নজর রাখবো তোর ওপর। তবে দুঃখ পাস না। জেনে রাখিস, যতকাল এ দেশের মানুষ আমাকে মনে রাখবে, ততকাল ওরা তোকেও মনে রাখবে।'

'তুমি যা চাও, তাই হবে মা', অশ্রুসজল কণ্ঠে বললো মহিষ, 'আমার এ জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।'

মাতৃভূমিকে শেষ বিদায় জানিয়ে জীবিত অবশিষ্ট অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে অর্ণবপোতে চাপলো মহিষ। দীর্ঘ ছ-মাস সমুদ্রযাত্রার পর অর্ণবপোত পৌঁছলো নবীন এক উপকূলে। সেখান থেকে শুরু হলো পায়ে হাঁটা। ছ-দিন পথ চলার পর মহিষাসরকে স্বাগত জানালো দু'কূল ছাপানো বিশাল এক নদী। সেই নদীর জলে নেমে আজ বহুকাল পরে বরুণমন্ত্রে স্রোতস্বিনীর আরাধনা করলো মহিষ। গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে তর্পণ করলো মাতামহী দনুর উদ্দেশ্যে। মনে হলো যেন ঘরে ফিরল। নদীর স্রোতে শরীর ভাসিয়ে শিশুর মতো ফুঁপিয়ে কাঁদলো বহুক্ষণ।

'এই নদী পুণ্যতোয়া, জীবনদায়িনী। এর উপকূলেই আমরা ঘর বাঁধবো।' ভেজা গলায় বললো মহিষাসুর।

'কী নাম হবে এই নদীর?' প্রশ্ন করলো অনুচর কৃষাঙ্গ। মহিষ বোধহয় নিজের নামে নাম রাখবে নদীর, ভেবেছিল কৃষাঙ্গ। ওকে অবাক করে দিয়ে মহিষ বললো, 'মাতামহী দনুর নামে এর নাম দিলাম— দন্যুব।'

মহিষাসুর মর্দন ও নির্বাসনের পর বহু সহস্রাব্দ পার হয়ে গেছে। ইউরোপের প্রধান নদী পুণ্যতোয়া দন্যুব আজও বয়ে চলেছে। সেই নদীর পাড়ের অধিবাসীরা আজও উৎসবের দিনে মহিষাসুরের মতোই শিংওলা মুকুট পরে। কালান্তরে মহিষের জনজাতি ছড়িয়ে পড়েছে সারা ইউরোপ জুড়ে। কিন্তু যেখানেই তারা গেছে, সেখানকার নদীর নাম তারা রেখেছে মাতামহী দনুরই নামে। ইউরোপের পশ্চিমসীমান্তে দন্যুর থেকে পূর্ব সীমান্তে দন এবং তাদের মধ্যবর্তী অজস্র নদী, সবাই আজও বয়ে চলেছে জল-উপাসিকা মাতামহী দনুরই নাম বুকে ধরে।

আর আমরা?

আমরা আজও দুর্গোৎসবে সিংহবাহিনীর আরাধনা করি। স্মরণ করি অসামান্যা এক মানবীকে, যিনি স্বীয় শক্তিতে ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়েছিলেন। তাঁর মনীষার প্রতি সম্মানে আজও মহাবলাচল পর্বত শ্রদ্ধাবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে আছে মহীশূর নগীরর ঠিক মধ্যিখানে। লোকে তাকে 'চামুণ্ডি পর্বত' বলে। জম্বুদ্বীপের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে শরৎকালে ঢাক বাজে সেই মহামানবীর সংগ্রামের স্মৃতিতে। কিন্তু কোথাও কোথাও সে ঢাক আজ আর বাজে না। কারণ, দুর্গোৎসবের পেছনে লুকিয়ে থাকা অসুরদের জন্মকথা আমরা ভুলে গেছি। যারা ইতিহাসকে ভুলে যায়, তারা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটায়। যারা রক্তবীজদের ভুলে যায়, তারা রক্তবীজদের জন্ম দেয়।

মহাবলাচলের যুদ্ধের পরেও বহুকাল পর্যন্ত অসুররা উৎপাত চালিয়ে গিয়েছিল। শেষমেশ দুর্গার ছেলে দেবসেনাপতি কার্তিকেয় অবশিষ্ট অসুরদের তাড়িয়ে হিমালয়ের পশ্চিমপারে পাঠিয়ে দেন। কার্তিকেয়র যে বাহিনী অসুরদের তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের বংশধাররা আজও আছে। বসবাস তাদের মধ্যপ্রাচ্যে, সিঞ্জর পর্বতের চূড়ায়। কার্তিকবাহন ময়ূরের উপাসক সেই উপজাতিকে লোকে বর্তমানে 'ইয়েজিদি' নামে চেনে। পলাতক অসুররা হিমালয়ের পশ্চিমবাহু জুড়ে ও তার পরপারে এক বিশাল সাম্রাজ্য তৈরি করেছিল। সেই অসুর-সভ্যতা এককালে মধ্যপ্রাচ্যের সীমানা ছাড়িয়ে ইউরোপ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছিল।

অসুর বাণীপালের নামে কাঁপতো ধরাধাম। আজ তারা প্রায় বিলুপ্ত। হালে আইসিসের অত্যাচারে অসুরদের শেষ

বংশধররাও বিতাড়িত হয়েছে প্রাচ্যভূমি থেকে। অথচ আমরা আজও এখানে রয়েছি। পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে একমাত্র আমরাই টিকে আছি। সভ্যতার এই অমরত্বের রসহ্যটা কী? সেদিন যদি মা দুর্গা অসুরনিধন না করতেন, তবে ভারতীয় সমাজ কেমন হতো? সোসাইটি ক্রিয়েটস হোয়াট ইট রিওয়ার্ডস।

আসুরিক, রাজশক্তি-কেন্দ্রিক, 'জোর যার মুলুক তার' নীতি যদি সেদিন ভারতে স্বীকৃতি পেয়ে যেত, তাহলে আর সব প্রাচীন সমাজের মতোই এদেশেরও রাজশক্তি-মুখপেক্ষী জো-হুজুর কর্তাভজা সমাজ গড়ে উঠতো। যে সমাজে লোকশক্তির কোনো ভূমিকা থাকতো না। কোনো বিদেশি শক্তি যদি রাজাকে হারিয়ে দিত, প্রজারা অমনি আক্রমণকারীর বশংবদ হয়ে যেত। অসুরদেরই দশা হতো আমাদের। সেটা যে হয়নি, তার জন্য আমরা মায়ের কছেই ঋণী। মা দুর্গা পরা ও অপরা, উভয় শক্তির আকর। তিনি বৎসলময়ী, সমাজের মাতৃস্বরূপা। মা আমাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে শিখিয়েছেন। সত্যপথে অবিচল থাকতে শিখিয়েছেন। মা দুর্গা যোগমায়া, শক্তিস্বরূপিণী। তিনি তাঁর সেই শক্তির অনন্ত ভাণ্ডার গচ্ছিত রেখে গেছেন ভারতবর্ষের প্রতিটি নারীর মধ্যে। বহুকাল প্রায়সুপ্ত ছিল সেই মাতৃশক্তি। আজ আবার তার জাগরণের মাহেন্দ্রক্ষণ সমাগত। সেই আদ্যাশক্তির পরা ও অপরাশক্তির যুগপৎ জাগরণের প্রতীক্ষায় রইলাম। জাগবে, সে নিশ্চয়ই জাগবে। দশদিক আলো করে জেগে উঠবে মাতৃশক্তি। তবেই নিশ্চিত হবে এ জগৎ সংসার।

প্রাগ ন্যাশনাল গ্যালারির সদর দপ্তর।

বোহেমিয়া-বাভারিয়ার ভূখণ্ডে

কুণাল চট্টোপাধ্যায়

কোনো ভ্রমণ সংস্থার সহায়তা নয়। নিজেরাই স্বাধীনভাবে ঠিক করেছি যাত্রাপথ। প্রথমে রোম ছুঁয়ে প্রাগ। সেখান থেকে মিউনিখ ও বাভারিয়ার প্রকৃতি চাক্ষুষ করে অস্ট্রিয়ান আল্পস দেখতে দেখতে ইতালির তাসকানি আসা। এক অর্থে বলা যায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে অঞ্চল জুড়ে রেনেসাঁস তথা নবজাগরণ সারা বিশ্বকে আলোড়িত ও আলোকিত করেছিল সেই ভূখণ্ডকে চাক্ষুষ করা এবং একই সাথে সেখানকার ঐতিহাসিক উপাদানের যথাসম্ভব আস্বাদ নেওয়া। ২৮মে, ২০১৭ সকাল সাতটায় উড়ান। তাই লাউঞ্জে নিদ্রাহীন রাত কাটল। পরদিন ঘড়ির কাঁটা ধরে রানওয়েতে দৌড় সেরে পাইলট জানালো For minor fault flight will be delaid. ঘণ্টা দু'য়েক বিমানে বসে ও প্রাতঃরাশ সেরে ফের লাউঞ্জে। আরও দু'ঘণ্টা পর পোর্ট ব্লেয়ার থেকে আসা বিমানে যখন দিল্লি পৌঁছলাম রোমগামী ফ্লাইট তখন চলে গেছে। বিমানকর্মী জানালো দুটো পথ খোলা আছে। রাতে হোটেলে থেকে পরদিন ভায়া ফ্রাঙ্কফুর্ট দশ ঘণ্টায় রোম, নয়তো দুবাই গিয়ে সেখান থেকে মাঝরাতে এমিরেটস-এর উড়ানে পরদিন এগারোটায় রোমে নামা। ভায়া ফ্রাঙ্কফুর্ট গেলে প্রাগের ফ্লাইট মিস হবে। তাই ভায়া দুবাই যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো।

দুবাই থেকে রোম যাত্রায় পানীয় হাতে সামনের মনিটরে গ্রেগরি পেগ-আড্রে হেপবার্নের 'রোমান হলিডে' চালু করে ভাবলাম যাক যাত্রায় বাধা কাটল। তখনো বুঝিনি বিড়ম্বনার কিছু বাকি আছে। রোমের ফিউমিসিনো (অধুনা লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি) এয়ারপোর্টে নেমে জানলাম প্রাগগামী রায়ান এয়ার সিয়ামপিনো থেকে উড়বে, যে এয়ারপোর্ট চল্লিশ কিলোমিটার দূরে। টিকিটে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। না জানাটা আমাদেরই অজ্ঞতা। হাতে সময় কম। অগত্যা ট্যাক্সিতে রওনা। বয়স্ক সুদর্শন চালক। ইংরেজি বোঝে। বাইরে সাজানো সুন্দর নিসর্গের দ্রুত সরে যাওয়া।

সিয়ামপিনো খুবই ছোট হাওয়াই আড্ডা। উদ্বেগ, খিদে, ক্লান্তি,

নিদ্রাহীনতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রোমের গ্রীষ্মের উত্তাপ। এ যেন কলকাতাকেও হার মানায়। দু'ঘণ্টার উড়ানে আহারের ব্যবস্থা নেই। মন কোনো ভাবেই তাই সৌন্দর্যভুক হতে নারাজ।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মতো ইতালির দক্ষিণে সমুদ্র এবং উত্তরে আল্পস। দেশটার তিন দিকেই সমুদ্র। পুবে অ্যাড্রিয়াটিক, পশ্চিমে টাইরেনিয়ান এবং লিওরিয়ান। দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর। সেখানে তার নিকট আত্মীয় গ্রিস। 'ইতালি' নামটা গ্রিক ঔপনিবেশিকদেরই দেওয়া। আবার 'গ্রিস' নামটাও দিয়েছে ইতালির মানুষেরা। মাছের লেজের আকারে পেনিনসুলা ইতালি ঢুকে গেছে ভূমধ্যসাগরের মধ্যে।

বিমান আল্পসের উপরে আসে। দিল্লি-লে পথের মতো বরফশৃঙ্গের সমুদ্র না হলেও বেশ কিছু বরফাবৃত শৃঙ্গের খুব কাছ দিয়ে উড়ে চললাম। অস্ট্রিয়া অতিক্রমের পর স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয় জার্মানির ডেগেনডর্ফের কাছে ইশার আর ডানিউবের সঙ্গম দৃশ্য। অপরূপ অস্ট্রিয়ার টাইরোল অঞ্চলের নিজস্ব নদী ইশার। রাজকীয় ডানিউবের ইশারায় ক্ষীণকটি ইশার যেন দিশাহারা। এক সময় এসে যায় প্রাগ। যার স্থানীয় নাম প্রাহা। আকাশ থেকে দেখা যায় লাল টালির গৃহশীর্ষের স্কাইলাইন। বলা যায় চেক রিপাবলিকের সাথে আজ আমরা চেকমেট হলাম।

আকারে বা গুরুত্বের বিচারে লন্ডন, পারী বা ফ্রাঙ্কফুর্টের সমগোত্রীয় নয় প্রাগ। বিমানবন্দর থেকে সিটি সেন্টারের দূরত্ব ১৮ কিলোমিটার। গাইডের পাঠানো নির্দেশিকা মেনে কার্ডে ৯০ মিনিট মেয়াদের টিকিট নিয়ে বাস-মেট্রো-ট্রাম সফর শেষে এসে গেলাম মধ্য ইউরোপের সুন্দরতম শহরের কেন্দ্রে। বাসে দেখছিলাম রমণীয় নৈঃশব্দের নিসর্গে আলুলায়িত সবুজ। শহরের প্রাণকেন্দ্রের অন্য রূপ। প্রাগের অভিজাত বৈভব দেখে প্রথমেই তমোনাশকে মনে পড়লো। সে বলেছিল প্রাগকে বাদ দিয়ে ইউরোপ ভ্রমণ ভাবা যায় না।

পথের দু'ধারে সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরের ভবনগুলির নির্মাণশৈলী, প্রাচীনত্ব, অলংকরণ নির্নিমেষে দেখার মতো। দুপুর তিনটে। রোদের তেজ আমাদের চৈত্রমাসকে মনে আনছে। এমন গরম পাবো স্বপ্নে ভাবিনি। তারই মধ্যে দীর্ঘ দিনের প্রত্যাশিত গ্রীষ্ম পেয়ে নর-নারী যেন সবাই ঘর ছেড়ে পথে। পরনে শর্টস আর টি-শার্ট। মহিলাদের এক বড়ো অংশের হাতে সিগারেট। পরিচ্ছন্ন ফুট জুড়ে স্থানে স্থানে ওপেন এয়ার পানীয়ের আয়োজন।

ভলটোভা রিভারের পূর্ব ও পশ্চিম জুড়ে প্রাগ। পশ্চিমে প্রাচীন শহর, পর্যটন দ্রষ্টব্যের সিংহভাগ সেখানে। পূর্বাঞ্চল আধুনিক। এই দিকে চার্চিল স্কোয়ার ছাড়িয়ে ছোট্ট স্টেডিয়াম ঘেঁসা নির্জন পাথর বিছানো পথ সোজা মিশেছে এক চিত্তাকর্ষক চার্চের সিঁড়িতে। এই পথের ওপর আমাদের আস্তানা, হস্টেল পেনশন ১৫। অতি প্রাচীন ভবনটিতে অ্যান্টিক ছাপ সর্বত্র।

সূর্যাস্তের পরে পরেই গাইড তার গাড়ি নিয়ে হাজির। ছ'ফুট দীর্ঘ সুদর্শন সাতাশ বছর বয়সি লুকাসকে আবিষ্কার করেছি গুগল সার্চ করে। ওরই ছকে দেওয়া পরিকল্পনা মতো আজ সন্ধ্যায় ওর বাড়িতে আমাদের ডিনারের নিমন্ত্রণ। আমাদের সল্টলেকের মতো প্রসারণশীল অঞ্চলের এক নবনির্মিত আবাসনের এক তলায় আমাদের দু'জনের জন্য অপেক্ষারত লুকাসের মা, স্ত্রী ও দিদি। দিদির কোলে তার বছর চারেকের কন্যা, আর স্ত্রীর কোলে লুকাসের দু'বছরের কন্যা। ঘরভর্তি বই ও সেই সঙ্গে দেওয়াল জোড়া মডার্ন আর্টের পেন্টিঙের সমাবেশ। লুকাস জানালো ওগুলো তার ঠাকুর্দার আঁকা। স্ট্যালিনের আমলে চরম নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন তিনি।

কুকিস, নুড্‌ল স্যুপ, বেকন, ঘরে বানানো বিশেষ চেক ডেলিকেসি ডাকলিঙ্ক সহযোগে ডিনার সেরে ঘরে ফেরা গেল। দু'জনেরই তখন প্রয়োজন নিটোল ঘুমের।

> Prague is not just a city but an entity of some kind.
>
> – Sezin Koehler

সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে দশটা ব্রেকফাস্ট আওয়ার। খাদ্য সম্ভারে এলাহি আয়োজন। দেখভালের দায়িত্বে দুই সুন্দরী চেক প্রৌঢ়া। ব্রাউন ব্রেড, স্লাইস্‌ড ব্রেড, বান, ক্রিশেন্টো কী নেই? জ্যাম, বাটার, চিজ, হনি, পি-নাট ক্রিম, কর্নফ্লেক, দুধ, পর্ক ও বিফের মিক্সড সসেজ। দু'রকমের ফ্রুট জ্যুস, কফি, টি সব কিছু মজুত। ইচ্ছে মতো খাও। এহেন প্রাতঃরাশ সহ থাকা খরচ দৈনিক মাথাপিছু ১১০০ টাকা।

দশটায় লুকাস হাজির। ওর সঙ্গে পায়ে হেঁটে আমরা আজ প্রাগ আবিষ্কার করবো। ঘুম থেকে উঠেই কাছের পার্কে মর্নিংওয়াক সেরে এসেছি। সযত্নে সাজানো সবুজ উদ্যান। পোষ্যকে সঙ্গী করে চেক প্রৌঢ়। ইউরোপের অন্য সব শহরের মতো সারমেয়প্রেমী মানুষ প্রাগেও কম নয়। চার্চিল স্কোয়ারে লাঠিতে ভর দিয়ে হেলে দাঁড়ানো উইনস্টন চার্চিলের মূর্তি। বেশ ক'বছর আগে লন্ডনে ওয়েস্ট মিনস্টার লাগোয়া পার্লামেন্ট স্কোয়ারে চার্চিলের এমন মূর্তি দেখেছি।

কেবল চার্চিল স্কোয়ার কেন, শহরের আনাচে কানাচে নানা ধরনের ভাস্কর্য। গুণমানে বিষয় বৈচিত্র্যে প্রত্যেকেই যেন একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। কোন মাত্রায় সৌন্দর্যবোধ কাজ করলে এমনভাবে শহরকে সাজানো যায়। রাস্তার ডিভাইডার শেষ হয়েছে এক ফোয়ারা ঘেরা বৃত্তে। তার চার প্রান্তে চারটি মানবমূর্তি। এরা কেউ বেহালা বাদনরত, কেউ বাঁশি। কারো হাতে অন্য তারবাদ্য। চীনের একাধিক অতি আধুনিক চোখ ধাঁধানো শহরের কোথাও কোন ভাস্কর্য চোখে পড়েনি। ঢাকায় তো মূর্তি নির্মাণ প্রায় নিষিদ্ধ। প্রাগ শহরের সৌন্দর্যায়ন দেখলে নিজের শহরের দৈন্য চোখে পড়ে। নবনির্মিত চিৎপুর লকগেট ফ্লাইওভার যেখানে বি. টি. রোডে মিশেছে সেখানে কোন ভিক্টোরিয়ান স্থাপত্য বা নিদেনপক্ষে আর্ট কলেজের ছাত্রদের কোনো চিত্তাকর্ষক সৃষ্টি শোভাবর্ধন করতে পারতো। তার পরিবর্তে নিত্য দর্শন করতে হয় খোলা প্রক্ষালনে পুরুষদের পশ্চাদদেশ। কলকাতাকে লন্ডন করার ইচ্ছে কার না হয়? কিন্তু বাস্তবায়নের জন্য বোধ হয় বয়স লাগে। প্রাগের ক্ষেত্রে বুদ্ধি মুক্তির শুরু সেই ত্রয়োদশ শতকে।

বিভিন্ন ট্যুরিস্ট লিটারেচারে প্রাগকে নানা ভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। কেউ বলে Walking distance Prague. কারো বর্ণনায় Prague is a small magical city. আবার কারো মতে প্রাগ হলো Romantic Hollywood fairy tale. প্রখ্যাত হলিউড অভিনেতা ও পরিচালক অ্যালান লেভি লিখেছেন, 'আমি শুধু মৃত্যুর আগে প্রাগ শহরকে আর একবার দেখবার স্বপ্ন দেখতাম। আমার জীবনের আশ্চর্য ঘটনা হলো, একবিংশ শতকের প্রতিটি সকালে আমি জেগে উঠি প্রাগ শহরে।'

লুকাসকে অনুসরণ করে আমরা পুরনো প্রাগে প্রবেশের জন্য পাউডার টাওয়ারের সামনে এসে থামলাম। গথিক স্থাপত্যে নির্মিত এটি পাউডার গেট নামেও পরিচিত। শহরের তেরোটি প্রবেশ দ্বারের অন্যতম প্রধান দ্বার এটি ১৪৭৫ সালে নির্মিত। অতীতে রাজ অভিষেকের শোভাযাত্রা এই তোরণদ্বার দিয়ে ক্যাসেল অভিমুখে যেত। সপ্তদশ শতকে এটি বারুদ রাখার গুদাম হিসেবে ব্যবহার করার কারণেই এমন নাম।

পাউডার গেটের লাগোয়া প্রাগ নগরপালিকার সদর দপ্তর। অপূর্ব তার নির্মাণশৈলী যে কোনো পর্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য। অনুষন্ধিৎসু ভ্রমণকারী পাউডার গেটের ১৪৫ ফুট ওপরে উঠে প্রাগ দর্শন করতে পারে।

এসে গেলাম শহরের প্রাণকেন্দ্র চালর্স স্কোয়ারে। প্রাগবাসীর প্রধান মিলনক্ষেত্র এই রেন্ডেভুকে কেন্দ্র করে নগর জীবন আবর্তিত হয়। প্রশস্ত পাথর বিছানো অঞ্চলটি ইউনেস্কোর হেরিটেজ তকমা পেয়েছে। একপ্রান্তে স্ট্রিট মিউজিসিয়ানরা বাদনরত। এদের সকলেই প্রবীণ নাগরিক। চেলো, বেস গিটার ও বেশ কিছু স্থানীয় তারের যন্ত্রানুষঙ্গে গান গাইছে জনৈক প্রৌঢ়। এদের ঘিরে পর্যটকের জটলা। সর্বত্র এক কার্নিভালের ছোঁয়া।

স্কোয়ারের উত্তরপ্রান্তে রাজকীয় মর্যাদায় দাঁড়িয়ে বিখ্যাত জোড়া স্পায়ারের চার্চ। নাম, চার্চ অফ আওয়ার লেডি বিফোর টাইন।

চার্লস ব্রিজ থেকে প্রাগ ক্যাসের দৃশ্য।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

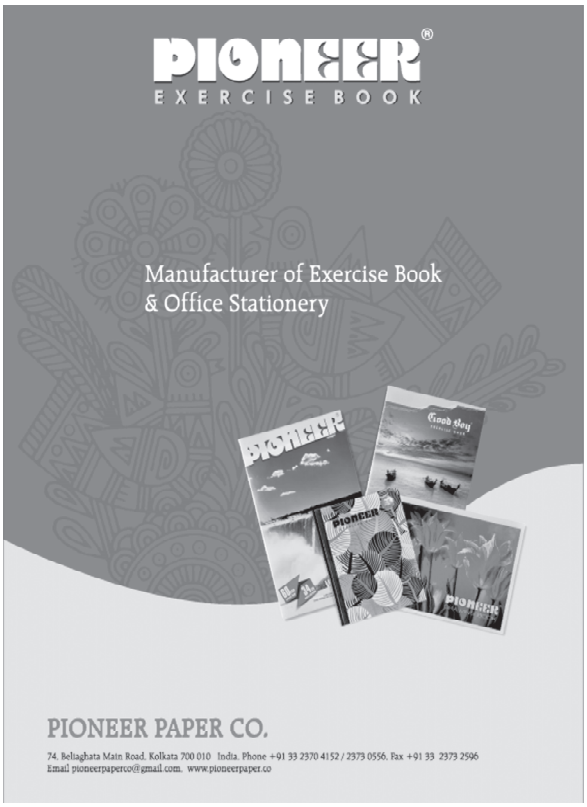

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

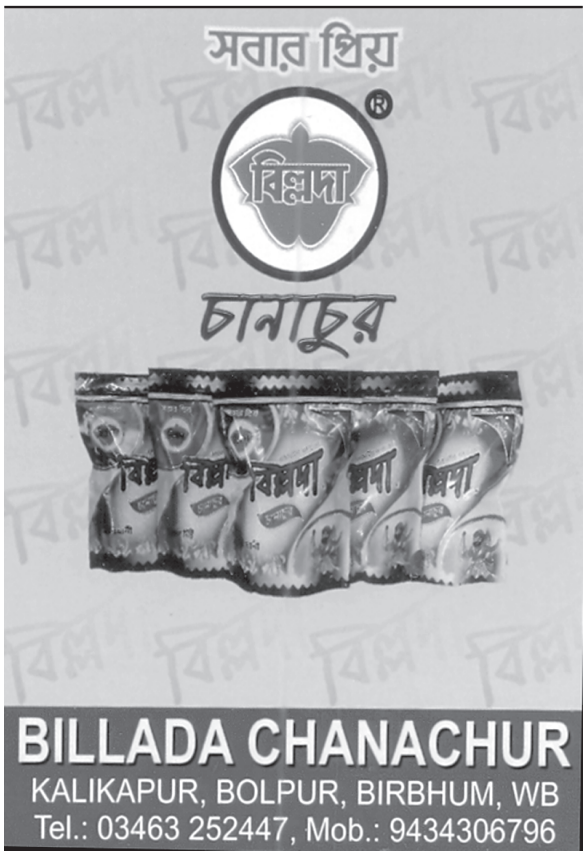

বোহেমিয়ান প্যারাডাইস, প্রকৃতি নিজেই যেখানে শিল্পী।

৮০ মিটার উঁচু এই রোমানেস্ক চার্চটি ১২৫৬ সালে গথিক ছোঁয়া পায়। অতি সূক্ষ্ম অভ্যন্তরভাগে সিলিং থেকে শুরু করে সর্বত্র অমূল্য পেইন্টিং। এই চার্চের অভ্যন্তরে প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহের (১৫৪৬-১৬০১) সমাধি। ড্যানিশ এই মহাবিজ্ঞানী জ্যোতির্বিদ প্রথম সূর্যকেন্দ্রিক গ্রহাবর্তনের ধারণা থেকে ক্যাসিওপিয়ার নক্ষত্রপুঞ্জ আবিষ্কার ও মহাকাশ বীক্ষণের নানান যন্ত্রই কেবল উদ্ভাবন করেননি, ছাত্র কেপলারকে এনে এই শহরকে বিজ্ঞান তীর্থে পরিণত করেছিলেন। ইউরোপের রেনেসাঁসের মূলে বড়ো অবদান ছিল সে যুগে প্রাগের লোকেদের শিক্ষাদীক্ষা ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গী। বুঝতে অসুবিধা হয় না আইনস্টাইন কেন এই প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ ও পাহাড়ে ঘেরা অতিমনোরম শহরটির প্রেমে পড়েছিলেন। পাকা জহুরির মতো এ শহরও আইনস্টাইনকে চিনতে ভুল করেনি। ১৯১০-এ ইউরোপের সবচেয়ে পুরনো ও প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অন্যতম প্রাগে থিওরেটিক্যাল ফিজিক্সের প্রধান অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন তিনি।

চার্চের সামনেই এক অসাধারণ ভাস্কর্য যার মধ্যমণি হয়ে দণ্ডায়মান চেক প্রজাতন্ত্রের পরমপূজ্য ব্যক্তিত্ব জন হুশ (১৩৬৯-১৪১৫)। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই মানুষটি একাধারে পুরোহিত, দার্শনিক, শিক্ষক এবং প্রাগের চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন ও রেকটর পদ অলংকৃত করেছিলেন। কবে কোন মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের ক্রান্তিকালে তাঁর প্রজ্ঞা ও আত্মত্যাগ কেবল বোহেমিয়া নয় সমগ্র বিশ্বের শ্রদ্ধা কুড়িয়েছে।

মধ্যযুগে রোমান পাপাল শাসনের স্থলন, বিজ্ঞান বিরোধী অবস্থান ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই মহাপুরুষটি মার্টিন লুথার, কেলভিন প্রমুখের একশো বছর আগে চার্চ রিফর্মেশন আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ফলে পোপের রোষানলে পড়তে সময় লাগেনি। এই স্থানে জীবন্ত পুড়িয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়। বধ্যভূমিতে নতজানু হয়ে দু'হাত তুলে উচ্চস্বরে প্রার্থনা করলে ঘাতকরা তাঁকে নগ্ন করে দু'হাত পিছন দিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে শুকনো কাঠ ও ঘাসের স্তূপে স্থাপন করে। অগ্নিসংযোগ মুহূর্তে কাউন্ট প্যালেটাইনের উপস্থিতিতে মার্শাল ভন প্যাপেল হেইন হুশকে ক্ষমাভিক্ষা করে নিজেকে বাঁচাতে বললে হুশ বলেন, God is my witness that the things changed against me, I never preached. In the same truth of the Gospel which I have written, taught and preached drawing upon the sayings and positions of the holy doctors, I am ready to die today.

কথিত আছে ঘাতকেরা অগ্নি প্রজ্বলনের উদ্দেশে ঠিক মতো জ্বালানি জড়ো করতে না পারলে কোনো এক মহিলা নাকি কিছু শুকনো পাতা সরবরাহ করে তাদের সাহায্য করে। তা দেখে মৃত্যুপথযাত্রী হুশ বলেছিলেন, Sancta simplicitas, চেক ভাষায় যা, Svata Prostota, ইংরেজিতে যার অর্থ Holy simplicity. আজও মানবতা বিরোধী কোনো নিষ্ঠুর কর্মে কোনো নির্বোধের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এই বাগধারাটি প্রাগে চালু। মৃত্যুর

আগে হুশের শেষ উক্তি ছিল, Christ, Son of living God, Have mercy on us. এই মহামানবের মৃত্যুর পর হুশাইটরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং ক্যাথলিক ক্রুশেডে তিনবার পোপকে পরাস্ত করে। সেই সময় জান জিজকার (১৩৬০-১৪২৪) নেতৃত্বে বোহেমিয়া এক শক্তিশালী পোপ বিরোধী শক্তিতে পরিণত হয়।

একটা ভাস্কর্য একটি জাতির ইতিহাসকে ধরে রেখেছে। এই মহাত্মাকে আত্মস্থ করে চেক সত্যিই আত্মপ্রকাশের অবকাশ পেয়েছে। রোমান ও অস্ট্রিয়ান শাসনে দীর্ঘকাল থেকে এই বোহেমিয়-মোরাভিয় ভূমিতে যে পলি সঞ্চিত হয়েছে তারই ফল তরুণ চেকভূমির সন্তানেরা। হুশ বা জিজকা থেকে ফ্রয়েড, কাফকা, কুন্দেরা, ডুবচেক, নাভ্রাতিলোভা। দেশটা ছোট হলেও তালিকাটা নেহাত ছোট নয়।

প্রাগের ওল্ড টাউন স্কোয়ারে রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে নিজেকে যখন হুশাইট ভাবতে শুরু করেছি তখনই লুকাস টাউন হলের দক্ষিণ দেওয়ালে টাঙানো ওরলজের সামনে এনে দাঁড় করালো। সকলেরই দৃষ্টি ঊর্ধমুখী 'ওরলজ', অর্থাৎ গ্রেট অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ক্লকের দিকে। কোন অতীতে ১৪১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রাগবাসীকে সময় সচেতন করে চলেছে এই ঘড়ি। নিজের শহর কলকাতায় জি.পি.ও.-র ঘড়ি থেকে বিগবেন কম ঘড়ি দেখলাম না কিন্তু ওরলজ যেন আরও কিছু। কাদান আর সিনদেল নামের চালর্স বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার দুই অধ্যাপক এটির নির্মাতা। কালের অতন্দ্র প্রহরীর মতো 'ওরলজ' অবস্থান করছে। দেখেছে অনেক, এমনকী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পার্শ্ববর্তী ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হলে সাময়িক চলা থামলেও পুনরায় সচল হয়েছে ১৯৪৮-এ। চন্দ্র সূর্যের অবস্থান, রাশিচক্রের স্থান বদল থেকে শুরু করে বাবিলনীয়, মধ্যযুগীয়, খ্রিস্টীয় নানা ধরনের সময় জানাচ্ছে এই ঘড়ি। প্রতি ঘণ্টায় পুতুল মোরগের ডাক ও ঘণ্টাধ্বনির সাথে ঘড়ির তলায় রাখা কাঠের জানালা খুলে গেলে খ্রিস্টের শিষ্যদের পৌত্তলিক মূর্তি বামদিক থেকে একের পর এক দক্ষিণে যায়। যায় মৃত্যুর চিহ্নবাহী একটি নরকঙ্কাল মূর্তিও।

বায়রন বলেছেন, যতদিন কলোসিয়াম ততদিন রোম। তেমনি প্রতিটি প্রাগবাসী বিশ্বাস করে যতদিন 'ওরলজ' ততদিন প্রাগ। দুপুর বারোটায় অসংখ্য পর্যটকের মধ্যে দাঁড়িয়ে চলমান পুতুলের সঙ্গে ঘণ্টাধ্বনি শুনতে শুনতে ভাবতে লাগলাম সত্যি সময় এক মহার্ঘ বস্তু। অতীত সেখানে ইতিহাস, ভবিষ্যৎ রহস্য, আজকের দিনটাই উপহার তথা Gift. তাইতো তার অন্য নাম Present. আজকের এই ৩০ মে, ২০১৭ দিনটি আমার কাছে আক্ষরিক ভাবেই পরমপ্রাপ্তি হয়ে থাকলো।

পায়ে পায়ে চলে আসি পারিজস্কা স্ট্রিটে। দু'ধারে কারুকার্য ও চিত্রের সাহায্যে সাজানো প্রাচীন ভবন, আধুনিক রেস্তোঁরা, বিলাসবহুল বিপণী প্যারিসকে মনে পড়ায়। এই শহর সুলভ ও

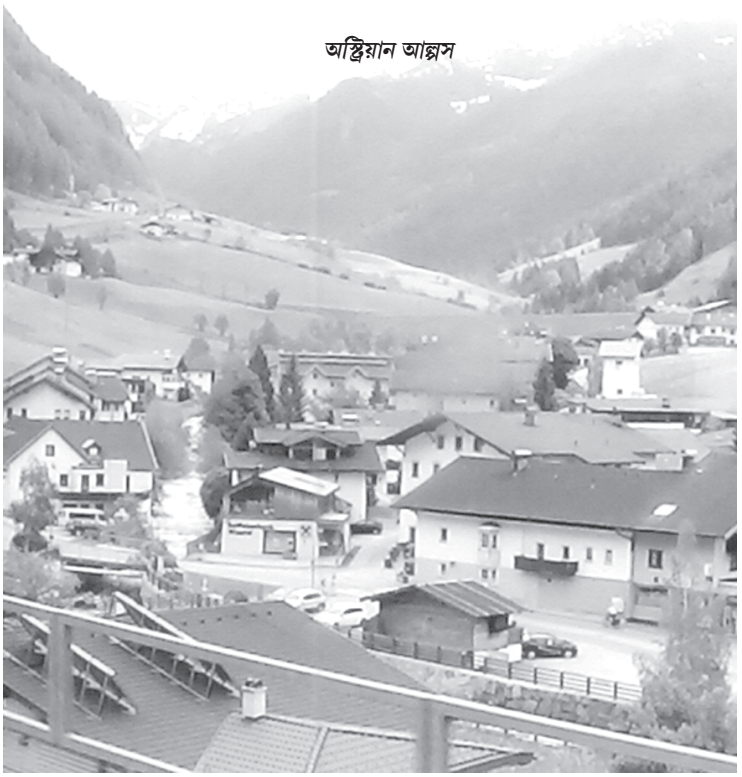

অস্ট্রিয়ান আল্পস

স্বাদু বিয়ারের জন্য ইউরোপে বিখ্যাত। মিউনিখের পরেই নাকি তার স্থান। কয়েক কদম আসতেই মধ্যযুগের স্পর্শ। অতি প্রাচীন ইহুদি নগরীতে ঢুকে পড়ি।

লুকাস ওল্ড-নিউ সিনাগগের সামনে দাঁড় করিয়ে জানায় অষ্টম শতকে ইউরোপে প্রাচীনতম ইহুদি গোষ্ঠী এখানে গড়ে উঠেছিল। এটি ইউরোপের প্রাচীনতম ও একই সাথে ধারাবাহিক ভাবে উপাসিত সিনাগগ। অভ্যন্তর ভাগের ভাবগম্ভীর পবিত্র পরিবেশ এক শুদ্ধ সমাহিত অনুভূতির সৃষ্টি করে। পাশেই ইহুদি সমাধিক্ষেত্র। পাঁচিলে ঘেরা এই ক্ষুদ্র স্থানটি তাদের কষ্টকর দমন পীড়নের স্মৃতি বহন করে চলেছে। পাশেই স্প্যানিশ সিনাগগের কারুকার্য স্তম্ভিত করে দেয়। এই শহর পিনকাস সিনাগগে ধরে রেখেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইহুদিদের ওপরে নেমে আসা দানবীয় নিষ্ঠুরতার স্মৃতিকে। যে অংশে নাৎসী কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প হয় বর্তমানে সেটা মিউজিয়াম। এ শহরে একলক্ষ কুড়ি হাজার ইহুদির সংখ্যা ১৯৪৫-এ মাত্র পনেরো হাজারে নেমে আসে। এখানে আটাত্তর হাজার স্থানীয় ইহুদির জন্মমৃত্যুর তারিখ ও পারিবারিক নাম সযত্নে পাথরের দেওয়ালে লেখা।

চেকদের এই পবিত্র ভূমিতে ইহুদিদের করুণ কাহিনি ও

মানবেতিহাসের এক ঘনকৃষ্ণ অধ্যায়কে ধরে রেখেছে টেরেজিন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প। প্রাগ থেকে এক ঘণ্টার দূরত্ব। একটা শান্ত নির্জন গ্রাম, যেখানে একলক্ষ চল্লিশ হাজার ইহুদি নর-নারী, শিশু বৃদ্ধ নির্বিশেষে গেস্টাপো বন্দিশালায় রাখা হয়েছিল। যাদের মধ্যে ৩৩ হাজারের মৃত্যু হয়েছিল। এদের অনেকেরই অন্তিম গতি হয়েছিল ট্রেবলিঙ্ক, আউসভিস্ট-এর মতো গ্যাসচেম্বারগুলিতে। যেটা অবাক হওয়ার তা হল তার মধ্যেও ওইসব নর-নারী তাদের ভয়াবহতাকে অস্বীকার করেও ধর্মীয় উৎকর্ষ ও সৃষ্টিশীলতা বজায় রেখেছিল। দুঃখের বিষয়, সময়গতভাবে প্রতিবন্ধী থাকায় টেরেজিন আমাদের অদেখা থেকে গেল।

১৩৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত মধ্য ইউরোপের প্রাচীনতম চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়, যার অন্য নাম ইউনিভার্সিটি ক্যারোলিনা দেখে আমরা Lesser Town -এ চলে এলাম নদীর পশ্চিম প্রান্তে।

গির্জাকে কেন্দ্র করে একসময় এ শহরে যে শিল্প সৃষ্টির প্লাবন ঘটেছিল তা ছড়িয়ে আছে অসংখ্য ক্যাথিড্রালে চার্চে। বারোক স্টাইলের অন্যতম সেরা দৃষ্টান্ত স্ট্রহোভ মনাস্টারি ও তার উপাসনালয় যখন অবাক করছে তখন গোল্ডেন লেনের সেন্ট ভিটাস ক্যাথিড্রাল যেন মনে মনে বলছে, 'ওরে পাগল আমাকে এখনো দেখিসনি।' এসব দেখলে বোঝা যায় কেন প্রাগকে City of hundred spires বলে। প্রাগের এই Lesser Town, Castle Town হিসেবেও পরিচিত। স্ট্রহোভের সৃষ্টি কবে কোন ১১৪৩ খ্রিষ্টাব্দে। ১৭৮৭ তে মোজার্ট এখানে অর্গান বাজিয়েছিলেন। পাশেই প্রাগ লোরেটো। তার Holy House of Our Lady এটিও বোহেমিয়ান বারোক শিল্প রীতির এক অনবদ্য রত্ন বিশেষ।

হাজার দর্শনার্থীর মধ্যে ঝাঁকি দর্শনের বেশি কিছুই হচ্ছে না। দেখতে দেখতে বেশ কিছু সিঁড়ি ভেঙে একসময় কখন এসে গেছি প্রাগ ক্যাসেলের মধ্যে। গিনিস বুক অফ রেকর্ড জানাচ্ছে সমুদ্র তল থেকে ১৮৭০ ফিট উঁচুতে সাড়ে সাতলক্ষ বর্গফুট এলাকা জুড়ে গড়া এই ক্যাসেলটি নাকি বিশ্বের বৃহত্তম প্রাচীন ক্যাসেল। বছরে এই ক্যাসেল প্রায় কুড়ি লক্ষ পর্যটক আকর্ষণ করে। ৮৭০ খ্রিস্টাব্দে এর পত্তন চার্চ অফ ভার্জিন মেরী দিয়ে। পরবর্তীকালে গড়ে ওঠে সেন্ট জর্জ, সেন্ট ভিটাসের মত ব্যাসিলিকাগুলো।

প্রাগ ক্যাসেলের অন্তর্গত সেন্ট ভিটাস ক্যাথিড্রালকে বিশ্বের সেরা তিনটি ক্যাথিড্রালের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। গত এক হাজার বছরে যত রকম স্থাপত্য রীতির সৃষ্টি হয়েছে সবগুলোই এখানে ব্যবহৃত। এখানকার বারগ্রেভ প্যালেস প্রাঙ্গণে প্রতিবছর সামার শেক্সপিয়র ফেস্টিভাল হয়। বর্তমানে এই প্রাসাদ চেক রাষ্ট্রপতির বাসস্থান। বাকিংহামের মতো এখানকার প্রহরী বদল দর্শনীয়। ক্যাসেল প্রাঙ্গণ থেকে সমগ্র প্রাগ নগরীর এক চিত্তাকর্ষক বিহঙ্গ দৃশ্য ধরা দেয়।

পায়ে পায়ে এসে যাই প্রাগের Exotic sounding name চার্লস ব্রিজে। কতো কাব্য, কতো বর্ণনা এই সুপ্রাচীন চতুর্দশ শতকের স্টোন ব্রীজকে নিয়ে। আধ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সেতুটি ৯০ ফুট চওড়া। পুরোটাই পাথর বিছানো। তলায় বয়ে চলেছে টলটলে ভলটোভা।

একটা ব্রিজকে ঘিরে এমন ভালোবাসা বিশ্বে বিরল। হবে নাই বা কেন। সাত সাতটি শতাব্দী ধরে এই ঐতিহাসিক নগরীর দুই প্রান্তের সংযোগকারী এই সেতু প্রাগ নগরীর আইকনিক সিম্বল। কেবল এঞ্জিনিয়ারিং মার্ভেলই শুধু নয়, এই সেতুকে ঘিরে প্রাগবাসীর আবেগ সুবিদিত। সেতুতে যানবাহন নিষিদ্ধ। পর্যটকের ঢল নেমেছে। সেতুর দু'ধারে পনেরোটি করে ত্রিশটি অসাধারণ মূর্তি। প্রতিটির কেবল ঐতিহাসিক মূল্যই নয় স্থাপত্য শৈলীও অসামান্য। এর বেশিরভাগই বারোক শিল্পরীতির নিদর্শন। বেশির ভাগই সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে নির্মিত। সেন্ট বার্নাডের কাছে সমর্পিতা ম্যাডোনা, যীশুর ক্রুসিফিকশন, সেন্ট ফ্রান্সিস অফ আসিসি, সেন্ট ক্রিস্টোফার বা সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারদের মতো মূর্তিগুলো কাকে ছেড়ে কাকে দেখি। বেশ বোঝা যাচ্ছে অপরাহ্নের ক্লান্তিতে আর যাই হোক

চার্লস ব্রীজ দর্শন করা উচিত নয়। কুয়াশা ঢাকা নির্জন শীতের সকালে চার্লস ব্রিজকে পাওয়া এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। এই সেতু দর্শনের সেরা সময় সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের মুহূর্তে।

টাউন হল ছেড়ে কাফকা মিউজিয়মের সামনে স্থির হই। দ্য ট্রায়াল, দ্য মেটামোরফোসিস, ইন দ্য পেনাল কোডের মতো উপন্যাস ও অসংখ্য কালজয়ী ছোট গল্পের স্রষ্টা এই চেক ইহুদি লেখককে কে না জানে। কাম্যু, ফুঁকোর সাথে এক সারিতে রাখা এই স্বল্পায়ু (১৮৮৩-১৯২৪) লেখক Alienation তত্ত্বের অন্যতম জনক। লিখেছেন জার্মান ভাষায়। আমস্ট্রার্ডামের ভ্যানগগ মিউজিয়ামের মতো লেখকের এই জন্মস্থানেও গড়ে উঠেছে কাফকা মিউজিয়াম।

সঙ্গী রাজীবের আই ফোন জানিয়ে দিচ্ছে সকাল থেকে এই পর্যন্ত বারো কিলোমিটারে কতগুলো স্টেপ ফেলেছি আমরা। লুকাস আমাদের ভিটকভ পার্ক দেখিয়ে ঘরে ফেরাতে চায়।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি দ্রষ্টব্য দর্শনের নেশায় ক্ষুধাবোধ কমে যায়। কিন্তু ক্লান্তি, সংক্ষিপ্ত সময়ে সবকিছু দেখার তাগিদ জনিত এক অস্বস্তি শরীরে বাসা বাঁধে। আমার অবস্থা ঠিক তেমন। তাই মুজতবা আলিকে স্মরণ করে স্ট্রিট কাফেতে বসে ফ্রায়েড চিজ স্যান্ডুইচ সহ বিয়ারের অর্ডার দিলাম।

ঘড়িতে ছটা বাজে। রোদ দেখে মনে হচ্ছে দুপুর দুটো। এই সময় এখানে প্রায় চোদ্দ ঘণ্টা রোদ থাকে। লম্বা দিনের আলো থাকায় ভ্রমণের চাহিদাও স্বভাবতই বাড়ে।

ভিটকফ পার্ক শহরের প্রান্তে অনুচ্চ এক পাহাড় শীর্ষে বিশাল সবুজের সমারোহে বানানো। পার্কের এক প্রান্তে জাতীয় স্মারক বানানো হয়েছে। সেখানে বিশাল অশ্বারোহী জান জিজকার মূর্তি। এটি নাকি বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম ব্রোঞ্জ মূর্তি।

পাহাড়ি সবুজের পারিপার্শ্ব ছেড়ে পায়ে পায়ে এসে গেলাম দিনের শেষ দ্রষ্টব্য জিজকভ টিভি টাওয়ারের সামনে। জিজকভ ডিস্ট্রিক্ট থেকে এই নামকরণ। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯২ এর মধ্যে নির্মিত এই টাওয়ারটি হাই-টেক আর্কিটেকচারের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। মহাকাশ যান সদৃশ এই ২১৬ মিটার উঁচু সৃষ্টিটির তিন কোণ থেকে তিনটি কলাম উঠে গেছে। তার একটি অন্য দুটির প্রায় দ্বিগুণ। এই কলামগুলো স্টীলের পাতের মধ্যে কংক্রিট দিয়ে নির্মিত। এই টাওয়ারের ৬৬ মিটার উচ্চতায় ১৮০ আসন বিশিষ্ট একটি রেস্টুরেন্ট আছে। সত্তর মিটার উচ্চতায় আছে হোটেল এবং ৯৩ মিটার উঁচুতে আছে অবসারভেটরি।

জিজকভ টাওয়ারকে দেখে সাংহাইয়ে হুয়াংপু নদী তীরে ওরিয়েন্টাল পার্ল রেডিও টিভি টাওয়ারের কথা মনে আসে। সেখানেও কলোসাল হাইটে রেস্টুরেন্ট আছে। সাংহাই টাওয়ারের তুলনায় জিজকভ উচ্চতায় অর্ধেকের কিছু কম, কিন্তু সৌন্দর্যে খাটো নয়।

যেটা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার তা হল এই উজ্জ্বল রুপোলি ধাতব কলামগুলোর গায়ে বেশ কিছু হামাগুড়ি দেওয়া শিশুর মূর্তি আটকানো। অনেকেই উঠছে, কেউ বা নামছে। ফলে শিল্পকর্মটি যান্ত্রিক ঔদ্ধত্যের মধ্যেও পেয়েছে এক মানবিক ছোঁয়া।

জিজকভও নির্মাণকালে আইফেলের মত এক শ্রেণীর মানুষের কাছে কম সমালোচিত হয়নি। আইফেল বিরোধী মোপাসা বা এমিল জোলার মতো জিজকভের ক্ষেত্রেও অনেকেই এর মধ্যে সৌন্দর্য খুঁজে পায়নি। কমিউনিস্ট শাসনকালে আনুষ্ঠানিক ভাবে না পারলেও চেকোশ্লোভাকিয়ার তদানীন্তন রাষ্ট্রপ্রধান তথা কমিউনিস্ট প্রেসিডেন্টের নামানুসারে জিজকভ টাওয়ারকে জ্যাকস্ ফিংগার বলে কটাক্ষ করা হয়েছে। এই সব সমালোচকদের অন্য যুক্তি ছিল শতাব্দী প্রাচীন ইহুদি সমাধি ক্ষেত্রের একাংশ ধ্বংস করে নাকি এই টাওয়ার বানানো হয়েছে। যুক্তি যাই হোক টাওয়ারটি আমার মতো অতি সাধারণ পর্যটককে নতুনত্বের স্বাদ দিয়েছে সে কথা বলতে বাধা নেই।

> Prague, the city so beautiful that it was spared by Hitler
>
> – World of Wanderlust

ইউরোপে Culturally best preserved city -তে আজ তৃতীয় দিন। আজ আমাদের লক্ষ্য বোহেমিয়ান প্যারাডাইস। সারাদিন ট্রেকিং-এ কাটবে। হিমালয়ের দেশের মানুষ আক্ষরিক ভাবেই আজ বোহেমিয়ান। আভিধানিক অর্থে বোহেমিয়ার অধিবাসীকে বোহেমিয়ান বলে। যে অর্থে লুকাস বোহেমিয়ান। এছাড়া শিল্পে নিবেদিত প্রাণ আপনভোলা মানুষকেও বোহেমিয়ান বলা হয়। যেমন ভ্যানগগ, বিভূতিভূষণ, জীবনানন্দ। সৃষ্টিছাড়া প্রতিভাবানরাই বোহেমিয়ান হতে পারে। কিন্তু ডাচ কারেজ, কৃপণ স্কচদের মতো বোহেমিয়ার সঙ্গে বাউন্ডুলের যোগ কেন কে জানে।

নিজের গাড়ি নিয়ে লুকাস হাজির। প্রাগ থেকে ৯০ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে এই স্বর্গের অবস্থান। স্থানীয় লোকজনের কাছে 'চেশকি রাজ' নামে এটি পরিচিত। একঘণ্টা যাত্রাপথে চেক গ্রামাঞ্চল দেখার সুযোগ মেলে। স্টিয়ারিং-এ বসে কথায় কথায় লুকাস জানায় এখানে নাকি কেউ গাড়িতে হর্ণ বাজায় না। যদি হর্ন বাজে তাহলে বুঝতে হবে ভুল করে আঙুল হর্নের নবে পড়ে গেছে। বোঝা যায় বিশ্বে হ্যাপিনেস ইন্ডেক্সে চেক রিপাবলিক কেন ছ'নম্বরে। লুকাস ইন্ডিয়ার খবর রাখলেও অমিতাভ বচ্চনের নাম শোনেনি।

এসে গেলাম চেশকি রাজের দ্বারপ্রান্তে। একটা মাত্র কাঠের সাজানো কটেজ। এখান থেকে টিকিট কেটে গাড়ি পার্কিং করে শুরু হল পায়ে হেঁটে স্বর্গের সিঁড়ি ভাঙা। প্রথমে অনেকটা সমতল অরণ্য। আমাদের ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগনার মতো। ম্যাপল,

বার্চ, ওক ও নানা অচেনা গাছের সমাবেশ। সাদা বড়ো বড়ো বুনো ফুল ফুটে আছে। তেমন কোনো পাখি চোখে পড়ছে না। জনমানবহীন অরণ্যে আমরাই একমাত্র পর্যটক। লুকাস জানায় আমাদের মতো ট্রেকিং করে চেশকি রাজ দর্শনে তেমন ট্যুরিস্ট ও বড়ো একটা পায় না।

কাল রাতে এখানে ঝড়বৃষ্টিতে কিছু গাছ পড়েছে তাই সরাতে ট্রাক্টর নিয়ে এসেছে কর্তৃপক্ষ। অরণ্য তেমন ঘন নয়। তবে পাইনের সমাবেশ নজর কাড়ে। এক সময় শুরু হল পাথরের রাজত্ব। বিশাল বিশাল নানা মাপের পাথরের ফাঁক দিয়ে উঠে আসা গেল অনেকটা ওপরে। দূরে সবুজ সমতল কৃষিক্ষেত, বাগিচা, গ্রাম কুমায়ুন হিমালয়ে সামলাতাল পূর্ণাগিরি থেকে যেমন দৃশ্য ধরা দেয় অনেকটা তেমন।

দেখা হলো একদল স্কুল ছাত্র-ছাত্রীর সাথে। মোরাভিয়া অঞ্চল থেকে ওরা এসেছে। প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর প্রত্যেকে। আমাদের পেয়ে বেজায় খুশি। এক সঙ্গে ছবি তুললাম। অত্যন্ত মনোরম আবহাওয়া।

ধীরে ধীরে চেশকি রাজ যেন তার আসল রূপ প্রকাশ করছে। পাথুরে পথ এতটাই পরিচ্ছন্ন যেন মনে হয় এইমাত্র কেউ ঝাড়ু দিয়ে গেছে। তার অন্যতম কারণ জঙ্গলে মৌসুমী ভারতবর্ষের মতো গোরু, মোষ, কুকুর, ছাগল, শেয়াল, ভাম প্রভৃতির অনুপস্থিতি। ফ্লোরা ফনায় আমাদের তুলনায় কম সমৃদ্ধ এই বোহেমীয় অরণ্যাঞ্চল। গায়ে গায়ে প্রায় জুড়ে থাকা সুউচ্চ পাথরের ফাঁকে ঠিক একজন মানুষ যেতে পারে এমন অসংখ্য গলিপথ যা Labyrinth নামে পরিচিত। রহস্যঘন বিচিত্র প্রস্তর গবাক্ষ বলা যায়।

অনেকটা উঠে আসার পর হঠাৎ যেন সকল দৃশ্য এক নিমেষে বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে হারিয়ে গেল। চোখের সামনে ধরা দিল অসংখ্য পাথরের অবস্থান। যেমন রহস্যজনক তাদের গঠন তেমন বিস্ময়কর

ওরলজ, গ্রেট অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ক্লক

সমাবেশ। যতদূর দৃষ্টি চলে ঘন পাইনের কালচে সবুজে ঘেরা অসংখ্য পাথরের অবস্থান। কোনটার আকার যেন কোনারকের মন্দির, কোনটা বা রামকিঙ্করের ভাস্কর্য। চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে অবিকল যেন শিশু কোলে জননী। প্রকৃতি নিজেই যেন তার শিল্পসত্তা প্রমাণে মরিয়া।

মনে মনে নিজেরাই নিজেদের ডেস্টিনেশন নির্বাচনকে বাহবা দিই। কতো দিন ধরে প্রকৃতি নিজের খেয়ালে বৃষ্টিপাত বাতাস, শীতলতা, ভূমিক্ষয় ও পরবর্তীকালে আগ্নেয়গিরিকে মোকাবিলা করে এই ভূতাত্ত্বিক শিল্পকলা রচনা করেছে। শতশত বছর ধরে এই বোহেমীয় স্বর্গ তার অপার্থিব সৌন্দর্যের ছটায় আকর্ষণ করে চলেছে চিত্রকর, লেখক, শিল্পী, স্বপ্নসন্ধানীকে। চেশকি রাজ যেন চেক জেম স্টোনের এক প্রাকৃতিক অনন্য সংগ্রহশালা। এক রূপকথার দেশ। ১৯৫৫ সালে এই প্রকৃতি উদ্যানটি ইউনেস্কো চিহ্নিত ক্ষেত্রের মর্যাদা পায়। বর্তমানে এর আয়তন ৭০০ বর্গ কিলোমিটার মতো।

পাহাড়ের মাথা থেকে নেমে জঙ্গলের মধ্যে মাটির পথের চৌমাথায় এক কাঠের বেঞ্চে বসি। লুকাস বাড়ি থেকে এনেছে সকলের জন্য ব্রেড আর কলা। বোহেমিয়ান লাঞ্চ এই শব্দবন্ধের বাস্তব রূপায়ণ। তিনদিকে ওক আর ম্যাপল গাছকে সঙ্গী করে পায়ে চলা পথ চলে গেছে এই বোহেমিয়ার খণ্ড খণ্ড স্বর্গে।

এমনই একটা পথ ধরে এগিয়ে চলি তিনজন। ভারতের ডুয়ার্স, শ্রীলঙ্কার সিংহরাজ বা চেক রিপাবলিকের চেশকিরাজ যাই হোক না কেন জঙ্গলে পায়ে হাঁটার আনন্দই আলাদা। টলটলে জলের সরোবর, কোনো পরিত্যক্ত ধ্বংসাবশেষ, সুসজ্জিত কোনো সংগ্রহশালা কিংবা বেশ কিছু রাজপুরুষের ক্যাসেলে সাজানো এই সংরক্ষিত অরণ্য। এমনই এক ক্যাসেলে এসে উপস্থিত হলাম। ঐশ্বর্যের দিক দিয়ে অনাড়ম্বর কিন্তু আভিজাত্যের চিহ্ন ক্যাসেলটির সর্বাঙ্গে। ভদ্রাসনে গৃহস্থ নেই, আছে মোটা দক্ষিণায় প্রবেশ ব্যবস্থা। তাই ইচ্ছে হল না ঢোকার।

> Prague never lets you go... this dear little mother has sharp claws.
>
> – Franz Kafka

প্রাগকে বিদায় জানাতে কষ্ট হচ্ছে। যদি কোনো একটি কারণে এ শহরকে ভালো লেগে থাকে সেটা হতে পারে এখানকার নাগরিক আবহাওয়ার মধ্যেও একধরনের নির্জনতার স্বাদ। আমাদের দেশে যেটা গ্যাংটক বা শিলঙে পাওয়া যায়।

সেন্ট্রাল বাস স্টেশন থেকে দশটার ইউরোলাইন বাসের টিকিট সঙ্গে নিয়েই কলকাতা ছেড়েছি। বাসে ওয়াইফাই, টয়লেট, স্বয়ংক্রিয় কফি বিয়ারের কিয়স্ক কী নেই। ছুটে চলল তাপ নিয়ন্ত্রিত সুসজ্জিত

যান। বোহেমিয়ার চেক রিপাবলিক ছেড়ে কখন বাভারিয়ার জার্মানিতে ঢুকলাম বোঝা গেল না। বাইরে চোখ জুড়োনো প্রকৃতি।

এই বাসযাত্রা আমাদের মতো সময়ের দিক দিয়ে প্রতিবন্ধী ভ্রমণকারীকে বেশ কয়েকটি দ্রষ্টব্য দেখিয়ে দিল। সারি সারি লুফ্‌থানসার বিমান সমেত মিউনিখ বিমানবন্দর ছাড়াবার পর এসে গেল সার্কাস তাঁবুর মতো জালের নকসায় বানানো আলিম্পিক স্টেডিয়াম। সেই সঙ্গে দূরে চোখে পড়ল টিভি টাওয়ার। সব শেষে বি.এম.ডব্লু মোটর সংস্থার দৃষ্টিনন্দন প্রধান কার্যালয়ের ভবন। এটি ভিয়েনার বিখ্যাত এক আর্কিটেক্টের বানানো। মিউনিখ নাকি 'ব-চতুষ্টয়ের' জন্য বিখ্যাত। এগুলি হল বিল্ডিং, বি.এম.ডব্লু, বেয়ার্ন মিউনিখ আর বিয়ার। তার মধ্যে প্রথম দুটির প্রমাণ চলন্ত বাস থেকেই পাওয়া গেল। অবশেষে সাড়ে তিন ঘণ্টার যাত্রা শেষ হল দেখার মতো নকসায় নির্মিত মিউনিখ সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাসে।

মোরাভিয়ান ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বোহেমিয়ান প্যারাডাইসের জঙ্গলে।

পাশেই ব্যস্ত রেল স্টেশন।

বাভারিয়া প্রদেশের রাজধানী মিউনিখের সঙ্গে হিটলারের জীবনযুদ্ধ নানা ভাবে জড়িয়ে আছে। ভিয়েনায় পেন্টিং স্কুল অ্যাকাডেমিতে ভর্তির পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ কিশোর হিটলার এই মিউনিখে এসে পথে পথে নিজের আঁকা ছবি বেচে রোজগার করতো। এই শহরেই তার সেনাবাহিনীতে যোগদান ও নাৎসি দলের জন্ম। মিউনিখের শোভায় মুগ্ধ হিটলার তার আত্মজীবনী মাই কেম্ফে লিখেছেন..... One has not seen Germany if one does not know Munich no, above all else one does not know German Art if one has not seen Munich.

এ শহরেও আমরা উঠবো হোটেল পেনশনে। স্টেশন থেকে দূরত্ব আড়াই কিলোমিটার। জনবিরল রাস্তায় সওদাগরি দপ্তর সমৃদ্ধ অঞ্চলে এই হোটেলটি। পরিচ্ছন্ন সুসজ্জিত ভবনটিতে প্রাগের মতো অ্যান্টিক ছোঁয়া নেই, রয়েছে আধুনিকতার বৈভব। মিনি ম্যানিকিওর্ড গার্ডেন লাগোয়া রিসেপশানে ঝুড়ি ভর্তি ওয়েলকাম চকোলেট। আমাদের দেশের যে কোন থ্রি-স্টার হোটেলের সমগোত্রীয় বলা যায় এটিকে।

মিউনিখকে আমরা দিয়েছি মাত্র দু'রাত। তার মধ্যে আগামী কাল কাটবে ১৩০ কিলোমিটার দূরে ফুসেন শহর লাগোয়া নিউসোয়াস্টাইন ক্যাসেল দর্শনে। তাই আজকেই যতটা সম্ভব মিউনিখ দর্শন করতে হবে। সেকথা রিসেপশনের তরুণটিকে জানালে সে গাইডম্যাপ হাতে ধরিয়ে প্রাণপণে তার জার্মান ইংরেজিতে জানালো সিটি সেন্টার ও সেখানকার বিখ্যাত টাউন হল তেমন দূরে নয়। যদি আমরা পায়ে হেঁটে শহর দর্শন করতে চাই তাহলে কেবল মারিয়ান প্লাজ সেন্টারে ওই টাউন হলেই দিনের বাকি সময়টা কাটানো ভালো। জানলাম বেয়ার্ন মিউনিখ স্টেডিয়াম অনেকটাই দূরে। ছেলেটি অভিজ্ঞ ট্যুরিস্ট গাইডের মতো বলল, The character of a city is defined by its gardens. সেই সঙ্গে জানতে চাইলো আমরা কেন ইংলিশ গার্ডেন দেখবো না। ১৭৮৯ সালে ৩৭৫ হেক্টর এলাকা জুড়ে গড়ে ওঠা এই উদ্যানটি নাকি নিউ ইয়র্ক সেন্ট্রাল পার্কের (৩৪১ হেক্টর) চেয়েও বড়। মনে মনে ভাবি স্টেশন থেকে আসার পথে টের পেয়েছি এ শহরে চোখ জুড়োনো সবুজের সুপরিকল্পিত সমারোহ। কুড়ি শতাংশেরও বেশি অংশ জুড়ে এখানে খোলা আকাশ।

প্রাগ থেকে এসে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ইউরোপের বৃহত্তম জি.ডি.পি.-র দেশে এসেছি। কেবল অর্থই নয় চিন্তার ঐশ্বর্যের ছোঁয়াও সর্বত্র। জার্মানিতে এটা আমার দ্বিতীয় সফর। আগেরবার ঢুকেছিলাম হল্যান্ড থেকে কোলনে। রাজপথের মাঝে ও দু'ধারে ছায়াদানকারী স্থানীয় মৃত্তিকার একান্ত আপন বৃক্ষ বিন্যাসের মাধ্যমে সৌন্দর্যায়নের চিহ্ন। এসব দেখে মন ভারাক্রান্ত হয় যখন ভাবি বিশ্ববঙ্গ সরণিকে নিঃস্ব করে বেছে নেওয়া হচ্ছে মুখ্যত সেই অনাত্মীয় গাছ যা সৌন্দর্যে খেজুর গাছকেও লজ্জা দেবে। খেজুর গাছের তবু বিউটি না থাক ইউটিলিটি আছে। শীতে কলসি বাঁধা হলে দুর্গা টুনটুনি রসাস্বাদে আকৃষ্ট হয়। মাসকাট, দুবাই প্রভৃতি শহরে যে হাইব্রিড ম্যাকার্থুরি নামের গাছ দিয়ে সৌন্দর্যায়ন হয় সেই গাছ আমাদের সরকারি ভবন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে রাজপথ সর্বত্র বিদ্যমান। ফল-জ্বালানি-ছায়া কোনোটাই দিতে না পারা এই বন্ধ্যা বৃক্ষ নির্বাচন কার অনুপ্রেরণায় কে জানে।

শহরের প্রাণকেন্দ্র মারিয়ান প্লাজ। প্রাচীন টাউন হলের স্থানে নতুন টাউন হলকে ও সেন্ট পিটার চার্চকে ঘিরে এই চত্বরটি মিউনিখ শহরের প্রাণভোমরা বলা যায়। পনেরো লক্ষ মানুষের শহর মিউনিখে সারা বছর এক কোটি ট্যুরিস্টের আগমন হয়। প্রাগের

চালর্স স্কোয়্যারের সমগোত্রীয় এই মারিয়ান প্লাজ। সৌধটির নির্মাণ ১৮৬৭-তে শুরু ও ১৯০৯-এ শেষ। ব্রাসেলস টাউন হলের অনুকরণে নির্মিত এই গথিক ভবনটি নিঃসন্দেহে গর্ব করার মতো। পাঁচটি স্টিপল সমন্বিত এহেন স্থাপত্য বিরল বলা চলে। চারশোটি কক্ষ সমন্বিত এই বিল্ডিংটিতে শহরের মেয়রের ও বেশ কিছু সরকারি অফিস রয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে বিখ্যাত ঘড়ি ও তার কুপারর্স ডান্সার্স। প্রাগের গ্রেট অ্যাসট্রোনমিক্যাল ওরলজের মিউনিখ সংস্করণ যেন। এখানেও সকাল এগারোটা, দুপুর বারোটা ও বিকেল পাঁচটায় পুতুলরা নৃত্য প্রদর্শন করে।

এখানে এখন বসন্তকাল। নানান দেশের নর-নারীর জমায়েত ও তাদের কোলাহলকে ছাপিয়ে দূরাগত সমবেত কণ্ঠে পরিচিত সুর ক্রমশ কাছে এল। জনা কয়েক তরুণ-তরুণী খোল-করতাল ও অ্যাকোর্ডিয়ান সহযোগে কৃষ্ণকীর্তনরত। ইসকনের স্থানীয় ভক্তদের কপালে রসকলি, পরনে নির্ভেজাল বাঙালি ধুতি ও শাড়ি। স্বভাবতই সুর এবং নৃত্য সংক্রামিত হয়। মেতে গেলাম ওদের সঙ্গে। একটি ভারতীয় বালক তার বাবা-মায়ের হাত থেকে ছিটকে এসে আমাদের সঙ্গে গলা মেলালো। এ এক অনির্বচনীয় অনুভূতি। ট্যুরিস্টদের ক্যামেরা, সেলফির সক্রিয়তা জার্মান তন্বীর নৃত্য-গীতে স্মরণীয় হয়ে উঠল মারিয়ান প্লাজের অপরাহ্ন। আমরা ভক্তিবেদান্তর কলকাতা থেকে এসেছি শুনে বেজায় খুশি কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা স্থানীয় ভক্তকুল।

এই স্কোয়ারেরই লাগোয়া ভিক্টোরিয়ান মার্কেট। এটা ফার্মার্স মার্কেট নামেও খ্যাত। তাজা ফলের রস থেকে সসেজ কী নেই। সর্বোপরি রয়েছে বিশাল গাছের তলে বেঞ্চপাতা খোলা বিয়ার গার্ডেন। প্রায় শ'পাঁচেক লোকের সমাবেশ সেখানে। কাউন্টারে কল খুলে অবিরাম নানা মাপের মগে বিয়ার ভরে পরিবেশন করছে বিশেষ বাভারিয়ান পোশাকের জার্মান সুন্দরীর দল। অক্টোবরের বিয়ার উৎসবে মিউনিখের এই খালাসিটোলা কী রূপ নেয় অনুমান করা যায়। এই উৎসবময়তা আর কোথায় মিলবে? সসেজ সহ বিয়ার আনতে গিয়ে টের পেলাম এহেন মগ তুলতে গেলে জার্মান কব্জির প্রয়োজন। আমার মতো চা-কফির কাপ তোলা বাঙালি কবজির পক্ষে কাজটা বেশ কঠিন।

বিকেল গড়িয়েছে অনেকক্ষণ। গোধূলির মিউনিখে সারা দিনের ক্লান্তি দূর করতে এহেন আয়োজন ছেড়ে উঠতে মন চায় না। চার দিকে বিত্তবান সুখী মানুষের দল। এই মুহূর্তগুলোতেই মনে হয় জীবন কেবল যাপনীয়ই নয় উপভোগ্যও বটে। জীবনে কখনোই বেহিসেবি হওয়ার সুযোগ পাইনি। হিসেব করে মেপে চলা দৈনন্দিন প্রাত্যহিকতা থেকে ছিটকে বেরিয়ে চলে এসেছি। পরিচিতজনেদের অনেকের কাছেই এটা এক ধরনের রোমাঞ্চ। এই সব ইউরোপিয়ানদের কাছে এটা তাদের জীবনযাপনের অঙ্গ বিশেষ। একটু বেহিসেবি হওয়ার ইচ্ছে হয়। নিয়ে ফেলি আরও একবার ফেনিল বিয়ারের মগ। এবার আমি দার্শনিক হতে বাধ্য। এদেশের বিয়ার কি সত্যি নন অ্যালকোহলিক? পাশে বসে বয়স্ক পানরত জনৈক পর্যটকের সঙ্গে আলাপ হয়। একা এসেছে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে। এমনই এক সত্তরোর্ধ নিঃসঙ্গ দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গর সঙ্গে দেখা হয়েছিল হিমালয়ে হর-কি-দুন-এর পথে কলকাত্তাইয়া ধারে।

ঠিকানা নেই আগু পিছুর
কারো সঙ্গে যোগ না কিছুর
ক্ষণকালের ভোজবাজি এই ঠাট্টা।

এই সন্ধ্যা অক্ষয় অমর হলে কী ভালোই না হত। হঠাৎ অন্তরাত্মা বলে উঠল, 'টুপভুজঙ্গ হয়ে যেয়ো না। উঠে পড়ো।' অন্ধকার ঘনানোর পর কোন শহরেই আমরা বেশিক্ষণ বাইরে কাটাই না। ডিনারের আসরে বোঝা গেল খাওয়ার খরচ মিউনিখের তুলনায় প্রাগে অনেক কম।

There's a famous slogan here in Bavarian dilect, and we use it inside Bayern Munich. We say 'Mia San Mia'. It means we are we.

– Bastian Schweinstiger

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে প্রাতঃরাশ সারা গেল। শেষে আকণ্ঠ জার্মান ইয়োগার্ড খেয়ে সোজা স্টেশন। বুকিং কাউন্টারে শুনলাম টিকিটের চাহিদা আছে, কারণ আজ শনিবার। উইক এন্ড শুরু। বুকিং ক্লার্ক টিকিট দিয়ে বলল ইউ উইল গেট চার্মিং সিনারি।

পরিবহণের সুব্যবস্থায় জার্মানীকে ইউরোপের স্বর্গ বলা হয়। পাঁচজনের একটা দল তৈরি করতে পারলে বাসভাড়া অবিশ্বাস্য হারে নাকি কমে যায়। দলে দলে জার্মান যৌবন আজ তাই ঘর ছাড়া। অনেকেরই সঙ্গে সাইকেল। তাতে দু'দিনের আয়োজন ঠাসা। বাকিরা তরুণ তরুণী নির্বিশেষে ব্যাকপ্যাকার। সাইকেল নিয়েই ট্রেনে উঠছে। এরা সাইকেলকে এখনও আত্মার আত্মীয় মর্যাদা দিচ্ছে। এদের যৌবনের এহেন চাঞ্চল্য দেখলে কথাটা সত্যি মনে হতে বাধ্য যে যৌবন এখানেই। এদের মধ্যেই জন্ম নেয় কার্লের মতো তরুণ ও ওয়ান্ডার লুস্ট, ওয়ান্ডার ফোগেল, ইউথ হোস্টেলের মতো মুভমেন্ট।

সিট নম্বর নেই। পছন্দ মতো আসন নিলাম। ঘণ্টা দুয়েক বাভারিয়ান আল্পস দেখতে হবে। মুখোমুখি আসনের মাঝে টেবলে রঙিন রুটম্যাপ। ফলে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। কোন স্টেশন আসবে, কিংবা কখন অ্যালপাইন লেকের দর্শন পাবো। আধুনিক যুগে নির্মিত রূপকথার ক্যাসেল দর্শনের লক্ষ্যে আপাতত আমাদের গন্তব্য জার্মানির পাহাড়ি শহর ফুশেন।

দু'বছর আগে ১৪ হাজার ফিট উচ্চতায় টিবেটান রেলওয়ের অভিজ্ঞতা টাটকা। সেখানে শীতল মরুভূমি থেকে নমোসো লেকের স্বর্গীয় শোভায় চমকিত হয়েছি। আজ তরঙ্গায়িত সবুজের মাঝে লেকের সৌন্দর্য দু'চোখ ভরে দেখে পুলকিত হচ্ছি। ভারতেও জম্মু-কাশ্মীরে নবনির্মিত রেলপথে কামরা থেকে ভূস্বর্গ দর্শন করেছি। কেন জানি না মনে হয় এই বাভারিয়া যদি ভোগের ঘরের সুসজ্জিত পাশ্চাত্য সুন্দরী হয়, কাশ্মীর বা তিব্বত যেন অনাদৃতা প্রসাধন-উদাসিনী তন্বী।

ট্রেনের কামরা থেকে আল্পসের খণ্ডিত অংশই কেবল দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। একেবারে নিখুঁতভাবে সাজানো, যাকে বলে ম্যানিকিয়োর্ড বিউটি। কোথাও এতটুকু আগোছালো নয়। দূরে কালো পাইনের ব্ল্যাকফরেস্ট আরও দূরে অধিক উচ্চতায় বরফে সাজানো শৃঙ্গ। সামনের টেবিলের ছবি জানিয়ে দিচ্ছে দু'পাশে জনহীন ঢেউ খেলানো সবুজের বুক চিরে এই ট্রেনকে কেমন দেখাচ্ছে।

ফুসেন স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে মিনিট দশ বাসযাত্রা। দূর থেকেই ধরা দিল ঘন কনিফারের অন্দরে পিকচার পোস্টকার্ডের মত নিউসোয়ানস্টেইন ক্যাসেল। ছোটদের ফেয়ারিটেলে যে ছবির সঙ্গে আমরা পরিচিত হুবহু তার বাস্তবায়ন। জার্মানির এই জনপ্রিয়তম ক্যাসেলটি দেখেই ওয়াল্ট ডিজনি তাঁর ম্যাজিক কিংডম গড়ার প্রেরণা পান। ১৮৬৯ থেকে ১৮৮৬ এই সতেরো বছরে রাজা লুডউইগের হাতে বানানো এই ক্যাসেল। বড়লোকের খেয়ালই বটে। ওয়াগনারের পরম ভক্ত রাজা। নাট্যকারের অন্যতম বিখ্যাত চরিত্র সোয়ান কিং-এর স্মৃতিতে বানিয়েই ফেললেন পাহাড় শীর্ষে এই অসামান্য দুর্গসদৃশ প্রাসাদটি। প্রতিরক্ষার প্রয়োজন কখনোই হয়নি। তবুও বানালেন। চারতলা সৌধের ভিতরে ইন্দ্রের ভুবনের আয়োজনের কোনো ত্রুটি নেই। অসমর্থ বা বয়স্ক নর-নারী জোড়া ঘোড়ার কোচে চলেছে। হিমালয়ে অনেকবার এমন চড়াই ভেঙে যাওয়ার অভিজ্ঞতায় নতুন তেমন আকর্ষণ বোধ করছি না। গন্তব্যে পৌঁছে অস্ট্রিয়া ঘেঁষা নিচের হহেনসিউয়ানস্টেইন উপত্যকার দৃশ্য ও দূরের লেকের দৃশ্য ভুটানের ফুন্টসোলিং পাহাড়ের গুম্ফা থেকে তোর্সা ভ্যালির দৃশ্যকে মনে আনে।

পরদিন ইতালির পথে ট্রেন বদল করতে ইন্সব্রুকে কয়েক ঘণ্টা কাটলো। কাচ ঢাকা ট্রেনে গরমে কাহিল হয়ে অস্ট্রিয়ান আল্পস অতিক্রম মোটেই সুখদায়ক নয়। ইউরোপে গরম অবশ্যই বেমানান। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষ আমরা, তাই ইউরোপে এসে অস্ট্রিয়ান আল্পসে গরমে কষ্ট পাব কল্পনার অতীত।

স্টেশনটা একেবারে আল্পসের কোলে বসানো। পাহাড়ের মাথায় ছাইরঙের বরফের সারি। সত্যজিৎ রায়ের প্রফেসর শঙ্কুকে নিয়ে একটি কাহিনিতে এই শহরের নিখুঁত বর্ণনা আছে। হিটলারের অতিপ্রিয় শৈলশহর সাউন্ড অফ মিউজিক-ধন্য সলজবুর্গের সঙ্গে সুধা ধবলতায় এ শহর প্রতিস্পর্ধী হওয়ার ক্ষমতা রাখে। স্টেশনের জৌলুস জানিয়ে দেয় অস্ট্রিয়া কেন ইউরোপের বনেদি শাসক। হাঙ্গেরি, ক্রাকাউ, বোহেমিয়া, বসনিয়া, ক্রোয়েশিয়া তাকে ছেড়ে চলে গেলেও তার ভিয়েনা আছে, আছে ডানিউব। স্টেশনের চেহারা দেখে অনুমান করা যায় লোকারণ্যের পারি, রোম, লন্ডনের তুলনায় এখানকার শহরগুলো ধোঁয়াশা ও কোলাহলকে বিদায় দিয়ে এক অ্যারিস্টোক্র্যাটিক সাইলেন্স সহ রাজকীয় আভিজাত্য বজায় রেখেছে। জ্যুরিখ, জেনেভা, ভিয়েনা, ইন্সব্রুকের মতো শহরে ঝাঁকি দর্শন করা উচিত নয়।

জেনেভা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান সঞ্জীবন মহারাজ সময় নিয়ে একা সেখানে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করলেও পরিস্থিতিগত বাধ্যবাধকতায় এ যাত্রায় যাওয়া হলো না। ■

With Best Compliments From -

A

Well Wisher

উপন্যাস

অভ্রকণা, অশ্রুকণাগুলি

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

আজ অবধি কোনো হিসাবই মেলাতে পারলাম না। আসলে আমি তো হিসাবটা করতেই জানি না। — বুড়োর দিকে তাকিয়ে বলল মিলন। ঈষৎ যেন চিন্তিত মনে হলো তাকে। মিলনের উল্টোদিকে চেয়ারে মুখোমুখি বুড়ো বসে। বুড়োর মুখে একটা ফিচেল ধরনের হাসি। পুবদিকের জানালা দিয়ে সকালের রোদ এসে পড়েছে। একটু আগে জানালায় দুটো শালিক বসেছিল। মিলনের এখন কথা বলার ঘোর লেগেছে। বুড়োর মুখের দিকে তাকিয়ে আবার শুরু করল মিলন— জানেন তো, ছোটোবেলা থেকেই অঙ্ক কষতে পারতাম না। ফেল করতাম ক্লাসে। ভয়ে পিছনের বেঞ্চে গিয়ে বসে থাকতাম। এখনও কেউ হিসাব করতে বললেই আমার ভয় করে। কেমন যেন পেট গুলিয়ে ওঠে। বুকের ভিতর হুম্ হুম্ করে। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ— সব গুলিয়ে যায়। কী করি বলুন তো? এটা কি আমার অসুখ? বুড়োর চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করে মিলন। বুড়োর কোনো ভাবান্তর হয় না। শুধু ফিচেল হাসিটা আরও চওড়া হয়। তাহলে তোমার হিসেব করে কে— বলে বুড়ো, মিলনকে।

— কে আবার? আমার বউ। বউ বড় বকে আমাকে, জানেন। বলে, হিসাব করতে জানো না— লোকে ঠকিয়ে নিচ্ছে। সারা জীবন কী ঠকবে নাকি! বউটা বকে আমাকে, তবে ভালোও বাসে। দুপুরে বাড়ি ফিরতে দেরি হলে না খেয়ে বসে থাকে।

— বউ তো হিসাব রাখে, তুমি তাহলে কী কর সারাদিন?

— আমি? আমি তো সকালে ওই বাইক চেপে বেরিয়ে পড়ি। তা যদি বলেন, তো বাইকটারও তো অনেক বয়স হলো। কেমন যেন ঝরঝরে হয়ে গেল। বউ বলে— আমাকেও নাকি ওই বাইকটার মতো দেখতে।

— সাতসকালে বেরিয়ে পড়, তো, যাও কোথায়?

— ঘুরে ঘুরে অর্ডার ধরি। কার বাড়িতে গ্রিল বসবে, কার বাড়িতে গ্রিলে রং হবে এইসব। আমি অর্ডার ধরি, আর বউ দরদাম ঠিক করে। ওই যে বললাম না, আমি তো আসলে হিসাব বুঝি না।

— রোজ কি অর্ডার পাও?

— না, না। রোজ কি আর অর্ডার থাকে? তা ধরুন না, হপ্তায় দু-একটা পেয়ে যাই। আমাদের দুজনের সংসার। ওতেই চলে যায়।

— যখন অর্ডার পাও না, তখন কী কর?

— আসলে রোজ রোজ অর্ডার পেতে তো আমারও ভালো লাগে না। আমি তখন বাইকটা নিয়ে হাইওয়ে ধরে দূরে দূরে চলে যাই। ফাঁকা মাঠ দেখলে, গাছের তলায় বাইকটা রেখে আমিও শুয়ে থাকি চুপচাপ। বললে বিশ্বাস করবেন না বটে, মাটিতে কান পাতলে আমি তখন কতরকম শব্দ শুনতে পাই। মনে হয় মাটির তলায় ময়দানব আর একটা শহর বানাচ্ছে যেন। আর গাছেরও শব্দ শুনি। আমার কেন জানি ধন্ধ লাগে মাঝেমধ্যে। মনে হয়, গাছও যেন কথা বলতে পারে। সে পারে কী পারে না আপনি বলতে পারবেন ভালো। কত লেখাপড়া করেছেন।

— তারপর?

— তারপর কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমোতে ঘুমোতে একসময় ঘুমটা ভেঙে যায়। ধড়মড় করে উঠে পড়ি। তখন বউটার কথা আমার মনে পড়ে। তড়িঘড়ি বাইক চালিয়ে ফিরে আসি। দেখি, বউ ঠিক ভাত সাজিয়ে অপেক্ষা করছে। এইটুকুই তো আমার জীবন। আমি হিসেব বুঝি না, ঘুরে বেড়াই। আর বউ আমার গ্রিলের কারখানা সামলায়। যাই বলুন, বউ আমার লক্ষ্মীমন্ত কিনা।

এবার বুড়ো একটু প্রাণখোলা হাসে। বলে— তা বটে, তা বটে। এবার একটু চা খাও তো আমি বানাই।

— তা আপনি যদি বলেন, তো খাবো।

বুড়ো ওঠে। ইলেকট্রিক কেটলিতে জল বসায়। দূরে কোথাও একটা ঘুঘু ডাকছে। একটু আগে প্রান্তিক স্টেশন দিয়ে গুমগুম করে একটা মালগাড়ি চলে গেল।

— আপনার বউও লক্ষ্মীমন্ত।

— কী করে বুঝলে— গরম জলে চায়ের পাতা মেশাতে মেশাতে জিজ্ঞেস করে বুড়ো।

— সে বোঝা যায়। বলতে হয় না।

— তা, খুব ভুল বলোনি হে। আমার বউও একটু আধটু লক্ষ্মীমন্ত। আমি থাকব বলে কেমন বাড়িটা সাজিয়ে দিয়ে গেছে দেখেছো তো।

— লক্ষ্মীমন্ত বউ যখন, এখানে আপনি একা একা পড়ে থাকেন কেন?

— নাও চা খাও— মিলনের দিকে চায়ের কাপ বাড়িয়ে দেয় বুড়ো। নিজে চেয়ারের ওপর জমিয়ে বসে। বলে— কেন জানো? আসলে এখানে অন্য কেউ এসে থাকলে গাছেরা আমার সঙ্গে কথা বলে না। ওরা চায়, আমি শুধু ওদের সঙ্গে থাকি। শুধু ওদের সঙ্গেই কথা বলি। না হলে রাগ করে ওরা।

চায়ে চুমুক দেয় বুড়ো। অবাক হয়ে মিলন জিজ্ঞসা করে— তাহলে আপনিও গাছের কথা শুনেছেন? কথা বলেছে ওরা আপনার সঙ্গে?

— হ্যাঁ। বলেছে তো, এখনও বলে। সারাদিন কত কথা বলে ওরা আমার সঙ্গে। সকালে একরকম কথা বলে। বিকেলে একরকম। রাতের দিকে একরকম, আবার গরমকালে একরকম। বর্ষায় একরকম। কত কথা। কত কথা।

— ওহ্, তাহলে আপনিও জানেন, আপনিও জানেন। উত্তেজনায় হাতের চায়ের কাপ টেবিলে রেখে চেঁচিয়ে ওঠে মিলন। বলে— টুকিকে বলতেই হবে। টুকিকে আমি কতবার বলেছি, গাছেরা কথা বলতে পারে। ও বিশ্বাসই করে না আমার কথা।

— এবার আমার নাম করে বলো। বিশ্বাস করবে। কথা বলে বলেই তো ওদের আমি নাম রেখেছি। ওই যে বাড়ির পিছনে শিরিষ গাছটা— ওর নাম রেখেছি হৃদয়। আর সামনের বারান্দায় ডালপালা ছড়িয়েছে যে কৃষ্ণচূড়াটা, ওর নাম রেখেছি রূপকুমার। এদিকে ডালিম গাছটার নাম নবকুমার। আর ফায়ারবলটার নাম চিন্ময়ী। আচ্ছা, তা কী যেন নামটা বলছিলে— টুকি। তা টুকি কে? বউয়ের নাম নাকি?

— না, না। বউয়ের নাম নয়। বউ তো পারুল। টুকি আমোদপুরে থাকে। ভাতের হোটেল চালায়। আমি মাঝে মাঝে বাইক নিয়ে আমোদপুরে চলে যাই। টুকির হোটেল ভাত খাই। ডিমের ঝোল আর ভাত। বড় যত্ন করে খাওয়ায় টুকি। কতদিন বলেছি, টুকি, আমি হিসেব বুঝি না। ঠিকঠাক দাম কি তোকে দিতে পারলাম? টুকি দাম নেয় না। শুধু হাসে। বলে— সবার সব হিসাব বুঝে দরকার কী?

মিলন গলাটা একটু খাদে নামায় এবার। বলে— আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি!

— অনেক কথাই তো বলছ।

— বলছি, আসলে আমি ঠিক বুঝতে পারি না, টুকি কি আমাকে ভালোবাসে?

— সে আর আমি কী করে বলি বল? আমি তো নিজেই মানুষের মনের তল পাই না। আমি শুধু গাছেদের মন বুঝি।

চুপ করে বসে থাকে মিলন। ধীরে সুস্থে কাপের চা শেষ করে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলে— যাক, সকালটা অনেকক্ষণ কাটল আপনার সঙ্গে। এবার যাই। এবার একটু রতনপল্লির দিকে যাব। ওখানে গ্রিলের অর্ডার নিতে হবে। নতুন বাড়ি।

* * *

মিলন চলে যাওয়ার পর বুড়ো পুবদিকের বারান্দায় এসে বসে। এই বারান্দাটা ওর খুব প্রিয়। এখান থেকে গাছপালার ফাঁক দিয়ে প্রান্তিক স্টেশনটা দেখা যায়। মাঝে মাঝে মালগাড়ি যায় হুমহুম করে। রাতবিরেতে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে মালগাড়িগুলো দাঁড়িয়ে থাকে ইস্টিশনে। এক্সপ্রেস ট্রেন এসে থামে স্টেশনে। তখন একটু মানুষজনের ভিড়। তা বাদে ফাঁকা। বারান্দার গা ঘেঁষা এই শিরিষ গাছটায় অজস্র টিয়াপাখির বাসা। ভোরের দিকে ওরা হই-হই করে উড়ে যায় আকাশে। বিকেল পড়তে আবার ফিরে আসে। বুড়ো বসে বসে সারাদিন ওদের দেখে। আরও কত পাখি। সেদিন দুটো দোয়েল বারান্দার গ্রিলে বসে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছিল। আরও একদিন কী একটা নাম না-জানা পাখি। বুকের কাছটা হলদেটে। বুড়ো বারান্দায় বসে থাকে— ওরা এসে খেলে যায় চারদিকে। মোটেই ভয় পায় না বুড়োকে। বুড়োও অবশ্য ওদের ভয় দেখাতে চায় না।

বেশ অনেকক্ষণ বারান্দায় বসে থাকে বুড়ো। এখন একটু একটু করে তাপ বাড়ছে। কিন্তু বুড়োর বারান্দা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না। আজকাল, বুড়ো বুঝতে পারে, তাকে আলসেমিতে ধরছে। কখনো কখনো বসে থাকতে থাকতে ঘুম পেয়ে যায়। কতদিন এমন হয়েছে, চেয়ারে বসে ঘুমিয়েই পড়েছে বুড়ো। তারপর মালগাড়ির শব্দে ঘুম ভেঙেছে। আজকেও উঠতে ইচ্ছে করছিল না।

— ও দাদু শুনছ— রাস্তা থেকে রতন ডাকছে। ছেলেটা সারাদিন সাইকেলে টো-টো করে এ পল্লি থেকে ও পল্লি ঘুরে বেড়ায়। নার্সারিতে চাকরি করে। এবার নার্সারি থেকে একটা কাঠচাঁপার চারা এনে দেবে বলেছে। বোলপুরের হলে নতুন হিন্দি সিনেমা এলে সবার আগে লাইন লাগায়।

ডাক শুনে উঠে দাঁড়ায় বুড়ো। বারান্দার গ্রিল ধরে ঝুঁকে নীচের দিকে তাকায়। সাইকেলের প্যাডেলে পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে রতন। কায়দা করে চুল ছেঁটেছে।

— ও দাদু, সারাদিন তো বাড়িতে বসে। এদিকে খবর শুনেছ নাকি?

— না তো। কী খবর?

— গোয়ালপাড়ার মুখে বুড়ো বটগাছটাকে তো এবার কেটে ফেলবে।

— কে বলেছে তোকে এসব অলুক্ষুণে কথা? একটু আগে মিলন ঘুরে গেল। ও তো বলল না কিছু।

— আরে দূর, মিলন কী জানে। ওর কথা ছাড়ো। আমি তোমাকে একদম ঠিক খবর দিচ্ছি, মাইরি।

— তুই এ খবর জানলি কী করে?

— নিজের চোখে দেখে এলাম যে। রাস্তা চওড়া করবে। তার আগেই গাছটা কাটবে। ঠিকাদারের লোক এসেছে। মাপজোক হচ্ছে গো। কী ভিড় কী ভিড় বুড়ো বটগাছ ঘিরে।

বুড়ো বট কেটে ফেলবে— গোয়ালপাড়ার লোকদের খুব মন খারাপ। যাক গে, আমি নার্সারিতে যাই এখন।

বলেই ঝপ করে সাইকেলে উঠে পড়ে রতন। যেতে যেতেই মুখ ফিরিয়ে বলে— ওরা তোমার কাছে আসবে বলছিল একবার।

বারান্দার গ্রিলে মাথা ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে বুড়ো। দূরে কোথাও একটা ঘুঘু একটানা ডেকেই যাচ্ছে। গাছেরও তো মন আছে, নাকি— ভাবছিল বুড়ো।

।। দুই।।

এক একটা দিন সংঘমিত্রার কিছু ভালো লাগে না। আজ এরকমই একটা দিন। এখন জানুয়ারির শেষ। বেশ ভালোই ঠাণ্ডা আছে এখনও। আর ক'দিন পরেই মাঘোৎসব। কাল সন্ধেবেলা সংগীত ভবনের পাশ দিয়ে হেঁটে আসার সময় গানের রিহার্সাল শুনেছিল। ওদের বাড়ির সামনের বাগানেও এখন নানারঙের ফুলের মেলা। লাল, বেগুনি, সাদা, নীল, হলদে। আজ কলেজে বেরোনোর সময়ও অনেকক্ষণ ফুলগুলোর দিকে ঘোর লাগা চোখে তাকিয়ে ছিল সংঘমিত্রা। আদর করতে ইচ্ছে করছিল ওদের। তবুও আজ সকাল থেকেই সংঘমিত্রার কিছু ভালো লাগছিল না। সকাল থেকেই মনের ভিতর একটা মেঘ যেন জমেছিল ওর। কাটছিল না কিছুতেই। এরকম এক একদিন হয় ওর। তখন কোনো কিছুই আর ভালো লাগে না। তখন স্কুটি চালিয়ে একা একা কোপাইয়ের দিকে চলে যায়। এদিকটায় কোপাই শীর্ণতোয়া। তার পাড়ে একা একা চুপচাপ বসে থাকে অনেকক্ষণ। দূরে, রাস্তা দিয়ে ধুলো উড়িয়ে গাড়ি চলে যায়। গ্রামের পথে সাইকেল চালিয়ে চলে গেল যেন কে। কে যেন 'চই-চই' করে হাঁসগুলিকে ডাকছে। একা একা বসে থাকতে থাকতে এসব দেখে সংঘমিত্রা। একা বসে থাকতে থাকতেই ওর মনের মেঘগুলো একসময় কেটে যেতে থাকে। তখন আবার সবকিছু ভালো লাগে। কেন যে এরকম হয়— তা আজ অবধি বুঝতেই পারেনি সংঘমিত্রা।

আজ কলেজে ক্লাস নিতে গিয়েও বারেবারে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। পড়ানোর কথা ছিল বৈষ্ণব পদাবলী। ভালোই লাগল না পড়াতে। দশ মিনিট আগেই ক্লাস শেষ করে টিচার্স রুমে ফিরে এসেছিল। টিচার্স রুমে ঠিক জানালার পাশেই সংঘমিত্রার চেয়ারটা। এখানে বসলে জানালা দিয়ে শহরের রাস্তাটা দেখা যায়। মফস্‌সল শহরের এই রাস্তাটা বেশ ব্যস্ত। সারি সারি দোকান। রাস্তায় পশরা সাজিয়ে ফেরিওয়ালা। তারই মাঝে এক চিলতে জায়গা করে নিয়ে একটা শনি মন্দির। কত মানুষের আনাগোনা। সবাই ব্যস্ত। এই রাস্তায় অলস লোক খুব একটা চোখে পড়েনি সংঘমিত্রার। টোটো, সাইকেল রিক্সা, রাস্তার মাঝখানে বাস দাঁড় করিয়ে কণ্ডাক্টর হেঁকে যাচ্ছে— 'আমোদপুর, সাঁইথিয়া, আমোদপুর, সাঁইথিয়া...'। ধুলো ওড়ে রাস্তায়। এসব দেখতে খুব একটা খারাপ লাগে না সংঘমিত্রার। মানুষের বেঁচে থাকাটা তো বোঝা যায়। টিচার্স রুমে ফিরে চুপচাপ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বসেছিল সংঘমিত্রা। আজ বছর তিনেক হলো মফস্‌সলের এই শহরটায় লেকচারারের চাকরি পেয়েছে। বাড়ির কাছেই কলেজ। ওদের শ্যামবাটির বাড়ি থেকে টোটোয় কুড়ি মিনিট। ভুবনডাঙা পেরোলেই বোলপুর। তারপর স্কুলডাঙার রাস্তা ধরলেই ওদের কলেজ। শ্যামবাটির বাড়িটা বানিয়েছিল বাবা। ছ'কাঠার মতো জমি। ছোট্ট দোতলা বাড়ি ঘিরে বাগান। বাবার ইচ্ছে ছিল, সংঘমিত্রা শান্তিনিকেতনে বড়ো হবে। তাই হয়েছে। পাঠভবন থেকে বিশ্বভারতী। তারপর বোলপুরের এই কলেজে চাকরি। সংঘমিত্রা জানে, ওর হাতে নেই ভুবনের ভার। অবশ্য ভুবনের ভার নিতেও সংঘমিত্রা কখনো চায়নি। বরং চেয়েছে, এই শ্যামবাটির বাড়ি, তাকে ঘিরে বাগান, মন খারাপ হলে কোপাইয়ের ধারে ছুটে যাওয়া, সোনাঝুরির বন, নিস্তব্ধ সন্ধ্যা, এই সূর্যোদয়, ধু-ধু মাঠের প্রান্তে আকাশ কমলা করে সূর্যাস্ত— এসব নিয়েই নিজের মতো একা একা থাকতে। তাই-ই আছে সে। তবু মাঝে মাঝে কেন যে এরকম মন খারাপ হয়ে যায়— সেটাই বুঝতে পারে না সংঘমিত্রা।

ইংরেজি ক্লাস শেষ করে ইনুদি টিচার্স রুমে এসে ঢোকে। মাঝবয়সি, ঈষৎ পৃথুলা। ঢক্‌ঢক্ করে জল খায়। তারপর শাড়ির আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে বলে— পড়িয়ে তো এলাম। কিন্তু কী বুঝলো কে জানে। একটারও তো ক্লাসের দিকে মন নেই। এসব কথায় কান দেয় না সংঘমিত্রা। নিরুত্তাপ, টিচার্স রুমের জানালা দিয়ে রাস্তা দেখতে থাকে। উল্টোদিকের ফুটপাথে কমলালেবুওয়ালার ডালা থেকে কমলা কিনছে দুই তরুণী।

ইনুদি এবার সংঘমিত্রার দিকে ফেরে। বলে— কী রে, কথা বলছিস না কেন?

— তুমি বলছ তো, বলো, জানালা দিয়ে বাইরের রাস্তা

দেখতে দেখতেই বলে সংঘমিত্রা।

সংঘমিত্রার কাছ ঘেঁষে আসে ইনুদি। বলে— মন খারাপ বুঝি? তা মনের আর কী দোষ! বয়স হয়ে যাচ্ছে, তবু বিয়ে-থা করছিস না। এরকমই হবেই।

সংঘমিত্রার গত নভেম্বরে তিরিশ পূর্ণ হলো। ওর বন্ধুদের সবার বিয়ে হয়ে গেছে। কারও কারও বাচ্চাকাচ্চাও হয়েছে। ও বিয়ে করল না এখনও। বিয়ে করবে কী, আজ এতবছর কাউকে ভালোই বাসতে পারল না।

— আমি তো চা-উলি। কে বিয়ে করবে আমাকে? নিরুত্তাপ কণ্ঠেই বলে সংঘমিত্রা।

— চায়ের দোকানটা তো তোর হুজুগ।

হুজুগই বটে। এম-এ পাশ করার পর যখন চুপচাপ বসেছিল বাড়িতে, তখন ওর ইচ্ছে হয়েছিল একটা চায়ের দোকান খুলবে। সন্ধের ঝোঁকে সেই চায়ের দোকানে খদ্দের এসে চা খাবে আর গল্প করবে। ওর বাবা এ ধরনের একটি প্রস্তাবে তুমুল সায় দিয়েছিল। আর মা বলেছিল— এ আবার কী কথা? আমাদের বাড়ির মেয়ে চা বেচবে? তবে মায়ের আপত্তি ধোপে টেঁকেনি। বাবার প্রশ্রয়ে আর নিজের জেদে বাড়ির বাগানের পাশে এক চিলতে জমিতে একটা চায়ের দোকান খুলে ফেলেছিল। দোকানের নাম 'পেয়ালা-পিরিচ'। লেকচারারের চাকরি পেয়ে গেলেও চায়ের দোকানটা বন্ধ করেনি। বরং নিজের মতো করে সাজিয়েছে দোকানটাকে। রোজ কলেজ থেকে ফিরে সন্ধেবেলা দোকানে এসে বসে। তবে, ওর চায়ের দোকানে ও সবাইকে চা বেচে না। মানুষ বিচার করে তবেই ও চা বেচে। দোকানে একটা স্লোগান লিখে রেখেছে ও— 'ভালো চা, ভালো মানুষদের জন্য'। সংঘমিত্রার ধারণা, ও মুখ দেখে মানুষ চিনতে জানে।

— আমি এবার উঠি। আর তো ক্লাস নেই। আজ একটু তাড়াতাড়ি দোকান খুলব। বলতে বলতেই উঠে দাঁড়ায় সংঘমিত্রা।

— সাবধানে আয়। তবে যেটা বললাম, সেটা একটু মনে রাখিস। বিয়ে না করে একা একা এভাবে কতদিন থাকবি?

কলেজ থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা রাখে সংঘমিত্রা। অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়েই থাকে। আজ বাড়ি ফিরতেও ভালো লাগছে না। বিকেলের আলো এখন নরম হয়ে এসেছে। তবু এ রাস্তায় ব্যস্ততা কমেনি। ব্যস্ত মানুষজন। টোটো, রিক্সা, বাস। আমোদপুর, সাঁইথিয়া, আমোদপুর-সাঁইথিয়া...। ধুলো।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে এসব দেখেই যেতে থাকে সংঘমিত্রা। আজ মনটা কিছুতেই ভালো হচ্ছে না।

* * *

তালতোড়ে স্কুল শেষ করে রোজ এই রাস্তা দিয়েই সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফেরে অরণ্য। আর রোজই ফেরার সময় লক্ষ্য করে বিকেলের আলো যখন নরম হয়ে আসছে, এই সময়টায়, বাড়ির ঝুলবারান্দায় বুড়ো দাঁড়িয়ে থাকে। মুখে ফিচেল হাসি। বুড়ো লোকটাকে বড়ো অদ্ভুত লাগে অরণ্যর। চারদিকে গাছপালা ঘেরা এই বাড়িটায় বুড়ো একা থাকে। একদিন কথায় কথায় বলেছিল, এই গাছগুলি নাকি ওর ভাই-বোন। ওরা একসাথেই জন্মেছে। একসাথেই বড়ো হয়ে উঠেছে। অরণ্য একদিন বুড়োর বয়স জানতে চেয়েছিল। ফিচকি হেসে দাড়ি গোঁফের ফাঁক দিয়ে বুড়ো বলেছিল— শতাব্দী প্রাচীন। দেখছ না, আমার গায়েও কেমন শ্যাওলা জমেছে। এসব কথার কোনো উত্তর হয় না। কাজেই চুপ করেই ছিল অরণ্য।

আজকেও বুড়ো দাঁড়িয়ে ছিল বারান্দায়। অরণ্যকে দেখে দূর থেকেই হাত নাড়ল। কাছে আসতেই জিজ্ঞেস করল— কী মাস্টারমশাই, স্কুল শেষ হলো?

— হ্যাঁ— ঘাড় নেড়ে বলল অরণ্য।

— তাহলে সাইকেলটা দরজার কাছে রেখে ওপরে এসে একটু চা খেয়ে যাও। কথাও আছে একটু। দরজা খোলাই আছে। সোজা ওপরে উঠে এসো।

তালতোড়ের স্কুলটায় ছাত্র বেশি, টিচার কম। এক একজন টিচারকে বেশি ক্লাস নিতে হয়। বক্‌বক করতে করতে মুখে ফেনা উঠে যায়। তেষ্টা পায়। একটু তেষ্টা নিয়েই সাইকেল চালিয়ে ফিরছিল অরণ্য। কাজেই চা খাওয়ার কথায় সে আর আপত্তি না করে সোজা ওপরে উঠে এলো। বুড়োর বাড়িটা বেশ সাজানো। বুড়োর বউ আছে। বউ শহরে থাকে। মাঝে মাঝে এখানে এসে দু-একদিন থেকে যায়। বাকি সময় বুড়ো একাই থাকে। বুড়ো মানুষটা রহস্যময়, কিন্তু খারাপ নয়। আশপাশের পাঁচটা লোক বুড়োকে মান্যি করে। বড় হেঁয়ালি করে কথা বলে বুড়ো। অনেক কথারই কোনো মানে বোঝে না অরণ্য। কিন্তু শুনতে ভালো লাগে। কোথাও খুব একটা বেরোয় না বুড়ো। সারাদিন বাড়িতেই থাকে। তবে, কখনো কখনো বুড়োকে অনেকেই দেখছে, গোয়ালপাড়ার রাস্তা ধরে আনমনে হেঁটে যেতে। কোথায় যায়, তা অবশ্য জানে না কেউ।

বুড়ো কেটলিতে চা বসিয়েছে। বলে— জানতাম এই সময়ে তুমি ফেরো। বলতে পারো তোমার জন্যই বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম। ভাবছিলাম, একসঙ্গে চা খাব।

চেয়ার টেনে বসে অরণ্য। স্কুল থেকে ফিরছ, কিছু খাবে—

With Best Compliments from -

Ganpati Laminators
&
Packagers Pvt. Ltd.

Mfg. of HDPE and PP Woven Bags and Fabric

Best Compliments from-

ELGA PAINTS & POLYMERS

Manufacturer of

Quality Paints & Ancillaries

30D, Diamond Harbour Road

Kolkata - 700060

Phone : 033 2406 2431

জিজ্ঞাসা করে বুড়ো।

— না, না, ব্যস্ত হবেন না।

— আহা, আমার অসুবিধা নেই। আজ সকালে বেকারির কেক বিক্রি করতে এসেছিল। কিনেছি। আমার আবার তোমাদের মতো সাহেবি কেক পছন্দ নয়। আমার বেকারির কেক অনেক ভালো লাগে। একটু খেয়ে দেখ, ভালো লাগবে।

হাসে অরণ্য। খিদে একটু পাচ্ছিল বটে। আসলে ওদের স্কুলটা এমন জায়গায়, সেখানে খাবারের দোকান ধারেকাছে নেই। অরণ্য যে টিফিন নিয়ে আসবে সে উপায়ও নেই। অরণ্য এখানে একা থাকে, রতনপল্লিতে ঘর ভাড়া নিয়ে। সকালে স্কুলে আসার আগে দুটো সিদ্ধভাত করে খেয়ে আসে। সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে আবার রান্নাবান্না। ফলে খিদে পেয়েই যায়। চেনাশোনা অনেকেই বলে, এবার এই গ্রামের স্কুলটা ছেড়ে শহরের স্কুলে চাকরি নিতে। কিন্তু অরণ্যর ইচ্ছে করে না এই জায়গাটা ছাড়তে। পাঁচ বছর ধরে চাকরি করছে এই স্কুলে। একটা অদ্ভুত মায়া পড়ে গেছে। স্কুলের পাশেই বিরাট ধানক্ষেত। তার পাশে একটা দীঘি। এখন, এই শীতে, ধানকাটা হয়ে গেছে। মাঠ জুড়ে শুধু খড়। সারারাত হিম পড়ে সেই খড় ভিজে সপসপে হয়ে গেছে। বিকেলের আলো মরে এলেই পুকুরের ওপর হাল্‌কা কুয়াশার চাদর। এসব বেশ মোহময় লাগে অরণ্যর।

— নাও, চা খাও। সামনের টেবিলে চা নামিয়ে রাখে বুড়ো।

— আপনিও নিন। বলতে বলতে অরণ্য এক কাপ চা তুলে নেয়।

— নিচ্ছি। আচ্ছা, তুমি যেন কোন সবজেক্টের টিচার?

— সায়েন্স। কেমিস্ট্রি পড়াই।

— বেশ, বেশ, তাহলে তো তুমি বুঝবে। আচ্ছা বলো তো, আমাদের এই জীবনটার অর্থ কী?

অবাক হয় অরণ্য। বলে— কী জানি, জানি না। আসলে ভেবে দেখিনি কখনও।

হাসে বুড়ো। বলে— অবাক হলে তো। আমি অনেককে এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেছি। আসলে কেউই জানে না। আমিও জানতাম না, বুঝলে। তারপর একদিন একটা অদ্ভুত লোক এসে জীবনটার মানে বুঝিয়ে দিয়ে গেল।

— কী রকম?

— সে অনেকদিন আগের কথা। ওই যে গোয়ালপাড়ার রাস্তা, ওই রাস্তা ধরে একদিন একা একা, ঘোরের ভিতর হাঁটছি। যেন ভূতে ধরেছে আমাকে। হঠাৎ দেখি, আগে আগে একটা ফঙ্গবেনে গোছের লোক চলেছে। পরনে তাপ্পিমারা জামা। আর গলা ছেড়ে গান গাইছে। কী সুন্দর যে গানের গলাটা— কী বলব তোমাকে।

— তারপর?

— আমি তো তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে তার পাশে এলাম। আমাকে যেন সে খেয়ালই করল না। হাঁটতে হাঁটতে একের পর এক গান গেয়েই যেতে থাকল। অনেকক্ষণ পর গান থামলে আমাকে খেয়াল করল। বলল— কী হে, গান শুনছিলে বুঝি!

একটু উদাস হয়ে কী যেন ভাবে বুড়ো। তারপর আবার বলে— লোকটা চালচুলোহীন, বাউন্ডুলে গোছের, বুঝলে। আমার লোকটাকে দেখে খুব কষ্ট হচ্ছিল। আমি বললাম— তোমার তো ভারি দুঃখ, তাই না! লোকটা একচোট হেসে নিল। তারপর বলল— ধুস, ধুস, দুঃখ কিসের? আমার ঘরের জানালা ভাঙা। সেই ভাঙা জানালা দিয়ে বৃষ্টির জল এসে আমার ঘর ভিজিয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু সেই ভাঙা জানালা দিয়ে তো কখনো কখনো জ্যোৎস্নার আলোও এসে পড়ে। বৃষ্টির জল যে আমার ঘর ভাসিয়ে দিয়ে যায়, সেটা আমি কখনো মনে রাখি না। কিন্তু ওই যে এক-আধদিন ভাঙা জানালা দিয়ে জ্যোৎস্নার আলোও এসে পড়ে— ওটাই আমি মনে রাখি।

এতক্ষণ বলে এবার অরণ্যর মুখের দিকে তাকায় বুড়ো। বলে— এটাই হচ্ছে জীবনের অর্থ। বুঝলে কিছু?

বুড়োর কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝে না অরণ্য। তবু বলে— বেশ বুঝলাম।

— হ্যাঁ। হ্যাঁ। বুঝবে, বুঝবে। আমাদের সবার বুকের ভিতর ওই জ্যোৎস্নার আলোটাকে চারিয়ে রাখতে হবে, বুঝলে।

বুড়োকে আবার পাগলামি ধরেছে। কথা ঘোরায় অরণ্য। বলে— আপনার বাড়িটা কিন্তু বেশ। আমার খুব ইচ্ছা একদিন এসে অনেকক্ষণ থেকে যাই আপনার বাড়িতে।

ফিচেল হাসি হেসে বুড়ো বলে— থাকলেই পারো। এই বাড়িটা ম্যাজিক বাড়ি। এখানে এসে যে যার মনের সুপ্ত ইচ্ছা যদি বলে ফেলে, তবে সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়ই। আজ কিন্তু সে ইচ্ছা জানানোর দিন। বাইরে তাকিয়ে দেখ, কী এক আশ্চর্য আলো ছড়িয়ে পড়েছে। এক জীবনে এ আলো খুব কমদিনই দেখা যায়। একে বলে হৃদয়ের আলো।

অরণ্য বাইরের দিকে তাকায়। সত্যি, গাছপালার ফাঁক দিয়ে এক অত্যাশ্চর্য কমলা আলো ছড়িয়ে পড়েছে। কী মোহময় এই আলো। সত্যি, অরণ্যরও তো একটি গোপন ইচ্ছা আছে। সে ইচ্ছা ও কাউকে বলতে পারেনি। বলতে গেলেই অসম্ভব একটা লজ্জা জড়িয়ে আসে ওর শরীরে। বুকের কাছে ধুকপুক করে। গলা শুকিয়ে আসে। কারোর চোখের দিকে তাকাতে পরে না।

ফলে ইচ্ছেটা আর বলা হয়ে ওঠে না কখনো। ইচ্ছেটা বুকের ভিতরই থেকে যায়। অরণ্য অবাক হয়ে বাইরে, গাছের পাতায় মাখামাখি সেই অত্যাশ্চর্য আলো দেখতে থাকে।

এইসময় বাইরে অনেক কণ্ঠস্বর শোনা যায়। সমস্বরে কারা যেন ডাকে— দাদু, অ দাদু, বাড়িতে আছো? আমরা তোমার সাথে একটু কথা বলতে এসেছিলাম গো।

* * *

আজকে চায়ের দোকানে একাই বসেছিল সংঘমিত্রা। কিছুই আসলে ভালো লাগছিল না ওর। দুটো লোক চা খেতে এসেছিল। ভালো লাগেনি বলে ফিরিয়ে দিয়েছে তাদের। বলেছে— এখন চা বিক্রি হবে না। একা বসে বসে একটা বই পড়ার চেষ্টা করছিল। চারপাতা পড়ার পর সেটাও আর ভালো লাগছে না বলে বন্ধ করে রেখেছে। তারপর চুপচাপই বসে রয়েছে।

সন্ধে হয়ে এসেছে এখন। ধুনোর গন্ধ আসছে দোতলা থেকে। ধুনোর গন্ধটা বেশ লাগে সংঘমিত্রার। মনের মেঘটা আজ কাটছে না কিছুতেই। আরও কিছুক্ষণ এরকম বসে থাকার পরে, সংঘমিত্রা হঠাৎ নজর করল, সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে তার চায়ের দোকানের দিকেই আসছে অরণ্য। অরণ্য একটা স্কুলে চাকরি করে সংঘমিত্রা জানে। কিন্তু কোন স্কুলে সেটা কখনো জিজ্ঞাসা করা হয়নি। মাঝে মাঝেই অরণ্য এখানে চা খেতে আসে। মাথা নীচু করে বসে চা খায়। তারপর দাম মিটিয়ে উঠে চলে যায়। কোনোদিন একটাও কথা বলেনি। বড় লাজুক লোকটা।

সাইকেলটা বাইরে রেখে এসে একটা চেয়ার টেনে বসল অরণ্য। সংঘমিত্রা নিজের অজান্তেই হাত দিয়ে কপালের ওপর চুলটা একটু ঠিক করে নিল, শাড়ির আঁচলটাও গুছিয়ে নিল। মনের মেঘটা হঠাৎ করেই কেটে যাচ্ছে— বুঝল সংঘমিত্রা।

।। তিন।।

স্নান সেরে এসে পারুল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল। এই সময়টা একেবারে ওর একার। এসময় আয়নায় ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজেকে দেখে। দশবছর বিয়ে হয়ে গেল, এখনও শরীরে একটুও টাল খায়নি। শুধু কোমরের দিকে একটু মেদ জমেছে ইদানীং। বাচ্চাকাচ্চা হয়নি পারুলের। কত ডাক্তার দেখালো। তারাপীঠ, কঙ্কালীতলায় কতবার মানত করল। তবু এতদিনেও বাচ্চা হলো না। কত শখ করে মেলা থেকে কতগুলো পুতুল কিনেছিল পারুল। সেগুলো তোরঙ্গ বন্দিই হয়ে রইল। গায়ের রংটা চাঁপা, কিন্তু পারুলকে দেখতে খুব একটা মন্দ না। ঠোঁটের ওপরে একটা তিল আছে। হাসলে গজদাঁত দেখা যায়। সারাদিন তো নিজেকে আর দেখা হয় না। এই সময়টাই আয়নার সামনে নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে পারুল। দেখে আর নিজের সঙ্গে কথা বলে। সারাদিনে আর সময় কই। গ্রিলের কারখানা সামলাতে সামলাতেই তো দিন কাবার। না দেখলেই মিস্ত্রিগুলো কাজে ফাঁকি দেয়। চোখের আড়াল হবার জো নেই। কারখানাটা বাড়ির লাগোয়া এটাই যা রক্ষে। দুপুরের দিকে মিস্ত্রিগুলোকে খেতে পাঠিয়ে পারুল বাড়ি এসে স্নান করে, খায়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে। আসলে যার দেখার কথা ছিল, এতবছরে সে ভালো করে চোখ মেলে দেখলই না পারুলকে। বাবা অনেক দেখেশুনে বিয়ে দিয়েছিল লোকটার সঙ্গে। লোকটা ভারি ভালো। কিন্তু কীরকম একটা ঘোরের ভিতর থাকে সারাদিন। মনে হয় যেন এ জগতেরই লোক নয়। বিয়ের প্রথম রাতে কত আদর করে কথা বলে লোকে। আর এই লোকটা ওকে বলেছিল— আমি জীবনে কোনোদিন হিসেব কষতে পারিনি জানো! এ নিয়ে যেন আবার রাগ করো না পরে। কিন্তু রাগ না করে কী থাকা যায়? ব্যবসাটা তো পারুলকেই দেখতে হয়। রাগ হয়ে যায় মাঝেমধ্যে। যখন বিয়ের পর প্রথম এসেছিল এ বাড়িতে, তখন এ বাড়ির কী ছন্নছাড়া অবস্থা। থাকার মধ্যে লোকটার বুড়ি মা। সেই সংসারের হাল ধরে পারুল বাড়ির চেহারা পাল্টে দিয়েছে। কাঁচা বাড়ি প্রথমে পাকা হয়েছে। তারপর দোতলা। গ্রিলের কারখানা বড় হয়েছে। বাড়িতে টিভি, ফ্রিজ এসেছে। এবার গরমে শোয়ার ঘরে এ-সি বসাবে— ঠিকই করে রেখেছে পারুল। কতবার পারুল লোকটাকে বলেছে— ওই লড়ঝড়ে বাইকটা এবার পাল্টাও। অনেক নতুন মডেল বাজারে এসেছে, একটা কেন। তা শুনলে তো লোকটা। বলেছে, এই বাইকটাকে ও পাল্টাতে পারবে না। বাইকটা নাকি কাঁদবে। শোন কথা! এরকম আজগুবি কথা কেউ বলে! লোকটা যে কী— পারুল বুঝেই পায় না। তবে, লোকটাকে দেখে বড় মায়া হয় পারুলের। সারা সকাল আদাড়ে-বাদাড়ে ঘুরে দুপুরে যখন লোকটা খেতে আসে বাড়িতে, তখন ওর রোদে পোড়া মুখটা দেখে পারুলের ভারি

মায়া হয়। অনেক রাতে ঘুম ভেঙে পারুল দেখেছে মাথার নীচে হাত রেখে কাত হয়ে শুয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে লোকটা। তখনও পারুলের মায়া হয়েছে। পারুল এও জানে, মাঝে মাঝে লোকটা আমোদপুর যায়। ওখানে এক ভাতউলির দোকানে ভাত খায়। সারা দুপুর সেখানেই কাটিয়ে বিকেলে বাড়ি ফেরে। লোকটা কিছু বলেনি পারুলকে কোনোদিনই। যারা দেখেছে, তারা এসে বলেছে। তবু, পারুলের রাগ হয়নি। পারুল জানে, এ লোক ভালোবাসার মানেই জানে না।

আয়নার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসছিল পারুল। এখনও হাসলে গজদাঁত দেখা যায়। যৌবনের চপলতা কেটে গিয়ে এখন এক ধরনের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য পারুলের শরীরে ছড়াচ্ছে। স্বামী আদাড়ে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়, এই ফাঁকে কতজন যে পারুলের কাছে ঘেঁষার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পারুলের কাঠিন্য তাদের কাউকে কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। মাঝেমাঝে ভাবে পারুল, যেমন এখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছে, সত্যিই কি তার ভিতর সব ভালোবাসা শুকিয়ে যাচ্ছে। সারাদিন গ্রিলের কারখানা ঠেলতে ঠেলতে সেও কি ওই গ্রিলগুলির মতোই হয়ে যাচ্ছে? নকশা করা, কিন্তু শক্ত, লোহার। আবার, ভালোবাসা যদি শুকিয়েই গিয়ে থাকবে, তবে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কেন এখনও নিজেকে দেখে পারুল? কেন এখনও নিজের রূপে নিজেই মুগ্ধ হয়?

বাইরে এই সময় বাইক থামার শব্দ হলো। মিলন ফিরে এসেছে। আজকে একটু তাড়াতাড়িই যেন ফিরেছে— মনে হলো পারুলের। কাল থেকেই মিলন বড় চুপচাপ। নজর এড়ায়নি পারুলের। খেতে বসে অন্যদিন দু-চারটে কথা বলে তাও। কাল একেবারে চুপচাপ খেয়ে উঠে গেল। কাল বড় যত্ন করে আমোদি মাছ রান্না করেছিল পারুল। ঝাল ঝাল করে। আমোদি মাছ মিলনের বড় পছন্দের। মুখে অবশ্য বলেনি কখনো। কিন্তু খাওয়া দেখেই বুঝেছে পারুল। কাল সেটাও খুব একটা মন দিয়ে খেল বলে মনে হলো না। কাল থেকেই কী যেন ভাবছে লোকটা। ভেবেই যাচ্ছে। ইচ্ছে করেই পারুল কিছু জানতে চায়নি। যা ভাবছে ভাবুক। এক একটা লোক আসলে এরকমই হয়। ঘোরের ভিতর থাকতে ভালোবাসে।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই মিলন বলে— খেয়ে একবার বেরোতে হবে। এ কথার তেমন কোনো উত্তর অবশ্য পারুল দিল না। শান্ত চোখে তাকালো একবার। মিলন জানে, এরপর পারুল নিঃশব্দে ওর খাবার সাজিয়ে দেবে। দশবছর কেটে গেল— পারুলকে এখনও কেমন যেন অচেনা মনে হয় মিলনের। শান্ত দীঘির মতো, তল পাওয়া যায় না। সে দীঘিতে কোনো ঢেউ নেই।

স্নান করতে ঢুকে জলের কল খুলে অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল মিলন। আসলে কাল থেকেই তার মনে হচ্ছে, কী যেন একটা হতে চলেছে। কাল মাটিতে কান পেতে সে অতল থেকে উঠে আসা এক রহস্যময় গুমগুম শব্দ শুনেছে। এ শব্দ কিসের বার্তা তা মিলন বুঝতে পারছে না। শুধু এটুকু বুঝেছে, এ শব্দ একটা কোনো বার্তা তো নিয়ে আসছেই। কাল সকালে বুড়োর বাড়ি থেকে বেরিয়ে রতনপল্লির দিকে যাচ্ছিল মিলন। যেতে গিয়ে গোয়ালপাড়ার মুখে ভিড়ভাট্টা দেখে বাইক থামিয়ে নেমে পড়ল। বুড়ো বটকে ঘিরে সেখানে ভিড় জমিয়েছে সবাই। হাত-পা নেড়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কী যেন বলছে। আর কয়েকটা লোক, কী সব যেন মাপজোক করছে ফিতে দিয়ে। ভিড়ের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল মিলন। সবাই চেনা মুখ। গোয়ালপাড়ায় থাকে।

কী হয়েছে রে— ভিড়ের দিকে মুখ করেই জিজ্ঞাসা করেছিল মিলন।

— রাস্তা চওড়া হবে গো, এসব দোকান ভাঙা পড়বে।

— তা'লে তোরা কোথায় যাবি?

— আমরা আরও দূরে সরে যাব। বলছে, এই বুড়ো বটও কেটে দেবে। কিচ্ছুটি থাকবে না এখানে।

— অ্যাঁঃ, বললেই বুড়ো বট কাটতে দেব নাকি আমরা? আবদার আর কী— ভিড়ের ভিতর থেকে যে একজন যেন বলে উঠল। সবাই গলা মেলালো তার সঙ্গে। চিৎকার চেঁচামেচিতে বোঝা গেল না কে কী বলছে। শুধু তীক্ষ্ণ শিসের মতো কিছু শব্দ হাওয়ায় উড়োউড়ি করতে লাগল। এরই ভিতর কে একজন যেন গলা চড়িয়ে বললো— আমাদের বড় ঠাকুর বাস করে বুড়ো বটে। বুড়ো বট কাটা যাবেনি কো যাবেনি। আবার সবাই সমস্বরে গলা মেলালো। তীক্ষ্ণ শব্দগুলি আলাদা করে বোঝা গেল না। বেশ কিছুক্ষণ এরকম চলার পর ভিড়ের ভিতর থেকে কে একজন গলা চড়ালো। বললো— চেঁচাস কেনে? থাম তোরা। তোরা দেব না বললেই হবে? কানু ঘোষের লোক ঠিকাদারি পেয়েছে। কানু ঘোষ লোক পাঠিয়ে তোদের মারবে। যে বলছিল তার কথা শেষ হলো না। তার আগেই কে যেন আরও গলা চড়িয়ে বলল— অ্যাঁঃ, আমাদের বড়ো ঠাকুর বড়ো না, তোমার কানু ঘোষ বড়ো? পাট্টির লোক পাঠাবে? কত পাঠাবে পাঠাক না। আমাদের বড়ো ঠাকুর আছে। ভিড়টা সমস্বরে বললো— আছে, আছে, আছে। আমরা বুড়ো বট কাটতে দেবনি, দেবনি, দেবনি। মিলনের মনে হলো, এই কথাটার মধ্যে কেমন যেন একটা ছন্দ আছে। সেই ছন্দ যেন

ছড়িয়ে পড়ছে বুড়ো বটের ডালে ডালে, পাতায় পাতায়। আর যেই এমন ভাবনা মনে এলো, তখনই কেমন যেন ঘোর লাগল মিলনের। মনে হয়েছিল ওর এখনই আমোদপুর যাওয়া দরকার। খুব দরকারি একটা কথা জানাতেই হবে টুকিকে। তারপর, রতনপল্লির দিকে আর পা বাড়ালোই না মিলন। অবশ্য রতনপল্লিতে তো ওর যাওয়ার তেমন ইচ্ছেও ছিল না। বাইক ঘুরিয়ে সোজা আমোদপুর।

হঠাৎ করে ওকে দেখে টুকি একটু অবাকই হয়েছিল। বলেছিল— কী গো, আজ এই সক্কালবেলা?

— তোর সঙ্গে আমার একটু জরুরি কথা আছে টুকি।

— কী কথা?

টুকিকে হাত ধরে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে ফিসফিসে গলায় মিলন বলেছিল— তুই তো ভাবিস আমি আবোল-তাবোল বকি। কিন্তু মাইরি বলছি, আমার মতো আরও কতজন আছে, গাছের ভাষা বোঝে। ওই যে আমাদের নতুন পল্লির বুড়ো।

না হেসে আর পারেনি টুকি। বলেছিল— এই বলতে এতখানি পথ বাইক চালিয়ে এলে? দেশে বুঝি পাগলের সংখ্যা বাড়ল। আমার বলে এখন মরার সময় নেই। একটু পরে খদ্দেরের লাইন লাগবে। অর্ধেক রান্নাই হয়নি এখনও।

— সে তুই খদ্দের সামলা গে। আমি এখন চলি, আমাকে এখনই গোয়ালপাড়ায় ফিরতে হবে।

— যাবে'খন। ভাত চাপাই। দুটো খেয়ে যাও।

— না, আজ খাবো না। কানু ঘোষের লোকেরা গোয়ালপাড়ায় বুড়ো বট কেটে দেবে বলেছে। আমি যাই। বুড়ো বটকে ছুঁয়ে আমায় বসে থাকতে হবে।

আর দাঁড়ায়নি মিলন। বাইকে উঠে স্টার্ট দিয়েছিল। ফিরতেই হবে তাড়াতাড়ি। আর মিলনের দ্রুত চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে টুকি ভাবছিল— যাওয়ার মুখে কী যেন বলে গেল লোকটা!

তা, এ তো গেল কালকের কথা। আজ সকালে অন্য কোথাও যায়নি মিলন। ঘুম থেকে উঠে, চা-মুড়ি খেয়ে সোজা বুড়ো বটের তলায়। বাইকটা একপাশে রেখে বুড়ো বটের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে রাস্তা দেখছিল। কানু ঘোষের লোক এই রাস্তা চওড়া করবে। প্রান্তিক স্টেশন পেরিয়ে এ রাস্তা সোজা গিয়ে উঠবে ন্যাশনাল হাইওয়েতে। কত গাড়ি আসবে তখন কলকাতা থেকে। তখন এই বুড়ো বট আর থাকবে না। এরকম ভাবতে ভাবতেই একসময় ঘুমিয়েই পড়েছিল আর এই ঘুমের ভিতরই শুনেছিল মাটির গভীর থেকে উঠে আসছে এক রহস্যময় গুমগুম শব্দ। ময়দানব যেন জেগে উঠছে। একটা কিছু হয়ে যাবেই এবার। ভয়ে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল মিলনের। আর তখন প্রথমেই পারুলের কথা মনে পড়েছে তার। মনে পড়তেই বাড়ি ফিরে এসেছে।

স্নান করে বেরিয়ে মিলন দেখল, টোবিলে ভাত সাজিয়ে পারুল বসে আছে। তেমনই নীরব, শান্ত। কালকের কথা আর কিছু বললো না পারুলকে। এমনকী, আজ সকালের কথাও বলেনি। বললে খামোকা পারুল চিন্তা করবে। আটকে দেবে ওকে। বাড়ি থেকে হয়তো ওকে বেরতেও দেবে না। পারুল চায় না, ওর আদাড়ে-বাদাড়ে ঘোরা ভুলো মনের স্বামীটা কোনো বিপদে পড়ুক। কিন্তু বুড়ো বটের কথা তো না বললেও নয়। বুড়ো বটের কাছে পারুলের যে একটা মানত ছিল। বুড়ো বটের ডালে লাল সুতো বেঁধেছিল পারুল।

ভাত মাখতে মাখতে কিছুটা আপন মনেই, পারুলকে শুনিয়ে বললো— একটা কিছু হবে।

কী যেন একটা ভাবছিল পারুল। মিলনের কথায় হুঁশ ফিরল। চমকে উঠে বললো— কী হবে?

— হবে, হবে, আমি বুঝতে পারি সব।

— কী যে আবোল-তাবোল বক সারাক্ষণ। কী হবে তা বলো না পরিষ্কার করে।

— কী যে হবে, তা তো আমিও বুঝতে পারি না। বুঝতে পারলে তো বলবো।

— বুঝতে যদি পারোই না, তাহলে এসব আবোল-তাবোল বক কেন সারাক্ষণ?

— কিছু তো একটা হবেই। বুড়ো বটেরও তো মন আছে কিনা, তুমি বলো। ভাত খেতে খেতে একটা কিছু উত্তরের প্রত্যাশায় পারুলের মুখের দিকে তাকায় মিলন।

— কার মন আছে, কার নেই, সে তুমিই জানো। আমি ওসব খোঁজ রাখি না। শান্ত, কিন্তু কেটে কেটে বলল পারুল।

— গোয়ালপাড়ার দিকে রাস্তা চওড়া হবে। কানু ঘোষের ঠিকাদাররা কাল মাপজোক করতে এসেছিল। বলেছে, বুড়ো বটটা কেটে দেবে।

একটু চমকালো কি পারুল? মিলন ওর মুখের দিকে তাকায়। ভাবে, বুড়ো বটের কাছে পারুল একটা খোকা চেয়েছিল।

* * *

বুড়োর আজকাল বড় ঝিমুনি আসে। মাঝে মাঝেই আসে। এই যেমন আজ দুপুরের খাওয়ার পর পুবদিকের বারান্দায়

ইজিচেয়ারে বসে থাকতে থাকতেই ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। কে যেন বলেছিল, সুগার বাড়লে এরকম যখন-তখন ঝিমুনি আসে। ডাক্তার দেখাতে বলেছিল। ওসবে পাত্তাই দেয়নি বুড়ো। শরীরে এখন শ্যাওলা জমছে বুড়ো জানে। তবে আজকাল ঝিমুনি এলে বুড়োর চোখের সামনে কতকিছু ভেসে ওঠে। যেন ক্যালাইডোস্কোপে চোখ রেখেছে। কত ছবি, ফেলে আসা দিনকালের ছবি। কোনোটা রঙিন, কোনোটা সাদাকালো। তাহলে কি সে-ও খুব প্রাচীন হয়ে গেল? বটের মতো? তারও কি শরীর বেয়ে ঝুড়ি নামতে শুরু করেছে? হবে হয়তো। আজ ঝিমুনির ভিতরই বুড়োর চোখের সামনে সব অদ্ভুত ছবি ভেসে উঠতে শুরু করেছিল। বুড়ো দেখছিল, অন্তহীন জ্যোৎস্নায় যেন ভেসে যাচ্ছে চরাচর। সেই অন্তহীন জ্যোৎস্নার ভিতর সে যেন এক অতি প্রাচীন বাড়ির ছাদে পেটকাটি চাঁদিয়াল ওড়াচ্ছে। জ্যোৎস্নায় মাখামাখি এক ভূতে পাওয়া নিস্তব্ধ আকাশে সেই পেটকাটি চাঁদিয়াল একা একা উড়ে চলেছে। কী অপার্থিব সেই দৃশ্য। আর সেই অন্তহীন জ্যোৎস্নার ভিতর ছাদের কার্নিশের কিনারায় দাঁড়িয়ে দু-হাত বাড়িয়ে রাতপরির মতো এক নারী ডাকছে। ডেকেই যাচ্ছে। তার মুখটা খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে বুড়োর। কিন্তু চিনতে পারছে না কিছুতেই। মনে হচ্ছে, কবে, কোথায়, কোনযুগে এই নারীর সঙ্গে তার যেন দেখা হয়েছিল। কোনো এক মোহময়ী জ্যোৎস্নায় সেই অপরূপা নারী তার সঙ্গে হারিয়ে গিয়েছিল, তার হাত ধরে। তারপর? আর কিছু মনে পড়েনি বুড়োর। বরং ঝিমুনি ভেঙে উঠে দেখেছিল বিকেলের আলো একটু একটু করে কমে আসছে। শীতটাও বেশ জাঁকিয়ে পড়ছে। একটু পরেই ঝুপ করে সন্ধে নেমে পড়বে।

বুড়োর মাঝে মাঝেই কতদিন আগেকার কথা মনে পড়ে। সেই যে শহরে ও থাকত, সেই শহরের কথা। তার রাস্তাঘাট, মানুষজনের কথা। সেই যে বিশাল, অথচ নোনাধরা বাড়িটা, দিনের বেলাও যার সিঁড়ির তলায় অন্ধকার জমে থাকত, সেই বাড়িটার কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, বৃষ্টিতে একহাঁটু জল জমে যাওয়া গলিটার কথা। সেই ট্রাম লাইন ধরে ভোঁ-কাট্টা ঘুড়ি ধরতে যাওয়ার কথা— সব মনে পড়ে বুড়োর। কিন্তু সে শহর বুড়ো তো কবেই ছেড়ে এসেছে। সেখানে আর ফিরতেও ইচ্ছে করে না তার। সে এখন এখানে এসে বাসা বেঁধেছে। গাছেদের সঙ্গে ভাইবোন পাতিয়েছে। এখানে, রাত বাড়লে তার বাগানে; ঘোর অমাবস্যাতেও, ছড়িয়ে পড়ে এক অপার্থিব অন্তহীন জ্যোৎস্নার আলো। সে আলোয় শরীর ভাসিয়ে সেই মোহময়ী নারী নেমে আসে। যাকে বুড়ো কোথায় যেন দেখেছে, তবু চিনতে পারে না। বুড়ো আদর করে তার নাম রেখেছে জোছনাময়ী। এখানে, তার এই বাড়িতেই পড়ন্ত বিকেলে সেই কমলা রঙের আলো ছড়িয়ে পড়ে। যে আলো সারা জীবনে খুব কমই দেখতে পায় মানুষ। বুড়ো সেই আলোর নাম দিয়েছে হৃদয়ের আলো।

উঠতে ইচ্ছে করছিল না। তবু উঠতেই হবে এবার। একবার যেতে হবে গোয়ালপাড়ার দিকে। কাল বিকেলে গোয়ালপাড়ার লোকগুলো এসেছিল। আজ ওদের সবাইকে ঝন্টুর দোকানে আসতে বলেছে বুড়ো। সবার সঙ্গে কথা বলবে। একটা কিছু উপায় বের করতেই হবে। না হলে বুড়ো বটকে কিছুতেই বাঁচানো যাবে না। বুড়ো জানে, কানু ঘোষ যখন গাছ কেটে রাস্তা করবে বলেছে, তখন করবেই। কানু ঘোষের অনেক টাকা। অনেক লোকজন। কানু ঘোষের বাড়ি থেকে থানায় ভেট যায়। গোয়ালপাড়ার মানুষরা কানু ঘোষের হাত থেকে বুড়ো বটকে বাঁচাবে কী করে— ভাবে বুড়ো। এত অর্থ, এত বল— এদের সঙ্গে বুড়ো লড়বে কী করে? বুড়ো তো এতদিন ধরে যত্ন করে শুধু গাছদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে। গাছ তো মানুষের সঙ্গে লড়ে না।

গায়ে মেরুন রঙা র‍্যাপারটা জড়িয়ে রাস্তায় নামে বুড়ো। শীতটা এবার বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। কাল বাদে পরশু মাঘোৎসব। তখন প্রার্থনা করবে— বুড়ো বট যেন অক্ষয় হয়। এরকমটাই ভেবে রাখে বুড়ো। এই সেদিন কাগজে পড়ছিল, পৃথিবীটা নাকি খুব শীতল হয়ে আসছে। প্রকৃতির নিয়মেই নাকি পৃথিবী একদিন ক্রমে শীতল হয়ে যাবে। তখন এক বরফ পিণ্ডে পরিণত হবে সে। তখন কোনো প্রাণ থাকবে না। শুধু চতুর্দিকে সাদা ধু-ধু বরফ। আর সেই বরফের পৃথিবীর বুকে বয়ে যাবে কনকনে হাওয়া। সে বরফের পৃথিবীর আকাশে কোনো নীল রঙ থাকবে না। নিকষ কালো অন্ধকার এক আকাশ তখন পৃথিবীর ওপরে। তাতে তারাও দেখা যাবে না। নিজের হাতে বড় করে তোলা হৃদয়, রূপকুমার আর নবকুমার— ওরাও কি তখন বরফের গাছ হয়ে যাবে? ডাকলেও সাড়া দেবে না আর? সেই বরফের পৃথিবীতেও কি কোনো কোনো দিন রাতে অন্তহীন জ্যোৎস্নার আলো ছড়িয়ে পড়বে? সেই অন্তহীন জ্যোৎস্নাতেও কি নেমে আসবে জোছনাময়ী?

এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতেই বুড়ো মাটির রাস্তা ধরে এগোয়। এই অঞ্চলে রাস্তায় পিচ পড়েনি, আলোও বসেনি। তা হবেও না কোনোদিন। অনেক ধরে করে বুড়ো রাস্তাটা এরকম রাখতে রাজি করিয়েছে পঞ্চায়েতকে। এই অঞ্চলে সবাই বুড়োকে একটু মান্যি গন্যি করে— তাই যা রক্ষে। তাতেই বুড়োর কথায় রাজি হয়েছে পঞ্চায়েত। রাতের বেলায়,

আশপাশের বাড়ি থেকে দু-এক ফোঁটা আলো এসে পড়ে রাস্তায়। জোনাকি জ্বলে। সেই আলো আঁধারির রাস্তায় হাঁটতে যে বুড়োর কী ভালো লাগে।

আচ্ছা, ওই বুড়ো বটটার বয়স কত হলো? দেড়শো তো হবেই মনে হয়। অন্তত ওর বয়স দেখে তো তাই মনে হয়। একবার শুনেছিল, অনেক বছর আগে এক সাধু এসে আস্তানা গেড়েছিল এই বুড়ো বটের তলায়। সে ব্রিটিশ আমলে। সাধুর সর্বাঙ্গে ছাই মাখা। পরনে লাল কৌপিন। কোনো কথা বলতো না সাধু। দিনরাত মৌনী থাকত। রাতের বেলায় কারা যেন লুকিয়ে আসত সাধুর কাছে। শুধু তাদের সঙ্গেই সাধু দু-তিনটি কথা বলতো। তাও এমন গলা নামিয়ে কেউ শুনতে পেত না। গোয়ালপাড়ার লোকজন কলাটা-মুলোটা এনে দিত সাধুকে। তাই খেয়ে পেট ভরাতো। তবে সবাই খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করত সাধুকে। গোয়ালপাড়ায় এখন যারা থাকে, তাদের বাপ-ঠাকুরদারা বলে গেছে— ও সাধু ছিল নির্ঘাত ভগবান। সেই ভগবানের কাছে কিছু চাইলে মনোস্কামনা পূর্ণ হতই। একদিন মাঝরাতে ওই বটগাছ ঘিরে ফেলল পুলিশ। ধরে নিয়ে গেল সাধুকে। সাধুর ঝোলায় নাকি পিস্তল পাওয়া গেছে। সাধু নাকি স্বদেশী দলের সঙ্গে সাহেব মারতে গিয়েছিল।

সাধু আর ফিরে আসেনি। কিন্তু মুখে মুখে রটে গেল বড় ঠাকুর হয়ে সাধু এখনও রয়ে গেছে এই বুড়ো বটের ঝুরি নামানো শরীরের ভিতর। লোকে এখনও মনে করে এই বুড়ো বটের কাছে মানত করলে মনস্কামনা পূর্ণ হবে। কত আশা নিয়ে এর মাটি স্পর্শ করা ঝুরিতে লাল সুতো বাঁধে মেয়ে-বউরা।

জোরে পা চালায় বুড়ো। আর ভাবে, বুড়ো বটের ভিতর তো লুকিয়ে আছেন বড় ঠাকুর। পারবেন তো উনি বুড়ো বটকে বাঁচাতে?

* * *

শ্যামবাটি বাজারের দিক থেকে হেঁটে হেঁটে আসছিল অরণ্য। কাল থেকে একটাই প্রশ্ন ওর মনে ঘুরছে— সত্যিই পৃথিবীতে কি কোনো অদ্ভুত আলো ছড়িয়ে পড়ে? যে আলো জীবনে খুব কমই দেখতে পায় মানুষ? যে আলোতে মনের ইচ্ছে মুখ ফুটে বলে ফেলতে হয়। কাল বুড়োর ঘরের জানালা থেকে এরকম একটা আলো চোখে পড়েছে বটে। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে সে আলো তো দেখেনি। সত্যিই কি সেরকম কোনো আলো কাল পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছিল; নাকি পুরোটাই বিভ্রম? ওই খ্যাপাটে বুড়োর ম্যাজিক? জিজ্ঞেস করতে হবে বুড়োকে। জানাটা খুবই দরকার। আর কতদিন ইচ্ছেটা বুকের ভিতর চেপে রাখবে অরণ্য?

গোয়ালপাড়ার মুখে এসে দেখল, বুড়ো বটের তলায় অনেকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যমণি বুড়ো। পায়ে পায়ে সেদিকে এগোল অরণ্য।

।। চার।।

এক জামবাটি ভর্তি মুড়ি খাচ্ছিল কানু ঘোষ। সঙ্গে পেঁয়াজি। পেঁয়াজিটা বাড়িতে করা। কানু ভাত খেতে পারে না। রাতে রুটি। দুপুরে জলে ভেজানো মুড়ি। সঙ্গে একটু তরকারি। আগে পাঁঠার মাংসটা খেতে বেশ ভালোবাসত। বাটি ভর্তি ঝাল ঝাল কষা মাংস সাবাড় করে দিত তুড়ি মেরে। এখন খাওয়া নিষেধ। তবু মাঝে মাঝে মাংস খেতে মনটা আনচান করে। কিন্তু নিজেকে সামলে নেয়। তাকে বাঁচতে হবে অনেকদিন। কানু ঘোষের মরে যেতে ইচ্ছে করে না। আসলে ডাক্তার ওকে সব খাওয়া নিষেধ করে দিয়েছে। সুগার বেড়েছে, কলেস্টেরল, সেই সঙ্গে শরীরের ওজনও। ডাক্তার বলেছে— খাওয়া-দাওয়ায় সংযমী না হলে বিপদ আছে। তা শখ করে কে আর বিপদ ডেকে আনতে চায়? তাই ভাত ছেড়ে দিয়েছে, মাংসও। দিনে দু-বার মুড়ি, আর রাতে রুটি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভেটকি কানুর মুড়ি খাওয়া দেখছিল। তারও যে খেতে ইচ্ছে করছিল না— তা নয়। অনেক সকালে খেয়ে বেরিয়েছে। এখন কানুর মুড়ি খাওয়া দেখতে দেখতে ওর মুখের ভিতর একটু জল এসে গিয়েছিল। চট করে জিভ দিয়ে জলটা টেনে নিল মুখের ভিতর। এখন খেতে যাওয়া যাবে না। মুড়ি খাবে ও একটু পরে। কানু অফিসে গিয়ে বসলে। মুড়ি আর আলুর চপ। কানু পুরো মুড়িটা খাবে না। অর্ধেকটা বাটিতে ফেলে রেখে যাবে। আলুর চপ কিনে এনে ওই বাকি মুড়িটুকু খেয়ে নেবে ভেটকি। আলুর চপ কেনার পয়সাটা অবশ্য কানুই দেবে। কানুর সাথে, তা নয় নয় করেও প্রায় কুড়ি বছর লেগে আছে ভেটকি। ভেটকির এখন চল্লিশ। কানু ওর থেকে বছর পনেরোর বড়। কানুকে ছেড়ে কোথাও যাওয়ার কথাই ভাবতে পারে না ভেটকি। মাঝে মাঝে রেগে গিয়ে 'শুয়োরের বাচ্চা' বলে গাল পাড়লেও কানু যে আসলে ওকে সবথেকে বিশ্বাস করে তা

জানে ভেটকি। কানুর সব গোপন কর্ম ভেটকিকে করতে হয়। কানুর যতক্ষণ খাওয়া শেষ না হবে, ততক্ষণ ভেটকি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে। কানু কিছু জিজ্ঞেস না করলে নিজে থেকে আগবাড়িয়ে কথা বলার নির্দেশ নেই। কানু সেটা পছন্দ করে না।

আজ সকাল থেকেই বড় হুজ্জুতি গেছে কানুর। কাল রামপুরহাটে দুটো লাশ ফেলে দিয়েছে ওর ছেলেরা। আসলে ও দুটোই একটু আল্টু সাল্টু করছিল। তো, এসব লোককে তো আর ছেড়ে রাখা যায় না। কানু দুটোকেই খালাস করে দিতে বলেছিল। তাই দিয়েছে ওর ছেলেরা। তা নিয়ে কাল থেকে পুলিশ একটু ঝামেলা করছিল। তাই আজ সকালেই কানু ছুটে গিয়েছিল রামপুরহাটে। ও গিয়ে দাঁড়ালে পুলিশ চুপ মেরে যাবে— কানু জানে। কানু ঘোষকে ঘাঁটাবে এমন পুলিশ এখন বীরভূমে নেই। কানু গিয়ে দাঁড়াতে চুপ মেরে গিয়েছিল অবশ্য পুলিশ। তা এসব সামলাতে সামলাতে বেলা বেড়ে গেল। ফিরতে ফিরতে বিকেল। কানু বাইরে কিছু খায় না। এখন ফিরে এসে জামবাটি ভর্তি মুড়ি আর পেঁয়াজি নিয়ে বসেছে।

পেঁয়াজিটা মেনকা ভেজেছে। কানুর বউ। অল্প যেটুকুই খায় কানু, সেটুকু মেনকা রান্না না করে দিলে খায় না। সারাদিনে সংসারের কাছে ওইটুকু তো চাওয়া কানুর। তা ওটুকু চাওয়া মেনকা রাখে। তবে, আজকাল কানুকে নিয়ে একটু চিন্তা হয় মেনকার। বলে— তোমার তো অনেক আছে। এবার সব ছেড়ে শান্ত হয়ে বসো দেকিনি। কিন্তু ছাড়তে বললেই কি সব ছাড়া যায়? একবার ছাড়লেই তো বাকি জীবনের জন্য নিঃস্ব। একথা মেনকাকে কী বোঝাবে কানু? তিরিশ বছর আগে মেনকা পালিয়ে এসে কানুকে বিয়ে করেছিল। কঙ্কালীতলায় মেনকাকে সিঁদুর পরিয়ে বিয়ে করেছিল। কিছুই ছিল না তখন কানুর। বিয়ে করে এসে প্রথম রাতটা দুজনে বোলপুর স্টেশনে ওভারব্রিজের ওপর কাটিয়েছিল। তখন এখানে লালপার্টির সরকার। সংসার চালাতে কানু লালপার্টিতে ঢুকে পড়েছিল। তারপর তো কানুর সব হয়েছে। বোলপুরে তিনতলা বাড়ি। একটা স্করপিও, একটা বলেরো আর একটা মারুতি। কানু এখন সাতটা ধানকলের মালিক। শান্তিনিকেতনে রিসর্ট খুলেছে। ওটা ওর ছেলে দেখে। ছেলেটা বাবার মতো হলো না— এটাই যা দুঃখ কানুর। বড্ড নরম-সরম। একটা জাঁদরেল মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে দেবে— ভেবে রেখেছে কানু। গতবছর মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। গরিব ঘরের ছেলে। পছন্দ হয়েছিল কানুর। তুলে এনে বিয়ে দিয়েছে মেয়ের সঙ্গে। ঘরজামাই করে রেখে দিয়েছে। তিনটে ধানকল

জামাই সামলায়। মেয়েটা বড় হিন্দি সিনেমার পোকা। তা হোক গে, বাপসোহাগি মেয়ে। কানু ওকে একটু বেশিই প্রশ্রয় দেয়।

বছর সাতেক আগে যখন লালপার্টি সরকার থেকে সরে গেল, তখন ছ'মাস কানু চুপচাপ বসে ছিল। কোনোদিকে যায়নি। কিন্তু কানুকে তো সবার দরকার। কানু না থাকলে পার্টি কানা। ভোটটা কানুকেই সামলাতে হয় কিনা। সেই জন্যই কানু ব্যস্ত হয়নি। ছ'মাস পরে এখনকার সরকারি পার্টি কানুর দরজায় কড়া নাড়ল। কানু যেন অপেক্ষাই করছিল। ওর পার্টি অফিসের পতাকার রংটা শুধু পাল্টে গেল। কানু ওর লোকজন নিয়ে কানু ঘোষই রইল। বীরভূমের বেতাজ বাদশা। পাঁচ বছর আগে কানু এই পার্টির হয়ে এম এল এ হয়েছে। ইচ্ছে আছে এবার এম পি হবার। কানুকে এখনও জেলার এস পি সেলাম ঠোকে। ডি এমের ঘরে ঢুকলে ডি এম উঠে দাঁড়ায়। সরকারি টেণ্ডার বেরোলে ঠিকাদাররা আগে ওর বাড়িতে এসেই লাইন লাগায়।

তাই বলে কানুকে কেউ দুশ্চরিত্র বলতে পারবে না। কানু কখনো মেনকাকে ঠকায়নি। দু-হাত ভরে দিয়েছে মেনকাকে। মেনকাও খুব তৃপ্ত। ইদানীং অবশ্য সায়াটিকার ব্যথাটা মেনকাকে ভোগাচ্ছে। মেনকার কাছে এখন কোনো শারীরিক চাহিদাও কানুর নেই। তবু শরীর তো। তাকে তো আর সবসময় বাগে রাখা যায় না। তাই কানু একটা মেয়েমোনুষ রেখেছে। অনেকের যেমন দু-তিনটে থাকে, কানুর তেমন নয়। কানুর একটাই। বছর পঁচিশের মেয়ে। বেশ চটক আছে। বিয়ের বছর দুয়েকের ভিতর বরটা মরে গেছে। বেশি বেশি মদ খেয়ে লিভার পচে মরেছে। একা সোমত্ত মেয়েমানুষকে শেয়াল-কুকুর ঠুকরে খেত। কানু তাকে আশ্রয় দিয়েছে। আমোদপুরের দিকে একটা ভাতের হোটেল করে দিয়েছে। হোটেলের পিছনে একতলা পাকা ঘর। মাঝেসাঝে দু-একটা গয়নাও গড়িয়ে দেয়। কানু মাগনা কিছু নেয় না। হপ্তায় একদিন মেয়েটার কাছে যায় কানু। কানু যখন ওর ঘরে ঢোকে, তখন ভেটকি দরজার সামনে পাহারা দেয়। তা, মেয়েটা খুশিই করে দেয়— মানছে কানু। ওর ঘর থেকে বেরোলে কানুর মনটা ফুরফুর করে। তখন সাঁইথিয়া বাজারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ভেটকিকে দিয়ে চারটে গরম রসগোল্লা কিনিয়ে আনে। ডাক্তার যা বলে বলুক, একটা ও নিজে খায়। বাকি তিনটে ভেটকিকে খাওয়ায়। মেনকা এসব জানে। তবে, রাগ করে না। মেনকার তো সায়াটিকার ব্যথা। তাছাড়া, টাকা আছে, ক্ষমতা আছে যার, তার শরীরেরও তো একটা তৃপ্তির দরকার।

আধ বাটি মুড়ি খাওয়া শেষ করে একটু ঠাণ্ডা হলো কানু। জব্বর খিদে পেয়েছিল। এখন নিজেকে একটু সুস্থির লাগছে। মুড়ির বাটিটা ঠেলে সরিয়ে দিল। বাকি মুড়িটা এবার ভেটকি খাবে। মুড়ির বাটি থেকে চোখ উঠিয়ে এবার ভেটকিকে নজর করল কানু। অনেকক্ষণ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেন দাঁড়িয়ে রয়েছে তা জানতে চায়নি কানু। তখন মুড়ি খাওয়াটা খুব জরুরি ছিল।

— কী হলো? বলবি কিছু?

— আজ্ঞে।

— এতক্ষণ বলিসনি কেন? কী দেখছিলি? আমার খাওয়া?

— আজ্ঞে না। আপনি খাচ্ছিলেন কিনা, তাই...

— ভাসুর ঠাকুর আমার! আমি খাচ্ছিলাম বলে উনি কথা বলতে পারছিলেন না। হারামজাদা বল এবার।

— আজ্ঞে, আপনি বলেছিলেন না, তাই আজকে গোয়ালপাড়ার দিকে গিয়েছিলাম।

— গিয়েছিলি— কানুর চোখ এবার সরু হয়। তা কতক্ষণ ছিলি ওখানে?

— সকালের দিকেই চলে গিয়েছিলাম। তা এই ধরেন গে দশটা-এগারোটা।

— আঃ— বিরক্ত হয় কানু। দশটা আর এগারোটা এক হলো? একঘণ্টার ফারাক। শালা হিসাবটাও জানে না। তা ছিলি কতক্ষণ ওখানে?

— তা এই ধরেন তিনটে অবধি। দুপুরে একটু খিদে পেল। ওই গোয়ালপাড়ার মুখে ঝন্টুর যে দোকানটা আছে সেখানে মাছ-ভাত খেলাম।

— কী খেলে এসব কে জানতে চায়? কত লাগল খেতে?

— আজ্ঞে সত্তর টাকা। আগে ষাট নিত, গতমাসে দাম বেড়েছে। পকেট থেকে একটা একশো টাকার নোট বের করে ভেটকির দিকে ছুঁড়ে দেয় কানু। ভেটকি ধরতে পারে না। টাকাটা পায়ের কাছে মাটিতে পড়ে। পরম যত্নে ওটি তুলে ধুলো ঝাড়ার ভঙ্গি করে টাকাটা পকেটে ঢুকিয়ে নেয় ভেটকি।

— বাজে কথা ছেড়ে এবার বল তোকে যা খোঁজ নিতে বলেছিলাম, সেটা নিয়েছিস তো?

— আজ্ঞে, সেটা নিতেই তো যাওয়া। সারাদিন বসে বসে অনেক খোঁজ নিয়েছি।

— কীরকম?

— গোয়ালপাড়ার লোকেরা বলছে, বট গাছটা ওরা কাটতে দেবে না। বলছে, ঠিকাদারকে বলবে রাস্তা ঘুরিয়ে দিতে। তবু বট গাছ কাটতে দেব না।

— ইল্লি আর কী? বলবে, আর রাস্তা ঘুরিয়ে দেবে। তা বটগাছটা কাটতে দেবে না কেন? ওটা ওদের বাপ-পিতেমোর

সম্পত্তি নাকি?

— কী জানি কী বলছে সব। বলছে ওই গাছে কে নাকি একজন বড় ঠাকুর থাকেন। তার কাছে ওরা মানত করে। তা আমি দেখে এলামও বটে। গাছের ডালে যে কত লাল সুতো বেঁধেছে। বলছে, এ বট কিছুতেই কাটা যাবে না।

— তা আটকাবে কী করে?

— আমিও সেটাই তো বুঝতে পারলাম না। ভেঙে তো কিছু বলছে না।

— সেটা একটু খোঁজ নে। কী করবে ওরা।

— আজ সন্ধেবেলা নাকি ওই বটগাছের তলায় ওরা মিটিং করবে। সেরকমই শুনে এলাম।

আবার চোখ সরু হয় কানু ঘোষের।

— মিটিং করবে? ঘোঁট পাকাচ্ছে! পারবে কানু ঘোষের সঙ্গে। মেরে পিঠের চাম গুটিয়ে দেব সবকটার। কানু ঘোষ বলছে রাস্তা হবে তো হবে। গাছ কাটা হবে তো হবে।

মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে ভেটকি। বুঝতে পারে কানু ঘোষের মেজাজ চড়ছে।

— তুই যাবি মিটিংয়ে। পিছনে বসে থাকবি। কোনো কথা বলবি না। লুকিয়ে শুনে আসবি কী বলছে ওরা। তারপর আমি দেখছি শুয়োরের বাচ্চাদের।

মাথা হেলিয়ে সায় দেয় ভেটকি।

এতখানি বলে এবার অফিস ঘরের দিকে পা বাড়ায় কানু। তার পার্টি অফিস বাড়ির লাগোয়া। সকালে সন্ধেয় কানু নিয়ম করে এখানে বসে। পার্টি অফিসের বাইরে সবসময় কুড়ি-পঁচিশটা বাইকের ভিড়। জনা পঞ্চাশেক ছেলে। লোকে বলে, আড়ালে অবশ্যই, কানু ঘোষের দরবার। তা দরবার বলাই যায়। এখানে বসেই কানু সবার আর্জি শোনে। কাউকে যদি কোনো দণ্ড দিতে হয়, এখানে বসেই তা ঘোষণা করে কানু। হপ্তায় একদিন লোকাল থানার ও-সি পর্যন্ত এখানে হাজিরা দিয়ে যায়।

ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে আবার কী মনে করে কানু ঘুরে দাঁড়ালো। চোখ সরু করে ভেটকির দিকে তাকিয়ে বলল— তোকে আর একটা খোঁজ আনতে বলেছিলাম, সেটার কী হলো?

ভেটকির মুখে একটু সলজ্জ হাসি খেলে যায়। মাটির দিকে চোখ নামিয়ে বলে— সে তো দু'দিন আগেই নিয়েছি। আপনাকে বলা হয়নি।

— বলিসনি কেন? এখন বল।

— মাঝে মাঝে একটা লোক যায় বটে টুকির কাছে। দুপুরের দিকে।

—কী রকম লোক?

— একটু খ্যাপা টাইপের। একটা ভাঙা বাইক চালিয়ে আসে। খোঁজ নিয়েছি, ওর একটা গ্রিলের কারখানা আছে।

— তা কী করে গিয়ে?

— কিছুই না। কিসব গল্পটল্প করে। টুকি ওকে ভাত খাওয়ায়। তারপর চলে যায় লোকটা।

— আর?

— মাইরি বলছি আপনাকে। লোকটা কিন্তু কখনো টুকির ঘরে যায়নি। দোকানেই বসে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে ভেটকি। তারপর মাটির দিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলে— আজ্ঞে, লোকটা কিন্তু ভালো। সাদাসিধা। ওকে কিছু করবেন না। ওকে ছেড়ে দিন।

চোখ সরু করে কী যেন ভাবে কানু ঘোষ। তারপর আচমকাই খ্যা-খ্যা করে হাসতে শুরু করে। হাসতে হাসতেই বলে— মেয়েমানুষের কাছে যায়, ঘরে ঢোকে না— অ্যাঁ! ঢোঁড়া সাপ নাকি রে! টুকিকে বলিস ওকে যেন ভালো করে খাওয়ায়। তবে মাংসের ঝোলটা ওকে দেবে। মাংস কিন্তু আমিই খাবো। বলে আর খ্যাক-খ্যাক করে হাসে। অনেকক্ষণ ধরে হাসে। ভেটকি মাথা নীচু করে কানু ঘোষের হাসি শোনে। তবে একটু নিশ্চিন্তও হয়। যাক বাবা, খ্যাপা লোকটার বিপদ কেটে গেছে। লোকটা কিন্তু সত্যিই ভালো— এ নিয়ে মিথ্যে কিছু বলেনি কানু ঘোষকে।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে একশো টাকার একটা নোট ভেটকির হাতে গুঁজে দিয়ে যায় কানু।

* * *

নবদ্বীপের দোকানে বসে একা একা চা খাচ্ছিল সংঘমিত্রা। একবার সুবর্ণরেখায় যাবে ভেবেছিল। কয়েকটা বই কেনার আছে। কিন্তু এখন আর যেতে ইচ্ছে করছে না। চা খেয়ে উঠবে। বাড়ি যাবে। তারপর ধীরে সুস্থে, সন্ধের দিকে ওর চায়ের দোকানটা খুলে বসবে। আজ খুব একটা বেশি ক্লাস ছিল না কলেজে। তাড়াতাড়িই বেরিয়েছে। কী খেয়াল হলো কে জানে, ফেরার সময় রতনপল্লির মুখটায় টোটো থেকে নেমে পড়ল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে সোজা এই নবদ্বীপের দোকানে। সবে বিকেল হচ্ছে। এই সময় খদ্দের খুব একটা নেই। একা একা বসেই চা খাচ্ছিল সংঘমিত্রা। সেই সঙ্গে নবদ্বীপের সঙ্গে দু-একটা টুকটাক কথা। বেশ লাগছে আজ বিকেলটা। সুন্দর একটা আলো চারদিকে। কাল মনটা খারাপ ছিল বটে। কিন্তু

তারপর ভালো হয়ে গিয়েছে। আজ সকাল থেকেই মনটা ভালো। আজ কলেজে দুটো ক্লাস ছিল। খুব মন দিয়ে পড়িয়েছে। টিচার্স রুমে ইনুদির সঙ্গেও বেশ হেসে হেসে গল্প করেছে। এখন নবদ্বীপের দোকানে বসে চা খেতে খেতেও সংঘমিত্রা বুঝল, মনের ভিতরও আজ রোদ্দুর উঠেছে। তবে, আরও একটা বিষয়ও লক্ষ্য করেছে সংঘমিত্রা। মন খারাপ থাকলে যেমন কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না, তেমনই মন খুব ভালো থাকলেও কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। তখনও ইচ্ছে করে মন ভালোটা নিয়ে একা একাই থাকি। নিজের সঙ্গেই গল্প করি। সংঘমিত্রা ঠিক করল আজকেও সে কারও সঙ্গে কথা বলবে না। নিজের মনে, একা একা নিজের সঙ্গেই কথা বলবে।

নবদ্বীপের দোকান থকে বেরিয়ে আর টোটোয় উঠল না সংঘমিত্রা। ঠিক করল হেঁটে হেঁটেই গোয়ালপাড়ার মোড় অবধি যাবে, তারপর বাড়ি ফিরবে। অনেকদিন যাওয়া হয় না, আজ ক্যানেলের ধারে দাঁড়িয়ে একটু সূর্যাস্ত দেখবে। মন ভালো থাকতে থাকতেই দেখে নিতে হবে। বলা তো যায় না, আবার কখন মন খারাপ হয়ে যাবে। আসলে ওর মন যে কখন খারাপ হবে, আর কখন ভালো থাকবে, তা সংঘমিত্রা নিজেই বোঝে না। রতনপল্লির মুখে এসে একবার উদয়ন বাড়ির দিকে তাকালো সংঘমিত্রা। বিকেলের আলো পড়েছে উদয়ন বাড়ির বারান্দায়। তার সাদা রঙে বিকেলের আলোয় কমলা ছোপ। বাড়িটাকেও এই সময় দেখতে কী সুন্দর লাগছে। কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে আবার হাঁটতে শুরু করল সংঘমিত্রা।

আচ্ছা, ওর মন খারাপ হয় কেন? এমন তো নয় ও খুব কষ্টে আছে। ও যেরকম থাকতে চেয়েছিল, সেরকমই তো আছে। ওর থাকায় কোথাও কোনো ছন্দপতন হয়নি তো। তবু মাঝে মাঝে মন খারাপ হয় কেন? এ প্রশ্নটা ও নিজেই নিজেকে অনেকবার করেছে। তবু, তার কোনো সঠিক উত্তর খুঁজে পায়নি। এখনও হাঁটতে হাঁটতে আরও একবার নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করল— মন কেন খারাপ হয় বলতে পারো কি সেটা?

ওর ভিতর কে যেন একটা বসে ছিল। সে বলে উঠল— মনের খবর আমি কী জানি? সে তো তোমার রাখার কথা ছিল।

— আমি অত খবর রাখতে পারব না বাপু। তোমার জানা থাকলে তুমি বল।

— বলব আমি? শুনবে তো আমার কথা?

— যদি শোনার মতো হয়, শুনবো। তবে কথা দিতে পারছি না।

— এই যে তুমি এখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছ, কী সুন্দর আলো দেখ চারদিকে, গাছপালায় মাঠেঘাটে, ঘণ্টা ঘরের সামনে বাচ্চারা খেলছে— সব কেমন সুন্দর। তাই কিনা বল?

— হ্যাঁ। সুন্দর। সত্যিই খুব সুন্দর সবকিছু।

— মনটা আজ তোমার ভালো হয়ে আছে কিনা, বল।

— হ্যাঁ। ভীষণ ভালো হয়ে আছে। নিজে নিজেই গান গাইতে ইচ্ছে করছে, নাচতে ইচ্ছে করছে।

— আচ্ছা, তা কালকেও তো এরকম আলো ছিল চারদিকে, মাঠেঘাটে, গাছপালায় এরকম আলো তো কালকেও ছড়িয়ে পড়েছিল, কালকেও তো ঘণ্টাঘরের সামনে বাচ্চারা খেলে বেড়াচ্ছিল। তাই কিনা বল?

— হ্যাঁ। তা তো বটেই।

— তবে, কাল তোমার মন খারাপ ছিল কেন?

এবার সত্যিই একটু থতমত খায় সংঘমিত্রা। সত্যিই তো কাল ওর মন খারাপ ছিল কেন? সাতপাঁচ ভেবেও মন খারাপের কোনো কারণ খুঁজে পেল না সংঘমিত্রা। আর তখনই ওর বুকের ভিতর যে মানুষটা বসেছিল, সে খিলখিলিয়ে বলে উঠল— পারলে না তো, পারলে না। তাহলে আমি এবার বলে দিই?

— হ্যাঁ। বল— দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল সংঘমিত্রা।

— মনের আর কী দোষ বল? মনও তো লালন চায়। চায় কিনা বল? লালন না করলেই তার মেজাজ বিগড়োয়।

— লালন করব কী করে? সেটাই তো আমি জানি না।

— জানবে, জানবে, সব জানবে। খিলখিলিয়ে ভিতরের মানুষটা বলে উঠল— সময় হলে মনই বলে দেবে কী উপায়ে লালন করতে হয়।

নিজের মনে মনে কথা বলতে বলতেই কখন যেন গোয়ালপাড়ার মুখে পৌঁছে গিয়েছিল সংঘমিত্রা। ক্যানেলের ওপরে পুরনো কালভার্টের পাশে আর একটা নতুন কালভার্ট হয়েছে। আরও চওড়া, আরও বড়। অনেক বেশি গাড়ি যেতে পারে এখন। আসলে এখন অনেক কিছু বদলে যাচ্ছে। খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। গোয়ালপাড়া আর প্রান্তিকের দিকে কত বাড়ি হয়ে গেল। সোনাঝুরির লাল মাটির রাস্তায় পিচ পড়ল। উজ্জ্বল বাতিস্তম্ভ বসে গেল গোয়ালপাড়ার মোড়ে। শহর যেন হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। বিকেল শেষ হয়ে যাচ্ছে। তার আগে শেষ আলো ছড়িয়ে পড়েছে ক্যানেলের জলে। সোনাঝুড়ির বৃক্ষরাজির ডালে ডালে, পাতায় পাতায়।

সংঘমিত্রা লক্ষ্য করল গোয়ালপাড়ার মুখে যে বুড়ো বটগাছটা তাকে ঘিরে জটলা পাকিয়েছে জনা পঁচিশ-তিরিশ নানা বয়সের পুরুষ-মহিলা। এরা সবাই স্থানীয়। কারোর এখানে চায়ের দোকান, কেউ ভাতের হোটেল চালায়, কেউ পান

সিগারেট বেচে, কারো ছোট্ট মনোহারির কারবার। এদের সবাইকেই চেনে সংঘমিত্রা। ভিড় দেখে তাদের দিকে পায়ে পায়ে এগোলো। বুড়ো বটের তলায় একটা চেয়ার পাতা হয়েছে। আর গোল হয়ে দাঁড়িয়ে ওই জটলাটা উত্তেজিতভাবে কী যেন আলোচনা করছে।

কৌতূহল হলো সংঘমিত্রার। গলা উঁচিয়ে জানতে চাইল— কী হয়েছে গো তোমাদের এখানে?

— ও মা, দিদি! জানো না কিছু? কিছু শোনোনি?

— না, শুনিনি তো। আসলে কয়েকদিন আসিনি তো এদিকে।

— আমাদের এই বুড়ো বট গাছটা কেটে ফেলবে গো। গাছ কেটে রাস্তা চওড়া করবে।

— গাছ কাটবে? কে? একটু অবাকই হয় সংঘমিত্রা।

— ওই যে কানু ঘোষের লোকেরা। পরশুদিন এসে সব মাপজোক করে গেছে।

— ও মা। তা এবার কী হবে?

— আমরা এ গাছ কাটতে দেব না। এ গাছে আমাদের বড়ঠাকুর আছে।

— কিন্তু আটকাবে কী করে তোমরা?

— সেটা ভেবে বের করতে হবে। এই তো একটু পরেই নতুন পল্লির বুড়ো দাদু আসছে। দাদু এলেই আমরা সবাই মিলে শলা করব। বুড়ো বটকে কাটতেই দেব না।

— পারবে?

— পারতেই হবে দিদি। তুমিও একটু থেকে যাও না। তুমিও দুটো কথা বলবে।

বুড়ো বটের তলায় ভিড় করা মুখগুলোর দিকে অপলক চেয়ে থাকে সংঘমিত্রা। শেষ বিকেলের আলো ওদের মুখেও যে ছড়িয়ে পড়েছে। সে আলোয় কী এক অত্যাশ্চর্য ভালোবাসা যেন মাখামাখি হয়ে আছে। সংঘমিত্রা ঠিক করল— আজ আর চায়ের দোকান খুলবে না। বুড়ো বটের জটলায় আজ সে-ও একজন হয়েই থাকবে।

।। পাঁচ ।।

কেন আমাদের সুখবিলাসের কথা বলো। সারাদিন মদ খেত। ভ্যান চালিয়ে যেটুকু টাকা পেত মদ খেয়ে উড়িয়ে আসত। আর বাড়িতে এসেই বউকে পেটাতো। কী কষ্টের দিন গেছে বউটার। তা, বউটা এসে একদিন বুড়ো বটের তলায় হত্যে দিয়ে পড়ল। বটের গায়ে মাথা কোটে আর কাঁদে। বলে, বড় ঠাকুর আমার মানুষটাকে ভালো করে দাও গো। গাছের ডালে লাল সুতোও বাঁধল। তা ফল পেল কিনা তোমরা বল? সুখবিলাস মদ খাওয়া ছেড়ে দিল তো। এখন কী সুখের সংসার ওদের। বউটারও কী হাসিমুখ। এতখানি বলে লক্ষ্মী থামে। এই গোয়ালপাড়ার মোড়ে তার মুড়ির দোকান। ভিড়ের দিকে ফিরে চায় লক্ষ্মী। বলে— কী গো তোমরা বলো। আমি কিছু ভুল বলছি কিনা। তোমরাও তো দেখেছো। ভিড়ের ভিতর থেকে সবাই বলে ওঠে— ঠিক, ঠিক, ঠিক। মানত করেই তো ভালো হলো সুখবিলাস। বড়ো করে শ্বাস টানে লক্ষ্মী। তারপর মুখে একটা আবেশ এনে বলে— তা'হলে...

এখন সন্ধে নেমেছে। গোয়ালপাড়ার মোড়ে রাস্তার আলোগুলো একটা একটা করে জ্বলে উঠেছে। আগে রাস্তায় টিমটিমে আলো ছিল। আলো-অন্ধকারে মাখামাখি হয়ে থাকতো রাস্তাটা। এখন বড়ো বড়ো আলো বসেছে। রাতের বেলায়ও মনে হয় দিনের আলো। বুড়ো বটগাছের নীচে পাতা চেয়ারে বুড়ো বসেছে। বুড়োর বসার জন্যই ঝন্টুর দোকান থেকে চেয়ারটা আনা হয়েছে। বাকিরা সবাই গোল হয়ে বুড়োকে ঘিরে মাটিতে বসে। এত লোকের কথার মাঝেই ঝন্টু এককাপ চা এগিয়ে দিল বুড়োর দিকে। বলল— নাও দাদু, ধর। তোমার জন্যই বানিয়ে আনলাম। চিনি ছাড়া। বুড়ো বটের ঠিক পাশেই ঝন্টুর হোটেল। আগে কাঁচা মাটি আর টালির চালের ছিল। এখন পাকা হয়েছে। সকালে ডিম-পাউরুটি আর ঘুঘনি বিক্রি হয়। দুপুরে ভাত-মাছ। বিকেলে আবার চা আর চপ। বুড়োর দিকে চা বাড়িয়ে দিয়ে ঝন্টু ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বলল— আমি তা'লে একটা কথা বলি। এই ধর না কেন আমার হোটেলটার কথা। তখন তো হোটেল ছোট ছিল। বাবা বসত হোটেলে। তা বাবা করত কী, রোজ বুড়ো বটের গোড়ায় একটা ধূপ দিত। আর বলত— বাবা, একটু দেখ। তা দেখল তো বাবা! হোটেল তো পাকা হলো। বড়ো হলো। বড়ো ঠাকুর না থাকলে হতো এটা তোমরা বলো? জটলার ভিতর থেকে আবার সমস্বরে সবাই বলে উঠল— ঠিক, ঠিক, ঠিক।

বুড়ো আকাশের দিকে তাকালো। তারাগুলি এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়াও ছুটে আসছে। র‍্যাপারটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিল বুড়ো। জটলা থেকে সমস্বরে সবাই অনেক কিছু বলে যাচ্ছে। আর মাঝে মাঝে ধুয়ো দেওয়ার মতো

With Best Compliments From :

Dr. Sawar Dhanania

Master in Mech. Engineering (Gold Medalist) Jadavpur University, Kolkata

PhD IIT, Kharagpur, W. B.

Chairman

Rubber Board, Ministry of Commerce & Industry

Govt. of India

Email : sdhanania@gmail.com

Mob. : 9331741971

LAUREL

With Best Wishes From-

Laurel Securities Private Limited

(Member of National Stock Exchange of India Ltd.)

LAUREL ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED

(Mutual Fund Distributor)

Laurel Investment Advisor

(Investment Advisor)

JAIN BAID & COMPANY

(Chartered Accountants)

909-910, Diamond Heritage, 16, Strand Road, 9th Floor, Kolkata - 700001

Phone No. 66153334-39, Fax No. 66153330 / 41, Email ID - prakash_laurel@yahoo.com

আওয়াজ উঠছে— ঠিকই তো, ঠিকই তো, ঠিকই তো। কাল গোয়ালপাড়ার এই মানুষগুলো গিয়ে বুড়োকে ধরেছিল। বলেছিল— বুড়ো বটকে বাঁচাতেই হবে। বুড়ো বট না থাকলে, কে ওদের ভালো রাখবে? বুড়ো বটকে বাঁচাতে হবে, যে করেই হোক। কিন্তু কী করে বুড়ো বটকে বাঁচাতে হবে, তা ওরা কেউ ভেবে পায়নি। বুড়োও অবশ্য ভেবে পায়নি। কানু ঘোষের অনেক টাকা, অনেক লোক— তার হাত থেকে বুড়ো বটকে বাঁচানো যাবে কী করে ভেবে পায়নি বুড়ো। তখনই ঠিক হয়েছিল আজ সন্ধেবেলা বুড়ো বটের তলাতেই শলা করতে বসবে সবাই মিলে। একটা উপায় ঠিক বেরিয়ে আসবে। বড় ঠাকুরই উপায় বলে দেবেন।

বুড়ো বটের ঝুরি মাটি ছুঁয়েছে। মাটি ছোঁয়া সেইসব ঝুরিতে কত সহস্র লাল সুতো বাঁধা। রোদে বৃষ্টিতে অনেক সুতোর রং উঠে গেছে। শুধু সুতোটাই বোঝা যায়। কত মানুষের কত গোপন ইচ্ছা চিহ্ন এইগুলো। কত যুগ ধরে কত মানুষ এইসব সুতো বেঁধে এসেছে বুড়ো বটের ঝুরিতে। ভেবে তল পায় না বুড়ো। আচ্ছা, মানুষের এইসব ইচ্ছা হয় কেন? সবসময় যে সব ইচ্ছা পূরণ হয় তা তো নয়। তবু মানুষের আবার নতুন নতুন ইচ্ছা হয়। কেন হয়? ভেবে ভেবে কোনো উত্তর পায় না বুড়ো।

ভিড় থেকে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ছিল ভেটকি। রাস্তার আলো একটু আড়াল করে। মুখটা ভালো করে চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছে। যাতে চট করে ঠাহর করা না যায়। দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু কান খাড়া করে শুনছিল জটলা থেকে ভেসে আসা কথাগুলো। আর ফুক ফুক করে বিড়ি খাচ্ছিল। এই জীবনের প্রায় অর্ধেকটাই কানু ঘোষের পায়ে পায়ে ঘুরে কেটে গেল। স্রেফ উঞ্ছবৃত্তি। আড়ালে যে লোকে ওকে বাবুর বাড়ির অ্যালসেশিয়ান বলে তা ভেটকি জানে। সেটা শুনতে কি ভালো লাগে ভেটকির! মোটেই না। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে ভেটকির এই উঞ্ছবৃত্তি ছেড়ে চলে আসবে। আর যাবে না কানু ঘোষের বাড়িতে। আর এরকম চাদরে মাথা মুড়িয়ে আড়ি পাততে আসবে না। কানু ঘোষের বাঁধা মেয়েমানুষের ঘরে কোন পুরুষ আসে লুকিয়ে সে খবরও নিতে যাবে না। এসব ভাবে, কিন্তু ছেড়ে আসতে পারে না। ছেড়ে যাবে কোথায়? ভেটকি তো এছাড়া কোনো কাজ করতে শেখেনি। তাছাড়া কানু ঘোষ তো তার অন্নদাতা। মাঝে মধ্যেই তার হাতে দু-দশ টাকা গুঁজে দেয় তো। এ বাদে এধার ওধার থেকে কানুর নাম করে কিছু টাকা কামানোও তো আছে। ভেটকির বউ এসব পছন্দ করে না। কতবার বলেছে, এবার এসব বাদ দাও। একটু ভদ্রভাবে বাঁচো দেখি। ভেটকি বলতে পারেনি, মানুষের সব ইচ্ছাই কি পূরণ হয় রে বউ?

অন্ধকারে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ভেটকির মনে পড়ে গেল, তারও তো কতগুলি ইচ্ছা ছিল। সে ইচ্ছাগুলি কোনোদিন ফুল হয়ে ফুটে উঠল না। ভেটকির বউ কতদিন বলেছিল, কঙ্কালী মাকে একটা ভালো শাড়ি পরিয়ে আসবে। আর দশ-বিশজন ভিখারিকে নারায়ণসেবা করাবে। বউয়ের সে ইচ্ছা ভেটকি রাখতেই পারলো না এতদিনেও। ভেটকির ইচ্ছে ছিল, মেয়েকে একটা ইংরেজি বলা স্কুলে পড়াবে। তার মেয়েও সাদা জামা পরে হাসতে হাসতে ইংরেজি বলা স্কুলে যাবে— এমনই কতদিন ভেবেছে ভেটকি। ভেটকির এই ইচ্ছাও পূর্ণ হলো না। ভেটকি ভেবেছিল, ওরও একদিন একটা একতলা পাকা বাড়ি হবে। সামনে একটু উঠোন। লাউমাচা। বেস্পতিবারে বউ লক্ষ্মীপুজো করবে। আর ভেটকি যখন বাড়ি ফিরে আসবে, তখন বউ জল-বাতাসা এগিয়ে দিয়ে বলবে— আজ বড়ো পরিশ্রম গেল, না গো? জটলার কথা কান পেতে শুনছিল আর ভেটকির মনে হচ্ছিল, ওর বউ-ও যদি বুড়ো বটের ঝুরিতে একটা লাল সুতো বেঁধে দিয়ে যেত। কিন্তু সে উপায় আর নেই। আর ক'দিন পরেই বুড়ো বট কাটা পড়ে যাবে। যদি বুড়ো বট কাটা না পড়ত, যদি আরও অনেকদিন বুড়ো বট মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতো— তবে নিশ্চয়ই ভেটকি তার বউকে বলত, একটা লাল সুতো বেঁধে মানত করতে। বুড়ো বটের গায়ে মাথা ঠেকিয়ে বউ বলত— বড় ঠাকুর, এবার এই উচ্ছন্ন লোকটাকে একটু মানুষ করে দাও। তা অবশ্য আর কোনোদিন হবে না— জানে ভেটকি।

জটলার ভিতর গলার স্বর ক্রমশ বাড়ছে। আলাদা করে বুড়ো আর কারুর কথা শোনে না। একটা গুঞ্জন শুধু মাথার ওপর ভেসে বেড়ায়। বুড়ো বটের পাতায় পাতায় ঘুরে বেড়ায় সে গুঞ্জন। বুড়োর কানে আলাদা করে আর কোনো কথা ঢোকে না। আকাশের দিকে তাকায় বুড়ো। ঘন কালো আকাশে অসংখ্য তারা ফুটেছে আজ। কাল মাঘোৎসব। উপাসনা মন্দির মোমবাতির আলোয় সেজে উঠবে। মাঘোৎসবের দিনটিতে বুড়ো সন্ধে নামতে না নামতেই আম্রকুঞ্জে অন্ধকারে নিজেকে আড়াল করে বসে থাকে। ভিড়ের ভিতর যায় না। উপাসনা মন্দির থেকে উপনিষদের বাণী ছড়িয়ে পড়ে শান্তিনিকেতন প্রাঙ্গণে। স্তব্ধ হয়ে বসে শোনে বুড়ো। একসময় মাঘোৎসবের উপাসনা শেষ হয়। যে যার মতো ঘরে ফিরে যায়। সবার শেষে বুড়ো ফেরে। একা। তারপর রাতভর তার নির্জন বাড়িটিতে বসে শিরিষ আর কৃষ্ণচূড়া গাছের সঙ্গে সুখ-দুঃখের গল্প করে

যায়। ওরা সে গল্প শোনে। আদর করে বুড়োকে। এসবই ঘটে সকলের অন্তরালে। বুড়ো কাউকে একথা কোনোদিন বলেনি।

আচ্ছা, ওর নিজের কি কোনোদিন কোনো ইচ্ছে ছিল? বিশেষ ইচ্ছে? যা আজ অবধি পূর্ণ হয়নি। ভেবে তল পায় না বুড়ো। কোনো বিশেষ ইচ্ছের কথাই তার মনে পড়ে না। এই বুড়ো বটের তলায় তাকে ঘিরে যারা বসে আছে, তাদের কতজনের তো কতরকম ইচ্ছে। কারো ইচ্ছে পূর্ণ হয়েছে, অনেকের ইচ্ছেই পূর্ণ হয়নি। তবু আজ, এই জানুয়ারির শীত সন্ধ্যায় অপূর্ণ ইচ্ছেগুলিকে ছাপিয়ে পূর্ণ ইচ্ছেগুলিই যেন বড় হয়ে ওঠে। যাদের কখনোই, কোনো ইচ্ছেই পূর্ণ হয়নি— তারাও যেন আবার নতুন নতুন ইচ্ছে নিয়ে বাঁচতে চায় আজ। বুড়োর মনে হয়, এটাই আসলে মানুষের বেঁচে থাকা।

ও দাদু, দাদু, এবার তুমি কিছু বলো— ঝন্টুর ডাকে চটকা ভাঙে বুড়ো। আকাশের দিক থেকে চোখ নামিয়ে এবার জটলার দিকে তাকায়। জটলায় জড়াজড়ি করে অনেক মেয়েপুরুষের মুখ। আলাদা করে কাউকেই আর চেনা যায় না এখন। এক মুখ যেন সবার, একই কণ্ঠস্বর। জটলার দিকে তাকিয়ে বুড়ো বলে— তা কী করতে চাও তোমরা?

— কী আবার? এতক্ষণ তো বললাম আমরা। বুড়ো বটকে কাটতে দেবো না। কিছুতেই না। সমস্বরে বলে ওঠে জটলার মেয়েপুরুষরা।

— সে তো বুঝলাম। কিন্তু আটকাবে কী করে? কানু ঘোষের অনেক পয়সা, অনেক লোক। পুলিশও কানু ঘোষের কথা শোনে। পারবে কানু ঘোষের সঙ্গে?

জটলার গুঞ্জনটা এবার থমকে যায়। এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। আসলে বুড়ো বটকে বাঁচাবে কী করে— সেটা ওরা কেউই ভেবে পায়নি। দু'দিন ধরে বুড়োও খুব ভেবেছে। কিন্তু ভেবে কোনো উপায় বের করতে পারেনি। জটলার থেকে একটু দূরে থাকা ভেটকির কানেও গেল বুড়োর কথাটা। মোক্ষম বলেছে বুড়ো। এক কথায় সবাই চুপ। কারও মুখেই আর কোনো উত্তর নেই। তা বুড়ো কথাটা খুব ভুল বলেনি বটে— ভাবল ভেটকি। আজকে এখানে আসার আগেই ভেটকি দেখে এসেছে কানু লোকজন ডেকে পাঠিয়েছে। ষণ্ডাগুন্ডা সব ছেলে। বাইক চালায়, হাতে বালা। গত পঞ্চায়েত ভোটের সময় বুথ দখল করল। তাদের যা বলার বলে দিয়েছে কানু। দু-তিনদিনের ভিতর ওরা দল বেঁধে চলে আসবে। এখানে সব দোকানপাট ভাঙচুর করবে। চাই কি, মেয়েদের গায়ে হাত দিয়ে একটু হাতের সুখও করে নেবে। বুড়ো বটগাছটাও কেটে দেবে। কিচ্ছু করতে পারবে না গোয়ালপাড়ার লোকগুলো। এতক্ষণে এই লোকগুলোর জন্য ভেটকির একটু মন খারাপ লাগতে শুরু করে। আর ভাবে, আগে জানলে বউটাকে একবার বলতো, বুড়ো বটে একটা লাল সুতো বেঁধে দিয়ে যেতে।

— আমার একটা কথা বলার ছিল— বলে মিলন উঠে দাঁড়ায়। জটলার সবকটি মুখ উৎসুক হয়ে মিলনের দিকে তাকায়। মিলন একটা উদোমাদা চণ্ডীচরণ। সবাই জানে। তবু মিলন কী বলে জানে, জানতে চায় সবাই।

— তা'লে বলি আমার কথাটা?

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, বল, বল। ভ্যানতাড়া করো না এখন। জটলার ভিতর থেকে অধৈর্য গলায় কে একজন বলে ওঠে।

— আমি বলছিলাম কি, কানু ঘোষের অনেক লোক। অনেক পয়সা। আমরা পারবো কেমন করে? কিনা, তাই বল—

— আরে বাবা, সে তো আমরা জানি। নতুন কিছু বলার থাকলে বলো না— জটলার কণ্ঠস্বর ক্রমশ অধৈর্য হয় এবার।

— আমি বলছিলাম, এই বুড়ো বটকে জড়িয়ে আমরা সবাই যদি বসে থাকি। সারাদিন, সারারাত। ঘিরে বসে থাকি বুড়ো বটকে। যদি আগলে রাখি তাকে। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে জটলার দিকে তাকায় মিলন। তার কথা মেনে নেবে কি সবাই?

মিলনের কথার পর জটলাতে আবার একটা নীরবতা নেমে আসে। ফিসফাস করে পরস্পর কী যেন আলোচনা করতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে, জটলার ভিতর থেকে ক্ষয়াটে চেহারার এক মাঝবয়সি মানুষ উঠে দাঁড়ায়। গলা খাকারি দিয়ে বলে— তা বুঝলে সবাই, মিলন খুব একটা খারাপ বলেনি। বুড়ো বটকে ঘিরে আমরা সবাই বসে থাকি না কেন। আজ রাত থেকেই। ওকে বাঁচাতে পারবো কি, পারবো না জানি না। কিন্তু যে ক'টা দিন রয়েছে, ওকে ঘিরে থাকি না কেন। কী বল হে সবাই?

দূরে দাঁড়িয়ে ভেটকি অবাক হয়ে শুনছিল। ওই ন্যালাখ্যাপা ম্যাদামারা লোকটা তো মোক্ষম বলেছে। ওই লোকটাই তো ঝরঝরে বাইক চালিয়ে টুকির কাছে যায়। আজকের কথাটা যদি কানুর কানে যায়, তাহলে মেরেই ফেলবে লোকটাকে। টুকির ঘরে না ঢুকেও বেঘোরে মরে যাবে লোকটা। তবে, রক্তারক্তি কাণ্ড একটা কিছু ঘটে যাবেই— তা বুঝতে পারে ভেটকি। কানু ঘোষের লোকেরা এসে এদের ছেড়ে দেবে না।

কী সুন্দর বলল মিলন। ভাবে বুড়ো। সকলে মিলে ঘিরে বসে থাকা এই গাছকে। ঘিরে ঘিরে বসে থাকা। আদরে-আহ্লাদে জড়িয়ে রাখা তাকে। মিলন সত্যিই গাছের ভাষা বুঝেছে। জটলার দিকে তাকিয়ে বুড়ো বলল— মিলন কিন্তু ভালো বলেছে। ওর কথাটা মেনে নাও সবাই। আজ রাত থেকেই বুড়ো বটকে ঘিরে বসে পড় মেয়ে-পুরুষ সবাই। দিনরাত সবসময়।

হাত দিয়ে এই বুড়ো বটকে ছুঁয়ে থাকো।

জটলার ভিতর থেকে সাড়া মিলল। গাছকে ঘিরে বসে পড়ার হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল। যারা গাছের ডালে লাল সুতো বেঁধেছিল তারা তো বসলই, যারা বাঁধেনি তারাও বসল। যেন আপনজনকে আগলে রাখছে সবাই।

এতক্ষণ সবটা চুপ করে দেখছিল সংঘমিত্রা। আজ সারাদিন ওর মনটা বড়ো ভালো হয়ে আছে। কোথাও যেন একটা খুশির হাওয়া বয়ে আসছে ওর মনের ভিতরে। জটলার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওরও এখন কিছু বলতে ইচ্ছে করল। বুড়োর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল— দাদু, আমি কি কিছু বলতে পারি?

— বল না। এখানে সবাই সবকিছু বলতে পারে। মনের কথা বলতে পারে।

— কাল তো উপাসনা মন্দিরে মাঘোৎসব। আজ এখান থেকেই আমরা মাঘোৎসব শুরু করে দিই না কেন। বটগাছটাকে ঘিরে আমরা মোমবাতি জ্বালাই, প্রদীপ জ্বালাই। ওকে ঘিরে বসে আমরা গান গাই। কত রকমের গান। উপাসনা মন্দিরের উপাসনা যেমন ছড়িয়ে পড়ে ছাতিম তলায়, আম্রকুঞ্জে, আমাদের গানও আজ ছড়িয়ে পড়ুক গোয়ালপাড়ায়, সোনাঝুরিতে, কোপাইয়ের তীরে।

অবাক হয়ে তাকায় বুড়ো। মেয়েটা বলছে কী! নিজের ভিতর আছে তো! বুড়োর মনে হলো, মেয়েটা যেন ঘোরের ভিতর কথা বলে চলেছে। আজ কি নিশিতে পেল সবাইকে? ঘোর লাগল সবার? ভাবে বুড়ো।

সংঘমিত্রার কথা শেষ হলো না। পাশের মনোহারি দোকান থেকে কে যেন ছুটে গিয়ে এক প্যাকেট মোমবাতি কিনে নিয়ে এলো। জটলার ভিতর থেকেই কেউ প্যাকেটটা এগিয়ে দিল সংঘমিত্রার দিকে। বলল— প্রথমটা আপনি জ্বালান দিদি। কে যেন হাঁক মেরে বলল— ওরে, দেশলাইটা দে। বুড়ো বটকে ঘিরে হাতে হাতে মোমবাতি জ্বলে উঠল। যেন আলোর মালা। বুড়ো সংঘমিত্রার দিকে তাকিয়ে, স্মিত হেসে বলল— এবার গানটা ধর। আমাদের আলোর উৎসব শুরু হোক। সব অন্ধকার দূর হোক।

কিছুক্ষণ তারাভরা আকাশের দিকে আপলক তাকিয়ে থাকে সংঘমিত্রা। তারপর আপন মনেই, যেন ধ্যানস্থ, চোখ বুজে গেয়ে ওঠে— 'আমার এই রিক্ত ডালি, দিব তোমারই পায়ে...'। বুড়ো বটের ডালপালা ছাড়িয়ে, গোয়ালপাড়ার মাঠঘাট ছাড়িয়ে, সোনঝুরির জঙ্গল পেরিয়ে ঈশ্বরের আকাশে খেলে বেড়াতে লাগল সেই সংগীত। অপার্থিব। মোহময়।

গোড়া থেকেই জটলার একদম পিছনে বসে ছিল অরণ্য। কোনো কথা বলেনি। শুধু গোয়ালপাড়ার লোকগুলোর কথা শুনছিল আর ওদের কাণ্ড কারখানা দেখছিল। অরণ্যর বসে থাকার অন্য একটা কারণ ছিল অবশ্য। অরণ্য ভেবেছিল, এইসব ভিড়ভাট্টা কমলে ও বুড়োকে ধরবে। সরাসরি জানতে চাইবে, সেদিন বুড়ো যে ম্যাজিক আলোর কথা বলেছিল, তা কি সত্যিই নেমেছিল পৃথিবীতে? নাকি তা ছিল নিছকই বিভ্রম। এখন সংঘমিত্রার গান শুনতে শুনতে কী এক অদ্ভুত লজ্জা পেয়ে বসল অরণ্যকে। ওর বুক ধুকপুক করতে লাগল, গলা শুকিয়ে উঠল। আর চোখ তুলে তাকাতেই পারল না অরণ্য।

রাত বাড়ল ক্রমে। বুড়ো বটকে ঘিরে গোল হয়ে বসে আছে মেয়ে-পুরুষ সবাই। মোমবাতি নিভে গেলে আবার নতুন মোমবাতি জ্বালিয়ে দিচ্ছে। কারা আবার যেন বাড়ি থেকে প্রদীপ এনেও জ্বালিয়ে দিয়েছে। আজ রাতভর ওরা এরকমভাবে বসে থাকবে। কাল থাকবে। পরশুও। যতদিন এই বুড়ো বট থাকবে। তাকে ঘিরে রাখবে ওরা।

বাড়ি ফিরতে হবে। বুড়ো এবার উঠে দাঁড়াল। আর তখনই বুকের বাঁদিকে একটা ব্যথা ঝিলিক দিয়ে উঠে মিলিয়ে গেল।

* * *

আজ সত্যি সত্যি পারুলের খুব চিন্তা হচ্ছে। বাড়ি ফিরতে এত রাত কখনো করে না লোকটা। টিভিতে রাত আটটার সিরিয়ালটা যখন শুরু হয়, তখনই ফিরে আসে। আজ আটটার সিরিয়ালটা শেষ হয়ে গেল। ন'টার সিরিয়ালও শুরু হয়েছে। এখনও আসার নাম নেই লোকটার! গ্রিলের কারখানার একটা মিস্ত্রিকে পাঠিয়েছিল খোঁজ করতে। সে ঘুরে এসে বলেছে, গোয়ালপাড়ার মোড়ে বুড়ো বটকে ঘিরে সবাই বসে আছে। ওর মধ্যে লোকটাও আছে। আবার মোমবাতিও নাকি জ্বালিয়েছে। এসব শুনে বুক কাঁপে পারুলের। পারুলের জগৎ এই বাড়ি আর বাড়ির পাশের কারখানা। এর বাইরে খুব একটা বেরোয় না পারুল। তবু সব খবর পায়। গ্রিলের কারখানার মিস্ত্রিরাই সব খবর এনে দেয়। কতবার ভেবেছে, লোকটাকে বলবে বোলপুরের হলে একটা সিনেমা দেখাতে নিয়ে যেতে। তা বলবে কাকে? সারাদিন নিজের ভাবেই থাকে লোকটা। বাইক নিয়ে আদারেবাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। এমন লোক পারুলের মন বুঝলে তো! কিন্তু আজ পারুলের বুকটা একটু একটু কাঁপছে। কানু ঘোষ বুড়ো বট কেটে রাস্তা চওড়া করতে চায় পারুল শুনেছে। কানু ঘোষ লোক ভালো নয়। করবে যখন বলেছে, তখন যে কোনো উপায়ে করবেই। পঞ্চায়েত ভোটে কী

কাণ্ডটাই না করল। তার সঙ্গে আগবাড়িয়ে কেউ লড়তে যায়? এ তো জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করা। এসব লোকের সঙ্গে অনেক গুন্ডা-বদমাশ থাকে। তারা রাতের বেলায় হামলা করে। মেয়ে বউদের ছাড়ে না— জানে পারুল। উঠে গিয়ে দেওয়ালে টাঙানো তারা মায়ের ছবিতে তিনবার মাথা ঠোকে পারুল। আঁচল দিয়ে চোখের কোণের জলটা একটু মুছে নেয়।

গোয়ালপাড়ার লোকেরা গেছে, গেছে। তা বলে এই লোকটার আগ বাড়িয়ে কী দরকার ছিল বুড়ো বটের তলায় বসে পড়ার। বুড়ো বটের ডালে পারুলও তো লাল সুতো বেঁধেছিল। হলো ওর খোকা? হলো না তো। তবু এই লোকটার বুড়ো বটের তলাতেই বসে পড়া চাই। এসব ন্যাকামি দেখলে একটু রাগও হয় অবশ্য পারুলের। অথচ খোকা হবে বলে পারুল কতকিছুই না করেছিল। বাচ্চার গরম জামা কিনেছিল, ছোট ছোট মোজা, লাল টুপি, খেলনা। খোকা হলো না। সেসব অনেকদিন পারুল তুলে রেখেছে তোরঙ্গতে। ফেলে দিতে পারেনি অবশ্য। তা বলে এখন আর খামোকা মন খারাপ করে না। এখন পারুল মন দিয়ে গ্রিলের কারখানা সামলায়। আর মাঝে মাঝে তোরঙ্গ থেকে বের করে ওই লাল টুপি আর গরম জামা রোদে দেয়।

ঘড়ি দেখল পারুল। সাড়ে ন'টা বেজে গিয়েছে। সারারাত ওই বুড়ো বটের তলায় কাটাবে কিনা কে জানে! এ লোকের কোনো বিশ্বাস নেই। এ সব পারে। রোজ এতক্ষণে এসে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ে। রাত জাগতে পারে না। যদি সারা রাত ওখানে থাকে কী করবে কে জানে! হয়তো ঘুমেই ঢলে পড়বে। হিম পড়বে সারা রাত শরীরে। একটা অসুখবিসুখ বাঁধাবে। বিরক্ত লাগতে থাকে পারুলের।

লোকটার কোনো শখ আহ্লাদ আছে কিনা, আজ অবধি বুঝতে পারল না পারুল। রোজ বাড়ি ফিরে এসে খেতে বসে একমনে খেয়ে যায়। ভালোমন্দ কোনোকিছুই বলে না কোনোদিন। এমনকী, খিদে পেলেও মুখ ফুটে কোনোদিন খাবার চায়নি। জামা-কাপড়গুলোও কতদিনের পুরনো হয়ে গেল, রং চটে গেল— তবু একজোড়া নতুন জামাপ্যান্ট কিনবে না। বললেই এড়িয়ে যাবে। অথচ এখন এ সংসারে তো কোনো অভাব নেই। এসব ভুলোভালা লোকের সঙ্গে সংসার করা চলে না। কেন যে মরতে এ লোকটার সঙ্গে বিয়ে হলো— এখন ভাবে পারুল। তারপরই মনে হয়, এ মানুষটা তো শিশুর মতো। রাতে যখন ঘুমিয়ে থাকে, একটু গুটিশুটি মেরে, হাতটা মাথার তলায় রেখে— তখন শিশুই তো মনে হয় একে। মায়া হয় পারুলের। ভালোবাসে কিনা জানে না, তবে এই শিশুটিকে ছেড়ে যাওয়ার কথা পারুল কখনো ভাবতে পারে না। জানে, একে ছেড়ে চলে গেলে, বড়ো অযত্নে নষ্ট হয়ে যাবে লোকটা। সবাই তো একরকম হয় না, থাক এই লোকটা এরকমই। বুক ভরে একটা শ্বাস নিয়ে ভাবে পারুল।

দেখতে দেখতে সাড়ে দশটা বেজে গেল। পারুলের বুকের ভিতর কাঁপুনিটা এবার বেড়েছে। একটা টর্চ হাতে বাড়ির বাইরে বেরল পারুল। গোয়ালপাড়ার দিকে যাবে এবার।

।। ছয়।।

— আর একটু ভাত দিই।

— নাহ, থাক। এমনিতেই বেশি হয়ে গেছে। এরপর আবার বাইক চালিয়ে ফিরতে হবে তো।

ডিমের ঝোল দিয়ে ভাতটা মাখতে মাখতে বললো মিলন। টুকি ডিমের ঝোলটা বেশ রান্না করে। অল্প রসুন দেয়। এই রসুনের গন্ধটাই বেশ লাগে মিলনের।

— খেয়ে উঠেই বাইক চালানোর কী দরকার! একটু বসেটসে তারপর যাও না হয়।

— তা হবে না। আজ রতনপল্লিতে গ্রিলের অর্ডারটা নিতেই হবে। দু'দিন যাইনি।

মিলনকে বেশ লাগে টুকির। কোনো চাহিদা নেই মানুষটার। এমনকী, নিজের কাছেও তো নিজের কিছু চাহিদা থাকে সবার। এর যেন তাও নেই। যা পাই তাই সই। মিলনের ঘরে একটা বউ আছে। জানে টুকি। অনেকদিন ইচ্ছে হয়েছে মিলনের বাড়ি গিয়ে ওর বউয়ের সঙ্গে আলাপ করে আসবে। কিন্তু যেতে পারেনি। কিছু যদি ভাবে মিলনের বউ। মাঝে মাঝে ভাবে, মিলন যে মাঝেমধ্যেই তার কাছে চলে আসে, কিছুক্ষণ বসে, গল্প করে। তারপর ভাতটাত খেয়ে চলে যায়, সে কি ওর বউ জানে? জানে বোধহয়— না, জানলে কি মিলন আর এরকম নিশ্চিন্তে এখানে ভাত খেয়ে যেতে পারে? মিলনকে টুকি চেনে মাত্র দু'বছর। দু'বছর আগে একদিন দুপুরে মিলন রাস্তায় বাইক দাঁড় করিয়ে এখানে ভাত খেতে ঢুকেছিল। ভাতটাত খেয়ে পকেট থেকে একগাদা খুচরো বের করে বলেছিল, আমি তো

হিসাব বুঝি না, তুমি এখান থেকে বুঝেশুনে নিয়ে নাও। এরকম খদ্দের বাপের জন্মেও কোনোদিন দেখেনি টুকি। তাই অবাক হয়ে মিলনের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। মুখ টিপে হেসে বলেছিল— তা আপনার হিসাব বোঝে কে? মিলনের হাত থেকে পয়সা গুনে নিতে টুকি আবার জিজ্ঞেস করেছিল— ক'বছর বিয়ে হয়েছে?

— এই হবে গো। বেশ কয়েক বছর।

— বাচ্চা কাচ্চা?

— নেই।

— অ। এই হিসাবটা বুঝি বউ বুঝে নিতে পারেনি।

কোনো উত্তর দিতে না পেরে মিলন চুপ করে তাকিয়েছিল। অবাক হয়েই।

— অমন করে কী দেখছেন আমাকে? আমি এই ভাতের হোটেলটা চালাই। আমি টুকি। তা আপনি কী করেন? কোথা থেকে আসছেন এদিকে?

— আমি? থাকি তো সেই তালতোড়ের দিকে। গ্রিলের একটা কারখানা আছে। ও বউ-ই দেখে। আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াই। এদিক-সেদিক।

— এদিকে কার কাছে এসেছিলেন?

— কারো কাছে না। ওই যে হাইওয়ের ধারে মাঠটা আছে, ওখানে শুয়েছিলাম। তারপর খিদে পেল। চলে এলাম।

আরও অবাক হওয়ার পালা টুকির। এ লোকটা বলে কী? এ কি পাগল? মাঠে শুয়ে ছিল, তারপর খিদে পেল আর চলে এল। এরকম খদ্দের টুকির এখানে আগে আর আসেনি। মিলন যখন বাইকে উঠে স্টার্ট দিয়েছে, তখন টুকি গলা চড়িয়ে বলেছিল— এদিকে এলে আবার আসবেন কিন্তু আমার হোটেলে।

কথা রেখেছিল মিলন। তারপর থেকে মাঝে মাঝেই আসে এখানে। টুকি খদ্দেরদের জন্য রান্না করে। আর মিলন পিছনে বসে আপন মনে বকে যায়। কত কথা বলে, সব কথার মানেও বোঝে না টুকি। শুধু এটুকু বোঝে, এই লোকটা এই সংসারে বড় বেমানান। এর জন্য কোনো সংসার তৈরি হয়নি। প্রথমদিনই মিলনের কাছ থেকে ডিমভাতের দাম নিয়েছিল টুকি। তারপর আর কোনোদিন নেয়নি। তবে এখন পরপর বেশ কয়েকদিন মিলন না এলে টুকি আনমনা হয়ে পড়ে। বারবার রান্না ফেলে ঘরবার করে। মন বসে না যেন কিছুতেই। আর যেদিন যেদিন এমন হয়, সেদিন সেদিন মাছের ঝোলে নুন দিতে ভুলে যায়, পোস্তর তরকারিতে বেশি ঝাল দিয়ে ফেলে। তবে এটাও ঠিক, মিলন আজ পর্যন্ত কোনোদিন টুকির ঘরে যেতে চায়নি। তবে,

মিলন এখন টুকিকে 'তুই' করে বলে, আর টুকি 'আপনি' থেকে 'তুমিতে' এসেছে।

এত কম কম খাও কেন? আর একটু ভাত দিই। পেট ভরে খাও। ডিমও দিই আর একটা?

— না, না, একদম দিবি না। অত খাওয়ার এখন সময় নেই।

আলাপ হওয়ার পর প্রথম ক'দিন তুমি তুমি করে বলতো মিলন। ধীরে ধীরে 'তুই'তে নেমেছে। তবে মিলন যখন ওর নাম ধরে ডাকে, বেশ লাগে টুকির।

— কী এমন রাজকাজ তোমার? একটু ধীরে ধীরে পেট ভরে খেয়ে যেতে পারো না?

— সে অনেক কাজ। ও তুই বুঝবি না।

— না, আমি কিছু বুঝব না। সব বুঝবেন উনি। কপট রাগের ভঙ্গি করে টুকি।

— বললে বুঝবি তুই? খেতে খেতেই টুকির মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে মিলন।

— বলেই দেখ না, বুঝি কি না।

— এখান থেকে গিয়ে আমাকে এখন গোয়ালপাড়ায় বুড়ো বটগাছের তলায় বসতে হবে।

— ও মা, এ আবার কেমন ধারা কথা? এই দুপুরবেলায় সব ছেড়েছুড়ে বটগাছের তলায় বসতে হবে কেন?

— বলেছিলাম তো তুই বুঝবি না।

— আহ্, বুঝিয়ে বললে তো বুঝব। এবার রাগের ভঙ্গিমা করে টুকি।

— বুড়ো বটকে তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে আমাদের। ও না বাঁচলে আমরা কী নিয়ে থাকব বল তো! কাল রাত থেকেই আমরা বুড়ো বটকে ঘিরে বসে আছি। তাকে জড়িয়ে রয়েছি। তার ফাঁকেই একবার তোর সঙ্গে দেখা করে গেলাম। এখন তো আর চট করে এদিকপানে আসা হবে না।

মিলনের কথার কোনো অর্থই বুঝে পায় না টুকি। কী চায় মিলন সেটাই বোঝে না। অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করে— হঠাৎ কী হলো? বটগাছ বাঁচাতে সবাই মিলে নেমে পড়লে কেন?

— না নেমে উপায় আছে? নইলে বুড়ো বটকে কেটে দেবে যে। কেটে রাস্তা চওড়া করবে।

— তা কাটলে কাটবে। তা নিয়ে তোমাদের এমন পাগলামি কেন?

— কী বলিস তুই টুকি! কাটতে এলেই কাটতে দেব? আটকাবো না? এই বুড়ো বটটার জন্যই তো আমরা বেঁচে থাকি। স্বপ্ন দেখি। এই যেমন, পারুল স্বপ্ন দেখেছিল ওর একটা খোকা হবে। বুড়ো বট খোকা দেয়নি বটে, কিন্তু স্বপ্নটা তো রয়ে গেছে। আমাদের সবার একটা একটা করে স্বপ্ন আছে জানিস। বুড়ো বট না থাকলে সে স্বপ্নগুলোও যে থাকবে না।

একটু থামে, তারপর আচমকাই টুকিকে জিজ্ঞেস করে— তুই কোনো স্বপ্ন দেখিস টুকি?

আচমকা এরকম প্রশ্নে টুকি একটু থতমত খায়। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলে— কী জানি, জানি না। আমার এসব পাগলামি করলে চলে?

ভাত খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল মিলনের। মাথা নীচু করে থালায় আপন মনে কীসব আঁকিবুকি কাটছিল। সেইদিকে তাকিয়ে নরম সুরে টুকি জিজ্ঞেস করল— তা, কে গাছটা কাটবে শুনি?

— কানু ঘোষ।

এক মিনিটের নিস্তব্ধতা যেন। তারপর টুকি আবার বললো— কানু ঘোষের কিন্তু অনেক লোক। অনেক গুণ্ডা। পারবে তোমরা কানু ঘোষকে আটকাতে? ও ঠিক গাছ কেটে দেবে।

— না পারি তো না পারব, তবে যতদিন পারি গাছটাকে জড়িয়ে ধরে তো বাঁচি আমরা।

মিলন উঠে হাত ধুতে যায়। তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে টুকি। জীবনে এমন কোনো দ্বিতীয় পুরুষকে দেখেনি সে। মানুষটা হিসাবে জানে না। ভরদুপুরে চিত হয়ে মাঠের মাঝে শুয়ে আকাশ দেখে। এখন বুড়ো বটগাছকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকবে। এই মানুষটার তল খুঁজে পাওয়া মুশকিল। বাঁচুক, মানুষটা এভাবেই বেঁচে থাকুক। আর মাঝে মাঝে তার ভাতের হোটেলে এসে ডিম-ভাত খেয়ে যাক।

মুখ ধুয়ে আসে মিলন। দুটো মৌরি ওর হাতে ঢেলে দেয় টুকি। বলে— সাবধানে যেও, আর অত চিন্তা করো না।

— সে যাবখ'ন। এখন আর ক'দিন তোর কাছে আসতে পারবো না। বুড়ো বটকে ঘিরে দিনরাত এক করে বসে থাকতে হবে।

— আসবে, আসবে। ক'দিন পরেই আসবে দেখ। মুচকি হেসে বলে টুকি।

— তুই কী করে জানলি? গাছটা কবে কাটতে আসে তার কোনো হিসাব নেই?

কী যেন ভাবে টুকি। তারপর বলে— ও গাছ কেউ কাটতে পারবে না। গাছ ঠিক বেঁচে যাবে, দেখ।

— বেঁচে যাবে? কানু ঘোষ গাছ না কেটে যাবে না।

— বলছি তো পারবে না ও গাছ কাটতে। গাছ ঠিক বেঁচে যাবে।

টুকির কথাটা যেন এবার একটু কঠোর শোনায়। অবাক হয়ে টুকির মুখের দিকে তাকায় মিলন।

— কী করে জানলি তুই?

— আমি ঠিক জানি। সব তোমায় বলতে হবে নাকি?

— একবার শুধু বল। আমি নিশ্চিন্ত হই।

— ও আমাকে স্বপ্নে ইচ্ছাময়ী ঠাকরুন বলেছে। ও গাছ কেউ কাটতে পারবে না। বলে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে গড়িয়ে পড়ে টুকি।

কিছুটা হতভম্ব হয়েই বেরিয়ে আসে মিলন। বাইকে স্টার্ট দিয়ে হাইওয়ের দিকে রওয়ানা দেয়। আপন মনেই ভাবে— কী যেন একটা বলল টুকি? ইচ্ছাময়ী ঠাকরুন? কই এরকম কোনো দেবীর নাম তো কোনোদিন শোনেনি মিলন। এ দেবীর নাম টুকি শুনলো কোথায়? ভাবে, ভেবে কোনো উত্তর না খুঁজে পেয়ে মিলন বাইকের গতি বাড়িয়ে দেয়। বুড়ো বটের কাছে একটু তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে।

মিলন চলে যাওয়ার পরও টুকি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। আজ আর কিছু করতে ইচ্ছে করছে না। বারবার শুধু মনে হচ্ছে, ওই বুড়ো বটকে কি বাঁচানো যাবে না? শুধু এই আধপাগলা, আলাভোলা একটা আশ্চর্য মানুষের জন্য? কী জানি কেন, টুকির বুকের ভিতরটা তোলপাড় হতে শুরু করে।

* * *

উঠোনে, রোদে, চৌকির ওপর আদুর গায়ে শুয়েছিল কানু ঘোষ। বেলা এখন এগারোটা। এই রোদে শুয়ে থাকতে বেশ আরাম লাগছে। একটা ভাড়া করা লোক আছে। রোজ এই সময়টা এসে তেল মাখিয়ে কানুর সারা শরীর ম্যাসাজ করে দিয়ে যায়। এই ম্যাসাজ করানোটা কানুর একটা শখও বলা যায়। শীতকালে এই ম্যাসাজটা করাতে বেশ লাগে কানুর। আবেশে চোখ দুটো বুজে আসে। আজও বুজে আসছিল। তবে ঘুমিয়ে পড়লে তো কানুর চলবে না। সজাগ থাকতে হবে। কানুর অনেক শত্তুর। দলের বাইরে, দলের ভিতরেও। কাজেই যখন তখন ঘুমিয়ে পড়লে চলে না। এই যেমন এখন, ম্যাসাজ করতে করতে আবেশে চোখ বুজে এলেও, কানুর চোখ কান চারদিকেই সজাগ আছে। উঠোনের চার কোণায় চারজন ষণ্ডাগুণ্ডা জওয়ান গোছের লোক দাঁড়িয়ে। ওরা কানুর ভাড়া করা দেহরক্ষী। এরকম আটজন দেহরক্ষী সর্বক্ষণ ঘিরে রাখে কানুকে। তাদের চোখ সদাসর্বদা চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ায়। জরিপ করে তারা চতুর্দিক। কানুকে সুরক্ষা বলয়ের ভিতর আগলে রাখে তারা।

শহর ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। কানু জানে এর সঙ্গে সঙ্গে টাকাও ছড়িয়ে পড়ছে। সে টাকা সময়মতো ধরতে জানতে হয়। সময়ে টাকা কী করে ধরতে জানতে হয়, তা কানু জানে। আর কানু এও জানে, টাকা থাকলেই ক্ষমতা, ক্ষমতা থাকলেই পিছনে মেলা লোকের সারি। কানুর টাকা আছে, ক্ষমতাও আছে। গত তিরিশ বছরে এই জেলার শেষ কথা কানুই বলেছে। অন্য কারো বলার সাহসই হয়নি। তিরিশ বছরে কতকিছু দেখল কানু। লাল পার্টি চলে গিয়ে এই পার্টি এলো। কানুও পার্টি অফিসের পতাকার রং পাল্টে ফেলল। কানুকে কেউ কিছু করতে পারল কি? পারল না তো। কানুর টাকাও আরও বাড়ল, ক্ষমতাও। এজন্য অনেকের চোখ টাটায়, তাও জানে কানু। তাতে কানুর অবশ্য কিছু যায় আসে না। ও নিজের কাজ নিজে করে যায়।

এই যেমন, শহর যে ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে, এটা কানু সবার আগে বুঝেছিল। সোনাঝুরির জঙ্গল কেটে রিসর্ট হলো। আবাসন হলো। কিছুদিন দু-একটা খ্যাপাটে গোছের লোক একটু বাগড়া মারার চেষ্টা করেছিল। জঙ্গল কাটতে দেব না— বলে খুব চিল্লামিল্লি করেছিল। দু-একটা মিটিং আর সভাও করেছিল। তা কিছু করতে পারল? পুলিশ এসে ঠেঙিয়ে ঠাণ্ডা করে দিল। সেই তো রিসর্টও হলো, আবাসনও হলো। এখন কলকাতা থেকে গাড়ি হাঁকিয়ে লোক এসে রিসর্টে থাকে। শনিবার সোনাঝুরির হাটে বাউল গান শুনতে ভিড় করে তারা। সাঁওতাল মেয়েদের নাচের ছবি তুলে নিয়ে যায়। এখন গোয়ালপাড়া থেকে প্রান্তিক অবধি রাস্তা চওড়া হবে। তাতে জমির দাম আরও বাড়বে। এই রাস্তা চওড়া করার ঠিকাদারি পেয়েছে কানুরই লোক। নিজের নামে সব কাজ অবশ্য করেও না কানু। প্রান্তিকের দিকে চারটে প্লট কেনা আছে কানুর। দুটো ছ'কাঠার, একটা দশ কাঠার আর একটা পনেরো। একটা ছেলের নামে, একটা মেয়ে-জামাইয়ের আর দুটো মেনকার নামে। মেয়েটা ভারি নরমসরম। যখন 'বাবা' বলে গা ঘেঁষে এসে বসে, তখন কানুর মন ভালো হয়ে যায়। ছোটবেলা থেকেই মেয়েটা বাপসোহাগি। যত আদর আবদার তার বাবার কাছে। এখন, এত বড় হয়েছে, ওর বিয়েও দিয়েছে কানু, তবু ওর আবদার সেই বাবার কাছেই। কানুর এখন বড় ইচ্ছে, মেয়ের ঘরে একটা নাতির মুখ দেখার। জামাইটাও কানুর খুব ন্যাওটা। তা হবে না-ই বা কেন, খেতে পেত না সেই ঘর থেকে তুলে এনে নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। কেন দিয়েছে? সারা জীবন ওর মেয়ের পায়ের তলায় পড়ে থাকবে, এই জন্যই না। প্রান্তিকে মেয়ের নামে যে ছ'কাঠার প্লটটা কিনেছে, ওখানে একটা সুন্দর দোতলা বাড়ি বানিয়ে দেবে। সামনে বাগান।

ওখানে ওর ছোট্ট ফুটফুটে নাতি খেলা করে বেড়াবে— আবেশে চোখ বুজে আসতে আসতে ভাবে কানু।

তবে, ছেলেটার জন্য মাঝে মাঝে কানুর চিন্তা হয়। ছেলেটা বাপের মতো হলো না। সিংহের ঘরে যে ভেড়া জন্মায় এই প্রথম কানু দেখল। ছেলেটা ছোটবেলা থেকেই তার থেকে একটু দূরে দূরে থাকে। মা ন্যাওটা। মেনকাই ওকে আগলে আগলে রাখে। ছোটবেলা থেকেই সামান্য জ্বরজারি হলেই কাবু হয়ে পড়ে ছেলেটা। নরম সরম গোছের আর কী! কারও সঙ্গে গলা উঁচু করে কথাটিও বলতে পারে না। তুই কানু ঘোষের ছেলে, কোথায় দাপিয়ে বেড়াবি— তা না। মেনিমুখো হয়ে ঘরের ভিতর লুকিয়ে আছিস! তবে, ছেলেটার জন্য মাঝে মাঝে চিন্তা হয় কানুর। ও না থাকলে এ ছেলেকে যে সবাই পথে বসাবে। দেখেশুনে বেশ একটা জবরদস্ত মেয়ের হাতে এ ছেলেকে তুলে দিয়ে যেতে হবে। সে মেয়েই আগলে রাখবে এ ছেলেকে। সেরকম একটা মেয়ের খোঁজ করছে কানু। সেরকম মেয়ে পেলে ছেলের বিয়ে দিয়ে তবেই নিশ্চিন্ত। সে মেয়েকেই তার সাম্রাজ্যের ভার বুঝিয়ে দিয়ে যাবে কানু।

তবে, আর একটা চিন্তাও কানুকে ইদানীং বড় ভাবাচ্ছে। এবারের ইলেকশনে এম পি হতে চায় কানু। এখানে তো অনেক হলো। এবারে দিল্লিটা একবার দেখে আসা যাক। প্রথমবার যখন দিল্লি গিয়েছিল কানু, দলের নেতাদের সঙ্গে, অনেক বছর আগে, স্পষ্ট মনে আছে সেসব কথা। বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে থামওয়ালা বাড়িটা দেখেছিল। এখানেই নাকি সব মন্ত্রী, এম-পিরা আসে। কানু তখনই ভেবে রেখেছিল, একবার তাকেও আসতে হবে এখানে। লোকে বলবে, কানু ঘোষ এম-পি। তা রাজনীতির সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে তো বোলপুরের কানু ঘোষ এম এল এ হয়েছে। এবার তাকে এম-পিটা হতেই হবে।

ম্যাসাজ করাতে করাতেই এসব ভাবতে থাকে কানু। আর পিটপিট করে আশপাশটা দেখতে থাকে। সজাগ থাকতে হবে। চোখ বন্ধ করলে চলবে না। চারদিকে শত্তুর। ঘরে-বাইরে। এই সময়েই ভেটকি এসে গুটিগুটি কানুর পায়ের কাছে দাঁড়ায়। সঙ্কোচে। কিছুক্ষণ তার আপাদমস্তক নিরিখ করে কানু। তারপর কিছুটা কর্কশ গলায় বলে ওঠে— তোকে কালকে সন্ধেবেলা একটা খবর নিয়ে আসতে বলেছিলাম না। নিয়েছিস?

— আজ্ঞে নিয়েছি।

— নিয়েছি তো এতক্ষণ জানাতে পারিসনি কেন? কাল সন্ধে থেকে আজ এই বেলা অবধি— এতক্ষণ লাগে তোর? এতক্ষণ কী করছিলি লাটের বাট?

— আজ্ঞে, কাল রাতে বউয়ের হঠাৎ শরীর খারাপ হয়ে গেল। আজ সকালে ওকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে ছুটলাম। ওষুধপত্র কিনলাম। সাত ঝামেলায় একটু দেরি হয়ে গেল।

— অ্যাঁ, বউয়ের অসুখ হয়ে গেল— মুখ ভেংচে বলে কানু— মাথা ঢাকতে গিয়ে পাছার কাপড় উঠে যায়, তোরা শালা বিয়ে করিস কেন?

একথার কোনো উত্তর হয় না। তাই ভেটকি চুপ করেই থাকে। নীরবতা ভেঙেই কানুই আবার জিজ্ঞেস করল— তা, বউকে ডাক্তার দেখাতে আর ওষুধ কিনতে কত খরচা হলো তোর?

— আজ্ঞে, এই শ'পাঁচেক।

— আমার থেকে নিয়ে নিস।

খুশি হলো ভেটকি। আসলে পাঁচশো টাকা খরচাই হয়নি ভেটকির। কাল রাতে একটু বদহজম হচ্ছিল। আজ হজমের ওষুধ কিনে এনেছে দোকান থেকে। গোটা পঞ্চাশেক টাকা লেগেছে। এখন বাড়িয়েই বললো ভেটকি। ও মাঝে মাঝেই এরকম করে। কানুর অনেক আছে। কানুকে এটুকু ঠকালে কোনো ক্ষতি নেই— জানে ভেটকি।

— তা, কাল সন্ধ্যায় কী দেখে এলি?

— আজ্ঞে, ওই লোকগুলো তো বলছে গাছ কাটতে দেবে না।

— গাছ কাটতে দেবে না! ইল্লি আর কী? তা কী করবে ওরা?

— বলছে, গাছটাকে ঘিরে বসে থাকবে।

খ্যা, খ্যা করে হাসে কানু। বলে— ঘিরে বসে থাকবে। শুধু ঘিরে বসে থাকবে? তা একটু নাচগান হবে না?

— আজ্ঞে, তাও তো হয়েছে কাল। গান হয়েছে। আর মোমবাতি জ্বালিয়েছিল।

আবার খ্যা-খ্যা করে হাসে কানু। বলে— গান গেয়েছে, অ্যাঁ, গান গেয়েছে। তার ওপর আবার মোমবাতিও জ্বালিয়েছে!

তারপর আচমকা চেঁচিয়ে উঠে বলে— মেরে পিঠের চাম গুটিয়ে দেব। শালা, গাছ কাটতে দেবে না। নৌটঙ্কি হচ্ছে! কানু ঘোষের সঙ্গে নৌটঙ্কি। আমার লোকেরা যাবে, গাছ কাটবে, রাস্তা চওড়া করবে। দেখি কোন মায়ের ব্যাটা আটকায়। কানু ঘোষের সঙ্গে পাঙ্গা নিতে আসছে। বুঝিয়ে দেব এবার।

এতক্ষণ চেঁচিয়ে এবার হাঁপাতে থাকে কানু। ভাবে, এত না চেঁচালেই ভালো হতো। ডাক্তার বলেছে, উত্তেজনা কম করতে। থামে। কিছুটা দম নেয়। তারপর বলে— তুই রোজ যাবি ওখানে। আজ কাল রোজ। চোখ রাখবি ওরা কী করে। আমি

দু-তিনদিনের ভিতর লোক পাঠাবো গাছ কাটতে।

ম্যাসাজ হয়ে গিয়েছিল। এবার ওঠে কানু। আদুর গায়ে তোয়ালে জড়িয়ে নেয়। যেতে যেতে ভেটকির দিকে ফিরে বলে— আমার কাছ থেকে পাঁচশোটা টাকা নিয়ে যাস।

কানু স্নানে যায়। ভেটকি আনমনে এসে সামনের রাস্তায় দাঁড়ায়। একটা বিড়ি ধরায়। যাক, আজ ফোকটে পাঁচশোটা টাকা এসে গেল। ফেরার পথে একটু মুরগির মাংস কিনে নিয়ে যাবে। মেয়েটা খেতে ভালোবাসে। তবে, ভেটকি একবারও বলেনি, টুকির কাছে যে লোকটা যায়, গাছ ঘিরে বসে থাকার কথা ওই লোকটাই প্রথম বলেছিল। ইচ্ছে করেই বলেনি ভেটকি। আসলে ওই লোকটাকে ওর একটু একটু ভালো লাগতে শুরু করেছে।

।। সাত।।

জ্যোতির্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত আছে। হে জগৎ পরিপোষক সূর্য, সত্যধর্মা, আমার উপলব্ধির জন্য আপনি উহা অপসারিত করুন। হে পূষণ, হে একাকী বিচরণকারী, হে নিয়ন্তা, হে প্রজাপতি তনয়, হে সূর্য, আপনি কিরণসমূহ সংবরণ করুন, তেজ উপসংহার করুন, আপনার যাহা অতি সুশোভন রূপ, তাহাই আমি আপনার কৃপায় দর্শন করিব। যিনি আদিত্যমণ্ডলে অবস্থিত পুরুষ আমি তাহা হইতে অভিন্ন।

পুবদিকের বারান্দায় বসে বারবার নিজের মনেই এই কথাগুলো আউড়ে যাচ্ছিল বুড়ো। রোজ সকালে প্রার্থনার সময় সে এটা বলে। আজ অনেকক্ষণ প্রার্থনা হয়ে গেছে। তারপর থেকেই বুড়ো বসে রয়েছে এই পুবদিকের বারান্দায়। অল্প অল্প করে কুয়াশা কেটে গিয়ে রোদ উঠছে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে সেই রোদ ছড়িয়ে পড়ছে এই বারান্দায়। বারন্দার গা ঘেঁষে ওঠা শিরিষ গাছটার ডালপালা রোদে-আলোয় এখন মাখামাখি। পুবের বারান্দায় বসে থাকতে থাকতে আপন মনেই বুড়ো ওই কথাগুলি বারবার আউড়ে যাচ্ছিল। কেন এরকম করছিল, তা বুড়ো নিজেও জানে না। কিন্তু প্রার্থনায় বলা ওই কথাগুলো, বারান্দায় বসে, সকালের এই নরম আলোয় বারবার বলতে বুড়োর ভালো লাগছিল। আজকাল এক জায়গায় বসলে খুব একটা উঠতে ইচ্ছে করে না, বাড়ি থেকেও খুব একটা বেরোতে ইচ্ছে করে না আজকাল। গাছপালা ঘেরা এই বাড়িটার একটি কোণে বসে থেকে বাইরের দিকে অপলক চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে শুধু। অথচ একসময় মাঠেঘাটে কত ঘুরে বেড়িয়েছে সে। এখন আর এসব কিছুই ইচ্ছে করে না। শরীরে শ্যাওলা জমেছে— বোঝে বুড়ো। সেদিন গোয়ালপাড়ায় বুড়ো বটের তলায় কথাবার্তা সেরে ওঠার সময় দুবার বুকের বাঁদিকে ঝিলিক করে একটা ব্যথা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। এ হচ্ছে, শরীরে শ্যাওলা পড়ার লক্ষণ— বুড়ো বোঝে। অনেক ছোটবেলায় একটা গল্প পড়েছিল— 'দ্য সেলফিস জায়ান্ট'— স্বার্থপর দৈত্য। ওই দৈত্যও তারই মতো একটা বাগান ঘেরা বাড়িতে একা থাকত। একদিন সেই দৈত্যটা মরে গেল। সবাই এসে দেখল, বাগানে মরে পড়ে রয়েছে দৈত্য, আর তার শরীর ঢেকে রয়েছে গাছ থেকে ঝরে পড়া ফুলে। আচ্ছা, তার শরীরও কি একদিন ঢেকে থাকবে ফুলে? বড়ো যত্ন করে যে গাছগুলোকে সে বড়ো করে তুলেছিল, তারা কি আদর করে যাবে তার শরীরে? আচ্ছা, সে-ও কি স্বার্থপর ছিল ওই দৈত্যের মতো? মনে হয় ছিল। ছিল বলেই হয়তো এই বাগানঘেরা বাড়িতে সে একা একা কাটিয়েছে। নিজের মতো করে, নিজের আনন্দে গড়ে তুলেছে এই বাগানকে। এই বাগান কাউকে স্পর্শ করতে দেয়নি। এ কি তার স্বার্থপরতা নয়?

এরকম সাত-পাঁচ ভাবনা আজকাল মনে আসতে থাকে। শরীরে শ্যাওলা জমলে এরকমই হয় বোধহয়। এই ক'দিন আগে যেমন ওই ফঙ্গবেনে লোকটার কথা খুব মনে পড়ছিল। অনেক বছর আগে গোয়ালপাড়ার রাস্তা ধরে কোপাইয়ের দিকে যাওয়ার সময় লোকটার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। অদ্ভুত এক জীবনবোধের কথা বলেছিল সেই লোকটা। এখনও স্পষ্ট মনে আছে, লোকটা পথ চলছিল আর গুনগুন করে গান গাইছিল। মন দিয়ে ও শুনেছিল লোকটার গান। গানের দুটো কলি এখনও মনে আছে— 'পরের জায়গা, পরের জমি, ঘর বানাইয়া আমি রই, আমি তো সেই ঘরের মালিক নই'.... অদ্ভুত একটা সুর ছিল গানটায়। সেই সুর বুড়োর মাথায় এখনও গেঁথে আছে। এখনও মাঝে মাঝেই সুরটা গুনগুন করে ওঠে বুড়ো।

ওই ফঙ্গবেনে লোকটার সবকিছুই কেমন যেন অদ্ভুত ছিল। চালচলন থেকে কথাবার্তা— সব। এমন অদ্ভুত মানুষ বুড়ো এ জীবনে কমই দেখেছে। বলা ভালো দেখেইনি। আসলে, কত কিছুই তো দেখার বাকি রয়ে গেল। অনেক কিছু না দেখেই চলে যেতে হবে। তবু, বুড়োর এজন্য কষ্ট নেই। যা দেখা হলো, তাই ঢের। এই যে রোজ দু'চোখ ভরে তার চারদিকে ছড়িয়ে থাকা

Autoply Harness Industries

Commerce House (1st Floor, Room No. 3-A)

2, Ganesh Chandra Avenue

Kolkata - 700 013

Phone : 2213-2971, 2213-2907

Manufacturers of

Autoply® BRAND

Automobile Wiring Harness,
PVC Auto Cable, Battery Cable, PVC Tape,
Wiring Terminal
and Auto Electrical parts

Durga Puja Festival Greetings
to
All Our Customers, Patrons
and Well Wishers.

MAZZA DENIM

Incense Sticks

Now you can capture the beauty of an experience light-up and unfold a thousand petals.

Shashi Industries

Bhabnagar - 364 001
Bangalore - 560 010

With Best Compliments:-

Monoj Kumar Kakra

Krishna Bangles

37, Biplabi Rashbehari Bose Road

2nd floor, Kolkata-1

চরাচর দেখে, তাই বা ক'জন দেখতে পায়? দেখতে চায় ক'জন? সবাই নিজের দিকে তাকিয়ে থাকে। আয়নায় নিজেকেই শুধু দেখে সবাই। অথচ একটু চোখ ঘুরিয়ে বাইরের দিকে যদি তাকাতো, কত আশ্চর্য দৃশ্যকল্প চোখে পড়ত তাদের। এই যেমন বর্ষার জল কীভাবে নারকেল গাছের পাতার ওপর ঝরে পড়ে, কীভাবেই বা সূর্যমুখী সকালের আলোয় জেগে ওঠে— এইসব আর কী খুব ছোটখাটো। তবু দেখার মতো তো।

এই সবই সাত-পাঁচ ভাবছিল বুড়ো। উঠে গিয়ে যে চা বানাবে সে ইচ্ছেও আজ করছিল না। এই সময়ই অরণ্য এসে ঢুকল। সোজা বুড়োর সামনে, বারান্দায়।

— নীচের দরজা খুলে রেখেছেন দেখলাম, তাই সোজা ওপরে চলে এলাম।

— হ্যাঁ, ও তো সকাল থেকে খুলেই রাখি। আমার বাড়িতে ডাকাত পড়বে না। তবে ফুল চুরি করতে চোর ঢুকলেও ঢুকতে পারে। বলে একটু মুচকি হাসে বুড়ো। তারপর বলে— তা, তুমিও কি ফুল চুরি করতে এলে নাকি?

— সে আপনি যা ভাবেন।

— যাক। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বস। আমি এখনও চা খাইনি। এবার একটু চা বানাই। আলসেমি কাটিয়ে চেয়ার ছেড়ে ওঠে বুড়ো।

অরণ্য বারান্দা দিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। গাছের ডালপালায় সকালের আলো মাখামাখি হয়ে অদ্ভুত সব বিমূর্ত ছবি তৈরি করেছে। দূরে কোথাও একটা মোরগ একটানা ডেকে যাচ্ছে। চার-পাঁচটা নাম না-জানা ছোট পাখি বারবার উড়ে এসে বারান্দায় বসছে, আবার উড়ে যাচ্ছে।

— তা মাস্টার, আজ যে সকাল সকাল? আজ ইস্কুল নেই? চা বানাতে বানাতেই জিজ্ঞেস করে বুড়ো।

— নাহ্, আজ মাঘোৎসব। ভাবলাম, একটা ছুটি নিয়ে নিই। এমনিতেই যেতে ভালো লাগছিল না।

— ইস্কুল কামাই করে সোজা আমার এখানে এসে হাজির।

— আপনার কাছে একটু আসব ভাবছিলাম। একটা কথা আপনাকে খুব জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে ছিল। সুযোগ পাচ্ছিলাম না। আজ স্কুলে যাইনি, তাই চলে এলাম। আজকেই জিজ্ঞেস করব প্রশ্নটা।

— তা এসেছ বেশ করেছ। তুমি এলে ভালোই লাগে আমার। এখন চা খাও।

অরণ্যের দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে নিজের চেয়ারে বসে বুড়ো। দু'জনেই কিছুক্ষণ নীরব বসে থাকে। চা খায়। বাইরের গাছপালা দেখে। একসময় সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে অরণ্যই বলে— আপনাকে একটা প্রশ্ন করার ছিল আমার। করি আজ?

— কর।

— আপনি কি ম্যাজিক জানেন? বা, সম্মোহন?

অরণ্যের আচমকা এ ধরনের প্রশ্নে কিছুটা অবাক হয় বুড়ো। তারপর বলে— হঠাৎ এই প্রশ্ন?

— না, এই আগে যেদিন এসেছিলাম, বিকেলের দিকে সেদিন আপনার বাড়ির জানালা থেকে আপনি একটা অদ্ভুত আলো দেখিয়েছিলেন। বাইরের গাছপালা সব সেই আলোয় মাখামাখি ছিল। ওরকম অদ্ভুত কমলা রঙের আলো আমি আগে কখনো দেখিনি।

— হ্যাঁ, দেখিয়েছিলাম তো। সে আলো তো আমিও দেখেছি। তাতে হলোটা কী?

— না, মানে, আপনার বাড়ির জানালা থেকে আলোটা দেখেছিলাম। তারপর বাইরে বেরিয়ে আর সেই আলোটা দেখতে পেলাম না। সত্যিই ওরকম আলো এসে পড়েছিল তো বাইরে! নাকি পুরোটাই আমার বিভ্রম? আপনি ম্যাজিক করেছিলেন? বা, সম্মোহন?

এবার হো-হো করে হেসে ওঠে বুড়ো। বলে— ওহ্, এই তোমার প্রশ্ন। তোমাকে তো সেইদিনই বলেছিলাম, এ আলো সবসময় দেখা যায় না। সারা জীবনে একবার, কি দুবার এই আলো মানুষ দেখতে পায়। আর এই আলো যখন নেমে আসে পৃথিবীতে তখন মনের ভালো ইচ্ছা মুখ ফুটে বলে ফেলতে হয়। সেদিন তুমি যখন আমার ঘরে বসেছিলে, তখন এই আলোটা বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু বেশিক্ষণ তো এ আলো থাকে না। তুমি বাইরে বেরোতে বেরোতে এ আলো চলেও গিয়েছিল। বুড়োর উত্তর খুব একটা মনঃপূত হলো না অরণ্যর। ওর মনে হলো, বুড়ো কিছু আড়াল করতে চাইছে। কোনো রহস্য! এ বুড়ো নিশ্চয়ই কোনো ম্যাজিক জানে। তুকতাকও জানতে পারে। বুড়োকে বরাবরই অদ্ভুত লাগে অরণ্যর। কিন্তু এসব তো এখন বলা যাবে না। তাই কথা ঘোরানোর জন্য বলে— গোয়ালপাড়ার লোকগুলো কি বুড়ো বটকে বাঁচাতে পারবে? কী বলেন?

— জানি না। তবে এটুকু জানি, ওদের মনের জোর রয়েছে।

— মনের জোর দিয়ে কি সবকিছু হয়? কানু ঘোষের কত লোক লস্কর আছে। গুণ্ডা, মস্তান, পুলিশ। গাছ কাটতে এলে কী করবে? পারবে ওকে ঠেকাতে?

— যাদের মনের জোর আছে, তারা সবকিছুই করতে পারে জানো তো? গাছটাকে ঘিরে কেমন বসে আছে দেখ ওরা। কত

ভালোবাসা গাছটার জন্য। যেন ওদের সংসারের কেউ।

— হ্যাঁ, কাল রাতে দেখেছিলাম ওরা গাছটাকে ঘিরে প্রদীপ জ্বালিয়েছে। যেন দেওয়ালি। আজও আপনার বাড়ি আসার সময় দেখলাম ওরা গাছটাকে ঘিরে বসে আছে। দিনরাত পালা করে বসছে ওরা সবাই।

— বুঝলে তো, ওই জড়িয়ে থাকাটাই আসল কথা। তাতে একে অপরের হৃদয়ের শব্দটা বুঝতে পারে।

— ওই গাছে ওরা লাল সুতো বাঁধে, মানত করে। ওদের সব মানত ফলে নাকি? আপনি বিশ্বাস করেন এসব?

— ফলে কি ফলে না জানি না। তবে এই বিশ্বাসটা আছে বলেই তো মানুষ বেঁচে থাকে। বিশ্বাস না থাকলে কী নিয়ে বাঁচবে বলো মানুষ?

দু'জনের কেউই আর অনেকক্ষণ কোনো কথা বলে না। নীরবে অতিবাহিত হয় কিছুটা সময়। বাইরে এখন কুয়াশা কেটে গিয়েছে। রোদে একটু তেজও এসেছে। উত্তর দিক থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ঝাপটা মারছে। বেকারির কেকওয়ালা একটু আগে হেঁকে গেল রাস্তা দিয়ে।

অরণ্য উঠে দাঁড়াল। বলল— যাই। একটু বাজার ঘুরে বাড়ি যাব।

— আবার এসো। বিকেলের দিকে এসো। আবার যদি ওরকম আলো দেখতে পাও। একটু হেসে বলল বুড়ো।

অরণ্য চলে যাওয়ার পরও চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইল। প্রান্তিক স্টেশন দিয়ে দুটো ট্রেন গেল। তাদের চলে যাওয়ার ঝুমঝুম ঝিকঝিক আওয়াজ শুনলো। তারপর মনে পড়ল, গাছে জল দিতে হবে। অনেকক্ষণ ধরে উন্মুখ হয়ে রয়েছে গাছগুলো। উঠে দাঁড়াল বুড়ো। আর তখনই বুকের বাঁদিকটায় একটা হালকা চিনচিন করে উঠল কি?

* * *

মাঘোৎসবের প্রার্থনা বেশ কিছুক্ষণ হলো শেষ হয়ে গিয়েছে। যারা এসেছিল, তারা অনেকেই বাড়ি ফিরে গিয়েছে। ইতস্তত এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে কয়েকজন। ছাতিমতলায় ছোট ছোট দু-একটা জটলা। ওখান থেকে হালকা হাসি মাঝে মাঝে ভেসে আসছে। উপাসনা মন্দির মোমের আলোয় এখনও উজ্জ্বল। মন্দিরের ঝাড়লণ্ঠনগুলোও এখনও জ্বলছে। জ্বলবে আরও বেশ কিছুক্ষণ। আলোয় উদ্ভাসিত উপাসনা মন্দিরটি এইসময় দেখতে বেশ লাগে। একটু দূরে, আম্রকুঞ্জের অন্ধকারে, একা বসে এসব ভাবছিল সংঘমিত্রা। মাঘোৎসবের প্রার্থনার পর সংঘমিত্রা এখানে এসে বসেছিল। অত ভীড় ওর ভালো লাগছিল না। ভালো লাগছিল না আর কারও সঙ্গে কথা বলতে। বরং, এখানে, এখন একা বসে, ওই আলোক উজ্জ্বল উপাসনা মন্দির দেখতে ওর ভালো লাগছিল।

আজকাল অদ্ভুত অদ্ভুত ভাবনা খেলে যায় সংঘমিত্রার মনে। অবাক করা সব প্রশ্নরা ভিড় করে আসে ওর মনে। সব প্রশ্নের উত্তর যে ও পায় এমন নয়। তবে, কোনোটা কোনোটা পেয়ে যায়। এই যেমন দুদিন ধরে ভেবে ভেবে একটা প্রশ্নের উত্তর ও কিছুতেই পাচ্ছে না। অথচ প্রশ্নটা খুব সহজ। সামান্য একটা প্রশ্ন। তবু উত্তরটা ও পাচ্ছে না। অনেক ভেবেছে দুদিন ধরে, উত্তরটা পায়নি। সেদিন গোয়ালপাড়ায় বুড়ো বটের তলায় সবাই যখন বসেছিল, ও তখন ফস করে বলে ফেলেছিল, মাঘোৎসবের আগে এই গাছ ঘিরে আমরাই উৎসব শুরু করে দিই না কেন? মোমবাতি জ্বালিয়ে, গান গেয়ে এই গাছটাকে ঘিরে হোক আমাদের উৎসব। কেন সেদিন ওরকম কথাটা বলেছিল? ভেবে পায় না আর। কেউ তো ওকে বলতে বলেনি। নিজের থেকেই বলেছিল। কিছুটা না ভেবে চিন্তেই। পরে মনে হয়েছিল, ওর বুকের ভিতর থেকে কে যেন একজন এরকম একটা কথা বলতে বলেছিল। কিছুটা ঘোরের ভিতরেই যেন এরকম একটা কথা বলেছিল। তারপর আরও অবাক কাণ্ড! সেদিন একটা গানও গেয়ে ফেলেছিল ও। কিছু না ভেবেই। গানটা শেষ করে দেখেছিল নতুন পল্লির ওই বুড়োটা, যাকে কিনা গোয়ালপাড়ার লোকগুলি খুব মান্যি করে, কেমন যেন অবাক হয়ে তাকিয়েছিল ওর দিকে! বলেছিল— এ তুই কী গান শোনালি? মনে হলো, ঈশ্বর যেন নেমে এসেছিলেন তোর গান শুনতে। নতুন পল্লির এই বুড়ো লোকটাকে এমনিতেই ওর একটু অদ্ভুত লাগে। রহস্যময়। কখন কী বলে কিছুই বোঝা যায় না। তবু, ওর গান শুনে একথা বলল কেন? ও কি খুব ভালো গেয়েছিল সেদিন? ঈশ্বর নেমে আসার মতো ভালো? ও তো কোনোদিন কারও কাছে গানই শেখেনি। তাহলে এরকম গাইলো কী করে? আসলে, ওদিনের সব ঘটনাটাই ওর কাছে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে এখনও। কেন যে এরকম করল ও সেদিন, সেটাই বুঝতে পারছে না। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, আসলে ও গানটা শোনাতে চেয়েছিল। ওর বুকের ভিতর গানটা কোথাও গুনগুন করছিল। শোনাতে ইচ্ছে করছিল গানটা। সেদিন যখন সবাই ওই বটগাছটাকে ঘিরে গোল হয়ে বসেছিল, একটি একটি করে মোমবাতি জ্বলে উঠছিল বটগাছটাকে ঘিরে, তখন বুকের ভিতর থেকে ওই গানটাই বেরিয়ে এসেছিল। অনেক ভেবে এই কারণটাই খুঁজে পেয়েছে সংঘমিত্রা, অন্য কোনো কারণ নয়।

কলেজে যখন পড়ত, তখন দেখেছে ওর অনেক বান্ধবী কারণে অকারণে হাসি হাসি মুখে গুনগুন করে গান গাইত। কেউ রবীন্দ্র সংগীত, কেউ বা হিন্দি সিনেমার গান। ও এও লক্ষ্য করেছে, প্রেমে পড়লে মেয়েদের এরকম গুনগুন করে গান গাওয়ার বাতিক পেয়ে বসে। ছেলেদেরও এরকম হয় কিনা কে জানে। তবে হয় মনে হয়। সিনেমায় এরকম দেখেছে। অনেক কিছুই যেমন জানে না, তেমনি প্রেম করলে যে বুকের ভিতরটা কেমন করে তাও জানা নেই সংঘমিত্রার। আসলে ও তো কোনোদিন প্রেম করতেই পারল না। এই মার্চে ওর তিরিশ পূর্ণ হবে। এতগুলো বছর চলে গেল, তবু সেভাবে ভালোবাসার কোনো মানুষ আবিষ্কার করা ওর পক্ষে সম্ভব হলো না। অথচ সংঘমিত্রার প্রেমে যে কেউ পড়েনি এমন নয়। অন্তত তিনজনের কথা ও জানে যারা ওর প্রেমে পড়েছিল। সংঘমিত্রাকে দেখতে খুব একটা খারাপ নয়। সহজ ভাষায় যাকে বলে সুশ্রী। ওর মা একবার ওকে না জানিয়েই কাগজে বিয়ের বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। তাতে লিখেওছিল 'একমাত্র কন্যা, সুশ্রী, পিতার দোতলা বাড়ি আছে।' বিজ্ঞাপনের ভাষাটি মোটেই পছন্দ হয়নি সংঘমিত্রার। ওর এখনও মনে আছে, যখন ক্লাস টেনে পড়ে, তখন পাড়ার একটা ছেলে ওর প্রেমে পড়েছিল। রোজ সকালে-বিকেলে ওদের বাড়ির সামনে সাইকেল নিয়ে চক্কর খেত। সংঘমিত্রা বারান্দায় এসে দাঁড়ালে, রাস্তার উল্টোদিকে সাইকেলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে উদাস হয়ে আকাশ দেখত ছেলেটা। সংঘমিত্রা, বুঝতো, আসলে আকাশ নয়, ছেলেটা আড়চোখে ওকেই দেখছে। সংঘমিত্রা ভালো করে ছেলেটার মুখের দিকে কখনো তাকায়নি। বরং, রাস্তায় কখনো সামনাসামনি হয়ে গেলে গম্ভীর মুখে অন্যদিকে তাকিয়ে থেকেছে। সাইকেল নিয়ে বেশ কয়েকমাস এভাবে ঘোরাঘুরির পর ছেলেটা আর কখনো আসেনি ওদের বাড়ির সামনে। পরে পৌষমেলায় ওই ছেলেটাকে দেখেছিল একটা মেয়ের হাত ধরে ঘুরে বেড়াতে। দেখে বেজায় হাসি পেয়েছিল সংঘমিত্রার।

দ্বিতীয় প্রেমটা এসেছিল ওর কলেজ জীবনে। ওর থেকে ঠিক এক ইয়ারের সিনিয়র ছিল বিক্রম। বেশ সুদর্শন। গালে চাপ দাড়ি। এক একদিন এক এক রঙের পাঞ্জাবি পরত। বেশ শৌখিন ছিল বিক্রম। বাইক চালিয়ে কলেজে আসত। বিক্রম নিজে থেকেই ওর সঙ্গে আলাপ করেছিল। ভালো কথা বলতে পারত বিক্রম। বিক্রমের বাইকের পিছনে চেপে কখনো কখনো ও খোয়াইয়ে ঘুরতে গেছে। কখনো কোপাইয়ের ধারে। কখনো বা ভুবনডাঙার মাঠে মুখোমুখি বসে গল্প করেছে। সমগ্র বিশ্বে কোথায় কী ঘটছে, সেরকম অনেক খবর রাখত বিক্রম। ভালো কথাও বলত। মোটের ওপর বিক্রমকে খুব একটা খারাপ লাগত না সংঘমিত্রার। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ওর মনে বিক্রমের প্রতি কোনো প্রেম এসেছিল। বরং, বিক্রমের মনে যে ওর প্রতি প্রেম ছিল, সেটা বেশ বুঝতে পেরেছিল সংঘমিত্রা। সেটা যখনই বুঝতে পারছিল, তখনই ও বিক্রমের প্রতি ক্রমশ নিস্পৃহ হচ্ছিল। বিক্রম যেদিন কোপাইয়ের তীরে বসে ওর হাতটা ধরতে চেয়েছিল, সেদিন হাতটা সরিয়ে নিয়ে নিস্পৃহ গলায় বলেছিল— 'তুমি বসো। আমি উঠি। আমার একটু অন্য জায়গায় যাওয়ার আছে।' বলে আর দাঁড়ায়নি। হন্‌হন্‌ করে হেঁটে বড়ো রাস্তায়। বিক্রমের বাইকে চড়েও ফেরেনি সেদিন। বিক্রম অবাক হয়ে তাকিয়েছিল— স্পষ্ট মনে আছে ওর। তারপর থেকে বিক্রম আর কোনো যোগাযোগ রাখেনি। বিক্রম এখন আমেরিকায়।

তবে ওর তৃতীয় প্রেমিকের কথা ভাবলে সংঘমিত্রার বেশ হাসিই পায়। ওদের কলেজের ইংরেজির লেকচারার। লোকটা ধুতি পরে আর একটু আনুনাসিক সুরে কথা বলে। এরকম ধুতি পরা ন্যাকা ন্যাকা লোকদের ওর মোটেই ভালো লাগে না। টিচার্স রুমে লোকটা সবসময় আড়চোখে ওর দিকে চেয়ে থাকত। গায়ে পড়ে দু-চারবার কথা বলারও চেষ্টা করেছে। ব্যাপারটা বিরক্তির পর্যায়ে পৌঁছল সেদিন, যখন কলেজ থেকে ফেরার পথে ওর রাস্তা আটকে একটা ইংরেজি কবিতার বই আর গোলাপ ফুল উপহার দিতে চেয়েছিল। গলায় কাঠিন্য এনে সংঘমিত্রা বলেছিল— 'এসব একদম করবেন না। পরে আবার যদি এরকম করেন, তাহলে আমি প্রিন্সিপালের কাছে কমপ্লেন করব।' লোকটার মুখটা তখন দেখার মতো হয়েছিল। মনে করলে এখনও সংঘমিত্রার হাসি পায়। তবে, পরে অবশ্য মনে মনে একটু দুঃখিত হয়েছে। অতটা কড়া করে না বললেই হতো মনে হয়েছে। অবশ্য এরপর থেকে লোকটা আর আড়চোখে ওর দিকে তাকাতো না। উল্টে এর কয়েকমাস পরে টিচার্স রুমে ওর দিকে একটা বিয়ের কার্ড এগিয়ে দিয়ে মিনমিন করে বলেছিল— 'আমার বিয়ে। হঠাৎ করেই ঠিক হয়ে গেল কিনা।'

ওর মা যে কতবার ওর জন্য পত্র ঠিক করেছে, কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ বা উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী। কেউ বিলেতে থাকে, কেউ দিল্লিতে, কেউ কলকাতায়। জীবনে এরা সবাই প্রতিষ্ঠিত। তা পাত্রী হিসেবে সংঘমিত্রাও তো ফেলনা নয়। এক সন্তান, শান্তিনিকেতনে নিজেদের বাড়ি, একটা কলেজের লেকচারার— কম কিসে! ফলে পাত্রপক্ষের সহজেই পছন্দ হয়ে যেত ওকে। কিন্তু ও কাউকেই পছন্দ করত না। ফিরিয়ে দিত সবাইকে। মনে হতো কাঙ্ক্ষিত পুরুষটি এখনও

এসে পৌঁছায়নি। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত পুরুষটি যে কেমন, কোন রাজবেশ পরে যে সে এসে দাঁড়াবে— এতদিন পর্যন্ত মোটেই ভেবে পায়নি সংঘমিত্রা। খুব রেগে যেত মা। বলত— এরপর কি তোর জন্য পাত্র গড়িয়ে আনবো? ও রাগত না, বরং বলত— বিয়ে না করে সারাটা জীবন কি থাকা যায় না মা? অনেকে তো তাই থাকে। এসব কথায় মায়ের রাগ আরও বেড়ে যেত। এখন অবশ্য এসব নিয়ে মা আর কিছু বলে না।

উপাসনা মন্দিরের মোমবাতিগুলো একে একে নিভতে শুরু করেছে। ছাতিমতলার জটলাটাও এখন আর নেই। দু-একজন এদিক-ওদিক যাও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, তারাও ফিরতে শুরু করেছে। ঠাণ্ডাটাও বেশ বেড়েছে এবার। সংঘমিত্রা ওঠে। ওকেও বাড়ি ফিরতে হবে।

ছাতিমতলা পেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। রাস্তাটাও এখন ফাঁকা। দু-একটা রিক্সাওয়ালা সওয়ারির আশায়। ও অবশ্য রিক্সায় উঠবে না। হেঁটেই যাবে। ভাবতে ভাবতেই পা বাড়ায়। কিছুটা এগোতেই লক্ষ্য করে ভুবনডাঙার দিক থেকে হেঁটে আসছে অরণ্য। মুখ নীচু করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে হাঁটছে। একটু অন্যমনে। যেন কী ভাবতে ভাবতে আসছে। কাল গান গাইতে গাইতেই সংঘমিত্রা লক্ষ্য করেছিল, সবার পিছনে অরণ্য বসে আছে। কী আড়ষ্ট ভঙ্গি। কী জড়তা। এত লজ্জা কিসের ওর কে জানে।

সংঘমিত্রা দাঁড়ায়। মাথার চুলটা হাত দিয়ে ঠিক করে নেয়। গায়ের চাদরটা, অকারণেই, একটু টেনে নেয়। অরণ্যর সঙ্গে কথা বলতে মন চায় সংঘমিত্রার।

।। আট।।

উপুড় হয়ে বুকে বালিশ চেপে শুয়েছিল কানু ঘোষ। আজ সকাল থেকে বড্ডো ধকল গেছে। যেখানে যত ঝঞ্ঝাট সব এই একার হাতে কানুকে সামলাতে হয়। মাঝেমধ্যে মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে যায়। তখন মুখ ফসকে দু-একটা অকথা-কুকথা বেরিয়ে যায়। ডাক্তার অনেকবার বলেছে, মেজাজ গরম করবেন না। তাহলে প্রেসার বাড়বে। আর প্রেসার বাড়লে শরীর বিগড়োবে। এখন শরীরটা বিগড়ে যাক, তা চায় না কানু। শরীর বিগড়োলে আর এম-পি হওয়া যাবে না। তখন পার্টির ভিতরেও অনেকে খুশি হবে। সামনে যারা কানুবাবু কানুবাবু করে আড়ালে তারাই তখন ভেংচি কাটবে— জানে কানু। সবকটাকে চেনে কানু, সবকটা হারামি। তাই কানু চেষ্টা করে যায় শরীর ঠিক রাখার। মেনকাও চেষ্টা করে কানু যাতে ঠিক থাকে। সে দিকে মেনকার কড়া নজর। কানুর মাংস খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। রান্না মশলা ছাড়া। কানুও সেসব নিয়ম মেনে চলে। শুধু টুকির ঘরে যেদিন আসে সেদিন একটু-আধটু নিয়ম ভেঙে যায়। টুকির রান্নাটা বেশ ভালো আর শরীরেও চটক আছে। তবু কানু কখনো কখনো মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না। আর কাগজওয়ালারা বসে থাকে কখন কানুর মেজাজ বিগড়োবে। বেগড়ানো মেজাজ নিয়ে কানু মুখ খুললেই খবর। তখন কানু কী বলল, তা নিয়ে হৈচৈ শুরু হয়ে যায় চারদিকে। ক'দিন বেশ হৈ-চৈ চলে, তারপর আবার সব চুপ মেরে যায়। বেশ মজা লাগে কানুর। আজকে যেমন মেজাজটা বিগড়ে গেছে সকাল থেকে। মেজাজটা বিগড়ে দিয়েছে সাঁইথিয়ার নতুন ও-সি। কম বয়স। রক্তে জোশ আছে, বোঝে কানু। কাজ দেখাতে চায়। তা বলে কানু ঘোষের সঙ্গে পাঙ্গা নিবি? জানিস না কানু ঘোষের হাত কত লম্বা। পরশু কানুর দলের দুটো ছেলেকে সোজা ধরে লকআপে চালান করে দিয়েছিল। অভিযোগ, ওরা নাকি কাকে ভয় দেখিয়ে টাকা তুলছিল। তা তুলছিল, তুলছিল। তুই ওসি আছিস কী করতে? বুঝিয়ে সুজিয়ে ওদের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারতি। তা না করে সোজা লকআপ! তাতেও হলো না। কাল কোর্টে চালান করে পনেরো দিনের জেল! পার্টির ছেলেরা কানুর নাম করে গিয়েছিল ওসি-র কছে দরবার করতে। ওদের মুখের ওপর এই নতুন ওসি-টা বলে দিয়েছে— ওসব কানু ঘোষফোস আমাকে দেখাবেন না। শুনেই কানু ঘোষের মেজাজ চড়াক করে গরম হয়ে গিয়েছিল। কানু ঘোষফোস দেখাবে না— এ বলে কী? পাঙ্গা লড়তে এসেছে কানু ঘোষের সঙ্গে? এখনই ওর থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিতে না পারলে— লোকে ভাববে কানু ঘোষ ভয় পেয়েছে। কাজেই আজ সকালেই দলবল নিয়ে কানু নিজেই ছুটে গিয়েছিল সাঁইথিয়া।

প্রথমে থানায় টেবিল চাপড়ে খানিক খুব জোর চেঁচামেচি হয়েছিল। নতুন ওসি-টা বেশ টেটিয়া। পাত্তাই দিতে চায়নি কানুকে। বলে কিনা, আইন আইনের পথে হাঁটবে। আপনার যা করার করে নিন। অ্যাঁ, বলে কী? আইন আইনের পথে হাঁটবে? ধুস, এ জেলায় সে কোনোদিন হয়েছে নাকি। এখানে আইন কানুর পথে হাঁটবে। এ জব্বর ডায়লগটা ও ঝেড়েও দিয়েছিল ওসি-র সামনে। আর তারপরই বুঝেছিল কাল কাগজে কানুর এ

কথাটাই হেডলাইন হবে। তা নিয়ে আবার হৈচৈও হবে। শেষে, চিফ মিনিস্টার ফোন করে একটু মিষ্টি গলায় শাসন করবেন। চিফ মিনিস্টার ওকে কখনো কড়া গলায় কিছু বলেন না, জানে কানু। আর বলবেনই বা কেন? শান্তিনিকেতনে দশ বিঘে জমির ওপর বাগানবাড়িটা চিফ মিনিস্টারের ছোট ভাইকে দখল করিয়ে দিল কে?

থাক গে সেসব কথা। কানুর অবশ্য অন্য একটা কথা ভেবে খুব চিন্তা হয়েছিল। আগের পার্টির কথাই ধরুন, বা এখনকার পার্টি, কানুর মুখের ওপর এরকম করে কোনো দু-পয়সার ওসি কোনোদিন কথা বলার সাহস দেখায়নি। এই দু'দিনের পুচকে ওসি-টা কী করে সেই সাহস দেখালো? তাহলে কি কানুর রাশ আলগা হয়ে যাচ্ছে? লোকে কি আর ভয় পাচ্ছে না কানুকে? লোকে যদি আর কানুকে ভয় না পায় তাহলে ওর চারপাশের ভিড়টাও যে হালকা হয়ে যাবে। এমন চিন্তা মাথায় খেলে যেতেই কানু সতর্ক হয়। ঠিক করে নেয়, প্রথম রাতে বিড়াল মারার মতো ওসি-টাকে আজকেই শিক্ষা দিতে হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে কানু ঘোষের হাত কতখানি লম্বা। আর এক মুহূর্তও দেরি করেনি কানু। থানায়, ওসি-র মুখোমুখি চেয়ারে বসেই সোজা ফোন করেছিল এস পি-কে। কানু ফোন করলে এস পি-র গলা যে একটু কেঁপে যায়, তা আগে লক্ষ্য করেছে কানু। এস পি কানুকে ভয় পায়, খাতিরও করে। গত মাসে চিফ মিনিস্টার যখন সিউড়িতে এসেছিলেন, তখন কানুকে এক কোণে টেনে নিয়ে গিয়ে হাত ধরে এস পি বলেছিলেন— 'কানুবাবু, আমার হয়ে প্লিজ একটু সি-এমকে বলবেন। বলবেন, আমার কাজে আপনারা খুশি।' তা বলেছিল কানু। এস পি লোকটা কথা শোনে। ওকে নিয়ে কানুর কোনো সমস্যা নেই। আজকেও কানুর ফোন পেয়ে এস পি-র গলা একটু কেঁপেই গিয়েছিল। ওসি-র সামনে বসেই কানু গম্ভীর গলায় এস পি-কে বলেছিল— ওসি-কে এটু বুঝেশুনে কাজ করতে বলুন। এরপর ঝামেলা হলে আমার কোনো দায় থাকবে না। ব্যাস, এইটুকুই। আর কিছু বলেনি। তাতেই যা বোঝার বুঝে গিয়েছিল এস পি। কানু ফোন রাখার দু-মিনিটের ভিতর এস পি-র ফোন ওসি-কে। একটু আমতা আমতা করছিল বটে ওসি প্রথমে। তবে, একটু পরেই ভিজে ন্যাতা। বিজয়ীর হাসি নিয়ে কানু বেরিয়েছিল থানা থেকে। কানু ঘোষের হাত যে কতখানি লম্বা— সে সবাইকে বুঝিয়ে দেওয়া গেছে। চারপাশের ভিড়টা আর কমবে না।

কোমরের কাছটা একটু টনটন করছে। তা করবে নাই বা কেন? কোমরের আর কী দোষ? এত দৌড়ঝাঁপ করলে কোমর তো একটু ব্যথা করবেই। কানুরও তো বয়স হচ্ছে, নাকি? আজকাল এইসব দিনগুলোতে শরীর একটু শুশ্রূষা চায়। শরীরের, মনেরও। আজ সাঁইথিয়া থেকে ফেরার পথে তাই টুকির এখানে চলে এসেছিল। কিছু না জানিয়েই।

— এইখানটায়, এইখানটায়, এই কোমরের দিকটায় একটু মালিশ কর। আস্তে আস্তে। বুকে বালিশ চাপা দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে থেকেই বললো কানু। টুকি এতক্ষণ পিঠে মালিশ করছিল, এবার তার হাত কোমরে নামল। আজ হঠাৎ করেই কানু এসে পড়েছে। এরকমভাবে কখনো আসে না। কানু এলে খবর দিয়েই আসে। বাঘের আগে যেমন ফেউ, তেমনই কানুর আগে আসে ভেটকি। ভেটকি এসে দুপুরে খবর দিয়ে যায়। অবশ্য মাগনায় খবর দেয় না ভেটকি। তার বদলে দশ-বিশটা টাকাও নিয়ে যায় টুকির কাছ থেকে। যেদিন কানুর আসার খবর থাকে, সেদিন বিকেল বিকেল হোটেল বন্ধ করে দেয় টুকি। স্নান করে সেজেগুজে, গায়ে একটু সেন্ট ছড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। সেন্টটা কানুই এনে দিয়েছিল তাকে। তা কানু তাকে কিছু কম দেয় না। কয়েকটা গয়নাও তো গড়িয়ে দিয়েছে। আর সবচেয়ে বড় কথা, এই ভাতের হোটেলটা চলছে কানুর জন্যই। এ হোটেলে পুলিশ কখনো তোলা চাইতে আসে না। পুলিশ জানে, এ হোটেলটা কানু ঘোষের বাঁধা মেয়েছেলের। কানু বরাবর সন্ধে পড়লে আসে। আজ একেবারে ভরদুপুরে এসে হাজির। টুকি তখন হোটেলে খদ্দের সামলাচ্ছিল। হোটেলের সামনে গাড়ি থেকে কানুকে নামতে দেখে অবাক টুকি। রান্নার লোকটার হাতে হোটেল সামলানোর দায়িত্ব দিয়ে টুকি ঘরে চলে এসেছিল। পিছনে পিছনে কানু। টুকি জানে, যতক্ষণ কানু এই ঘরে থাকবে, ঘরের বাইরে পাথরের মতো চেহারা নিয়ে আটটা মুশকো জোয়ান দাঁড়িয়ে থাকবে। রাস্তায় পুলিশের জিপ থাকবে।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে করতে টুকি বলেছিল— কী গো, এমন অসময়ে?

— কেন, এই সময়ে আসতে পারি না?

— আহা, তা বললাম নাকি? এই সময়ে তো আসো না কখনো, তাই...

— আজ ইচ্ছা হলো, তাই এলাম। নে, এক গ্লাস জল খাওয়া আগে।

এক নিঃশ্বাসে চোঁ-চোঁ করে গ্লাসের সবটুকু জল শেষ করে কানু বলেছিল— বড়ো ঝামেলা গেছে আজ। যা তুই পরিষ্কার হয়ে আয়।

— হ্যাঁ। যাই স্নানটা করে আসি। তুমি বসো একটু।

স্নান করে উঠে টুকি একটা নীল শিফনের শাড়ি পরেছে। শাড়িটা কানুই দিয়েছিল। মুখে হালকা করে একটু পাউডার। গায়ে সেন্ট। মাথার চুলটা আলগোছে বাঁধা। চেষ্টা করেছে চেহারায় যতটা মাদকতা আনা যায়।

কোমর টিপতে টিপতে টুকি বলল— কী গো, কী ঝামেলা গেছে তা বললে না তো?

— ঝামেলা কি একটা নাকি? সারাদিনই ঝামেলা যায়। কত বলব তোকে?

— তা একটু বললেই পারো।

— ও শুনে তুই কী করবি? ওসব তুই বুঝবি না। পলিটিক্সের ঝামেলা।

— আজকে কার সাথে ঝামেলা হলো?

— ওই যে সাঁইথিয়ার ওসি-টা। ফটাক ফটাক করে কথা বলছিল। বলে, আইন আইনের পথে চলবে, অ্যাঁ!

বলে একচোট হেসে নেয় কানু। সঙ্গে টুকিও হাসে।

— ব্যাটাকে বুঝিয়ে দিয়েছি কানু ঘোষ কে। আর কোনোদিন আমার সঙ্গে পাঙ্গা নেবে না।

— ঠিক করেছ। পুরুষ মানুষের একটু রাগঝাল থাকা ভালো। ম্যাদামারা মেনীমুখো পুরুষ আমার ভালো লাগে না।

কানু এবার চিৎ হয়ে শোয়। টুকি ওর বুকে হাত বোলাতে থাকে।

— সেই কখন বেরিয়েছ। একটু কিছু এনে দিই, খাও। আজ কাতলা মাছের ঝোল করেছি হোটেলে। আলু আর পেঁপে দিয়ে। এনে দিই?

— একটু পরে এনে দিস। এখন তুই একটু বস এখানে। একটু গল্প করি।

— ও মা, তোমার আবার সোহাগ চাপলো এখন? কপট বিস্ময়ের ভান করে টুকি।

— কেন, আমি কি তোকে সোহাগ করি না?

— কর তো, সে তো সন্ধেবেলা কর। দুপুরে তো কোনোদিন করোনি।

বলে হেসে গড়িয়ে পড়ে টুকি। কানুর বুকের ওপরেই। কানুও রসিকতায় যোগ দেয়। বলে— আজ না হয়, দুপুরেই সোহাগ করব।

তারপর অকস্মাৎই গম্ভীর হয়। বলে— তোর ভাতের হোটেলটা এবার একটু বড় করে দিতে হবে। একপাশে ভাতের হোটেল, একপাশে রোল, চাওমিন। আরও চারটে লোক রাখবি, খরচা আমার।

— সত্যি গো? কতদিনের ইচ্ছে আমার হোটেলটা বড় করি। কানুর বুকে মুখ গুঁজে বলে টুকি।

— করবি, করবি। এম-পি ইলেকশনে টিকিট পেয়ে গেলেই তোর হোটেলটা এবার বড় করে দেব।

— কোন ইলেকশান গো? দিল্লির ভোট?

— হ্যাঁ। দিল্লির ভোট। এবার আমাকে টিকিট দেবে দল। আর দিলেই জিতব।

— জানো তো, আমিও না তোমার নামে একটা মানত করেছি।

— মানত? কী মানত?

— মানত করেছি, তুমি সবক'টা ভোটে জেতো। আর জিতে জিতে অনেক বড় হও।

— বেশ, তা কোথায় করলি মানতটা?

— ওই যে গো, গোয়ালপাড়ার দিকে যে বুড়ো বটগাছটা আছে, ওখানে।

এবার সরু চোখ করে তাকায় কানু। বলে— সব জায়গা থাকতে ওখানে মানত করলি কেন?

— ওটা খুব জাগ্রত জায়গা গো। ওখানে ইচ্ছেঠাকরুন থাকে। যে যা মানত করে তাই ফলে যায়। আমি ওই গাছের ডালে লাল সুতো বেঁধে মানত করে এসেছি।

— ছেনালি করছিস না তো?

— মাক্কালি। কোনো ছেনালি করছি না। এই তোমাকে ছুঁয়ে একদম সত্যি বলছি। তুমি যত বড় হবে, তত আমারও লাভ কিনা বলো? আমার হোটেলটাও তো বড় হবে। কানুর বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বলে টুকি।

কানু স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

টুকি মনে মনে ভাবে, ওই ন্যালাখ্যাপা, ভুলোভালা, হিসেব না বোঝা লোকটার জন্য এইটুকু মিথ্যে কথা তো বলাই যায়। এতে ঠাকুর রাগ করবেন না।

* * *

মাঘোৎসবের দিন সন্ধেবেলা একটা অবাক করা কাণ্ড ঘটে গেল। এরকম যে ঘটতে পারে তা অরণ্য কখনো ভাবেনি। মাঘোৎসবের প্রার্থনা শেষ হওয়ার পর ও একটু ভুবনডাঙার দিকে গিয়েছিল। ভুবনডাঙায় কাজ শেষ করে যখন ফিরছে, তখন দূর থেকেই দেখেছিল, তালধ্বজের সামনে একটু আলোয়, একটু অন্ধকারে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে, কারও জন্য যেন অপেক্ষা করছে। একটু কাছে আসতে দেখে সংঘমিত্রা। উপাসনা তো অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গিয়েছে। যে যার ঘরেও ফিরে গিয়েছে এতক্ষণে। জানুয়ারির এই শেষ দিকে

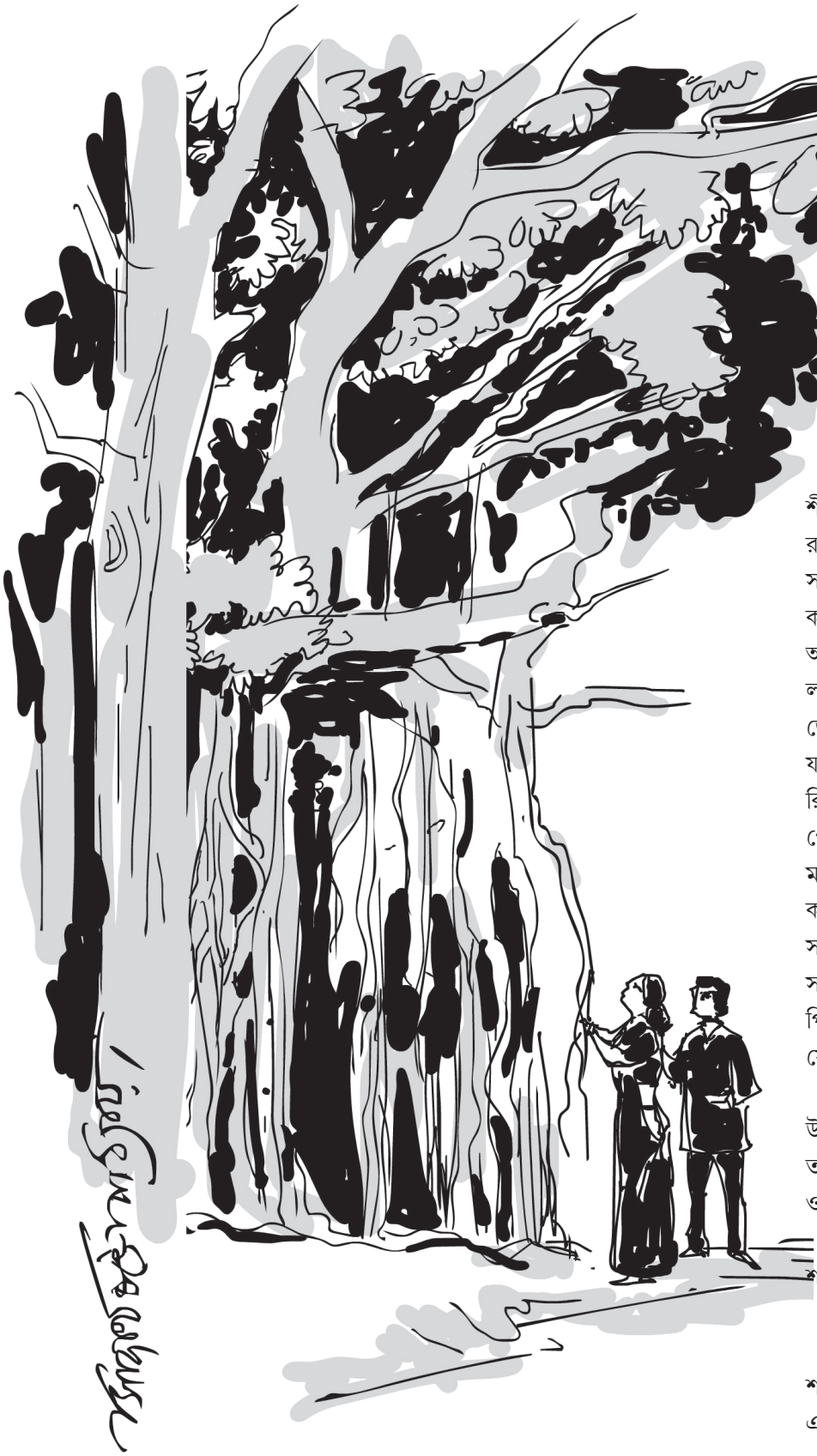

শীতের রাতে শান্তিনিকেতনের রাস্তাঘাটও বেশ ফাঁকা। এখানে, এই সময়ে সংঘমিত্রা কার জন্য অপেক্ষা করছে? ভেবে একটু অবাকই হয়েছিল অরণ্য। সেই সঙ্গে কেমন একটু আড়ষ্ট লাগছিল। একবার ভেবেছিল একটা রিক্সা ডেকে নিয়ে এই জায়গাটুকু পেরিয়ে চলে যাবে। কিন্তু রিক্সাগুলোও তো দূরে দূরে। রিক্সা ধরতে গেলেও তো ওই জায়গাটুকু পেরিয়ে যেতে হবে। সাতপাঁচ ভেবে মাথা নিচু করে হনহন করে হাঁটা শুরু করেছিল অরণ্য। সতর্ক ছিল, যাতে সংঘমিত্রার দিকে চোখ না পড়ে। কিন্তু সংঘমিত্রাকে পেরিয়ে যেতে না যেতেই পিছন থেকে কে যেন ডেকেছিল— এই যে শুনছেন...

একটু দাঁড়িয়ে গিয়েছিল অরণ্য। উপায় না থাকলেও চোখ তুলে পিছনে তাকিয়ে দেখেছিল সংঘমিত্রাই ডাকছে। ওর মুখে যেন একটু চাপা হাসি।

— হনহন করে চললেন কোথায়? শ্যামবাটির দিকে যাবেন তো?

— হ্যাঁ, ওই গোয়ালপাড়ায়।

— আমিও তো ওইদিকেই যাব। শ্যামবাটি। চলুন না একসঙ্গে যাই। একা একা হাঁটতে ভালো লাগছে না।

আড়ষ্টতা অরণ্যকে আরও জড়িয়ে

ধরছিল। গলা শুকিয়ে আসছিল। চোখ তুলেও তাকাতে পারছিল না। মাটির দিকে চোখ নামিয়ে শুধু বলেছিল— চলুন...

পাশাপাশি দু-চার পা হাঁটার পর সংঘমিত্রা বলেছিল— আপনি গোয়ালপাড়ায় থাকেন বুঝি?

— না, রতন পল্লিতে।

— তাহলে এখন ওদিকে চললেন যে?

— আসলে ওই বটগাছটাকে ঘিরে সবাই গোল হয়ে বসে আছে তো। মোমবাতি জ্বালিয়েছে।

— ও হ্যাঁ। তাই তো।

তারপর আবার কিছুক্ষণ নীরবতা। নীরবতা ভেঙে আবার সংঘমিত্রাই জিজ্ঞাসা করেছিল— আপনি বুঝি স্কুলে চাকরি করেন?

— হ্যাঁ।

— কোন স্কুলে?

— ওই তালতোড়ের দিকে হাইস্কুল। টিচার কম, ছাত্র বেশি।

— বাহ্, বেশ বললেন তো। টিচার কম, ছাত্র বেশি। বলে হেসে ওঠে সংঘমিত্রা।

— হ্যাঁ, গ্রামের দিকে স্কুলগুলো তো এরকমই।

— আমাদেরও তাই। ছাত্রী বেশি, টিচার কম।

— আপনিও স্কুলে?

— না, না কলেজ। বোলপুরে। এই তিনবছর হলো চাকরি পেয়েছি।

— আমার পাঁচ বছর হয়ে গেল।

— আপনার কোন সাবজেক্ট?

— সায়েন্স। কেমিস্ট্রি পড়াই।

— ও বাব্বা। আমি বিজ্ঞান কিছুই বুঝি না। আমি তো বাংলা পড়াই। বৈষ্ণব পদাবলী পড়াতে খুব ভালো লাগে।

— আমি তো বৈষ্ণব পদাবলী পড়িইনি।

— পড়বেন। ভালো লাগবে।

আবার কিছুক্ষণের নীরবতা। এবং আবার, যেন নিয়ম মেনেই নীরবতা ভাঙল সংঘমিত্রা।

— আপনার রতন পল্লির বাড়িতে কে কে আছে?

— কেউ না। আমি এখানে একা থাকি। বাবা-মা গ্রামে থাকে। আমি ভাড়া থাকি এখানে।

— আমাদের বাড়িতে আমি আর বাবা-মা। ব্যস, আর কেউ না। বলে একটু হাসে সংঘমিত্রা। তারপর কৌতুকমাখা চোখে প্রশ্ন করে— আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

— করুন।

— আপনি খুব লাজুক, তাই না?

— ধুস্।

— আমি বুঝতে পারি। আমার দোকানে আসেন। একা একা বসে চা খান। তারপর চলে যান। বলেই হেসে ওঠে সংঘমিত্রা।

মাথা নীচু করে শোনে অরণ্য। তারপর যেন স্বগতোক্তি করছে, সেভাবেই বলে ওঠে— আপনি সেদিন ভারী সুন্দর গান গেয়েছিলেন।

— কবে?

— ওই যে সেদিন। গোয়ালপাড়ায়। বুড়ো বটগাছের তলায় বসে।

— আপনি শুনেছেন? ভালো লেগেছে আপনার?

— হ্যাঁ। খুব। সত্যি বলছি।

এরপর অনেকক্ষণের নীরবতা। পাশাপাশি হেঁটে দুজনে শ্যামবাটি পৌঁছে যায়। পাশাপাশি হাঁটতে গিয়ে বেখেয়ালে, আলগোছে সংঘমিত্রার শাড়ির আঁচল যে অরণ্যের শরীর স্পর্শ করে যায়নি, এমনও নয়। শ্যামবাটি বাজারের কাছে এসে অরণ্য থামে। বলে— এবার আমি তো সোজা যাব। গোয়ালপাড়ায়।

— আমিও সোজা যাব।

অরণ্য অবাক হয়। বলে— বললেন যে, আপনার বাড়ি শ্যামবাটিতে!

— হ্যাঁ। বাড়ি তো শ্যামবাটিতেই। কিন্তু আমি এখন সোজা যাব। গোয়ালপাড়ায়। আপনার সঙ্গে।

কোথায়, কখন, কী অবাক কাণ্ড ঘটে যায়— মানুষ তো বুঝতে পারে না।

।। নয়।।

একটা বড়ো কিছু ঘটে যাবে এবার। ভয়ংকর রকম কিছু। তোলপাড় হয়ে যাবে হয়তো সব। ক'দিন থেকেই এরকম মনে হচ্ছিল মিলনের। কিন্তু কী যে ঘটবে, সেটাই ঠিকমতো বুঝতে পারছিল না। কাউকে সেভাবে বলতেও পারছিল না কিছু। নিজের মনেই বারবার আউড়ে যাচ্ছিল— 'ঘটবে, ঘটবে, এবার কিছু একটা ঘটে যাবে।' যেদিন বুড়ো বটগাছ কাটা পড়ার খবর শুনেছে, সেদিন থেকেই এরকম মনে হচ্ছে মিলনের। মুখ ফুটে

তা কাউকে বলতেও পারছে না। সেদিন খেতে বসে পারুলকে মুখ ফস্কে একবার বলে ফেলেছিল। পারুল অবাক হয়ে তাকিয়েছিল ওর দিকে। জিজ্ঞেস করেছিল— কী ঘটবে? কোনো উত্তর দিতে পারেনি মিলন। কী যা তা বলো— বলে চুপ করে গিয়েছিল পারুল। পারুলকে আজকাল ঠিকমতো বুঝতে পারে না মিলন। অবশ্য কোনোদিনই কি পারলো বুঝতে? খুব দরকার না পড়লে পারুল আজকাল কথা বলে না। সারাদিন গ্রিলের কারখানা নিয়ে পড়ে থাকে। তবে, তা বলে মিলনকে যে যত্ন-আত্তি করে না এমনও নয়। রোজ দুবেলা নিজের হাতে ভাত বেড়ে দেয় মিলনকে। মিলনের পছন্দের রান্নাও করে। মিলনের পকেটে টাকা না থাকলে টাকাও ঢুকিয়ে দেয়। কর্তব্যে যেন কোনো ঘাটতি রাখতে চায় না পারুল। এ সংসারের সবাই পারুলকে মান্যি করে। মিলনকে খুব একটা ধর্তব্যের মধ্যে আনে না কেউই। এমনকী গ্রিলের কারখানার মিস্ত্রিরাও নয়। অবশ্য তা নিয়ে মিলনের কোনো দুঃখ বা অভিমান নেই। বরং একটা চাপা সুখই আছে। পারুল তো সব দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নিয়েছে— এতেই খুশি মিলন। আরও একটা বিষয় মিলনকে খুব ভাবায় মাঝে মাঝে। পারুলের কি তার কাছে কোনো চাহিদা নেই— এরকম প্রশ্ন জাগে মনে। আজ অবধি পারুলের জন্য মিলন হাতে করে কোনোদিন কিছু নিয়ে যায়নি। অথচ, বিয়ের প্রথম প্রথম মিলনকে সবাই বলত— বাড়ি ফেরার পথে বউয়ের জন্য হাতে করে এটা সেটা নিয়ে যাবি। বউ খুশি হবে। কিন্তু মিলন রোজই ভুলে যেত। পারুলের জন্য হাতে করে কিছু আনাই হতো না। আর এরকম করেই দেখতে দেখতে দশটা বছর কেটে গেল। বিয়ের দশ বছর পরেও কি বউয়ের জন্য কেউ হাতে করে কিছু নিয়ে যায়— জানে না মিলন। অথচ পারুল কিন্তু ওর জন্য বছরে দু-বার জামাকাপড় কেনে। নববর্ষ আর পুজোর সময়। ওর জন্মদিনে মনে করে কঙ্কালীতলায় পুজো দিয়ে আসে, পায়েস রান্না করে। একটা নতুন বাইক কেনার জন্য পারুল ওকে টাকা দিতেও চেয়েছিল। কিন্তু মিলন নেয়নি। এই বাইকটাকে ও দূরে সরিয়ে দিতে চায় না। দিলে বাইকটা দুঃখ পাবে— ও জানে।

কিছু একটা ভয়ংকর রকম কাণ্ড ঘটে যাবে— এরকম যে ওর মনে হচ্ছে, এটা টুকিকেও বলতে পারেনি। আর টুকিকে বলেই বা কী হতো? ভয় পেয়ে যেত হয়তো। টুকি মেয়েটা বেশ ভালো। মিলনের তো ভালোই লাগে ওকে। মাঝে মাঝে টুকির কাছে গিয়ে দুদণ্ড গল্প করতেও ভালো লাগে। ওকে খামোকা ভয় পাইয়ে দিয়ে কী লাভ? কাউকে ও বলেনি বটে— কিন্তু কী ঘটবে সেটা তো ও নিজেও এখনও ভেবে উঠতে পারেনি। আচ্ছা, কানু ঘোষের লোকেরা কি দলবল নিয়ে ওদের মারতে আসবে! কানু ঘোষের হাতে অনেক গুন্ডা আছে। বোমা-বন্দুক আছে— সব জানে মিলন। কানু ঘোষ সাদা পাঞ্জাবি-পাজামা পরে, সাদা স্করপিও চড়ে— দূর থেকে সেটাও দেখেছে মিলন। কানু ঘোষের লোকেরা যদি এসে মারে, কী করবে ওরা? সেদিন কে যেন বলছিল— দু-একদিনের ভিতর কানু ঘোষের লোকেরা গাছ কাটতে আসবে। গাছ কেটে রাস্তা চওড়া করবে। তখন চেনাই যাবে না ওদের গোয়ালপাড়া। কলকাতা থেকে সোজা গাড়ি এসে এ রাস্তা দিয়ে প্রান্তিকে ঢুকবে। কানু ঘোষের লোকেরা যদি এসে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয়! বা গুলি চালায়! যদি গুলি লেগে মরে যাই, তাহলে কি লোকে শহিদ মিলন পাল বলবে? পারুল কি ওর বুকের ওপর আছাড়ি পিছাড়ি খেয়ে কাঁদবে তখন— এইসব সাতপাঁচ ভাবতে থাকে মিলন। কিন্তু মিলনের মনে হয়— এ অঙ্ক তো অনেক সরল। কানু ঘোষের লোক আসবে আর গাছটা কেটে দেবে। গাছটাকে ওরা বাঁচাতে পারবে না। তা মিলন জানে। এই গাছ ঘিরে যারা বসে আছে তারাও এটা জানে। তবু ওরা বসে আছে। বসে আছে কেননা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ বুড়ো বটকে ওরা আগলে রাখতে চায়। কিন্তু কানু ঘোষের লোকেরা আসবে কি আসবে না এ ভেবে যে খুব একটা ভয় করছে মিলনের এমনও নয়। কানু ঘোষ তো জানা বিপদ। প্রথম দিন থেকেই জানা। মিলনের মনে হলো— এমন একটা কিছু কাণ্ড ঘটে যাবে যেটা আগে থেকে ও জানেই না। বুঝতেই পারছে না। সেই অজানা ভয়ংকর কাণ্ডটাই ঘটে যাবে হয়তো খুব শীঘ্রই। কেন এমন মনে হচ্ছে কে জানে!

বুড়ো বটের ছায়ায় বসে এরকমই ভাবতে থাকে মিলন। আপম মনেই। আজ পাঁচ-ছদিন হলো ওরা সবাই পালা করে দিনে রাতে সবসময় এই বুড়ো বটকে ঘিরে গোল হয়ে বসে থাকছে। মিলন অবশ্য রাতে কোনোদিন থাকেনি। রাত হলেই ওর ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে। তবে সকাল হলেই এই ক'দিন এখানেই ছুটে আসছে মিলন। দুপুরে একটুক্ষণের জন্য খেতে বাড়িতে যাচ্ছে। তারপর আবার এখানে। রাত ন'টা বাজলে বাড়ি। মিলন জানে, ন'টার সিরিয়ালটা দেখে উঠে পারুল টেবিলে রাতের খাবার সাজাবে। এই ক'দিন মিলন গ্রিলের অর্ডার আনতে যায়নি কোথাও। সেটা পারুলও জানে। অবশ্য সে নিয়ে পারুল ওকে কোনোদিন জোর করেনি। এখন দেখতে দেখতে বেলা চড়ে গেছে। রোদ উঠেছে মাথার উপর। বুড়ো বটের তলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে গল্প করছে সবাই। কেউ কেউ মোবাইল দেখছে। একটু আগে ঝন্টু সবাইকে বিনি পয়সায় চা খাইয়েছে। বুড়ো বট ঘিরে যারা বসে থাকবে এই

ক'দিন দিনে দু-বার ঝন্টু তাদের বিনে পয়সায় চা খাওয়াবে বলেছে। এটা আমার কর্তব্য কিনা বলো— বলেছে ঝন্টু। এই বুড়ো বটের ডালে লাল সুতো বেঁধেই ঝন্টুর দোকানটা না এত বড় হলো। তা একটা কর্তব্য তো ঝন্টুর আছেই।

মিলনের মনে পড়ে যায়, টুকি সেদিন ইচ্ছে ঠাকরুনের কথা বলছিল। এমন কোনো ঠাকুর দেবতার নাম মিলন আগে কখনো শোনেনি। টুকির কাছেই প্রথম শুনলো। আর টুকি যখন বলেছে, তখন আছে নিশ্চয়ই। সব ঠাকুর দেবতার নাম কি আর মিলনের জানা? নিজের অজান্তেই মিলন কপালে হাত ঠেকায়। টুকি বলেছিল, বুড়ো বটগাছটা নাকি কাটা পড়বে না। ইচ্ছে ঠাকরুন বাঁচিয়ে দেবেন। খুব যে একটা বিশ্বাস করেছিল মিলন— এমন নয়। আবার খুব একটা অবিশ্বাস করতেও ইচ্ছে করছে না। যদি ইচ্ছে ঠাকরুন গাছটা বাঁচিয়ে দেন, তবে টুকির সঙ্গে গিয়ে ইচ্ছে ঠাকরুনের থানে একবার পুজো দিয়ে আসবে— ভাবে মিলন।

বেলা বেড়ে গেছে। ঘড়ির কাঁটা বারোটা পেরিয়েছে। এবার উঠতে হবে। পারুল এতক্ষণে নিশ্চয়ই স্নান সেরে নিয়েছে। ওঠার তোড়জোড় করছিল, এমন সময় পাশে বসা নিবারণ বলে উঠল— বাড়ি যাচ্ছিস নাকি?

— ভাবছি যাব এবার। চান খাওয়াটা করে আসি।

— একটু পরে যাস। দু-মিনিট বস, তোর সঙ্গে একটু কথা বলে নিই। এতক্ষণ বিড়ি টানছিল নিবারণ। এবার বিড়িটা মাটিতে ফেলে পা দিয়ে ডলতে ডলতে বললো। নিবারণের একটা সেলুন আছে গোয়ালপাড়ার মোড়ে।

— তা বসছি না হয়। যা বলার একটু তাড়াতাড়ি বল।

— রাস্তা তো চওড়া হবে। গাছটাও কেটে দেবে— বুঝেছিস নিশ্চয়।

— তা তো বুঝেছি।

— এসব আমরা আটকাতে পারব না। কানু ঘোষের হাত পড়েছে।

— তা তো পারবোই না।

— রাস্তা যখন চওড়া হবে আমাদের এসব দোকান ভেঙে দেবে, উঠিয়ে দেবে। আমাদের বলে গেছে এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে।

— তোমাদের এখানে আর দোকান করতে দেবে না।

— হ্যাঁ রে, কানু ঘোষের লোকেরা কি মারবে আমাদের? তোর কী মনে হয়?

— প্রথমে মুখে বলবে। তারপর শুনতে না চাইলে মারবে।

— ওসব মারধরে আমার খুব ভয়। লাগবে আমার।

নিবারণ মুখ নামিয়ে কী ভাবতে থাকে। নিবারণকে দেখে একটু কষ্টই হয় মিলনের। নিবারণের দিকে তাকিয়ে বলে— তোমার কী খুব ভয় লাগছে নাকি!

— না, ভয় না, তবে এখন চিন্তা হয় খুব। দুটো মেয়ে আছে। সোমত্ত। বিয়ের বয়স হয়েছে। এখন এ দোকান তুলে দিলে কোথায় যাই বল তো?

মিলনের কাছে এর কোনো উত্তর নেই। চুপ করে বসে থাকে মিলন। উত্তর দিক থেকে আসা হাওয়া হু-হু করে বয়ে যায়। সঙ্গে ধুলো আর শুকনো পাতা।

— তুই বেশ ভালো আছিস। মিলনের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন নিরাসক্ত ভাবেই বলে নিবারণ।

— আমার আবার কী দেখলে তুমি?

— এই যে কেমন গ্রিলের কারখানা করেছিস। কত বড়ো ব্যবসা। আমাদের মতো তো আর দোকান উঠে যাওয়ার চিন্তা নেই।

— ও আর আমি কী করলাম? ব্যবসা তো আমার বউ-ই সামলায়। ব্যবসার আমি কিছুই জানি না। আমি শুধু ঘুরে বেড়াই। এধার-ওধার।

— তা বউটা তো তোর লক্ষ্মীমন্ত। তোকে চিন্তাই করতে দেয় না কিছু। আমাদের বউগুলো যদি ওরকম হতো...

— তা বলতে পারো লক্ষ্মীমন্ত। আমার তো যা কিছু সব বউয়ের জন্যই। শুধু এই একটা ব্যাপার... বউয়ের কোনো বাচ্চা হলো না...

— হলো না কেন? আর হবে না নাকি?

— কী জানি হলো না কেন। কত তো ডাক্তার দেখালাম, মানত করলাম।

— তা একদিক দিয়ে তুই কিন্তু বেঁচে গেছিস। আমার মতো যদি দুটো মেয়ে থাকতো তবে বুঝতি। মেয়ে দুটো সোমত্ত, তার ওপর আবার দোকানের পাট গুটোতে হবে। এ যে কী দুশ্চিন্তা, তা তুই বুঝবি না।

আবার নিঃস্তব্ধতা নেমে আসে দু'জনের মাঝখানে। উত্তরের হাওয়া ধুলো আর শুকনো পাতা নিয়ে বুড়ো বটের চারপাশে পাক খায়। এই শীতের দুপুরে সে হাওয়ায় যেন কোথাও একটা বিষণ্ণতা মিলেমিশে যায়। নিবারণ আর একটা বিড়ি ধরায়। একটু বড়ো করে টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ে। তারপর আপন মনেই যেন বলে ওঠে— গাছ কাটবে, রাস্তা বড়ো করবে। রাস্তার ধারের সব জমি প্লট প্লট করে বিক্রি হয়ে যাবে। আলো বসবে রাস্তায়। কলকাতা থেকে বাবুরা আসবে। বাড়ি বানাবে। কত আনন্দ করবে সে বাড়িতে। বিকেলে খোয়াইয়ের মাঠে সাঁওতালদের নাচ দেখতে যাবে। আচ্ছা, ওদের জন্য কি সেলুন

হবে এখানে? ওরা তো আমার সেলুনে আসবে না...

* * *

সেই সকাল থেকে ভেটকি একটু দূরে দাঁড়িয়ে নজর রাখছে বুড়ো বটগাছের তলায় গোল হয়ে বসে থাকা লোকগুলোকে। এখন বেলা বেড়েছে। এর ভিতর অবশ্য দু-তিন কাপ চা খেয়ে নিয়েছে। সকালে একবাটি মুড়ি খেয়ে বেরিয়েছিল। আর কিছু খায়নি। এখন খিদেয় পেটটা মোচড় দিচ্ছে। মুখের ভিতর একটু টক টক জল জমেছে। একটু পরেই বাড়ি চলে যাবে। বউ আজ কী রান্না করেছে কে জানে! আজকাল বউয়ের মেজাজটা সবসময়ই তিরিক্ষে হয়ে থাকে। বাড়ি ঢুকলেই অশান্তি। বাড়িটাকে আজকাল একটু এড়িয়েই থাকতে চায় ভেটকি। খিদে পেলে বাড়ি ঢোকে, নয়তো ঢোকে না। এই ক'দিন সকাল থেকে এখানে এসে লোকগুলোর ওপর নজর রাখতে হয়েছে। কানু ঘোষের অর্ডার। তবে আজ শেষ। কাল থেকে আর আসতে হবে না। এমনিতেই কাল বিকেল থেকে অবশ্য ভেটকির মনটা বেশ খুশি খুশি হয়ে আছে। কাল সন্ধেবেলা, টুকির ঘর থেকে বেরনোর পর, খামোকাই কানু ঘোষ ওর হাতে তিনশোটা টাকা গুঁজে দিয়েছিল। বলেছিল— এটা তুই রাখ। কিছু কিনে নিয়ে যাস বাড়িতে। অবশ্য তারপরই পাছায় একটা লাথিও মেরেছিল। কানু ঘোষের মেজাজ ফুরফুরে থাকলে এরকম পাছায় লাথি মারে— সেটা ভেটকি জানে। এটা আদরের একটা ধরন। এক একজন, এক একরকম আদর করে— এই আর কী। কানুর আদরটা এরকমই। তবে, কারণে অকারণে কানু ওর হাতে টাকা গুঁজে দেয়— এটা অস্বীকার করতে পারে না ভেটকি।

বেলা বাড়ছে। খিদের চোটে এবার মাথাটাও ঝিমঝিম করতে শুরু করেছে। মুখের ভিতর জল জমছে। এবার বাড়ি ফিরতেই হবে। তার আগে যে কাজটা কানু ঘোষ দিয়েছে, সেটা শেষ করে ফেলাই ভালো। এরকম ভাবনা-চিন্তা করে ভেটকি পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় বুড়ো বটের নীচে বসে থাকা জটলাটার দিকে। ওই জটলার কেউ যে ওকে ভালো চোখে দেখে না, বরং সন্দেহ করে, সেটা ভেটকি ভালোই জানে। ওই যে বটগাছের পাশে হোটেল চালায় যে ছেলেটা, ঝন্টু, ও ভেটকিকে কানু ঘোষের খোচর বলে ডাকে। সেটা ভেটকি একদিন শুনে ফেলেছিল। তবু পায়ে পায়ে ভেটকি জটলাটার দিকে এগোয়। কানু ঘোষ যেটা বলতে বলেছে, সেটা ওদের বলে ফেলতে পারলেই ছুটি। কাল থেকে আর এখানে আসতে হচ্ছে না।

গাছের তলায় বসেই মিলন লক্ষ্য করল, কানু ঘোষের লোকটা পায়ে পায়ে তাদের জটলার দিকেই আসছে। লোকটাকে মোটেই ভালো লাগে না মিলনের। কেমন যেন মরা মাছের মতো চোখ। থ্যাবড়ানো মুখ। এরকম মুখ মিলন কারও দেখেনি। লোকটাকে কেউই পছন্দ করে না। তবু লোকটা সর্বত্র ঘুরঘুর করে বেড়ায়। কানু ঘোষের চর। কানুর হয়ে খবর জোগাড় করে বেড়ায়। মিলন বাড়ির দিকে যাবে বলে ঠিক করেছিল। কিন্তু এখন এই লোকটাকে এদিকে আসতে দেখে আবার বসে পড়ল। নিশ্চয়ই কোনো বাজে মতলব নিয়ে লোকটা আসছে এদিকে। হয়তো আজ থেকেই গাছ কাটবে— সেই কথাই বলতে আসছে।

পায়ে পায়ে জটলার কাছে এসে দাঁড়ায় ভেটকি। ওকে আসতে দেখে জটলার সবাই যে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে তা বুঝতেও পারে। জটলার মানুষগুলো এখন নিজেদের মধ্যে কথা থামিয়ে সরু চোখে ওকে জরিপ করছে। একটু অস্বস্তিই লাগে ভেটকির। এরকম উচ্ছুন্নে জীবন হলে এরকমই হয়। লোকে সন্দেহ করে। কী করে ও এদের বোঝাবে, আসলে উঞ্ছবৃত্তি করতে ওরও ভালো লাগে না।

মাটির দিকে চোখ নামায় ভেটকি। গলাটা যতটা সম্ভব নরম করে বলে— একটা কথা বলার ছিল।

জটলার ভিতর থেকে কে একটা গম্ভীর গলায় বলে— তা কী বলতে চাইছ, বলেই ফেল।

আর একজন তীক্ষ্ণ স্বরে বলে ওঠে— কী আর বলবে? ওই তো কবে থেকে গাছ কাটবে বলতে এসেছে। তা বলো, বলো।

জটলার ভিতর থেকে এক বয়স্কা মহিলা অভিশম্পাত দেওয়াও শুরু করে— গুষ্টিশুদ্ধ সব মরবি তোরা। এ গাছ কাটলে গুষ্টিশুদ্ধ মরবি। সব ক'টা মরবি, সব কটা...

ভেটকি একটু থতমত খায়। তারপর— আজ্ঞে তা নয়। আমার কথাটা একটু শোনো তোমরা।

জটলার ভিতর থেকে গম্ভীর গলা আবার বলে উঠল— এত ভনিতা না করে আসল কথাটা কী বলতে এসেছ বলে ফেলো দিকি।

সামান্য কেশে গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে ভেটকি বলে— বলছিলাম কী, মানে কানু ঘোষ বলতে বলেছে— এই গাছটা কাটা হবে না। আর নতুন রাস্তা অন্যদিক দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। গাছটা থাকবে, কেমন। আমি চলি।

ভেটকির কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত নীরবতা নেমে আসে গোটা চত্বর জুড়ে। কথাগুলো বলে ফেলেই ভেটকিও অন্যদিকে ফিরে হনহন করে হাঁটা লাগায়। হাঁটতে হাঁটতেই শুনতে পায় বুড়ো বট গাছের তলায় জটলা থেকে নৈঃশব্দ্য ভেঙে সমস্বরে একটা হো-হো শব্দ উঠেছে। বুঝতে

পারে, ওদের চোখে এখন আনন্দের কান্না। ওদের ভিতর কেউ কেউ বুড়ো বটের পায়ে গড় হয়ে প্রণাম করছে। না তাকিয়েও সব বুঝতে পারে ভেটকি। ভেটকিরও মনটা বেশ খুশি হয়ে ওঠে। আরে, উচ্ছুন্নে মানুষও কখনো কখনো ভালো খবর নিয়ে আসে— সে সবাই বুঝলে তো!

মরা মাছের মতো চোখের লোকটাকে এখন আর খুব একটা খারাপ লাগছে না মিলনের। বুড়ো বটের তলায় এখন একজন আর একজনকে জড়িয়ে ধরেছে। ঝন্টু ছুটেছে মিষ্টি আনতে। নিবারণ আর একটা বিড়ি ধরিয়ে ফেলল। গম্ভীর গলার লোকটা বলে উঠল— আজ সন্ধেবেলা এখানে কীর্তনের আসর বসবে। হরির লুঠ হবে। সবাইকে একটু খবর দিও হে।

মিলন মনে মনে ঠিক করে নিল, এখন আর বাড়ি ফেরা হবে না। এখন একবার টুকির কাছে যেতেই হবে। জেনে নিতে হবে ইচ্ছে ঠাকরুনের থানটা কোথায়।

।। দশ।।

বুড়ো বটের তলায় আজ সবাই কীর্তনের আসর বসিয়েছিল। আজ বড়ো আনন্দের দিন সবার। কানু ঘোষ জানিয়ে দিয়েছে বুড়ো বট কাটা হবে না। রাস্তাও অন্যদিক দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। বুড়োর কাছে গোটা ঘটনাটাই কেমন অলৌকিক মনে হচ্ছে। এরকমও হয় নাকি? সত্যিই কি অলৌকিক বলে কিছু আছে? কানু ঘোষ কেনই বা হঠাৎ গাছ কাটবে না বলে জানালো, কেনই বা রাস্তাটা ঘুরিয়ে দিতে চাইছে— ভেবে কোনো তল পাচ্ছে না বুড়ো। দুপুরে খবরটা পাওয়ার পর থেকেই ভাবছিল। জিজ্ঞেসও করেছিল সবাইকে। কিন্তু কেউ সঠিক কারণটা বলতে পারল না। এখন আর কে-ই বা কারণ জানতে চায়। বুড়ো বট কাটা হবে না— এতেই সবাই খুশি। সন্ধেবেলা বুড়োও গিয়েছিল বুড়ো বটের তলায় কীর্তনের আসরে। গোয়ালপাড়ার লোকগুলোর ভিতর এখন খুশির জোয়ার নেমেছে। একজন আর একজনকে জড়িয়ে ধরছে। হাসিমুখে কথা বলছে সবাই। সন্ধেবেলা কীর্তনের আসরে গিয়ে বুড়ো দেখে, বুড়ো বটকে ঘিরে কী সুন্দর আলপনা দিয়েছে মেয়েরা। প্রদীপ জ্বালিয়েছে। বেশ একটা পুজো পুজো ভাব। ঝন্টু মাগনাতে সবাইকে চা খাওয়াচ্ছে আর বলছে— কী বলেছিলাম না বড় ঠাকুর বড় জাগ্রত। তার দয়াতেই তো সব হলো। কে একজন বলে গেল— ভাগ্যিস আমরা বুড়ো বটের তলায় হত্যে দিয়ে বসেছিলাম। তাতেই না হলো। বড়ঠাকুর শুনল তো আমাদের কথা! বসে বসে এই আনন্দটাই অনেকক্ষণ ধরে দেখল বুড়ো। বড়ঠাকুর আছে কি নেই তা বুড়ো জানে না, জানার খুব একটা যে ইচ্ছে আছে— এমনও নয়। এই মানুষগুলোর জীবনে এই যে আনন্দ এসেছে— এটাই বড় কথা।

কীর্তনের আসর থেকে ফিরতে একটু রাতই হয়ে গিয়েছিল আজ। বাড়ি ফিরে পুবদিকের বারান্দায় চেয়ার টেনে বসেছিল। উঠে আর রাতের খাবার গরম করে খেতে ইচ্ছে করছিল না। একদিন রাতে না খেলে তেমন কিছু হবে না— ভাবলো বুড়ো। বরং, এখন এভাবে বারান্দায় বসে থাকতেই ভালো লাগছে। আজকাল রাতের দিকে মাঝেমধ্যেই বুড়ো এরকম বারান্দায় বসে থাকে। এরকম বসে থাকতে থাকতেই কখন ঘুম এসে যায় বোঝে না। অনেক ভোরে, যখন শিরিষ গাছের ডালে প্রথম পাখিটা ডেকে ওঠে— তখন ঘুম ভাঙে বুড়োর। আজকেও সেভাবেই ঘুমিয়ে পড়বে। আজ সকালে রতন একটা চন্দন গাছের চারা এনে দিয়েছে। কাল সকালে ওটা বাগানে লাগিয়ে দেবে। এই গাছটার একটা ভালো দেখে নাম দিতে হবে। সকাল থেকেই ভাবছে কী নাম দেবে। এখনও অবধি কোনো নাম মাথায় আসেনি। এক একটা নাম চিড়িক দিয়ে মাথায় উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোনো নামই সেরকম পছন্দ হচ্ছে না বুড়োর। আজ আর কোনো নামই মাথায় আসবে না। কাল সকালে যখন আলো ফুটবে, তখন গাছগুলোর গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে ঠিক একটা নাম মনে আসবে। আসবেই— জানে বুড়ো। রোজ ভোরবেলা যখন বাগানে অল্প অল্প করে আলো ছড়িয়ে পড়ে, ঘাসগুলো শিশিরে মাখামাখি হয়ে যায়, তখন বাগানে নামে বুড়ো। পরম মমতায় ওদের গায়ে হাত বোলায়। ওদের জড়িয়ে ধরে গাছের হৃদ্‌স্পন্দন শোনার চেষ্টা করে। এবং কী আশ্চর্য, শুনতেও পায়। গাছেরা ডালপালা দিয়ে ওকে আড়াল করে থাকে। গাছেদের নিয়ে এ সংসারটা বেশ ভালোই লাগে বুড়োর। এ সংসারে কোনো চাহিদা নেই, কোনো ঝগড়াও নেই। শুধু ভালোবাসা দিয়ে একে অপরকে কেমন জড়িয়ে থাকা।

রাত বেড়েছে। অবশ্য ওদের এই নতুন পল্লিতে সন্ধে সাতটার পরই মনে হয় অনেক রাত। বুড়ো অনেকদিন ঘড়ি ব্যবহার করে না। বাড়িতে কোনো ঘড়িও রাখেনি। আলোছায়ার লুকোচুরি দেখে বুড়ো সময় আন্দাজ করে। এখন

যেমন, প্রান্তিক স্টেশন দিয়ে গুমগুম করে একটা এক্সপ্রেস ট্রেন চলে গেল। রোজই এসময়ে ট্রেনটা এখান দিয়ে যায়। এ ট্রেনটার যাওয়া শুনে বুড়ো আন্দাজ করতে পারে, এখন রাত সাড়ে এগারোটার কাছাকাছি হবে। কোনো কোনো সময় অনেক রাতে কোনো মালগাড়ি এসে দাঁড়ায় স্টেশনে। তার ঘটাং ঘটাং এক অপার্থিব শব্দ ভেসে আসে। মনে হয় অনেক দূরের দেশের বার্তা বয়ে নিয়ে এলো বুঝি। তার চাকায় না জানি জড়িয়ে আছে কত দেশের ধুলো। কখনো কখনো দুপুরের দিকে বুড়ো গিয়ে বসে থাকে প্রান্তিক স্টেশনে। এসময় স্টেশনটা ফাঁকা থাকে। একটা-দুটো কুকুর শুধু গুটিশুটি মেরে শুয়ে থাকে এদিক ওদিক। তখনও গুমগুম আওয়াজ তুলে মালগাড়ি ছুটে যেতে দেখেছে বুড়ো। তার একদম শেষের কামরায় একাকী এক গার্ড বসে। পাহাড়, অরণ্য, নদী পেরিয়ে কত দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওই গার্ড, এমনই একা একা। কখনো কখনো ওই একাকী গার্ডটিকে দেখে হিংসা হয়েছে বুড়োর। মনে হয়েছে, সে-ও যদি কখনো মালগাড়ির গার্ড হতে পারতো।

এরকম প্রান্তিক স্টেশনে বসেই একদিন সে ঝড়ের রূপ দেখেছিল। প্রথমে আকাশের এক কোণে কালো এক চিলতে মেঘ করে এলো। তারপর নিমেষের ভিতরে সে মেঘ ছড়িয়ে গেল সারা আকাশ জুড়ে। ঘন কালো সে মেঘ। কী প্রলয়ংকর সে রূপ। আছাড়ি পিছাড়ি খেতে শুরু করল গাছগুলো। মনে হলো, যেন ধ্বংস করে তবেই শান্তি হবে। বুড়োর সর্বাঙ্গ ধুলোয় ঢেকে গেল। গায়ে উড়ে এসে পড়ল শুকনো পাতা। কোনো ভ্রূক্ষেপই করল না বুড়ো। অবাক হয়ে সে এক প্রলয়ংকরীর নাচন দেখতে লাগল দুচোখ ভরে। তারপর একসময় ঝড় থেমে গেল। শান্ত হলো চরাচর। পাখিরা ডেকে উঠল। শীতল হাওয়া ছুটে এলো কোথা থেকে। পশ্চিমের আকাশে কালো মেঘ সরে গিয়ে কমলা রঙের এক অত্যাশ্চর্য আলো উঁকি দিল। মুগ্ধ করা সে রূপের দিকেও তাকিয়ে রইল বুড়ো।

পুবদিকের বারান্দায় বসে এসবই মনে করার চেষ্টা করছিল বুড়ো। বয়স তার নেহাত কম হলো না। তবে তাকে অবশ্য বয়সের আন্দাজে একটু বেশিই বুড়ো মনে হয়। সেটা হয়তো তার হাবভাবের জন্য। এই এতখানি বয়সে বুড়ো অবশ্য দু-চোখ ভরে দেখল অনেক। ও যা দেখল, তা অনেকেই দু-চোখ ভরে দেখতে পায় না। এই যেমন শিরিষ গাছের পাতার ওপর লেগে থাকা বর্ষার জলে রোদ্দুর পড়লে কী অপূর্ব এক কিরণ বিচ্ছুরিত হয়— তা কি কেউ দেখেছে? বুড়ো কিন্তু দেখেছে। বললে লোকে হাসবে। বলবে, এ একটা দেখার জিনিস হলো? কিন্তু বুড়ো জানে, এই জল আর রোদ্দুরের ভিতর কী রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। বা, রতনের মেয়ের কথাই ধরুক না কেন। গেলবার পৌষমেলা থেকে রতনের ক্লাস নাইনে পড়া মেয়েটার জন্য একটা গুলদস্তার মালা কিনে এনেছিল বুড়ো। মেয়েটাকে দিতেই তার কী আনন্দ। সারা মুখে যেন ঝাড়বাতির আলো জ্বলে উঠেছিল। এরকম আনন্দ দেখেছে কেউ কখনো? এ কি কখনো পয়সা খরচ করে দেখা যায়, না পয়সা খরচ করে দেখতে হয়? বুড়ো এইসব দেখেছে। এর জন্য বুড়োর নিজেকে ভাগ্যবান মনে হয়। কারণ, বুড়ো বারবরই এসব দেখতে চেয়েছে। অন্যকিছু, বড় কিছু, বুড়ো দেখতে চায়নি কখনো। বুড়োর মাঝে মাঝে মনে হয়, শুধু ওর জন্যই বোধহয় ঈশ্বর এত ছোট ছোট আনন্দের ব্যবস্থা করে রেখে দিয়েছেন ভুবনে।

আজ যখন কীর্তনের আসরে বসেছিল বুড়ো, তখন মিলন এসে ওর কানে কানে বলেছিল— ইচ্ছে ঠাকরুনের কথা আপনি কিছু জানেন নাকি? মিলনকে বুড়োর বেশ লাগে। কোনো বিদ্বেষ, কোনো দুঃখ যেন এই লোকটাকে স্পর্শ করতে পারেনি। এই পৃথিবীতে লোকটা হিসাব রাখতে জানে না। সব হিসাবের ভার অন্যের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। নিজে মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়ায়। বুড়ো জানে এইসব লোকেদের জন্যই ঈশ্বর চারদিকে এত আনন্দের সম্ভার সাজিয়ে রাখেন। সেসব এই লোকগুলোই শুধু দেখতে পায়, অন্য কেউ পায় না। কীর্তনের আসরে বসে মিলনের মুখে ইচ্ছে ঠাকরুনের কথা শুনে বেশ মজা লেগেছিল বুড়োর।

— না বাপু, এরকম কোনো ঠাকরুনের কথা শুনিনি। তা তুমি শুনলে কোত্থেকে?

— মিলন ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে বলেছিল— আরে ছাই আমি কি জানতাম নাকি? আমাকে তো টুকিই বলেছে।

— তা টুকি জানল কোত্থেকে?

— সে আমাকে কিছুতেই বলেনি। আজ কত করে বললাম, টুকি আমাকে একবার ইচ্ছে ঠাকরুনের থানে নিয়ে চল, পুজো দিয়ে আসি। তা কিছুতেই রাজি হলো না। বলে, ওখানে সবার যেতে নেই। টুকির বড়ো জেদ কিনা। তাই আমি আর কিছু বলিনি।

— টুকি তোমাকে হঠাৎ ইচ্ছে ঠাকরুনের কথা বললো কেন?

— ওই যে সেদিন গেলাম না টুকির ওখানে। তা টুকিকে বলছিলাম, আমাদের বুড়ো বটটা এবার কেটে দেবে। শুনে টুকি বলল, কিছু হবে না। বুড়ো বট কেউ কাটতে পারবে না। বুড়ো বটকে ইচ্ছে ঠাকরুন রক্ষা করবেন। শেষ পর্যন্ত দেখুন সেটাই

হলো। হলো কিনা বলুন!

— হ্যাঁ। তা তো হলো বটেই। তা তোমার ইচ্ছে ঠাকরুনের থানটা কোথায়? একটু মজা করেই বলে বুড়ো।

— সে কি আমি জানি! সে তো টুকি জানে। আমাকে বলতে চায় না কিছুতেই।

একটু থামে মিলন। তারপর বুড়োর কাছ ঘেঁষে আসে। ফিসফিস করে বলে, আর একটা কথা বলি আপনাকে?

— বল।

— আজ না বাইকের পিছনে চাপিয়ে টুকিকে এখানে নিয়ে এসেছি। একটু পিছন দিকে তাকান। ওই দেখুন, একদম শেষে বাঁদিকে বসে আছে। আপনার দিকেই তাকিয়ে আছে।

বুড়ো পিছনের দিকে তাকায়। শ্যামল স্নিগ্ধ চোখজোড়া পরম মমতায় তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। ওই চোখ আশ্রয় দিতে জানে।

— আপনাকে একদিন নিয়ে যাব টুকির কাছে। ডিম ভাত খাইয়ে আনব। রসুন দিয়ে ডিমের ঝোলটা টুকি খুব ভালো করে। একবার খেলে ভুলবেন না।

বুকের বাঁদিকে একটা ব্যথা খোঁচা দিয়ে উঠেই মিলিয়ে যায়। শরীরটাও একটু থিরথির করে কেঁপে ওঠে যেন। চেয়ারের হাতল দুটো শক্ত করে চেপে ধরে বুড়ো। বড়ো তেষ্টা লাগছে আজ। বুকটা একদম শুকিয়ে কাঠ। জিভটা যেন ভিতরের দিকে গুটিয়ে আসছে। একটু জল খেতে হবে। চেয়ারের হাতলে ভর রেখে বুড়ো আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। আর তখনই আবার ব্যথাটা ফিরে আসে। দামামা বাজাতে শুরু করে বুকের ভিতর। গুমগুম আওয়াজ ওঠে যেন। যেন হাজার হাজার মালগাড়ি চলে যাচ্ছে বুকের ভিতর দিয়ে। থিরথির করে কাঁপতে থাকে বুড়োর শরীর। কেমন যেন আচ্ছন্ন লাগে নিজেকে। মাটিতেই শুয়ে পড়ে বুড়ো। চোখের সামনে সাদা পর্দার মতো কুয়াশায় ভেসে আসে কত ছবি। পশ্চিম আকাশ কালো করে আসা ঝড়, গোয়ালপাড়ার ফঙ্গবেনে মানুষটি, বুড়ো বটের তলায় সারি সারি প্রদীপের আলো, মাঝরাতে স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা একলা একটি মালগাড়ি— কত কী। মনে হয়, শিরীষ গাছটা তার দু-বাহু বাড়িয়ে যেন মুখে মাথায় আদর করে দিচ্ছে। নিজেকে মেঘের মতো হালকা লাগতে থাকে বুড়োর। মনে হয়, কেউ যেন তাকে অনেক দূরের দেশে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ওই নক্ষত্র ছাড়িয়ে অন্য কোথাও। বুকের ভিতর গুমগুম শব্দ বাড়তে থাকে। গভীর ঘুম বুড়োকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলতে থাকে। চোখ বুজে আসতে আসতেই বুড়ো ভাবে— চন্দন গাছটার নাম দেবে টুকি। বুকে হাত চেপে মাটিতেই শুয়ে পড়ে বুড়ো।

শিরীষ গাছের ডাল থেকে একটা রাতচরা পাখি অন্ধকারে উড়ে যেতে যেতে শুধুই ডেকে যায়— যাচ্ছি যাই, যাচ্ছি যাই, যাচ্ছি যাই...

* * *

পারুল আজ খুব সেজেছে। এরকম সাজতে পারুলকে কখনো দেখেনি মিলন। হ্যাঁ, সে বিয়ের দিন সেজেছিল বটে। লাল বেনারসি আর চন্দন পরেছিল। বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল পারুলকে— মনে আছে মিলনের। তা বাদে পারুলকে খুব একটা সাজগোজ করতে দেখেনি। মাঝেমধ্যে, এদিক-ওদিক, নেমন্তন্ন বাড়ি গেলে টেলে একটু আধটু সাজে। তাও বেশি কিছু না। আজ যেন একটু বেশিই সেজেছে। নীল রঙের শাড়ি, তার সঙ্গে ম্যাচিং ব্লাউজ, এমনকী ঠোঁটে হালকা একটু লিপস্টিকও দিয়েছে। গলায় লকেট দেওয়া একটা সোনার হার। চার-পাঁচ বছর আগে হারটা পারুল পছন্দ করে বানিয়েছিল। মিলন আড়চোখে পারুলকে দেখে আর অবাক হয়ে যায়। কী যে আজ হলো পারুলের, কে জানে। এ যেন এক অচেনা পারুল। একে যেন মিলন কোনোদিন দেখেনি।

বুড়ো বটের তলায় কীর্তনের আসরে আজ কিছুটা রাতই হয়ে গিয়েছিল। কীর্তনের পর হরির লুঠ হলো। মিলনও হরির লুঠের বাতাসা কুড়িয়েছিল। পাঁচটা বাতাসা পেয়েছিল। তিনটে টুকিকে দিয়েছিল, দুটো নিজে খেয়েছিল। তারপর বাইকের পিছনে চাপিয়ে টুকিকে আবার আমোদপুর পৌঁছে দিয়ে আসে। বাইকের পিছনে বসে টুকি ওর কোমর জড়িয়ে রেখেছিল। খুব হাওয়া দিচ্ছিল। টুকির গায়ের গন্ধ ওর নাকে লাগছিল। মাঝে মাঝে ওকে একটু বেশি জড়িয়েই ধরছিল টুকি।

— কী রে এমন করিস কেন?

— উফ্ ঠাণ্ডা লাগছে না। আস্তে চালাও না কেন বাইকটা। রাতের আকাশে কত তারা। দুপাশের ধান খেতে ধান কাটা হয়ে গেছে। শিশিরে ভেজা খড় শুধু। সেই আকাশের নীচে কালো পিচের রাস্তা ধরে বাইক চালিয়ে টুকিকে আমোদপুরে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল মিলন।

বাড়িতে ঢুকে পারুলকে দেখে একটু অবাকই হয়েছিল বটে। এত সেজেছে কেন পারুল? কোথাও গিয়েছিল কি? সে কথা অবশ্য পারুলকে জিজ্ঞাসা করেনি মিলন। জিজ্ঞাসা করাই যায়। তবু করেনি। কেন জানি না সঙ্কোচ হয়। শুধু আড়চোখে দেখছিল পারুলকে। শরীরটা একটু ভারি হয়েছে বটে, কিন্তু পারুল যে এখনও সুন্দরী আছে তা মানতেই হয়। এরকম বউ

পেলে যে কেউ বর্তে যেত, কিন্তু সব ছেড়ে ওর মন পড়ে রইল মাঠেঘাটে— নিজের সম্পর্কে নিজেরই খুব অবাক লাগে মিলনের। মিলন এও লক্ষ্য করেছিল দরজা খুলে দিয়ে পারুল কেমন লাস্যময় একটা হাসি হেসেছিল। এরকম হাসি অনেক বছর আগে হাসত পারুল। বিয়ের পর পর। আবার আজ রাতে এরকম হাসি ফিরিয়ে আনল কেন পারুল? অবাক হয়ে মিলন ভাবে।

খেতে বসেও লক্ষ্য করেছিল মিলন, পারুল যেন কেমন অস্বাভাবিক আচরণ করছে। রোজ রাতের খাবার টেবিলে সাজিয়ে দিয়ে উল্টো দিকে পারুল চুপটি করে বসে থাকে। মিলন মাথা নীচু করে খায়, আর পারুল চুপচাপ তাকে লক্ষ্য করে। প্রয়োজন ছাড়া খুব একটা কথা বলে না পারুল। মিলনের খাওয়া হয়ে গেলে সবকিছু গুছিয়ে শুতে যায় পারুল। এখনও ওরা এক ঘরে শোয় বটে, কিন্তু এক খাটে শোয় না। বহুদিন হলো পারুল বড় খাটটাকে বিদায় করে দুটো সিঙ্গল খাট এনেছে। কিন্তু আজ সবকিছুই অন্যরকম। লক্ষ্য করেছিল মিলন।

With Best Compliments:-

Luxmi Tea Co. Private Limited

Group Gardens :-

NARAYANPUR T. E.
SHYAMGURI T. E.
MONMOHINIPUR T. E.
MANOBAG T. E.
BHUYANKHAT T. E.
MANU VALLEY T. E.
GOLOKPUR T. E.
PEARACHERRA T. E.
JAGANNATHPUR T. E.
SAROJINI T. E.
FULBARI T. E.
URRUNABUND T. E.
MAKAIBARI T. E.
KENDUGURI T. E.
MORAN T. E.
SEPON T. E.
ATTABARIE T. E.
LEPTKATTA T. E.
ADDABARI T. E.
DIRAI T. E.
MAHAKALI T. E.

17, R. N. Mukherjee Road
Kishore Bhawan, Kolkata - 700 001
Phone No. 2248 4437 / 4227
Fax No. 2243 0177
E-mail : mail@luxmitea.com
Web. : www.luxmigroup.in

একটু যেন উচ্ছলতা পারুলের ভিতর। টেবিলের ওপর নখ দিয়ে আঁকিবুকি কাটতে কাটতে আপন মনেই গুনগুন করে কী যেন গাইছিল। ভাত খেতে খেতে মাঝে মাঝেই চোখ তুলে তাকিয়ে মিলন দেখেছিল, পারুল তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

— আর দুটো ভাত দিই?

— না, না, বেশি হয়ে যাবে।

— তাহলে মাছ নাও আর একটা।

— এখন থাক। একটা খেলাম তো।

— তোমার খাওয়া আজকাল বড্ড কমে গেছে। সারাদিন এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াও। অসুখ বিসুখ বাঁধিয়ে বোসো না যেন। আর শোনো, টাকা দেব, কাল দুটো জামা কিনে নিও। একই জামা পরে রোজ ঘুরে বেড়াও। ভালো লাগে না দেখতে।

খাওয়া শেষ করে এসেই মিলন শুয়ে পড়ে না। একজন বলেছিল, খাওয়ার পর অন্তত এক ঘণ্টা টান টান হয়ে বসে থাকতে হয়। তাহলে খাবার হজম হয়। তাই করে মিলন। খাওয়ার পর একঘণ্টা বিছানায় বসে থাকে। এই সময়টা পারুল ঘরে এসে বিছানার চাদর পরিষ্কার করে। তারপর শুয়ে পড়ে। শোয়ার আগে রোজই মিলনকে বলে— 'আলোটা কিন্তু নিভিয়ে দিও।' আজও মিলন খাওয়ার পর বিছানায় টান টান হয়ে বসেছিল। পারুল ঘরে এলো, কিন্তু বিছানার চাদর পরিষ্কার করল না। বরং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। মিলন এমনিতেই হিসেব বোঝে না। আজকের এই হিসেব কোনোভাবেই মেলাতে পারছিল না। পারুলের যে কী হয়েছে— সেটাই ভেবে কূল পাচ্ছিল না। কিন্তু কিছু একটা হয়েছে সেটা বুঝতে পারছিল। নয়তো এরকম পারুল করে না। পারুল অনেক শান্ত। দীঘির মতো। সেই দীঘিতে হঠাৎ ঢেউ উঠল কেন কে জানে?

আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেকে দেখতে দেখতেই পারুল আচমকাই মিলনকে জিজ্ঞেস করল— আচ্ছা, কানু ঘোষ বুড়ো বট কাটল না কেন? রাস্তাটাই বা ঘুরিয়ে দেবে বলল কেন হঠাৎ?

— কী জানি। কানুর হয়তো ইচ্ছে হয়েছে তাই।

— ধুস্, ইচ্ছে না ছাই। কিছু তো একটা কারণ আছে। নয়তো কানুর মতো একটা লোক এরকম করে!

— কেন করেছে তা আমি জানবো কেমন করে?

— এত ঘোরো চারদিকে, চোখ-কান খোলা রাখতে পারো না?

— রাখি তো, কিন্তু কিছু ধরা পড়ে না যে।

— সারাদিন যে কী ঘোরের ভিতর থাকো কে জানে।

কোনো উত্তর দেয় না মিলন। বসে থাকে চুপ করে। পারুল আরও কিছুক্ষণ আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেকে দেখে। মুখ টিপে হাসেও যেন।

— এই শাড়িটায় কেমন লাগছে আমাকে বল তো?

— ভালোই তো। খারাপ কোথায়?

— এটা কোনো উত্তর হলো? আসলে তুমি ভালো করে দেখইনি।

— না, না, দেখেছি। বাড়িতে ঢুকেই তো দেখলাম।

— পাশের বাড়ির কমলের মা কলকাতা গিয়েছিল। ওকে দিয়ে কিনিয়ে এনেছি।

— ভালো করেছ।

— তোমার ভালো লেগেছে?

— হ্যাঁ।

এবার শব্দ করে হেসে ওঠে পারুল। হাসি থামলে বলে— বড়ো মন রেখে কথা বল তুমি।

মিলন কোনো উত্তর দেয় না। পারুল অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করে মিলনকে। তারপর বলে— বিকেল বেলা মিস্ত্রিরা বলছিল, বটগাছের ভিতরে যে বড়ঠাকুর থাকে সেই নাকি গাছটাকে রক্ষা করেছে।

— হ্যাঁ, গোয়ালপাড়ার লোকেরা তো তেমনই বলছে।

— বড়ঠাকুর কি খুব জাগ্রত?

— কী জানি। গোয়ালপাড়ার লোকেরা খুব মানত করে।

— হ্যাঁ, আজকে তো সবাই খুব ছুটে যাচ্ছে গাছের কাছে। মানত করার ধূম পড়েছে। মিস্ত্রিগুলোও গেল। লাল সুতো বাঁধবে।

— অনেকের মানত তো ফলে। ঝন্টুর যেমন। মানত করেই নাকি ঝন্টুর দোকান এতবড় হয়ে গেল। আজ বলে বেড়াচ্ছিল সবাইকে।

— আমিও আর একবার মানত করব। লাল সুতো বেঁধে আসব কাল।

আচমকাই একটা বিদ্যুৎ ঝলক দেখল মিলন। অনেকদিন পর সিল্কের শাড়ির খসখস শব্দ স্পর্শ করেছে ওর শরীরে। চুড়ির ঠুং ঠাং শব্দ, পমেটমের গন্ধ— সব একাকার হয়ে আসছে। পারুল যেন এখন এক বাঘিনী। ঝাঁপিয়ে পড়েছে মিলনে ওপর। ভয়ে কিছুটা গুটিয়ে যায় মিলন।

— আমাদের এবার একটা খোকা হোক। মিলনের বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে পরম আশ্লেষে বলে পারুল।

সাংঘাতিক একটা কিছু যে ঘটতে চলেছে— ক'দিন ধরেই তা মিলনের মনে হচ্ছিল। পারুলের মুখটা নিজের বুকে চেপে

ধরে মিলন মনে মনে ভাবল— সাংঘাতিক কাণ্ডটা আজই বুঝি ঘটে যাবে।

* * *

দিন কাটে, মাস কাটে। ক্রমে ক্রমে শীত চলে যায়। বসন্ত আসে। কাল দোলপূর্ণিমা। স্কুল থেকে বেরিয়ে মাঠের ধার দিয়ে আসতে আসতে অরণ্য দেখল, বাচ্চারা চাঁচর সাজাচ্ছে। আজ রাতে চাঁচর পোড়াবে। এখন ঠাণ্ডাটা কমে এসেছে। তবু বিকেলের এই সময়টা ঠাণ্ডা পড়তে থাকে। এই ঠাণ্ডাটা বেশ ভালো লাগে অরণ্যর। এটা উপভোগ করার জন্যই স্কুল থেকে বেরিয়ে এই রাস্তাটুকু হাঁটে অরণ্য। সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে হাঁটে। সেই নতুন পল্লি অবধি। তারপর সাইকেলে ওঠে। পাশে দু-চারটে চেনাশোনা মানুষের সঙ্গে দেখা হয়। অল্প কুশল বিনিময় হয়। এছাড়া নিজের মনেই পথ হাঁটে অরণ্য। নিজের মনে পথ হাঁটতে ওর ভালোই লাগে। কত কী ভাবতে ভাবতে হাঁটা যায়। কথা হলে তো সেসব ভাবনা আর আসে না মাথায়। তখন সব জট পাকিয়ে যায়। কাজেই রাস্তায় কারোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে দু-একটা কথার পরই অরণ্য তাড়াতাড়ি নিজের পথে পা বাড়ায়। এতে লোকে ওকে কী ভাবলো, তা নিয়ে কিছু যায় আসে না অরণ্যর। ওর একলা ভাবনার মতো একটা সময় থাকতে হবে, সেটাও তো বুঝতে হবে সবাইকে।

হাঁটতে হাঁটতে নতুনপল্লির বাঁকটার মুখে এসে পড়ল অরণ্য। এখানে পাশাপাশি দুটো পলাশ গাছ রয়েছে। দুটো গাছেই ঝেঁপে ফুল এসেছে। কিছু ফুল মাটিতেও ঝরে পড়েছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পলাশ ফুলগুলো দেখে। মাটি থেকে দুটো ফুল কুড়িয়ে নিয়ে পকেটেও পোরে। কাল সকালে নতুনপল্লির মেয়েরা এই ফুল মাথায় গুঁজবে। কেউ বা আবার ফুল কুড়িয়ে নিয়ে বিক্রি করবে কলকাতা থেকে দোল দেখতে আসা রমণীদের। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে পলাশ গাছ দুটোকে দেখে অরণ্য। তারপর আবার হাঁটা শুরু করে। এই বাঁকটা ঘুরলেই সেই বাড়িটা। বাড়িটা এখন শূন্য। ওই বারান্দায় রোজ বিকেলে এখন আর কেউ এসে দাঁড়ায় না। বাড়ির বাগানের গাছগুলো নিজেদের খেয়ালে বেড়ে উঠছে। নিজেদের খেয়ালেই বাগানে ফুল ফুটছে। বাড়ির সামনের কৃষ্ণচূড়া গাছটা যেন নিজের খেয়ালেই এখনও বারান্দার ওপর ঝুঁকে পড়ে কার সঙ্গে কানে কানে কথা বলে। অরণ্য বাড়িটার সামনে এসে একটু থমকে দাঁড়ায়। একবার তাকায় শূন্য বারান্দার দিকে। বুঝতে পারে, বাড়ির ভিতরে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। বেড়ার ধারে বেড়ে ওঠা গুলঞ্চ গাছটায় হাত বোলায়। কার যেন স্পর্শ লেগে আছে এখানে। লোকটা একটু খ্যাপাটে ছিল ঠিকই। লোকটাকে রহস্যময় মনে হতো অরণ্যর। তবে লোকটা ভালো ছিল। কেন যে চলে গেল! কী তাড়া ছিল ওর? আসলে কিছু কিছু লোক এরকমই হয়। কথা বলতে বলতে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল— যাই। তারপরই হনহন করে রওনা দেয়। বুড়োটাও এরকমই ছিল— ভাবল অরণ্য।

আজকে আর হাঁটবে না। সাইকেলে উঠে প্যাডেলে চাপ দিল।

* * *

চায়ের দোকান খুলে বিকেল থেকে একাই বলেছিল সংঘমিত্রা। কাল দোল। আজ কলেজ তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেছে। কলেজে ছেলেমেয়েরা আজ দোল খেলেছে। ইনুদি একটু আবির মাখিয়ে দিয়েছিল ওর গালে। বাড়িতে এসে মুখ ধুয়েছে। তবু হালকা আবিরের দাগ লেগেই রয়েছে। একটু পরেই সন্ধে হবে। আকাশে গোল চাঁদ উঠবে। পূর্ণিমার চাঁদ। সোনাঝুরি জঙ্গল ভেসে যাবে সেই আলোয়। সংঘমিত্রার ইচ্ছা হচ্ছে, তখন একটু হেঁটে আসবে সোনাঝুরির দিকে। সংঘমিত্রা চাইছে না আজ ওর দোকানে কোনো খদ্দের আসুক। আজ মনটা আনচান করছে। আজ কাউকে চা বিক্রি করতে ইচ্ছে করছে না।

রাস্তার দিকে গেটটা ঠেলে যে কেন ভিতরে ঢুকছে। শব্দ পেয়ে সংঘমিত্রা মুখ তুলে তাকালো। অরণ্য। সাইকেলটা গেটের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে বাগান পেরিয়ে হেঁটে আসছে। সংঘমিত্রা আনমনেই নিজের কপালের চুলটা ঠিক করে নিল। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে নিল একবার। দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

দরজার কাছে এসে সংঘমিত্রাকে দেখে একটু হাসল অরণ্য। বললো— একটু চা খেতে এলাম।

— আজ তো চা হবে না।

— তাহলে আর কী? চলি...

— না, যাবেন না। আমি এখন সোনাঝুরির দিকে হাঁটতে যাব। আপনার সঙ্গে।

অরণ্য দেখল, একটা অত্যাশ্চর্য কমলা আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। চরাচর ভেসে যাচ্ছে সেই আলোয়। বুড়োর বাড়ির জানালা থেকে এরকমই আলো ও দেখেছিল একদিন। বুড়ো বলেছিল, মানুষের জীবনে এই আলো দু-একবারই আসে। আর তখনই মনের ইচ্ছেটা মুখ ফুটে বলে ফেলতে হয়।

মনের ইচ্ছেটা আজ মুখ ফুটে বলে ফেলতেই হবে— ঠিক করে নেয় অরণ্য। ■

সন্ধ্যাবেলার কাব্য

মালিনী চট্টোপাধ্যায়

নবোদিত সূর্য পিয়াল গাছের আড়াল থেকে রত্নাকে দেখছে। যেদিনই এসময় গাছে জল দেয় রত্না, সূর্য দেখে। নতুন ফুল ফুটলে রত্নার খুব আনন্দ হয়। আজও দুটো লিলি, একরাশ দোপাটি আর নীল শালুক ফুটেছে। কিন্তু রত্নার মন কাল রাত থেকে ভালো নেই। একমাত্র সন্তান রনিত আর বৌমা গুঞ্জা এখন আমেরিকায়। চাকরি করছে। বহুদিন আসে না। গতমাসে রত্নার টাইফয়েড হয়েছিল। সে ফাল্গুনকে বলেছিল রণিতকে খবর দিও না। অকারণে চিন্তা করবে।

— বেশ। তুমি একটু সেরে ওঠো। তারপর খবর দেব।

সে একটু সেরে উঠতে রনিতকে খবর দিয়েছে ফাল্গুন।

সেদিনই সন্ধ্যায় রত্নার ফোন বেজে উঠেছে। ওপ্রান্তে রনিতের উদ্বিগ্ন স্বর— মা! এখন কেমন আছো?

সে বলেছে— ভালো! একবার দেশে আয়। যদি হঠাৎ মরে যাই তোর সঙ্গে আর দেখা হবে না।

— যাঃ! মরবে কেন? তোমার কী-ই বা বয়স। এখনও ষাটও হয়নি।

— তাও আয়। কতদিন তোকে দেখি না।

— যাব। গুঞ্জাও তোমার জন্য চিন্তা করছে।

তারপর থেকে রত্না রনিতের জন্য

অপেক্ষা করেছেন। ফোনে শুধু বলেছে— চেষ্টা করছি, যাব।

ফুল গাছে জল দেওয়া হয়েছে। রত্না বাড়ির বাঁ প্রান্তে ফল বাগানের দিকে যান।

রনিতের ছেলেবেলার সঙ্গী রত্না। তার হাত ধরে ছোট ছোট পায়ে রনিত বাগানে ঘুরে বেড়িয়েছে। তারপর সে হাত ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গেছে। এতদূরে যে মায়ের অসুস্থতার খবরেও আর আসে না। মেজদি সেই কবে বলেছিল— বড় হলে ছেলে পর হয়ে যায়।

— আয়, আয়, আয়।

রত্না চোখ তুলে তাকাল। তার বাড়ির উল্টোদিকের একটা বাড়ির পর হলুদ রঙের বাড়িটা থেকে লগ্না বিড়ালকে ডাকছে। কালো কালো উজ্জ্বল চোখ, সুন্দর ঠোঁট, ফরসা মুখে লালচে আভা। রত্না মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকেন। এক ছেলে আর এক মেয়ে লগ্নার। ওর ছেলে, মেয়ে কী সুন্দর ওর কাছেই রয়েছে।

পিছনে পায়ের শব্দ। রত্না ফিরে তাকান। ফাল্গুন।

ফাল্গুন বলে— গাছে জল দিচ্ছ কেন? আজ মিহির আসবে না?

রত্না গাছে জল দিতে দিতে বলে — না! ফোনে জানাল।

— আমাকে বললে না কেন? তুমি কি এত জল দিতে পারবে? আমাকে দাও। আমি দিচ্ছি।

ফাল্গুন ওর হাত থেকে পাইপটা নেওয়ার জন্য হাত বাড়ায়।

রত্না পাইপ দেয় না। বলে— কাজের মধ্যে থাকলে সব ভুলে থাকা যায়, জানো! কতদিন রনিতকে দেখি না।

ফাল্গুন নীচুগলায় বলে— ও এখন বড়ো হয়েছে। সংসার করছে। ওর নিজস্ব জীবন রয়েছে। ওকে ওর মতো থাকতে দাও। আমরা আমাদের মতো থাকি। কত আনন্দের উপকরণ ছড়িয়ে রয়েছে চারপাশে। তুমি তো আগে গান শুনতে। নিজেও আপনমনে গান গাইতে। এখন আর গান করো না কেন?

— ও কাছে থাকলে, নয়তো মাঝে মাঝে ওর দেখা পেলে সব ভালো লাগে, বাগান করতে, গান শুনতে, রান্না করতে। নইলে আর কিছু ভালো লাগে না।

ফাল্গুন বলে— আমি বাজারে যাচ্ছি। বেশি পরিশ্রম করো না। বড়ো হলে সন্তান পর হয়ে যায়।

— সাবধানে যেও।

সামান্য পরে গাছে জল দেওয়া শেষ হয়। রত্না ঘরে আসে।

বেতের আসবাব। এক কোণে বাহারি টবে ইনডোর প্ল্যান্ট। দেওয়ালে রনিত আর গুঞ্জার বিয়ের ছবি।

রত্না লীলাকে বলে— লীলা, একটু চা কর।

— করছি মাসিমা।

তখনই কলিংবেল বেজে ওঠে। রত্না লীলাকে বলে— তুই চা কর। আমি দেখছি।

দরজা খুলে সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। সামনে যে তরুণটি দাঁড়িয়ে সে আঠাশ বছর আগে রত্নার কোলে এসে রত্নার জীবনকে লাবণ্যে ভরিয়ে দিয়েছে। তার পাশে গুঞ্জা, সামান্য কিছুদিন আগে এসে যে রত্নার মেয়ে না হওয়ার দুঃখ ভুলিয়েছে।

রত্না হৈহৈ করে ওঠে— আজ আসবি জানাসনি তো। আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে। আয়, ঘরে আয়।

দুজনেই নীচু হয়ে তাকে প্রণাম করে। রনিত ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে— ভেবেছিলাম তোমাদের সারপ্রাইজ দেব।

দু'জনে লাগেজ রেখে সোফায় বসে। রত্না ব্যস্ত হয়ে বলে— দাঁড়া তোদের জলখাবারের ব্যবস্থা করছি। ছুটি পেলি তাহলে?

— ছুটি পাইনি মা, চাকরিটা ছেড়ে দিলাম।

বহুদিন পর এত আনন্দ হচ্ছে রত্নার। রনিতের যা রেজাল্ট নিশ্চয়ই এখানে কোনো ভালো চাকরি পেয়ে যাবে।

পরক্ষণেই রত্নার মন মেঘলা হয়ে গেল। অনেক টাকা মাইনে পেত। ওদের নিশ্চয়ই কষ্ট হবে।

সে বলে— আমার জন্য চাকরি ছেড়ে দিলি? আমি তো সুস্থ হয়ে গেছি।

— তোমার জন্য তো বটেই, তাছাড়া দেশের কথাও খুব মনে হতো মা। আমেরিকা সুন্দর। কিন্তু এদেশের মতো সুন্দর দেশ কোথাও নেই।

রত্নার খুব ভালো লাগল। আমেরিকায় গিয়েও রনিত দেশকে ভোলেনি তাহলে!

সে বলে — দুপুরে কী খাবি বল দু'জনে?

রনিত হেসে বলে— মাছ। কতদিন গলদা চিংড়ির মালাইকারি খাই না।

গুঞ্জাও হাসে— মুড়িঘণ্টও অনেকদিন খাই না।

রত্না হাসতে হাসতে বলে— সব হবে, গলদা চিংড়ির মালাইকারি, মুড়িঘণ্ট, দই মাছ, মাংস সব। আগে তোদের বাবাকে ফোন করি। বাজারে আছে, তারপর তোদের জলখাবারের ব্যবস্থা করব।

রত্না ফাল্গুনকে ফোন করেন। তারপর ব্যস্ত পায়ে রান্নাঘরে যায়।

বিকেলে লগ্না এলো— বৌদি, রনিত এসেছে?

— হ্যাঁ গো এসো!

লগ্না ব্যাগ থেকে একটা টিফিন ক্যারিয়ার বার করে এগিয়ে দেয়। বলে— ও আজ গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিল। পুকুরের মাছ নিয়ে এসেছে।

রত্না হাসিমুখে টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে

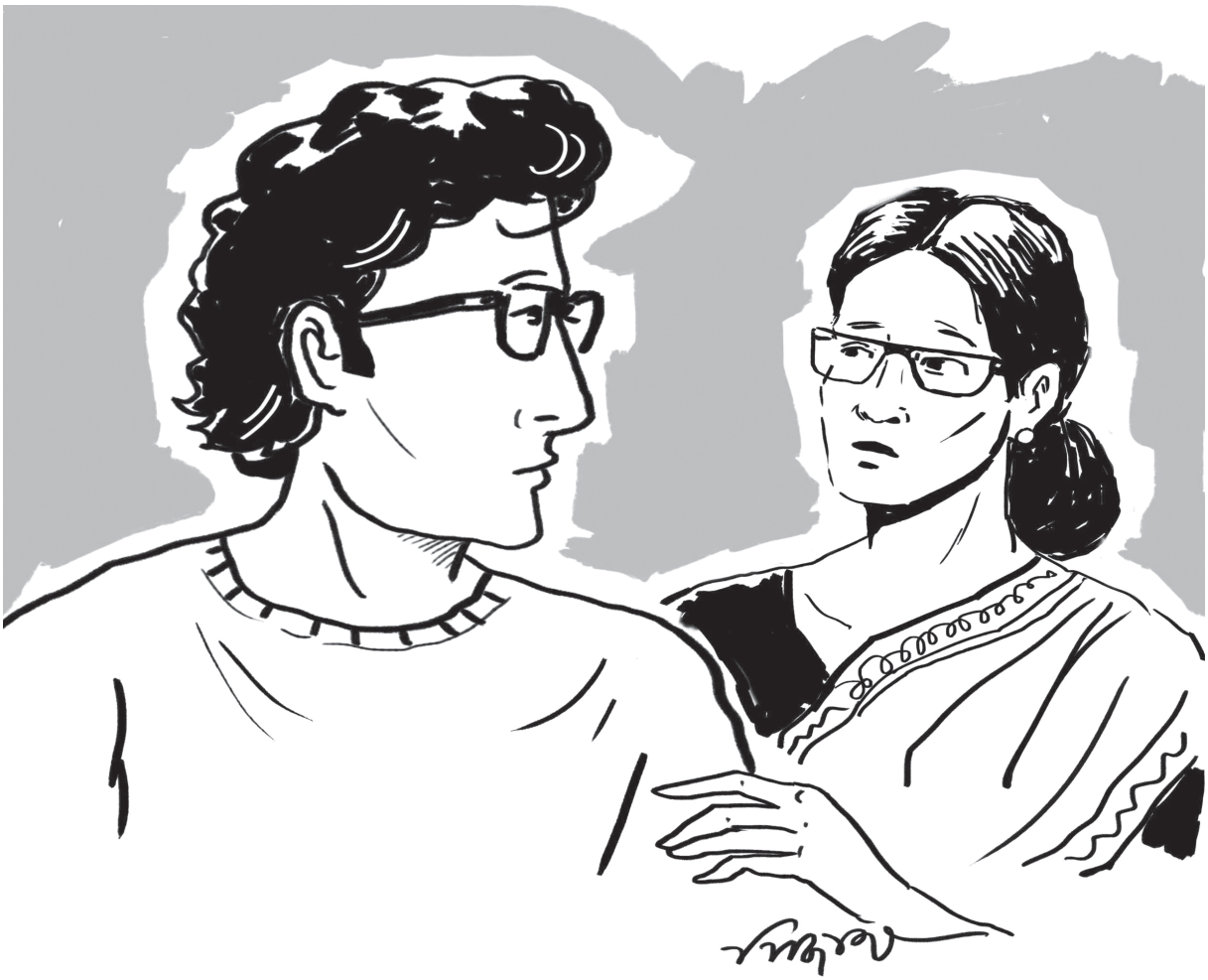

বলে— এসো, ঘরে এসো।

লগ্না ওর পিছু পিছু ঘরে আসে। রনিতকে বলে— রনিত, কতদিন থাকবে?

রনিত বলে— আর ওদেশে যাবো না বৌদি। এখানেই থাকব।

— খুব ভালো ডিসিশন নিয়েছ। মায়ের কত কষ্ট হয়।

চারজনে আড্ডা জমে ওঠে। চারজনের বয়সের ব্যবধান বিস্তর। কিন্তু মন সবার সমান রঙিন।

ফাল্গুনও এসে ওদের সঙ্গে যোগ দেয়।

রনিত বলে— সিনেমাহলে কোনো ভালো ছবি এসেছে বৌদি? চলুন, সবাই মিলে দেখে আসি। কতদিন হলে গিয়ে ছবি দেখি না।

লগ্না বলে— টেনিদার একটা ভালো ছবি এসেছে তো গীতাঞ্জলিতে। 'কম্বল নিরুদ্দেশ'।

রত্না হৈহৈ করে ওঠে— কালকেই সবাই মিলে দেখতে যাব চলো।

রনিত বলে— কাল হবে না, মা। পরশু যাব। সায়কদাকেও বলবেন, বৌদি!

— বলব, তুমি এসেছ, আমরা যে কী খুশি হয়েছি।

রত্না হাসিমুখে বসে থাকে। লগ্নাকে, ওর ছেলেমেয়ে বরকে কত আপন মনে হচ্ছে রত্নার। শুধু ওরা নয়, সারা পাড়ার লোককে পরমাত্মীয় মনে হচ্ছে। নিজে সুখী হলে কী সবাইকে সুখী দেখতে ইচ্ছা করে? রত্না মনে মনে ঈশ্বরকে বলে— আমার জীবন সুখে ভরিয়ে দিয়েছ, সব সৎ লোককে সুখী কর ভগবান! বলেই ভাবে, ঈশ্বর তো চিরকাল তাই করেন। সৎ মানুষের চেয়ে সুখী আর কে আছে?

আরও কিছুক্ষণ গল্প করে লগ্না চলে যায়।

রনিত বলে— মা, তোমাকে বলা হয়নি। কাল একবার কলকাতা যাব।

— কাল? কেন?

— একটা ইন্টারভিউ আছে, আরও কিছু কাজ আছে।

— কী কাজ?

— পরে বলব।

— রত্না ক্ষুব্ধ হয়ে বলে— আমাকে বলা যাবে না?

রনিত হাসে— তোমাকে বলা যাবে না, এমন কোনো কথা আছে?

— তবে?

রনিত সামান্যক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে— আমেরিকায় এই ক'বছর অনেক টাকা রোজগার করেছি। আমি অনেক খেলনা, শাড়ি আর পোশাক কিনেছি। সামনে দুর্গাপুজো আসছে। তারপীঠের ভিখিরিদের অবস্থা দেখেছো? কিংবা কলকাতার? ওদের বুঝি শখ হয়

না, পুজোয় নতুন পোশাক পরার? ওদের বাচ্চাগুলোর কোনো খেলনা নেই। তাই ঠিক করেছি কাল কলকাতা গিয়ে আরও কিছু জামাকাপড় আর খেলনা কিনব। তারপর ওদের উপহার দেব।

রত্না কী বলবে ভেবে পায় না। নিঃশব্দে চেয়ে থাকে।

গুঞ্জা বলে— আমি তোমার কাছে থাকব।

রনিত বলে— আমার কিছু বন্ধুবান্ধবের সঙ্গেও ফোনে কথা বলেছি। সকলেই প্রচুর উপার্জন করে। প্রত্যেকে যদি দুশো টাকা করেও দেয়, পুজোর সময় অনেক ভিক্ষাজীবীর মুখে হাসি ফুটবে। আরও অনেক পরিকল্পনা আছে আমার। আগে একটা চাকরি জোগাড় করি।

রত্নার খুব আনন্দ হচ্ছে। মনে মনে বলে— বড়ো হলে ছেলে পর হয় না ফাল্গুন। বন্ধু হয়ে ওঠে। এ ছেলে বিদেশে গিয়েও দেশকে ভোলেনি। মাকে ভোলেনি। দেশের ভিখিরিদেরও ভোলেনি।

বাগানে ফুল ফুটলে রত্নার আনন্দ হয়। কী সুন্দর দুটো ফুল ফুটেছে রত্নার জীবনে। ফুলের চেয়েও সুন্দর ওদের মন। অনাবিল সুখে রত্নার মন ভরে যাচ্ছে। ▮

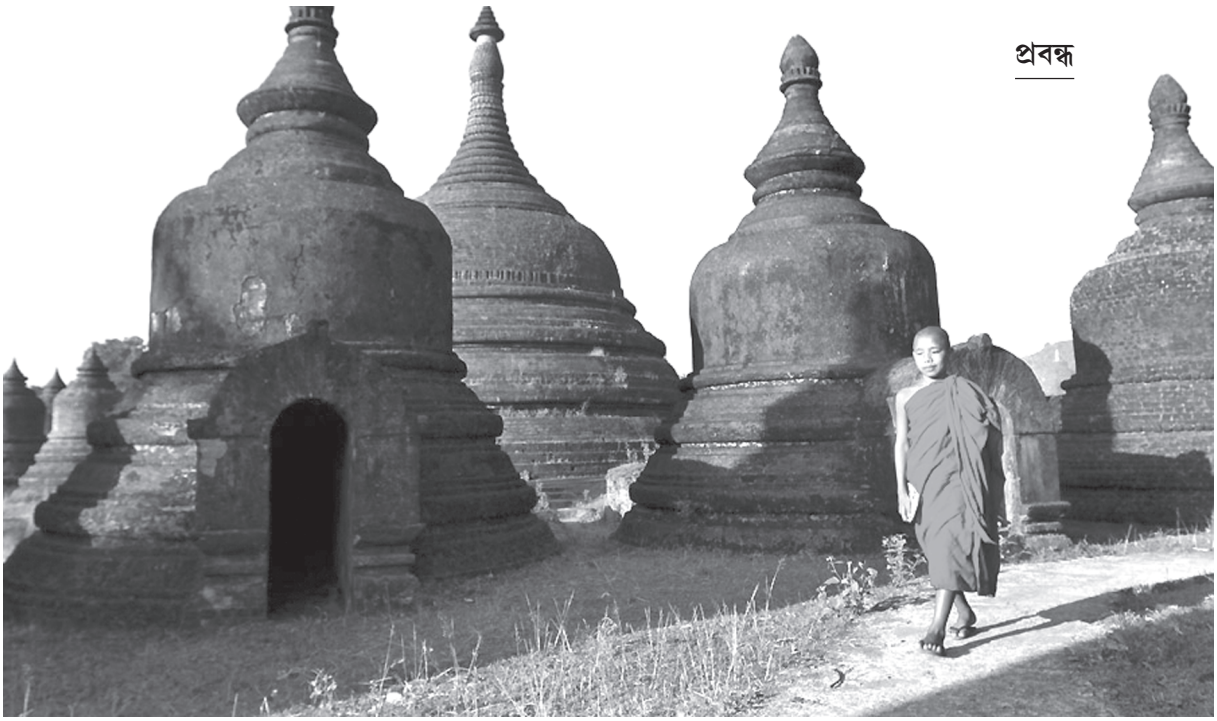

প্রবন্ধ

রাখাইন প্রদেশের ম্রক-উ প্যাগোডা।

উনিশ শতকের কলকাতায় মগ মন্দির ও তার দেউলিয়া পুরোহিত

অরিন্দম মুখোপাধ্যায়

১৭৬৮ শকের (১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দ) শ্রাবণ মাস। কার টেগোর অ্যান্ড কোম্পানির অফিস থেকে বৃষ্টিস্নাত কলকাতায় দুই ভাই ঘোড়ার গাড়িতে জোড়াসাঁকোর ভদ্রাসনের উদ্দেশে রওনা হলেন। কোম্পানির লিকুইডিশন ঘোষণা করার পর উত্তমর্ণদের সঙ্গে দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ এবং গিরীন্দ্রনাথের এটিই ছিল প্রথম বৈঠক। ইংল্যান্ডে পিতার মৃত্যুর পর বিপুল ঋণের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে প্রায় দেউলিয়া খাতকে পরিণত হয়েছিলেন তাঁরা। পাওনাদারদের সঙ্গে সেদিনের বৈঠক ভালোভাবে মিটলেও দেবেন্দ্রনাথের মনের ভয় তবু কাটেনি। বাড়ি ফেরার পথে দেবেন্দ্রনাথ তাই তাঁর ছোট ভাইকে বলেছিলেন, 'ঈশ্বর ও ধর্ম আমাদিগকে রক্ষা করুন। যেন ইনসলভেন্ট আইনে আমাকে মস্তক দিতে না হয়।'

সেই সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এই দেউলিয়া বা ইনসলভেন্ট হওয়ার ঘটনা যেমন প্রভূত ঘটত, তেমনই ভয়াবহ ছিল তার পরিণামও। ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্সের ডেভিড কপারফিল্ড (১৮৫০) খ্রি.) বা হার্ড টাইমস্ (১৮৫৪ খ্রি.)-র কথা মনে পড়ছে? ডিকেন্স তাঁর এই উপন্যাসগুলিতে দেউলিয়া মানুষজনের প্রতি অবিচার-অত্যাচারের কথা মর্মস্পর্শীভাবে তুলে ধরেছেন। ঔপন্যাসিকের এইসব কাহিনি অনেকটাই তাঁর

নিজ জীবনসম্ভূত। কারণ ডিকেন্সের বাবাকেও তাঁর বাল্যকালে দেউলিয়া অবস্থায় জেলে যেতে হয়েছিল। যে কারণে ছেলেবেলায় প্রথাগত পড়াশোনা বন্ধ করে ডিকেন্সকে কারখানার কাজে যোগ দিতে হয়। সেই যুগে দেবেন্দ্রনাথ বা ডিকেন্সের মতো বহু মানুষেরই জীবন বদলে যেত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দেউলিয়া ঘাতক আইনের নানা অমানবিক ধারা-উপধারার জাঁতাকলে।

সম্প্রতি উনিশ শতকে কলকাতায় স্থাপিত 'মোকাম কলকাতার গোত্রহীন কব্জ দারানের উপকারার্থে আদালত' বা 'দ্য কোর্ট ফর দ্য রিলিফ অব ইনসলভেন্ট ডেটরস অ্যাট ক্যালকাটা'তে পরিচালিত একটি মামলার কিছু নথি আমাদের হাতে এসেছে। এই মূল্যবান নথিগুলি যে কেবলমাত্র সে যুগে কলকাতায় স্থাপিত দেউলিয়া ঘাতক আদালতের কাহিনিই উন্মোচিত করেছে তাই নয়, এর মাধ্যমে আমরা তৎকালীন কলকাতার সামাজিক ইতিহাসের ও অধুনা অজানা এক অধ্যায় সম্পর্কে অবগত হয়েছি।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকালে ভারতের তিন প্রেসিডেন্সি শহর কলকাতা, বোম্বে এবং মাদ্রাজে প্রথম দেউলিয়া ঘাতক আইন চালু হয়। ১৮০০ সালে ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় জর্জের আমলে গৃহীত ভারত শাসন আইনের ২৩ এবং ২৪ ধারা ছিল এই বিষয়ে। ফোর্ট উইলিয়ামের অন্তর্গত সুপ্রিম কোর্টকে কলকাতায় এই সংক্রান্ত মামলা পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ভারতের জন্য দেউলিয়া বিষয়ক এই আইনটি ব্রিটেনের ১৭৫৯ সালের আইনের অনুকরণে তৈরি হয়েছিল।

১৮০০ সালে এই বিষয়ে প্রাথমিক আইন তৈরি হলেও বাস্তবিক ১৮২৮ সালে এই আদালতের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। তৎকালীন সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতি এই আদালতের প্রধান ছিলেন এবং প্রথম থেকেই এই আদালতের একটি স্বতন্ত্র, পৃথক অস্তিত্ব বজায় ছিল। দেউলিয়া বিষয়ক আদালত বোম্বে এবং মাদ্রাজ শহরে প্রয়োজন অনুসারে বসত। কিন্তু কলকাতায় এই আদালত সাধারণত প্রতি মাসের প্রথম শনিবার বসত। ১৮২৮ সালের এই আইনে প্রথম বড় পরিবর্তন আসে ১৮৪৮ সালে। যে আইনে ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্পদের পরিমাণের ভিত্তিতে নিয়ম পৃথকীকরণের সংস্থান রাখা হয়। এরপর এই আইনটির ভিতর অল্প-বিস্তর পরিবর্তন মাঝে মাঝে এলেও আলোচ্য আইনটির আয়ু ছিল দীর্ঘ এবং আইনটি ১৯০৯ সালে এই সংক্রান্ত পরিবর্তিত আইন লাগু হওয়ার আগে পর্যন্ত এদেশে বলবৎ ছিল। বর্তমানে আলোচ্য দেউলিয়া খাতক আদালতের পূর্বে উল্লিখিত মামলার নথিগুলি ১৮৫২ সালের। অর্থাৎ এই আলোচ্য মামলাটি পরিচালিত হয়েছিল মহারানি ভিক্টোরিয়ার একাদশ রাজ্যবর্ষ ১৮৪৮ সালের আইন অনুসারেই।

আলোচ্য নথিগুলি থেকে জানা যায়, জনৈক লক্ষ্মীচরণ ঠাকুরের কথা। যার বসবাস ছিল মোকাম কলকাতার মিয়াজান্নে গলিতে। এই স্থানে তৎকালে একটি মগ বা বার্মিজ মন্দির ছিল। এই মন্দিরেরই পূজারি ছিলেন লক্ষ্মীচরণ। আদালতি নথিতে লক্ষ্মীচরণকে গাঁউ (Kowan) (কমা) পূজারী (Priest) বলা হয়েছে। কলকাতা গেজেটে এই মামলা সংক্রান্ত আদেশের যে সারাংশ প্রকাশিত হয়, তাতে আবার লক্ষ্মীচরণকে গাঁউ অথবা প্রিস্ট বলা হয়েছে। বার্মিজ ভাষায় গাঁউ শব্দের অর্থ প্রধান বা চিফ। কোনোভাবেই 'পূজারী' নয়। তাই আদালতি নথিতে গাঁউ, পূজারী অথবা পূজারীর প্রতিশব্দ হিসেবে গাঁউয়ের ব্যবহার আভিধানিক অর্থে সঠিক নয়। মনে হয় বার্মিজ শব্দ গাঁউয়ের সঠিক অর্থ না জানায় ইংরাজ আদালতের নথিতে এই বিভ্রান্তি।

লক্ষ্মীচরণের এই মামলাটি প্রথম আদালতে ওঠে ১৮৫২ সালের ৩ জুন। মামলা সংক্রান্ত নথি থেকে জানা যায়, জনৈক মোহরচাঁদ বাবুর্চির অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া খাতক লক্ষ্মীচরণ সেই সময় কলকাতার সাধারণ কারাগারে বন্দি ছিলেন। সেই কারণে ঋণগ্রস্ত লক্ষ্মীচরণ বন্দিদশা থেকে মুক্তিলাভের আশায় খাতক আদালতে আবেদন করেন।

উপরিল্লিখিত তথ্যগুলি নিঃসন্দেহে তৎকালীন সামাজিক ইতিহাসের এক অজানা অধ্যায়ের প্রতি আলোকপাত করে। কলকাতার সূচনালগ্ন থেকেই এই নগরের বিশ্বজনীন আবেদন সার্বজনীন। পৃথিবীর নানা দেশের নানা জাতির মানুষ চিরকালই এই শহরকে আপন বলেই মনে করেছে। তাই মগ জনগোষ্ঠীও এই শহরের আকর্ষণে এখানে বসবাস করতে আসবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

এই সুযোগে মগ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বাংলার সম্পর্কের ইতিহাস নিয়ে একটু চর্চা করা যেতে পারে। বাংলা ভাষার একটি প্রচলিত প্রবাদ হলো 'মগের মুলুক'। অরাজকতা বোঝাতে অনেক সময়ই এই প্রবাদ আমরা ব্যবহার করে থাকি। এখন প্রশ্ন, কারা ছিল মগ আর কোথায়ই বা ছিল তাদের মুলুক? ইতিহাস বলছে, এই মগের মুলুকের উত্তর সীমানা হলো উত্তর-পূর্ব ভারত ও বাংলাদেশ। দক্ষিণ ও পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর, উত্তর-পশ্চিমে বাংলাদেশ এবং পূর্বে ব্রহ্মদেশের সঙ্গে সীমানা নির্ধারণকারী রাখাইন পর্বতমালা। এই ভূখণ্ডের প্রাচীন নাম হলো 'রাখাই'। যার উৎপত্তি সংস্কৃত শব্দ রক্ষ এবং যক্ খো (পালি) বা যক্ষ (সংস্কৃত) শব্দ থেকে।

এই দেশের মানুষেরা নিজেদের 'রাখাঁই তেজ্ঞী' বলে অভিহিত করতেন। মধ্যযুগে চট্টগ্রামবাসীরা রাখাঁই-র রাজধানী ম্রিয়া-উ কে রোসাং বলতেন। ব্রিটিশ শাসনকালে উচ্চারণের আরও পরিবর্তনে এই অঞ্চল 'আরাকান' নামে পরিচিত হয়। ব্রিটিশ অভিধা ছেড়ে বর্তমানে এই অঞ্চল রাখাইন নামে পরিচিত। খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ ২৬৬৬ থেকে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় রাখাইন

কম-বেশি একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্মী রাজা বোধফয়া (১৭৮২-১৮১৯ খ্রি.) স্থায়ীভাবে এই অঞ্চলকে জয় করে ব্রহ্মদেশে সংযুক্ত করেন।

রাখাইনের প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থ 'রাজোয়াং' থেকে জানা যায়, ১৪৬ খ্রিস্টাব্দে মগধের জনৈক সান্দাতুরিয়া (চন্দ্রসূর্য) নামক এক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এই অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করেন। উত্তর রাখাইন এবং বাংলাদেশের চট্টগ্রামের বৃহৎ অংশ যার অন্তর্ভুক্ত ছিল। চন্দ্রসূর্য বংশের প্রথম রাজধানী ছিল রাখাইনের ধান্যবতী। মগধ আগত এই জনগোষ্ঠীই পরবর্তীকালে মগ বা মঘ নামে পরিচিত হয়। এই অঞ্চলের মোঙ্গলয়েড নৃ-গোষ্ঠীর সঙ্গে মগধের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও কালক্রমে বাঙালিরা রাখাইনের সকল অধিবাসীদেরই মগ নামে অভিহিত করতে থাকে। সম্ভবত রাখাইনের সর্বত্র বৌদ্ধধর্মের প্রসারই এর মূল কারণ ছিল। অপর একটি মতে মগ শব্দ এসেছে মোঙ্গল নৃগোষ্ঠী থেকে। এই মতটি আমাদের কাছে খুব একটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। পণ্ডিতদের মতে, মগ শব্দটি একটি বাংলা শব্দ। রাখাইন বা মায়ানমারের অভিধানে এই শব্দটি কোনোদিনও অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

মধ্যযুগে বাংলার সঙ্গে রাখাইনের সম্পর্কের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। এই সময়ে ক্ষমতা দখলের সাপ-লুডো খেলায় কয়েক শতক জড়িয়ে পড়ে ব্রহ্ম-সম্রাট, রাখাইন-রাজ, গৌড় রাজ-দরবার, দিল্লির মুঘল শাসকবৃন্দ, এমনকি পর্তুগিজ জলদস্যুরাও। খ্রিস্টাব্দ পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত মোঙ্গলয়েড মগেরা কখনো আলাদা কখনো পর্তুগিজদের সঙ্গে মিলে বাংলার সমুদ্রোপকূলবর্তী জেলা সমূহে জলদস্যুরূপে ভীষণ রকম উপদ্রব করেছিল। পর্তুগিজরা মগেদের সহায়তায় বাংলার উপকূলে আক্রমণ চালিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের দাস হিসেবে বন্দি করে ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজধানী বাটাভিয়ায় বিক্রি করতো।

মগেরা নিজেদের প্রয়োজনেও বাঙালি ক্রীতদাসদের ব্যবহার করতো বলে জানা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আরাকানের একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী হলো কালাডান। বার্মিজ ভাষায় 'কালা' শব্দের অর্থ বিদেশি ভারতীয় আর 'ডন' শব্দের অর্থ স্থান। অর্থাৎ বিদেশিদের বাসস্থান। আসলে এই কালাডান নদীর উপত্যকায় মগেরা বাংলাদেশ থেকে দাস হিসেবে অপহরণ করে আনা মানুষদের ধান উৎপাদনের জন্য ভূমিদাস হিসেবে ব্যবহার করতো। বিদেশি দাস-ভারতবাসীর আবাসভূমি বলেই মগেরা এই নদীর নাম দেয় কালাডান। তাই এইসব কারণে বাঙালির মোঙ্গলয়েড মগেদের প্রতি অশ্রদ্ধা থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বাংলা ভাষা সাহিত্যের মতো কিছু বিষয়ে তাদের অবদানও স্মরণীয়। সে কথাও আমাদের ভুলে গেলে চলবে না।

বাংলার প্রথম নিয়মমাফিক আদমসুমারি হয় ১৮৭২ সালে। এইচ বেভেরেলি সাহেবের সংকলিত এই রিপোর্ট থেকে জানা যায়, অবিভক্ত বাংলায় সেইসময় মগ অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল ৫৬ হাজার ছশো সতের জন। মগ জনসংখ্যার বেশিরভাগই পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, বাখরগঞ্জের অধিবাসী ছিলেন। চব্বিশ পরগনা জেলায় এই সংখ্যা ছিল ২৩২ জন। কলকাতার জনসংখ্যাও এই চব্বিশ পরগণার ভিতরই ছিল। তাই একথা ধরে নেওয়া যেতেই পারে, জীবিকার কারণে এই ২৩২ জন মগ অধিবাসীর বেশিরভাগই থাকতেন দেশের রাজধানী কলকাতাতেই।

এখন প্রশ্ন হলো, এই মগ জনগোষ্ঠী কলকাতার কোন অঞ্চলে থাকত আর কী-ই বা ছিল তাদের জীবিকা? এ জি রুস্যাগ কোম্পানির ১৮৫৬ সালের 'দ্য নিউ ক্যালকাটা ডিরেক্টরি ফর দ্য টাউন অব ক্যালকাটা'র সূত্রে জানা যায়, মগেরা এই সময় মধ্য কলকাতার বিভিন্ন স্থানে বসবাস করতো। এই সকল অঞ্চল প্রথম থেকেই মিশ্র জনগোষ্ঠীর আবাসস্থল। বাসস্থান হিসেবে মগেদের

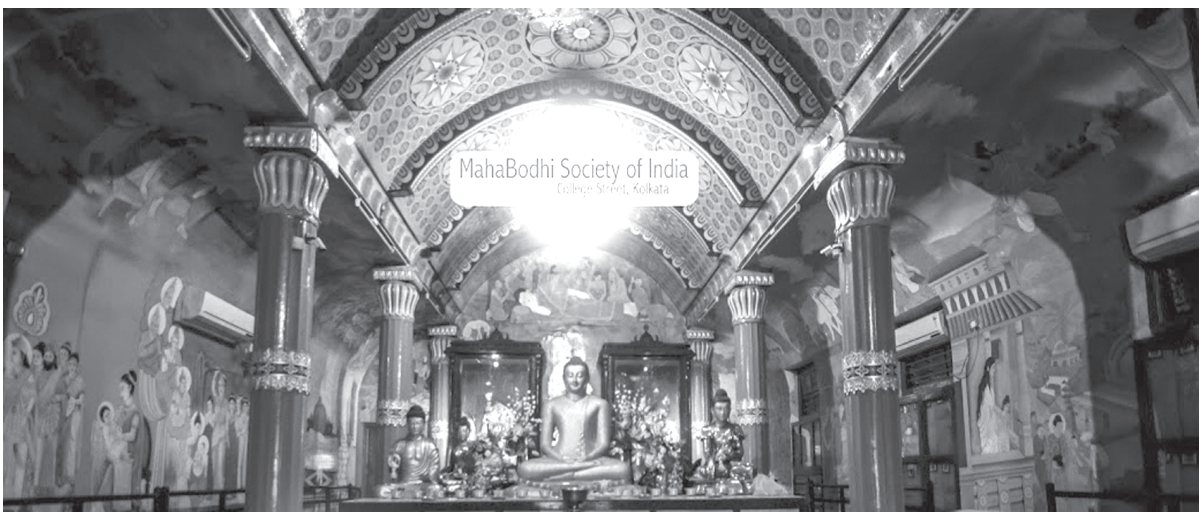

মহাবোধী সোসাইটি, কলকাতা।

With Best Compliments from :-

A

Well

Wisher

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank - Kolkata
Branch : **Shakespeare Sarani**

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

দ্বারকানাথ ঠাকুর

কলকাতার এই অঞ্চল বেছে নেওয়ার পেছনে তাদের কর্মক্ষেত্রের অবস্থানই গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে মনে হয়। কারণ, এই সকল অঞ্চল থেকে ইউরোপীয়ানদের জনবসতি খুব দূরে অবস্থিত ছিল না।

সেকালের বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, কলকাতায় মগেদের মূল উপজীবিকা ছিল পাচকের কাজ। আসলে দীর্ঘদিন পর্তুগিজদের সঙ্গে অবস্থানের কারণে মগেরা বেশ খানিকটা ইউরোপিয়ান রন্ধনপ্রণালী সম্পর্কে অবহিত হয়েছিল। তাই নেই মামা ইউরোপিয়ান শেফের বদলে কানা মামা মগেরা সেইসময় পাচক হিসেবে চাকরি পেত কলকাতার বিভিন্ন বিদেশি পরিবারে। পর্তুগিজ রন্ধনপ্রণালী, মূলত দেশি মশলা আর আরাকানি পাচকের হাতের গুণ— সব মিলিয়ে কলাকাতায় ইউরোপিয়ানদের নিশ্চিতভাবে এসব রান্না স্বাদ বদলের নতুনত্বে মন্দ লাগত না। এমনকি একথাও শোনা যায়, শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ দেব তাঁর বাড়ির ভোজসভায় সাহেবদের ইউরোপিয়ান খানা পরিবেশনের জন্য মগ রাঁধুনি নিযুক্ত করেছিলেন।

আদালতি নথিতে লক্ষ্মীচরণের বাসস্থান হিসাবে কলকাতার মিয়াজান্নে গলির উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৫১ সালে প্রকাশিত 'দ্য বেঙ্গল অ্যান্ড আগ্রা ডায়রেক্টরি'তে জিগ-জ্যাগ লেনের সঙ্গে একই বন্ধনীতে মির জানি গলি নামক এক রাস্তার উল্লেখ প্রথম দেখতে পাওয়া যায়। এই রাস্তাটি কসাইটোলার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। ১৮৫৬ সালের 'নিউ ক্যালকাটা ডায়রেক্টরি'তে আবার এই রাস্তার নাম ঈষৎ পরিবর্তিত হয়ে মিয়াঁজান কা গল্লি হিসাবে নথিভুক্ত হয়েছে। এই রাস্তাটিও জিগ-জ্যাগ লেনের সন্নিহিত ছিল। ১৮৫৬ সালের এই ডায়রেক্টরিতে আবার মিয়াঁজান কা গল্লির পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছে ওয়েস্টন লেন। এখানে ওয়েস্টন লেনে কয়েকটি মগ কুটিরের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তীকালে ১৮৬২ সালের 'ক্যালকাটা ডায়রেক্টরি'তে আবার ওয়েস্টন লেনের নেটিভ নাম মিয়াঁজান কা গল্লির বদলে 'বন্দুকওয়ালা গল্লি' দেওয়া হয়েছে। আজও এখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা ওয়েস্টন লেনকে 'বন্দুক গলি' বলে অভিহিত করে থাকেন। ১৮৬২-র এই ডায়রেক্টরিতে আমরা আবার পার্শ্ববর্তী বউবাজার লেনেও সাতটি মগ পাচক কুটিরের সন্ধান পাই। পূর্বে উল্লিখিত ওয়েস্টন লেনই ঈষৎ পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানে ওয়েস্টন স্ট্রিট।

মধ্য কলকাতার বউবাজার অঞ্চলে পুব-পশ্চিম বিস্তৃত এই রাস্তাটির বর্তমানে পূর্ব দিকের সূচনা চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে। পশ্চিমে যার সমাপ্তি বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে। পূর্বদিকে এই রাস্তার প্রথম অংশের নাম আজ কপালিটোলা লেন। এখানে কপালিপল্লির প্রতিষ্ঠাতা দাস পরিবারের আজও বাসস্থান।

এই কপালিটোলা লেনকে প্রথম যে রাস্তাটি উত্তর-দক্ষিণে ছেদ করেছে তার নাম রবার্ট স্ট্রিট। রবার্ট স্ট্রিটের পরবর্তীতে কপালিটোলা স্ট্রিট থেকে যে রাস্তাটি কেবলমাত্র উত্তরমুখী বর্তমানে তার নাম বুদ্ধিস্ট টেম্পল স্ট্রিট। যেখানে আজ বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা বা দ্য বেঙ্গল বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অবস্থিত। বুদ্ধিস্ট টেম্পল স্ট্রিটের সামনেই অধুনা বিখ্যাত বো-ব্যারাক আর কপালিটোলা পার্ক ওরফে নালন্দা উদ্যান অবস্থিত। এই উদ্যানের পরেই অপর এক উত্তরমুখী রাস্তা বো স্ট্রিট যার সমান্তরাল দক্ষিণমুখী অংশের নাম আবার খইরু প্লেস।

এই বো স্ট্রিটের পর থেকেই পূর্ব-পশ্চিমের প্রধান রাস্তাটি বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে পড়া পর্যন্ত আজও ওয়েস্টন স্ট্রিট নামে অভিহিত। কলকাতার আদি যুগে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের নাম ছিল কসাইটোলা। পূর্বে উল্লিখিত দুটি ক্যালকাটা ডায়রেক্টরিতেই আমরা মিয়াঁজান কা গল্লি বা ওয়েস্টন লেনের পশ্চিমে সীমানা হিসেবে এই কসাইটোলাকেই দেখতে পাই।

বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট এবং বো স্ট্রিটের মাঝে ওয়েস্টন স্ট্রিটকে ছেদ করে উত্তর-দক্ষিণে সমান্তরাল ভাবে বিস্তৃত আর একটি পূর্ণ রাস্তা দেখা যায়। বর্তমানে যার নাম মেটক্যাফ স্ট্রিট। ১৮৫৬ সালে এই রাস্তাটি স্থানীয় মানুষজনের কাছে পরিচিত ছিল কিং কুপার কা গল্লি হিসেবে। ১৮৪৭-১৮৪৯ সালে জে সি ওয়াকার কোম্পানির তরফে ফ্রেডরিক ওয়াল্টার সিমস, এইচ এল থুইলার ও আর স্মিথের কলকাতার মানচিত্রে এই রাস্তাটির নাম পরিবর্তিত হয়ে জিগ-জ্যাগ

লেন হিসেবে উল্লেখিত হচ্ছে। ওয়েস্টন স্ট্রিট ও মেটক্যাফ স্ট্রিটের একই স্থানে বর্তমানেও অবস্থিতি নিশ্চিত করে চিহ্নিত করে লক্ষ্মীচরণের সেযুগের বাসস্থান তথা মগ বা বার্মিজ মন্দিরের সঠিক অবস্থানকে। যার থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায়, বর্তমান কপালিটোলা পার্ক থেকে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের মধ্যবর্তী ওয়েস্টন স্ট্রিটের কোনো স্থানেই অবস্থিত ছিল পূর্বোল্লিখিত মন্দিরটি।

লক্ষ্মীচরণের মামলার নথিগুলি নিশ্চিতভাবে উনিশ শতকের কলকাতার একটি অজানা অধ্যায়ের প্রতি আলোকপাত করে। সেই সময় কলকাতায় মগ সম্প্রদায় যে কোনো মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিল, তা এতদিন আমাদের অজানা ছিল। আদালতের এই সমস্ত অজ্ঞাত নথি ছাড়া অন্য কোথাও যার নির্দিষ্ট উল্লেখ এখনও পর্যন্ত আমরা দেখতে পাইনি। এই মন্দিরটি নিশ্চিতভাবেই একটি বৌদ্ধ উপাসনালয় ছিল। সেই হিসাবে সম্ভবত অধুনালুপ্ত ওই উপাসনালয়টি ছিল কলকাতায় স্থাপিত প্রথম বৌদ্ধ মন্দির। আমাদের মনে হয় তৎকালীন কলকাতায় মগ পাচকদের দ্বারা নির্মিত কোনো পর্ণকুটিরেই সেই সময় স্থাপিত হয়েছিল এই মন্দিরটি।

যদি আমরা মেনে নিই আলোচ্য মন্দিরটি একটি বৌদ্ধ উপাসনালয় ছিল, তাহলে স্বভাবতই আমাদের মনে যে প্রশ্ন ওঠে তা হলো— লক্ষ্মীচরণ ঠাকুর এই মন্দিরের পূজারী হন কীভাবে? কারণ লক্ষ্মীচরণের নাম-পদবী ও মগ-সংস্রব থেকে আমাদের প্রাথমিক অনুমান তিনি সম্ভবত বাঙালি ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁর আদি নিবাস ছিল চট্টগ্রাম। লক্ষ্মীচরণ কলকাতায় কাজের খোঁজে এসে এই মগ মন্দিরে পূজারী হিসেবে নিযুক্ত হন। নাকি তাঁকে এই বৌদ্ধ মন্দিরের পূজারী হিসেবেই চট্টগ্রাম থেকে কলকাতায় আনা হয়েছিল, তা বোধহয় আজ আর জানা সম্ভব নয়। মগ-বার্মিজ প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ মন্দিরের হিন্দু ব্রাহ্মণ পূজারী আপাত আশ্চর্যের মনে হলেও রাখাইন তথা ব্রহ্মদেশের ধর্মীয় পরম্পরার ইতিহাস জানা থাকলে সেই যুগের এই ঘটনা বিস্ময়কর বলে মনে হবে না।

এখন অল্প কথায় জেনে নেওয়া যাক, রাখাইন বৌদ্ধ পরম্পরার সেই ইতিহাসকে। প্রাচীন রাখাইন ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া যায় ১৪৬ খ্রিস্টাব্দে রাজা চন্দ্রসূর্য রাখাইনের তৎকালীন রাজধানী ধান্যবতীতে মহামুনি বুদ্ধমূর্তি ও মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। কথিত আছে সেইসময় মহামুনির পূজা করার জন্য চট্টগ্রাম থেকে একটি ব্রাহ্মণ পরিবার ও তাঁদের সেবকরূপে একটি শূদ্র পরিবারকে ধান্যবতীতে নিয়ে যাওয়া হয়। রাজা চন্দ্রসূর্য ছিলেন মহাযান বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। কিন্তু পরবর্তীতে রাখাইনে থেরোবাদ প্রতিষ্ঠিত হলেও এই পরম্পরার অবসান হয়নি। পর্তুগিজ পাদরি মানরিকের (১৫৯০-১৬৬৯) বিবরণ থেকে জানা যায়, রাখাইনের শাসকদের রাজ্যাভিষেক, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া প্রভৃতি অনুষ্ঠান হিন্দু ব্রাহ্মণদের তদারকিতেই অনুষ্ঠিত হতো। রাজার শ্বেতহস্তী পালনের কাজও তাদের উপরেই ন্যস্ত ছিল। এছাড়া রাজ পরিবারের আনন্দ-উৎসব, ধর্মীয় কাজের তদারকি ও ভাগ্যফল গণনার কাজও তাঁরাই করতেন। এইজন্য রাখাইনের রাজ দরবারে একদল ব্রাহ্মণ ছিলেন। ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্মরাজ বোধফয়া রাখাইন জয় করলে তাঁর পুত্র ৩৮ হাজার রাখাইন বন্দির সঙ্গে মহামুনি বৌদ্ধমূর্তি, সেখানকার পূজারী ব্রাহ্মণের বংশধর ও শূদ্রসেবকদের বংশধরদের ব্রহ্মদেশের তৎকালীন রাজধানী মান্দালয়ে নিয়ে যান। হিন্দু ব্রাহ্মণদের ব্রহ্মদেশে 'পৌনা' বলা হয়ে থাকে। বর্তমান লেখক কিছুদিন আগে মান্দালয়ের মহামুনি প্যাগোডায় এই রাখাইন পৌনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছেন।

শুধু রাখাইন নয়, ব্রহ্মদেশের অন্যত্র ছোট-বড় ভূস্বামীবৃন্দও সেই সময় তাদের ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে এই পৌনাদের নিযুক্ত করতেন। ব্রহ্মদেশের শেষ সম্রাট থিবো (রাজত্বকাল ১৮৭৮-১৮৮৫)-র মান্দালয় রাজদরবারেও এই পৌনাদের অবস্থানের কথা জানা যায়। তাই কলকাতার মগ-বৌদ্ধ মন্দিরে হিন্দু ব্রাহ্মণ হিসেবে লক্ষ্মীচরণের নিযুক্তি সেই প্রাচীন পরম্পরারই অনুসারী ছিল, একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যেতে পারে।

এবার লক্ষ্মীচরণের মামলার মূল কাহিনিতে আসা যাক। আগেই বলেছি, অর্থ অনাদায়ে জনৈক মোহরচাঁদ বাবুর্চির অভিযোগে লক্ষ্মীচরণকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়। মোহরচাঁদের নাম দেখে তার ধর্ম ও পেশা সম্পর্কে আন্দাজ করা যায়। কিন্তু মোহরচাঁদ কত টাকা এবং কেন তা লক্ষ্মীচরণকে ঋণ দিয়েছিলেন তা আমাদের জানা নেই। যেমন জানা নেই ঠিক কবে লক্ষ্মীচরণকে গ্রেপ্তার করা হয়। যেহেতু আদালতে ৩ জুন, ১৮৫২ সালে প্রথম লক্ষ্মীচরণকে পেশ করা হয়, স্বাভাবিকভাবেই তার অল্প কিছুদিন আগেই লক্ষ্মীচরণ গ্রেপ্তার হন— এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। এই দিন বিচারপতি তাঁর আদেশে লক্ষ্মীচরণের মামলা সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র আদালতে জমা দিতে বলেন। লক্ষ্মীচরণের এই মামলাটি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স পিলের অধীনে ছিল। স্যার লরেন্স তাঁর আদেশে আরও বলেন একমাসের ভিতর লক্ষ্মীচরণের দেউলিয়া সংক্রান্ত মামলার নোটিস তাঁর সকল উত্তমর্ণদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এবং এই একমাসের ভিতর কোর্টের আদেশের সারাংশ ক্যালকাটা গেজেটে দু'বার প্রকাশ করতে হবে। আদালত এই মামলার পরবর্তী শুনানির তারিখ জুলাই মাসের ৩ তারিখে ধার্য করে।

মামলার দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ ৩ জুলাই প্রধান বিচারপতি মূল বাদী মোহরচাঁদ বাবুর্চিকে ৭ আগস্ট সকাল এগারোটায় সশরীরে আদালতে উপস্থিত হওয়ার আদেশ দেন। একইসঙ্গে তিনি কলকাতার শেরিফকে এ বিষয়ে নোটিস জারি করতে বলেন। লক্ষ্মীচরণের ততদিন পর্যন্ত জেলে থাকার নির্দেশই বহাল থাকে।

বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা, কলকাতা।

৭ আগস্ট, শনিবার মামলার তৃতীয় শুনানিতে মোহরচাঁদের পক্ষে সওয়াল করেন আইনজীবী কেভি। কেভি বিচারালয়ের কাছে লক্ষ্মীচরণের দেউলিয়া ঘোষণার আবেদনের তীব্র বিরোধিতা করেন। প্রধান বিচারপতি পিল নাইট এই মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষণা সেপ্টেম্বর মাসের ৪ তারিখ পর্যন্ত মুলতুবি রাখেন।

৪ সেপ্টেম্বর কোর্টের আদেশে আরও কয়েকজন বন্দির সঙ্গে লক্ষ্মীচরণ অবশেষে মুক্তিলাভ করে। অর্থাৎ লক্ষ্মীচরণের আবেদন বিবেচনা করে বিচারপতি তাকে দেউলিয়া ঘোষণা করে আর্থিক দায় থেকে মুক্ত করেন। লক্ষ্মীচরণের মুক্তির এই আদেশটিও ক্যালকাটা গেজেটে প্রকাশিত হয়।

কলকাতার জেলে চার মাসের উপর বন্দি থাকার পর লক্ষ্মীচরণ এই শহরেই থেকে গিয়েছিলেন না এখান থেকে তিনি তাঁর জন্মভূমিতে ফিরে গিয়েছিলেন তা আমাদের জানা নেই। সুদুর রাখাইন থেকে কলকাতায় এসে মগ জনগোষ্ঠীর তৈরি প্রথম বৌদ্ধ মন্দিরটি এরপর কতদিন টিকে ছিল সেকথাও আজ জানার কোনো উপায় নেই। তবে ১৮৫২ বা তৎপূর্ববর্তী সময়ে যে স্থানে কলকাতার প্রথম বৌদ্ধমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, প্রায় সেখানেই ১৮৮৮ সালে ২১/২৬ বো স্ট্রিটে চট্টগ্রাম থেকে আগত কৃপাশরণ মহাস্থবির 'মহানগর বিহার' স্থাপন করেন। যা আজও ওই অঞ্চলে নবকলেবরে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা হিসেবে স্বমহিমায় বিরাজমান। এই ধর্মাঙ্কুর সভায় পরবর্তীকালে রাখাইন বৌদ্ধমঠের সঙ্ঘনায়ক উপুঙ মহাস্থবির কৃপাশরণকে অষ্টধাতু নির্মিত অপরূপ একটি বৌদ্ধমূর্তি দান করেন। মূর্তিটি আজও সেখানে বিদ্যমান।

কলকাতায় উনিশ শতকের মধ্যাহ্নে মগ জনগোষ্ঠীর দ্বারা প্রথম বৌদ্ধমন্দির স্থাপিত হলেও সেই মন্দিরের প্রথম পুরোহিত ছিলেন বাঙালি। আবার পরবর্তীকালে সেই স্থানেই বাঙালি বৌদ্ধস্থবির প্রতিষ্ঠিত মঠে রাখাইন সংঘ নায়কের বুদ্ধমূর্তি দান সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের এক অসমাপ্ত বৃত্তকেই যেন সম্পূর্ণ করে।

নানা উত্থান-পতনের মধ্যেও বাংলার সঙ্গে রাখাইনের, বাঙালির সঙ্গে রাখাইনবাসীর এই মেলবন্ধন সুদুর ঐতিহাসিক কাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রবাহমান। লক্ষ্মীচরণ, কৃপাশরণ বা উপুঙরা হলেন তারই প্রতীক। ▌

চিহ্নায়ন

উপন্যাস

শেখর সেনগুপ্ত

আকাশ ও মেঘের মতিগতির ওপর অধিক আস্থা স্থাপন যে ভারী কাঁচা কাজ, দিনের শুরুতেই তা বোঝা গেল। ফ্ল্যাটবাড়ির ঝুলবারান্দায় বসে লুচি আর মোহনভোগ রসিয়ে রসিয়ে যখন খাচ্ছে অনুত্তম, আঁখি তখন সেখানে দাঁড়িয়েই সান্ধ্য আবেগে আকাশের দিকে চেয়ে স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিল, 'দ্যাখো, আকাশের বুকে যেন কতবড় রুপোর থালা। কী আলো!'

অনুত্তমকে মুখ তুলতেই হয় এবং যেহেতু তার দৃষ্টি সবসময় ভালোর সঙ্গে মন্দকেও খোঁজে, তাই বলেছিল, 'রুপোর থালা ঠিকই, কিন্তু ওই থালার চারদিকে যে কিছু মেঘ সুজির হালুয়ার মতো দলা পাকিয়ে রয়েছে, সেটাও কিন্তু খেয়াল করা উচিত। লক্ষণ ভালো নয়।'

অনুত্তমের ইঙ্গিত যে নির্ভেজাল, আঁখি সেটা টের পেল ভোর হবার আগেই। রাতে আবহাওয়া দপ্তর নাকি হুঁশিয়ারি দিয়েছিল, 'ঝড়ঝঞ্ঝা মারাত্মকভাবে আসছে পশ্চিম থেকে। নামও তার 'মুসিবত'। মুসিবতের হুটোপাটি সেই যে শুরু হয়েছিল, এখনও তাতে ক্ষান্তি নেই। অনেকদিন বাদে শিলাবৃষ্টি। এপার ওপার একাকার। দিনের আলো এমন মলিন যে দৃষ্টিবিভ্রমের আশঙ্কা। অনুত্তম ও আঁখি দুজনেরই মনে হচ্ছে, তারা নিছক একটা পোড়ো বাড়ির মধ্যে সেঁধিয়ে রয়েছে বুঝি। খুব দরকার না থাকলে এই মুহূর্তে একমাত্র মতিচ্ছন্নরাই বাড়ির বাইরে পা রাখে। এখনও বাতাস কমবেশি দামাল। কলকাতা শহরের কোথায় কত যে অঘটন ঘটে গেল, কত কী অদল-বদল হলো, তা অনুভব করতে খুব একটা দূরদৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। টিভির স্ক্রিনে সকল বিপর্যয়ের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয় না। অথচ কাল তারা রুপালি চাঁদকে সাক্ষী রেখে কী সরস পরিকল্পনা ফেঁদেছিল। প্রকৃতির রোষ না রসিকতা সব ভজঘট পাকিয়ে দিয়ে গেল।

পরের দিনটা তো রবিবার। অনুত্তমের অফিস যাবার তাড়া নেই। ছেলে রনি নিউজার্সিতে। সুতরাং এই রবিবারটাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে আঁখি ও অনুত্তম গেঁথে রেখেছিল গুটিকয়েক সম্ভাব্য কর্মসূচি। এদের মধ্যে অন্যতম হলো শক্তিগড়ে গিয়ে ল্যাংচার আস্বাদন। কত মস্ত মস্ত ব্যক্তিত্ব সময় থেকে সময়ান্তরে শক্তিগড় গিয়ে ল্যাংচা খেয়ে শংসাপত্র দিয়ে এসেছেন।

রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র বোস থেকে আরম্ভ করে উত্তমকুমার অবধি। শক্তিগড়ে ল্যাংচাপর্ব সেরে চলে যাবে কার্জনগেটে— বঙ্গভঙ্গের অপরাধী লর্ড কার্জনের সম্মানে বর্ধমানের মহারাজার অবদান। সেখান থেকে ঘুরে ঘুরে দেখবে বর্ধমানের অন্যতম দ্রষ্টব্য ১০৮ শিবমন্দির। তারপর...। চিটেগুড়ের মতো লেগে ছিল একটার সঙ্গে আর একটা পরিকল্পনা। প্রকৃতির মন্দবাজনা সব ভণ্ডুল করে দিল। সরকারি বাসের একজোড়া টিকিটও কেটে এনে রেখেছিল অনুত্তম। অনুত্তমের কোনো চারচাকার ব্যক্তিগত মালিকানা নেই, যদিও সে একজন পদস্থ পুলিশ গোয়েন্দা, এযাবৎ বজ্জাতদের বহু হাট তছনছ করে দিয়েছে। রাজনীতির টোপ গেলার লোভকে সংবরণ করতে পেরেছে। হরদম বিবেক ও নৈতিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছে। তাই গোরাবাজার এলাকায় এরকম একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট তার। ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিতে হয়েছে। গাড়ি কেনার রেস্ত জোগাবে কে? এই নিয়ে আঁখির এলোমেলো কিছু অনুযোগ থাকলেও অনুত্তমের কিন্তু এ অবধি মনে হয়নি, একটা চার চাকার অভাবে তার জীবন থেকে সব জোছনা কেউ শুষে নিয়েছে। যতদিন চাকরি আছে, গাড়ির অভাব তেমন ঠাহর করতে পারবে না। তারপর যদি খুব অসুবিধা হয়, ভাববার অবকাশ থাকবে। প্রয়োজনে ছেলের কাছে হাত পাতবে।

এখনও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পথে নামলে অথৈ জলে খাবি খায় না। বাস, ট্রাম, অটো, টোটো, ট্যাক্সি এসব তো একেবারে অলভ্য নয়। মোদ্দা কথা, প্রৌঢ় দম্পত্তি কলকাতার সরকারি বেসরকারি যানবাহনের সঙ্গে এখনও দিব্যি মানিয়ে নিতে পারছে। আরও একটা ব্যাপার আছে, বাস বা অটো যখন ছোটে, অনুত্তমের ভেতরে একটা শিরশিরে বাতাসও যেন বইতে থাকে। সে পার্শ্ববর্তী সহযাত্রীকে সামান্য জরিপ করে নেয়। যেন তার তৃতীয় নয়নটি জেগে ওঠে। পোয়াটাক রাস্তা পার হতে না হতেই জলজ্যান্ত, কিন্তু অপরিচিত মানুষটার সম্পর্কে বেশ কিছু বিবরণ দিতে পারে। যেগুলি প্রায়শই নির্ভুল হয় অথবা সত্যের কান ঘেঁষে চলে যায়। একবার বাসের মধ্যে কোনাকুনি বসে থাকা আঁখির এক বান্ধবী সম্পর্কে অনুত্তম এমন একটি কথা বলেছিল, যা আঁখিকে যুগপৎ সচকিত ও ব্যথিত করে; কিন্তু মন্তব্যটাকে উড়িয়েও দিতে পারেনি।

এহেন অনুত্তম চৌধুরীকে আঁখি চৌধুরীও মনে মনে সমীহ না করে পারে না। তো সে যাই হোক, এখন তারা দু'জনই বিমর্ষ। একটা মধুর সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করে ছাড়ল অপ্রত্যাশিত দুর্যোগ। প্রকৃতি তার নিজস্ব মৌনতাকে বিসর্জন দিয়ে এখনও এমন গজরাচ্ছে যে হতাশায় আঁখি হাতের চিরুনিটাকে দূরে নিক্ষেপ করে। অনুত্তম সেটা আবার তুলে এনে ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখে। একবার তাদের মনে হয়েছিল, ছাতা মাথায় দিয়ে ফ্ল্যাট বাড়ির ছাদে গিয়ে দাঁড়ালে কেমন হয়? পরক্ষণেই তারা স্বীকার করে নেয়, এ ধরনের বিলাসিতা করবার বয়স দুজনেরই পেরিয়ে এসেছে। পরিস্থিতি যখন আরও থমথমে হয়ে উঠছে, ঠিক তখন আঁখির থ্রি জি মোবাইলটা পল রবসনের গান গেয়ে ওঠে, 'উই আর অন দ্যা সেম বোট ব্রাদার...'

স্ক্রিনের দিকে চেয়ে ঈষৎ উৎফুল্ল আঁখি জানায়, 'মামা ফোন করছেন।'

'মামা!'

'হ্যাঁ, মামা।'

মুহূর্তে তাদের চেতনায় ঘা লাগে— অনুত্তমের লেখক-মামা তার হাজার স্কয়ার ফিটের মডার্ন ফ্ল্যাটটিতে একা— সম্পূর্ণ একাই রয়েছেন। তাঁর দিকে নজর দেবার মতো কেউ নেই গত তিনদিন ধরে। মামা ও মামিমার জন্য রেলের টিকিট কেটে পাঠিয়েছিল তাদের একমাত্র কন্যা সুলেখা রায়গড় থেকে। জামাতা ছত্তিশগড়ের পদস্থ সরকারি আধিকারিক। গত তিন

বছর ধরে অনেক সাধ্য-সাধনা করেও মা-বাবাকে আনতে না পারায় সুলেখার খুব অভিমান হয়েছিল। দূরভাষে ব্যথিত গলায় আপন মর্মবেদনা জানিয়েছে ক'বার। তবুও হুঁশ আসেনি মামার। খালি কাগজ আর কলম। কলম আর কাগজ। বুঝতাম লিখে অনেক কামাচ্ছেন বা পুরস্কার-টুরস্কার পাচ্ছেন, তাহলেও সেটা না হয় একটা জোরালো বৃত্তান্তের জন্ম দিত। আর মামি? তিনি দিনের মধ্যে ঘণ্টা কয়েক ঠাকুরের সিংহাসনের সামনেই বিভোর। বাড়িতে কোনো কর্ত্রী আছেন বলেই মনে হয় না। এবার জামাই জোড়া টিকিটি পাঠাতে অপ্রস্তুত। তবুও মামা অনড়। শেষে রেগেমেগে কন্যার মান ভাঙাতে মামি একাই গিয়ে উঠে বসলেন বম্বে মেল ভায়া নাগপুরে। মামা দুঃখিত। নিজের ব্যস্ততার কথা যদি জানাতে বসেন, সেটা অনেকের কাছে হয়ে উঠতে পারে ছোটমুখে বড় কথা। আসলে সত্যি তাঁর ইদানীং লেখক হিসেবে একটু নামডাক হয়েছে। কেবল রহস্য উপন্যাস রচনাতেই নয়, রাজ্যের চোর-ছ্যাঁচড়াদের ওপর একটি পত্রিকায় ধারাবাহিক লেখালেখি বেশ আলোড়ন তুলেছেন, যদিও তাকে ঠিকঠাক কোনো রাজনৈতিক দলের পতাকার নীচে এনে দাঁড় করানো কঠিন। মেয়ের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করার আগে মামির প্রথাসিদ্ধ গজগজানি। '... কী আমার ভুবনখ্যাত লেখকরে। .. আমি চললাম। তোমার হাঁটুর ব্যথা আরও বাড়ুক বসে থেকে থেকে।...'

মামির এই রকম বাক্যবান মামা যেভাবে হাসিমুখে হজম করেন, তাতেই মালুম হয় ওদের দাম্পত্য প্রেমের গভীরতা। টাকা-পয়সা যতই সামান্য হোক, অনুত্তম কিন্তু তার মাতুলকে একজন বহুমুখী কৃতবিদ্য মানুষ বলেই মনে করে। কুলগৌরবও বলা চলে। ম্যাট্রিকে প্রথম যোলজনের মধ্যে নাম ছিল। ইতিহাস ও অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ ডিগ্রি থাকলেও গবেষণায় মাথা ঘামাননি। অধ্যাপনা ছেড়ে ঢুকে যান একটি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে। সেখানেও যে উচ্চতায় পৌঁছে যাবার কথা, সেটা হয়নি তৈলমর্দনে পারদর্শিতার অভাবে। এখন মাথার চুল সব সাদা; কিন্তু মামিকে তুষ্ট রাখতে কলপ ব্যবহার করেন নিয়মিত। লিখেছেন বিস্তর। অবসর নেবার পর সেটা আরও বেড়েছে। কিন্তু যে গুণ থাকলে পুরস্কার মেলে, সেই গুণের ও তৎপরতার বড় অভাব। কল্পনাকে প্রশ্রয় দিতে অক্ষম। বিস্তর বইপত্তর নথি ঘেঁটে নিবন্ধ লেখেন। আর উপন্যাস লেখার ব্যাপার হলেই ভাগ্নে সি আই ডি অনুত্তমের থুতনি ধরে নাড়া দেন, 'একটা প্লট দে। রহস্য কাহিনি লিখব। সামাজিক উপন্যাস যদি লিখতে বসি, ধোঁকা দিতে পারব না। ফলে আমার অনেক কিছুকে গড়বড় করে দেবার জন্য বহু প্রভাবশালী পিছনে লাগবে, সাহিত্যের বাজারে এতসব ওজনদার নিন্দুকদের সামাল দেওয়া আমার অসাধ্য।'

অনুত্তম তখন মাথা নাড়ে— মামা, তোমার মেরুদণ্ড যেন জীবনের বাকি দিনগুলিতে এরকম সোজাই থাকে। আমার কাছ থেকে যখন-তখন প্লট পেতে থাকবে।

এহেন মাতুলের সঙ্গে অনুত্তমের বেটারহাফ আঁখি চৌধুরীর এখন ফোনে কী কথাবার্তা হচ্ছে, তা শোনা যাক—

মামা : কে, আঁখি মা?

আঁখি : হ্যাঁ, মামা। আমি তোমার আঁখি।

মামা : কী করছিস রে তোরা দু'টিতে?

আঁখি : কিছুই তো করার নেই মামা। ভয়াবহ আবহাওয়া। আমরা বিলকুল ঘরবন্দি। সারা গোরাবাজার হাবুডুবু খাচ্ছে। পথে বেরিয়েছে, এরকম লোকের সংখ্যা হাতে গুনে বলা যায়। তোমার ওখানে অবস্থা কেমন?

মামা : তফাত ঊনিশ বিশ। তবে ব্যতিক্রম কিছু আছে বৈকি! যেমন আজ সকালে আমাদের হাউসিং কমপ্লেক্সে একটা তাগড়াই দাড়াশ সাপকে দেখা গেছে। তোরা তো এ জিনিস স্বপ্নেও দেখতে পাস না।

আঁখি : বাব্বা! মামা, মামি তো হাওয়া। তুমি এখন করছটা কী?

মামা : গায়ে আমার ময়লা পিরান। টেবিলে কাগজ ও কলম। কিন্তু মাথাটাকে এফোঁড় ওফোঁড় করেও কোনো বস্তুর খোঁজ পাচ্ছি না। অনুত্তমকে খোঁচাই। আমারই ভীমরতি। গত এক বছরে মাত্র দুটো প্লট দিতে পেরেছে। অন্তত পুজো সংখ্যাগুলির জন্য কিছু মশলা তো চাই।

আঁখি : তোমার ভাগ্নেও এখন আর আগের মতো নেই। রাজনৈতিক জাঁহাবাজদের অসামাজিক দাপট থামাতে না পারায় নিজেকে কেমন গুটিয়ে নিচ্ছে। প্রসঙ্গ তুলতে গেলে হঠাৎ বাক্য হারিয়ে বসে।

মামা : আরে না। এ সবই হলো নিজেকে একটু বিরাম দেওয়া। যথাকালে বাঘাচোখে তাকাবে। পরিপক্ক মাথায় সৃষ্টি হবে দিব্যদর্শন। অপরাধীদের মুরোদ একসময় শেষ হবেই। দে, একবার ভাগ্নের সঙ্গে কথা বলি।

এরপর মামা-ভাগ্নের দড়ি টানাটানি। সত্যিই বুক ফুলিয়ে বলবার মতো জটিল কেস অনুত্তমের হাতে একটাও নেই। শুধু ষণ্ডাগুন্ডাদের কুকীর্তি নিয়ে বড়সড় অথবা মাঝারি মাপের রহস্যকাহিনি তো দাঁড় করানো যায় না। আর মামা যে জাতের লেখক, মিথ্যা ও কল্পনার পিছু ধাওয়া করবেনই না মরে গেলেও। মামা বললেন, 'করবিটা কী এইরকম একটা দিনে? ল্যাপটপ?'

'অগত্যা।'

'না, তোরা দুজনে চলে আয় আমার কাছে। থাকবি যতদিন তোদের মামি ফিরে না আসছে। তোর সঙ্গ আমার দরকার রে। পুরনো কেসের গল্পই শুনব। সুপারি কিলার, আড়কাঠি, তোলাবাজ এদের নিয়ে উচ্চাঙ্গের রহস্যকাহিনি লেখা সম্ভব না হলেও বর্তমান ছবিটাকে তো তুলে ধরা যাবে। তাই বা কম কী? অতএব, তুই আজ আঁখি মাকে নিয়ে আমার এখানে আসছিস। অবশ্যই আসছিস। আমি সুবলকে দিয়ে গাড়ি পাঠাচ্ছি।'

মামা সুইচ অফ করলেন। শেষদিকে তাঁর স্বর শ্লেষ্মায় জড়িয়ে যাচ্ছিল। মামা তাঁর গাড়িটাকে পাঠাচ্ছেন ড্রাইভার সমেত। এরপর না গেলে হেনস্থার সম্ভাবনা ষোল আনা।

লেখক মামা আঠারো বছর আগে এই বড়সড় ফ্ল্যাটটি কেনেন। এর পিছনে বিলক্ষণ কিছু যুক্তি আছে। প্রথমত, নারায়ণপুর বৃহত্তর কলকাতার অন্তর্গত এবং এয়ারপোর্ট প্রায় ঢিলছোঁড়া দূরত্বে। দ্বিতীয়ত, এখানে সবুজ একেবারে ধূসর হয়ে যায়নি এবং রাত ঘনালে এলাকাটা মোটামুটি মটকা মেরে থকে অর্থাৎ দূষণের পরিমাণ মাত্রাছাড়া হয়নি। তবে বঞ্চনার অভিমানও রয়েছে। নাকের ডগায় নিউটাউনকে নিয়ে সরকারের যত আদিখ্যেতা, তার পাঁচ শতাংশও নারায়ণপুরের জন্য নয়। একগণ্ডা মসজিদ, মন্দিরের সংখ্যা মাত্র এক। জনসংখ্যা বাড়ছে মারাত্মক হারে। হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা অনেকটাই বেশি। দেড়যুগ আগে চাকরি থেকে অবসর নিয়েই মামা যেভাবে দুম্ করে ফ্ল্যাটটা কিনে নেন, তাতে স্বজন-পরিচিত সকলেরই ভ্রূকুঞ্চন ঘটে— ঋষিতুল্য মানুষটা আর একটা ভুল করে বসলেন। অতঃপর পাপীতাপীদের নিয়েই ঘুরপাক খাবে তাঁর যতেক ভাবনা। কিন্তু পছন্দটা তো মামার একার নয়। মামিও তো ঘাড় কাত করেন। তিনি কোনো হিরেজহরতের খোঁজ পেলেন? তবে এই ফ্ল্যাট কলকাতার অন্য সব ফ্ল্যাটকে টেক্কা দিতে পারে মজবুতিতে ও উচ্চতায়। জম্পেশ করে বুড়ো-বুড়ি এখানেই তাঁদের জীবনের শেষ পর্বটা শেষ করতে পারবেন। আত্মীয়রা কালেভদ্রে চড়াও হলেও ক্ষতি নেই। দারুণ বাজার। কাজের লোক নিয়েও ক্রাইসিস নেই। গৃহপ্রবেশের দিনে বহুবছর বাদে মামি মামাকে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনিয়েছিলেন। কন্যা ও জামাতাও খুশি। মামা যথেষ্ট মান্যতা পাচ্ছেন স্থানীয় চক্ষুষ্মান শিক্ষিত লোকদের কাছ থেকে। এঁদের মধ্যে কয়েকজন তো যেন হরিহরাত্মা।

স্থানটির আরও কিছু ব্যাপার লক্ষণীয়। মশক ও সারমেয়রাই যেন পুরসভার আদত পোষ্য। প্রায় প্রতিটি লোকের গায়ে রাজনীতির মোহর। হাওয়া বুঝে জার্সি বদলে ওস্তাদ। হয়তো সেই কারণেই বিগত জমানার কৌটাবাজি ও সিন্ডিকেটীয় জুলুমবাজি বর্তমানে আরও উদ্দীপ্ত ও ঊর্ধ্বগামী। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চমকপ্রদ। দলত্যাগ এবং মলত্যাগ এদের কাছে সমান। যানবাহনের মধ্যে প্রাধান্য পায় অটো ও টোটো। এদের পারস্পরিক হানাহানি নিত্যকার ঘটনা। এই সব নিয়েই স্থানীয় নেতাদের যা কিছু কোষ্ঠকাঠিন্য, শিরঃপীড়া ইত্যাদি উপসর্গ ও তাদের অপশম। এহেন পরিবেশের সঙ্গে লেখক মামা দিব্যি মানিয়ে নিয়েছেন। পারতপক্ষে কোনো নেতা-নেত্রীর বচন শুনতে যান না। এমনকী তথাকথিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চে স্থান পেয়েও এমন ভাব দেখান যেন কানে তুলো ও চোখে চালসে। অথচ স্থানীয় প্রতিটি লোকের সঙ্গে গলায় গলায় খাতির কোনো মতলব ছাড়াই।

এহেন মাতুলের নিবাসে অন্তত হপ্তাখানেক কাটিয়ে আসার মওকা। আঁখি কেবল রাজি নয়, অনুত্তম অনিচ্ছা প্রকাশ করলে এমন মন্তব্য করবে যে সি আই ডি সাহেবের কানটান গরম হয়ে উঠতে পারে।

মামার ড্রাইভার সুবলও চলে এসেছে লাল মারুতি নিয়ে। তবে গোরাবাজারে গাড়ি পার্ক করতে গেলে অনেক ঝানু চালকও যেন কাঁচিকলে পড়ে যায়।

পার্কিং প্লেস খুঁজতে সুবলকে চলে যেতে হয় রেলের লেভেল ক্রশিং অবধি। রেলের লোক গেটটাকে সাপটে ধরে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে দুটো মিষ্টি কথা বলে, আহ্লাদের সঙ্গে বিড়ি বিনিময় করে নিশ্চিন্তে অনুত্তমদের দোরগোড়ায় এসে গেল সুবল।

দশ মিনিটের মধ্যে আঁখি ও অনুত্তম সুবলের গাড়িতে উঠে বসে। ফার্লং কয়েক যাবার মধ্যেই মমতাময়ী মুখ্যমন্ত্রীর দু-দুখানা অতিকায় কাটআউট। ফুটবল খেলার মাঠ থেকে আরম্ভ করে শ্মশানঘাট অবধি আত্মপ্রচারের এমন বাহারের হাত থেকে উদ্ধার মেলা দুষ্কর। তামিলনাড়ুতে গিয়েও অনুত্তম জয়ললিতার এবং লক্ষ্ণৌ গিয়ে মায়াবতীর এহেন চিত্রময় রগড় প্রত্যক্ষ করে এসেছে। সে সরকারি আমলা। তাই এসমস্ত প্রভাব খুব কম সময়ে মন থেকে মুছে ফেলতে সমর্থ।

তবে খুব খারাপ লাগে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক পোস্টারগুলিতে ভুল বানানের ছড়াছড়ি দেখে। শোধনের প্রয়াসও নাস্তি।

এয়ারপোর্টের একনম্বর গেটকে ছুঁয়ে সুবল গাড়িকে নিয়ে এল কইখালির মোড়ে। সেখানে বিকট যানজট। এখানেও হেতু

সেই রাজনীতি। ভোট আগত। তাই কাল ব্রিগেডে হবে শাসক দলের মহাসমাবেশ। সেই উদ্দেশ্যে জোর প্রচার। পথে বেপথে গুচ্ছ গুচ্ছ প্রচারমঞ্চ। পতাকা ও প্ল্যাকার্ডে ছয়লাপ। যেন এক ধরনের বর্ণবিভ্রাট।

সুবল কলকাতার রাস্তায় একজন দুঁদে গাড়িচালক। জটলা কাটিয়ে নারায়ণপুর ঢোকার পথে গড়িয়ে নিয়ে যেতে পারল চারচাকাকে। কিন্তু অটো, রিক্সা, ভ্যানগাড়ি, সাইকেল, পুলকার এবং থেকে থেকে যাত্রাবোঝাই বেসরকারি বাস— এরা সকলেই একে অপরের ভয়ে তটস্থ। ড্রাইভাররা কটমট করে একজন আর একজনের দিকে তাকায়, দু-চার কলি কাঁচা খিস্তি উড়ে এসে যেন পারস্পরিক বশীকরণের কাজ করে।

পথের একধারে এয়ারপোর্ট অথরিটির দেওয়াল দৈর্ঘ্যে কমসে কম দু'কিলোমিটার। বাম জমানায় এই পথটা ছিল সহস্র দীর্ণ, কোথাও কোথাও যেন ধাপার আবর্জনা, দুর্গন্ধ। এখন সেই দুর্দশা প্রায় কাটিয়ে ওঠা গেছে। কিন্তু নারায়ণপুরে বটতলায় এত মানুষের ভিড় যেন একজন আর একজনের মাথা খায়। বয়স্কদেরও খাতির করে না। তার ওপর হেলমেটহীন ছোকরারা যেভাবে বাইক ছোটায়, তাতে ঘাপটি মেরে থাকা বিপদ যে কোনো মুহূর্তে লাফ দিতে পারে। ট্রাফিক নিয়ম মানবার বালাই নেই বললেই চলে। কোনোরকমে বিরাম নিতে নিতে অকুস্থল হাউসিংয়ের অভ্যন্তরে উদয় হলো সুবলের চারচাকা। কমপ্লেক্সের ভেতরটাতেও অনেক দুর্দশা। বিস্তর খোঁচাখুঁচির পরও জল নিষ্কাশনে অকথ্য পরিস্থিতি। মশা-মাছির অবাধ বংশ বিস্তার।

সোপার্দ করা অভিযুক্তের ভঙ্গিমা নিয়ে গাড়ি থেকে প্রথমে নামে অনুত্তম। তারপর আঁখি। মামা দাঁড়িয়েই ছিলেন। বললেন, 'আসতে নিশ্চয় বেশ ঝামেলা হয়েছে। টিভিতে দেখলাম, কলকাতার এখানে-ওখানে গাছ পড়ায় চলাচলে খুব ঝামেলা হচ্ছে।'

সুবল জানায়, 'এ এলাকায় তেমন কিছু ঘটেনি। তাছাড়া বৃষ্টিও ধীরে ধীরে ধরে আসছে।'

মামা বললেন, 'অত ভরসা করাটা অবিমৃশ্যকারিতা। সারা দুনিয়ায় আবহাওয়া বদলাচ্ছে। দায়ী আমরাই। প্রকৃতি কখন যে কোথায় মোক্ষম ঘা মারবে, মানুষ আর নির্ভুল ভাবে বলতে পারছে না।'

মামা অনুত্তম ও আঁখিকে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন ঘরের দিকে।

এই হাউসিং কমপ্লেক্সের পরিস্থিতি কোনোকালেই রাজকীয় ছিল না। এখন তো নয়ই। তদুপরি কিছু আবাসিকের মানসিকতা

জঘন্য। তারা হাউসিং সোসাইটির মেইনটেন্যান্স বাবদ একটি টাকাও জমা দেন না। অথচ জল ও বিদ্যুৎ উপভোগ করেন। স্থানীয় পুরসভায় নালিশ করেও বিচার মেলেনি। কারণ, সকল পুরপিতা ও পুরমাতার বড় ভাবনা ভোট নিয়ে। ভোটের কথা ভাবতে ভাবতেই তাদের এক সময়ের নীতিসমৃদ্ধ ডনবৈঠক করা শরীর বর্তমানে নিছকই পেটরোগা, নড়বড়ে।

আঁখি এসেই হেঁশেলের দখল নিয়েছে। বড় বড় কাপে টইটম্বুর কফি বৃষ্টিবাদলের দিনে মেজাজকে তরতাজা করে। আলস্য, অভিমান, ভয়ডর সব উধাও। তিন জনেরই চোখে মুখে মেরুজ্যোতির প্রকাশ।

আঁখি ও অনুত্তমকে নিয়ে আসতে গাড়ি পাঠবার পরই বিবেচক মামা এক কাণ্ড করেছেন। নারায়ণপুরের সবচেয়ে বিখ্যাত ও পেল্লাই রেস্তোঁরা 'হালুম-হালুম' থেকে রেওয়াজি খাসির মাংস নিয়ে এসেছেন টিফিন কেরিয়ার ঠেসে। সেই বস্তুর সৌরভে বাতাস ম-ম।

মামা সচরাচর টিভির সুইচ অন করেন না। খবর মানে কি কেবল বিজ্ঞাপনে টাসা সরকারি কেত্তন, খুন-খারাপি ও ধর্ষণ? আজ কিন্তু টিভির পর্দা থেকে দৃষ্টি সরাবার ফুরসত নেই। ইসলামি জঙ্গিদের মদতদাতা প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানকে ভারত সমেত তামাম দুনিয়া কী জবাবটা দিচ্ছে, তা দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে আবেগে উত্তেজনায় কপালে ঘাম জমে। মামা রুমাল বের করে কয়েকবার ওই ঘাম মুছলেন। চিনে মাটির বাটিতে সাজিয়ে গরম ঘুগনিও পরিবেশন করল আঁখি। টিভি দেখতে দেখতেই কেটে গেল ঘণ্টাখানেক। এরপর স্নানপর্ব। আঁখি দেখল, নীচের কামিনী ঝোপটার আড়াল থেকে একটা প্রজাপতি বেরিয়ে আসছে বৃষ্টি থেমে যাওয়ায়। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে অনুত্তম অবাক হয়ে দেখল ও শুনল, মুনিশ গোছের একটা সাধারণ লোকও আকাশের দিকে দু-হাত তুলে স্লোগান দিচ্ছে, 'ভারতমাতা কী জয়!' গোটা দুনিয়াটাই যেন রাগে গরগর করছে।

যথারীতি খাবার টেবিলে পরিবেশনের দায়িত্বও আঁখিরই। বোলের ঢাকনা খুলতেই অপূর্ব রেওয়াজি ঘ্রাণ। স্বাদ নেবার পর সেই মুগ্ধতা পরিপূর্ণ হলো।

'দুর্দান্ত।'

— অনুত্তমের মন্তব্য।

মামা মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'হালুম হালুম'-এর রেওয়াজি মাংসের স্বাদ যে একবার পেয়েছে, সে পারতপক্ষে অন্য কোনো হোটেল বা রেস্তোরাঁয় ঢুঁ মারতে যাবে না।'

আঁখি হাসে, 'রেস্তোরাঁর নামটা কিন্তু ভারী অদ্ভুত। হালুম-হালুম।'

মামা বললেন, বিকেলের দিকে ওয়েদার যদি পারমিট করে আমি তোমাদের নিয়ে যাব ওই রেস্তোরাঁয়। ওরকম ঝকঝকে তকতকে রেস্টুরেন্ট ধারেকাছে দ্বিতীয়টি নেই। বৈচিত্র্য আছে, সুনাম আছে। বিক্রিবাটা ঈর্ষণীয়। নারায়ণপুরের বাইরের লোকেরাও এসে ভিড় করে চেয়ার দখল করতে।'

আরও দু'গ্রাস শেষ করার পর মামা জানালেন, 'হালুম হুলুমের মালিক সত্যনারায়ণ সরকার চমৎকার খোলামেলা স্বভাবের লোক। আমার প্রায় বন্ধুস্থানীয়। তবে সময় সময় কেমন যেন থম মেরে যান। কী কারণে যে তার মনে কু গায়, বলতে পারবো না। একটা হতে পারে, ওর কোনেও ছেলে বা মেয়ে নেই। আর সত্যনারায়ণের স্ত্রী কেবল শিক্ষিতা নয়, প্রায় ডানাকাটা পরি। ওদের বিয়ে নিয়ে নাকি বিস্তর জানাজানি কানাকানি হয়েছিল। দু'হাতে টাকা কামাচ্ছে। অথচ ভবিষ্যতের কেন্দ্রবিন্দুতে খুব অনিশ্চয়তা। আমি ওই দম্পত্তিকে নিয়ে কোনো এক সময় উপন্যাস নিশ্চয় লিখব।

দুর্যোগের দাপট ধীরে ধীরে কমে আসে। দামাল বাতাস ক্রমে নিরীহ গোবেচারি। সূর্য যখন পশ্চিম মুখে হাঁটা দিয়েছে, পড়তি বেলায় রোদ্দুর তখন আগাগোড়া মোলায়েম।

মামার গলায় খুশির আমেজ, 'তোমরা দুটিতে রেডি হয়ে যাও। আমি সত্যনারায়ণকে ফোন করে দিয়েছি। আজকের সন্ধ্যায় 'হালুম-হুলুম'-এর প্রধান খদ্দের হবো আমরা তিনজন। অনুত্তমের নামডাক যে হয়েছে আজ পরিচয়টা হবে।'

নারায়ণপুরে সকাল থেকে রাত অবধি কোলাহল। কোলাহলের অন্যতম উৎস রাজ্য রাজনীতি ও তজ্জনিত রকমারি সংবাদ ও রটনা। এই এলাকায় বরাবরই দলত্যাগের খুব হিড়িক। যখন যে দল ক্ষমতায় আসবে, তখন সেই দলের দিকে বেশিরভাগ ভাগ্যান্বেষী লম্ফ প্রদান করবেই। ফলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ঠেকানো শিবের অসাধ্য। কাল আবার আগুয়ান ভোট নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মহাসভা কলকাতার হৃদপিণ্ডে। এখান থেকে কোন গোষ্ঠী কত বেশি সংখ্যক অনুগামীদের নিয়ে ময়দানে হাজিরা দিতে পারবে, তা নিয়েও চলছে সেরা প্রতিযোগিতা। বেশ কয়েকটা পার্টি অফিস। ব্যস্ততার মধ্যেও সেখানে নিথরভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলে ও মেয়েদের মনে হচ্ছে যেন শোরুমের পুতুল। অধিকাংশ বাইক চালক ও আরোহীদের মাথায় হেলমেট নেই। গতির মত্ততায় গাঢ়ভাবে বুঁদ। মারতে অথবা মরতে যেন বদ্ধপরিকর। বেশিরভাগ দোকান খোলা হয় বেশ বেলায়। আর ঝাঁপ ফেলা রাত এগারোটার পর। বিস্তর হাই রাইজিং ফ্ল্যাট যেমন উঠছে, তেমনই অনেক আবাসনেরই পলেস্তরা খসা দশা পীড়াদায়ক। আঁখি ও অনুত্তম বুঝতে পারে, রাজনীতি নিরপেক্ষ লোক হয়েও তাদের লেখকমামা বেশ

লোকপ্রিয়। বারবার মাথা হেলিয়ে মুচকি হাসির আদান-প্রদান। অর্থাৎ দুঃসময়েও মামা বিপন্ন হননি। হবেনও না। এলাকায় বৃহৎ নৃশংসতা বর্বরতার নজির নেই বললেই চলে। হাঁটতে হাঁটতে বটতলা। মামা দাঁড়িয়ে পড়েন, আঙুল তুলে দেখালেন 'হালুম-হুলুম'কে। সত্যিই যথেষ্ট বড় ও জমজমাট রেস্টুরেন্ট। সবক'টা চেয়ারে বসে আছেন খদ্দেররা। শার্ট-ট্রাউজারে ফিটফাট তরুণরা যেমন আছেন, কাপড়চোপড় সামলে অতি বয়স্করাও বেমানান নন। মহিলাদের মধ্যে কালো বোরখায় সর্বাঙ্গ ঢেকে কম-বেশি জড়সড়। ওরা যে এখানে ঢুকতে পেরেছেন এটাই বুঝি সাবাসি জানাবার মতো সাহসী সিদ্ধান্ত। কর্মচারীরা সকলেই বিশেষ উর্দিধারী। ছোটাছুটি, দেখভাল, জিজ্ঞাসাবাদ— ব্যস্ততার বিরাম নেই। 'হালুম-হুলুমের' একমেবাদ্বিতীয়ম্ স্বত্বাধিকারী বাবু সত্যনারায়ণ সরকার ওই যে একটি বড়সড় চেয়ারে দেহ স্থাপন করে সমানতালে নির্দেশ দিচ্ছেন, টাকা গুনে ড্রয়ারে রাখছেন, কম্পিউটারে বোতাম টিপছেন। তাঁর ধরনধারন মুহূর্তে মুহূর্তে বদলায়। কখনো সাদাসাপটা হুকুম, কখনো ভাষায় অলংকার বসিয়ে কোনো ছা-পোষা খদ্দেরকেই হাত ধরে টেনে অবলীলায় পাশে বসানো এবং একজন সর্বজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় কিছু উপদেশামৃত বর্ষণ। কখনো কাতর হয়ে মিনারেল ওয়াটার গলায় ঢালে, কখনো কারোর দিকে উপেক্ষার দৃষ্টিও হানেন। সব মিলিয়ে হালুম-হুলুম-এর পরিস্থিতি পরিবেশকে তিনি স্বয়ং চুটিয়ে উপভোগ করছেন।

মামা যখন অনুত্তম ও আঁখিকে নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন, সত্যেনবাবু তখন পরপর তিনবার কম্পিউটারে বোতাম টিপলেন। তারপর মুখ তুলে মামাকে দেখেই যেন নাড়ীরটান অনুভব করেন। সটান উঠে দাঁড়িয়ে জড়িয়ে ধরেন বান্ধবকে।

অনুত্তম ততক্ষণে জরিপ করে ফেলেছে এখানকার পরিবেশ এবং সত্যেন সরকারকে। ভদ্রলোকের বয়স বাহান্ন হতে পারে। আবার ছাপান্নও হতে পারে। পানপাতার মতো মুখ। সেখানে বলিরেখার সংখ্যা কম নয়। বিত্তবান হলেও শরীরে চর্বির একান্ত অভাব। হাড়প্রধান শরীরে দৈর্ঘ্য সাড়ে পাঁচ ফিটের চেয়ে ইঞ্চিখানেক বেশিই হবে। রং ফরসা, একমাথা চুলে কালোর রঙের বাহার। বাণিজ্যের সঞ্জীবনী মুহূর্তেও একজন প্রবীণ কর্মচারীকে নিজের আসনে বসিয়ে তিন অতিথিকে নিয়ে বাড়ির ভেতরের একটি সুসজ্জিত ঘরে ঢুকে পড়লেন সরকারবাবু। সেখানে তিনটে সোফা। অনুত্তম যেন ইচ্ছে করেই সরকারবাবুর পাশে বসে পড়ে। তাদের মুখোমুখি আঁখি ও মামা। পরিচয়পর্ব শেষ হয় চটপট। 'আপনাকে নিয়ে উনি যে কয়টি বই লিখেছেন, সব আমি পড়েছি। উন্মুখ হয়ে ছিলাম পরিচিত হতে। এখন কথা বলে মনে হচ্ছে আপনি ও আখিঁ দেবী আমার কাছে মোটেই অচেনা নন।'

অন্তরঙ্গ আলোচনা। ব্যক্তিগত অবস্থান নিয়েই জাবরকাটা। কিছুটা আবেগ— যেখানে ফ্যানটাসিরও উঁকিঝুঁকি। সত্যনারায়ণ সরকার আজ এই এলাকায় অন্যতম ধনী ব্যক্তি। রাধাগোবিন্দের মন্দির নির্মাণে মোটা অঙ্কের টাকা ডোনেট করেছেন। কিন্তু জীবনটা তাঁর সংগ্রামী। নাগরদোলার মতো উঠেছে-নেমেছে। বিস্তর রোদ-বৃষ্টি ঠেঙিয়ে আজ তিনি এখানে এসে পৌঁছেছেন।

সরকারবাবু বলছেন, 'এখানে যত বাড়ি দেখছেন, তাদের প্রতিটি বড় অনুষ্ঠানে খাবার পাঠাবার বরাত আমি পাই। বরাত আসে রাজারহাট, কইখালি ও নিউটাউন থেকেও। দোকানের পিছনে রয়েছে যে বড় বকুলগাছটা, ওকে আমি সমীহ করি। এক একসময় মনে হয় ও যতদিন আছে, আমিও ততদিন আছি।... চেহারা দেখে বুঝতে পারবেন না। আসলে বয়স আমার বাষট্টি পেরিয়েছে।'

কফি এলো। এগ রোল এলো। প্রকৃত সুস্বাদু। কথা অসমাপ্ত রেখে বাথরুম ঘুরে এলেন সরকার। টকাস করে রোলে কামড় দিয়ে আঁখি বলে ওঠে, 'বাঃ! দারুণ তো খেতে!'

এই সময়ই একজন কর্মচারী এসে খবর দেয়, 'থানা থেকে লোক এসেছে। খাবারের প্যাকটটা চাইছে।'

সরকারবাবু গম্ভীর মুখে বললেন, 'দিয়ে দাও।'

কর্মচারী তৎক্ষণাৎ একরকম ছুটে পালায়।

'এই হয়েছে মুশকিল।' সরকারবাবু নীচু গলায় বললেন, 'পুলিশের কোনো বড় কর্তা থানায় এলে অথবা পথচলতি কোনো মন্ত্রী পার্টি অফিসে ঢুকে পড়লে ফোন আসবেই। অমুক খানা পাঠান। সব ফেলে রেখে ওই খানাই রেডি করতে হবে। দাম যে কী হবে, কবে পাবো স্থিরতা নেই। বেশি কিছু বলতে পারি না। আমার বউ তো আবার রাজনীতি করে।'

'তাই নাকি!' আঁখি চোখ কপালে তোলে, 'ওনার সঙ্গে যে এখনও পরিচয় হলো না!'

'একটু অপেক্ষা করুন। কী এক গোপন মিটিংয়ে গিয়েছে। এখুনি ফিরবে।'

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না।

মিনিট দশেকের মধ্যে কর্ত্রী এসে গেলেন। বয়স্ক ব্যবসায়ী সত্যনারায়ণ সরকারের স্ত্রী কেমন হতে পারেন, তা নিয়ে আঁখির

হয়তো একটা কল্পনা ছিল। সেই কল্পনা সম্ভবত বাস্তবের সঙ্গে মিলল না।

আরে, ইনি যে এক অতি আধুনিকা তরুণী। রূপের বিচারেও প্রথম সারিতেই বসবেন। ঘিঞ্জি নারায়ণপুরে তাঁর অবস্থান নির্ঘাত অসচরাচর। পরনে জিনসের প্যান্ট ও টাইট গেঞ্জি, চুলে কদমছাঁট। চোখে মিহি চশমা। গায়ের রং এমন রক্তাভ ধবল যে অ্যাংলোকে হার মানায়।

'নমস্কার, আপনাদের সকলকে নমস্কার।'

— ঋজু তনু ঈষৎ বক্র হয়। 'স্বর অতীব মোলায়েম। সরকারবাবু একটু হাসলেও তাতে খুশির ঝলক কম। বললেন, 'আমার স্ত্রী জিনিয়া সরকার। বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট হলেও গুণে বড়। রাজনীতিতে নেমেই যেভাবে নাম কিনেছেন, সামনের পুরভোটে কাউন্সিলর হবেই। তাতে অবশ্য আমার ব্যবসায়িক সুবিধা কিছু হবে। একটি দুঃখ আমাদের। কোনো উত্তরাধিকারী নেই।'

জিনিয়া সরকার আঁখির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি ছিলাম না। সত্যি—'

অনুত্তম তাকে শেষ করতে দেয় না, দলের কাজ আগে। তাছাড়া সরকারবাবু যেভাবে আপ্যায়ন করলেন, অতুলনীয়।'

জিনিয়া মিষ্টি হেসে বসে পড়েন। বলেন, 'আপনার নাম কাগজে পড়েছি। আপনার মামাবাবুর উপন্যাসেও আপনিই নায়ক। অনেকদিনের ইচ্ছে, আপনার সঙ্গে পরিচিত হবো। এতদিনে সেই ইচ্ছে পূর্ণ হলো।'

আর এক রাউন্ড কফি এলো। এবার সঙ্গে চিকেন পকোড়া। এটাও স্বাদে অসাধারণ।

জিনিয়া সরকার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দোতলা বাড়ির প্রায় সবটাই দেখালেন আগন্তুকদের। তারপর সবিনয়ে বললেন, 'আবার আমাকে ঘণ্টাখানেকের জন্য বের হতে হচ্ছে। বুঝতেই পারছেন, সামনেই সাধারণ নির্বাচন। কাল ময়দানে বিরাট মিটিং। আমার একটা ভূমিকা রয়েছে। নারায়ণপুর থেকে যতজন সম্ভব মহিলাকে নিয়ে যাবো সভায়। পুরুষদের সংগঠিত করার দায়িত্ব তরুণ নেতা ফরিদ আহমেদের।

জিনিয়ার এই ঘোষণায় সরকারবাবুর মুখবিকৃতি লক্ষণীয়। চাহনিতে ফুটে ওঠে বিরক্তি, 'একসময় তুমি থাকতে বইখাতা নিয়ে। এখন এই পার্টিবাজি তোমাকে শুষে খাবে।'

জিনিয়া ঠোঁট ভাঙেন, 'থাক না। সেটা একেবারেই আমার ব্যাপার। আমার যাতে আনন্দ, সেখানেই আছে আদর্শ।'

সরকারবাবু চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন, 'দুনিয়াটা আমি তোমার চেয়ে বেশি দেখেছি, জিনিয়া।'

'কাস্টমারদের পকেট হাল্কা করাটাই তোমার জীবনের ব্রত। আমি তো এ নিয়ে মাথা ঘামাই না। আমাকে যেতেই হচ্ছে।'

জিনিয়া সরকার বেরিয়ে গেলেন। জানালা দিয়ে বাইরের প্রকৃতিকে কিছুটা দেখা যায়। রাতের আকাশে ঘুরছে সাদা মেঘের ভেলা। সত্যনারায়ণাবাবুর তখনও তাঁর জমজমাট রেস্তোরাঁ নিয়ে ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি আবার একরকম জোর করেই বসালেন অতিথিদের। গৃহস্বামী প্রায় একতরফাই বলে চলেছেন। জোরালোভাবে খুলে দেখাচ্ছেন তাঁর সংগ্রামী জীবনের কাঠামোকে। বর্ণনায় যে খুব চৌখস, তা নয়। তবে একেবারে অকপট স্মৃতিচর্চা। চক্ষুদান পর্ব থেকে শুরু করে একেবারে শেষ অবধি। ঘটনার ঠেলাঠেলি। বোঝা যায়, ভেতরটা তার কী কারণে যেন ফুঁসছে। একমাত্র সাহিত্যিক মামাই গভীর আগ্রহে শুনছেন তার প্রতিটি কথাকে।

'...এই তো দেখলেন আমার সংসারের পরিধি। একটা সন্তান যদি থাকতো। আমি দত্তক নেব না। দু'জনের সংসারে কত রকমের যে ফ্যান্সি জিনিস। জিনিয়া যে মাসে কত টাকা ওড়ায়!... সংসার সামলায় একটা কাজের মাসি। রান্না থেকে আরম্ভ করে সব। এ বাড়িতেই থাকে। জিনিয়ার ন্যাওটা। ওর পিছনেই যে মাসে কত টাকা ঢালে আমার মিসেস!'

আঁখি হঠাৎ মন্তব্য করে, 'জিনিয়াদেবী ভাগ্যবতী। কুবেরের ঘরনি। উনি আপনার জীবনে এলেন কীভাবে, আপত্তি না থাকলে যদি...'।

মামা তখনই বলেন, 'আমি সব জানি। সব। আমার লেখার পাত্রপাত্রী।'

সরকারবাবু মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করেন। পুনরায় ফিরে যান স্মৃতির সরণিতে। সত্যনারায়ণ এবং জিনিয়া দুজনেরই জন্ম পুরুলিয়ায়। পাশাপাশি দুটি গরিব পরিবার। কিন্তু বয়সের ব্যবধান, তা ধরুন প্রায় আঠারো বছর। সত্যনারায়ণ যখন পাড়ার ক্লাবে দাপিয়ে ফুটবল খেলছে, শিশু জিনিয়া তখন লাল পলাশের ওপর দিয়ে ছোটাছুটি করছে। সরকার ওকে কতবার কোলে তুলে নিয়ে বাড়িতে ঢুকেছে। ওই ছোট্ট বয়সি জিনিয়া তখন থেকেই যেন রূপসচেতন। আর আছে ঈর্ষাকাতরতা। উপহার লাভের প্রবণতা। সরকারের বাবা স্থানীয় এক দর্জির কাছে কাজ করতেন। অন্নজোটানো কঠিন। অথচ দুই মেয়ে ও এক ছেলে। ছেলে সকলের ছোট। এক দিদিকে পটিয়ে সেই যে কে একজন মরুভূমির দেশে উড়ান দিয়েছিল, তার হদিশ বের করার সাধ্যি বাপের হয়নি। আর এক দিদি থাকেন দক্ষিণের ভেলোরে। খ্রিস্টান হয়ে যাবার দৌলতে সি এম সিতে আয়ার কাজ করেন। স্বামী সাউথ ইন্ডিয়ান সিল্কে জরির কাজ করেন। বহু বছর ধরে ফ্যামিলি গেটটুগেদার অনুষ্ঠিত হয়নি। সনাতন মাধ্যমিক পাশ করতে পেরেছে। মিশুকে স্বভাব। প্রচুর কথা

একনাগাড়ে বলে যেতে সক্ষম। কলেজে ঢোকার চেষ্টা চলছিল, আর তখনই মর্মান্তিক বিপর্যয়। স্থানীয় এক বহুতল বাড়িতে দামি পর্দা লাগাতে গিয়েছিলেন সত্যনারায়ণের বাবা। নেমে আসার সময় পা ফস্কে পড়ে যান অনেক নীচে। আর তাতেই মৃত্যু।

'আমার অবস্থা তখন বুঝতে পারছেন? কোনো কাজই তো জানি না। পোস্ট অফিসে বাবার কিছু টাকা ছিল। তার একটা অংশ ভাঙিয়ে পথের ধারে বসে শুরু করলাম চপ-বেগুনির ব্যবসা। মাও সাহায্য করেন। বেশ চলছিল। মাকে নিয়ে বেড়াবার শখ মেটাতে গেলাম পুরীতে। গৌড়ীয় মঠে আশ্রয় নিয়েছিলাম। তিন দিনের বেশি থাকা হলো না। এক প্রভাবশালী পর্যটক এসে স্থানচ্যুত করলেন আমাদের। ফিরে এলাম। এসে দেখলাম, আমাদের তেলেভাজার সরকারি জায়গাটা অন্যের কবজায় চলে গেছে। দুটো মেয়ে ও একটা ছেলে ওখানেই শুরু করে দিয়েছে সেই তেলেভাজারই শিল্প। আমার সাধ্য নেই ওদের সরিয়ে দিতে। কারণ ওই ছোকরা লাল পার্টির ক্যাডার। আর মেয়েদুটি ওর গুণমুগ্ধ। যদি কিছু করতে যাই, ভিটেছাড়া হতে হবে।'

সত্যনারায়ণ সরকার আবার চোখ বন্ধ করলেন। অতীতকে টেনে আনছেন। চোখ খুললেন। শুরু হলো পুনরায় স্মৃতিচারণ, 'স্যার জানেন, আজ আজ দু-দুটো গাড়ি। ইচ্ছে হলে আরও দুটো কিনে গ্যারেজে ঢোকাতে পারি। একদিন ভাগ্যের সন্ধানে কলকাতায় পাড়ি জমাবো বলে মাকে রাজি করিয়ে বসতবাড়িটাকে বেচে দিয়েছিলাম। মাকে নিয়ে চলে এলাম এই রাজধানীতে। আমার ইনটুইশন বলছিল, কলকাতায় যা ভাগ্য ফিরবে। কলকাতায় এসে ভাগ্য ও মেহনতকে পুঁজি করে অনেক পাঞ্জা কষেছি। যেবার কলকাতায় এলাম, ডিসেম্বরের শেষ। পুরুলিয়ার তুলনায় শীতের কামড় কম। একজনের পরামর্শ মেনে ঢুকে গেলাম নারায়ণপুরে। বৃহত্তর কলকাতার অংশ। একদিকে এয়ারপোর্ট, অন্যদিকে রাজারহাট। তখনও নিউটাউনি গড়ে ওঠেনি। থিক থিক করছে লোক। বেশিরভাগই ধর্মে মুসলমান। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে লাগাম নেই। কয়েকটা মসজিদ। আজানের রবে বাতাস কাঁপে। আমার পুঁজি তো ঘড়াখানেক মোহর নয়। যা টাকা ছিল, তাতেই জলের দরে দেড়কাঠা জমি। সেখানেই টালির বাড়ি। শুরু করেছিলাম দশকর্মা ভাণ্ডার দিয়ে। চলল না। হিন্দুদের সংখ্যা যে তখন কম। মুকুন্দ দে নামে বাম দলের এক নেতা ছিলেন। এখন তিনি

দলত্যাগ করে নীল দলে আছেন। তাঁরই গোঁফের তলায় মুচকি হাসি দেখেছিলাম আমি। কাছে ডেকে ঘাড়ে হাত রেখে পরামর্শ দিলেন, 'এখানে দশকর্মার বাজার নেই। রেস্তোরাঁ কিংবা গোলদারির ব্যবসা যদি ফেঁদে বসতে পারো, আঙুল ফুলে কলাগাছ হলেও হতে পারে।'

সরকারবাবুর পুনরায় ক্ষান্তি দান। শ্রোতারা কেউই মুখ না খোলায় তিনি আবার শুরু করলেন, 'হয়ে গেলাম মুদি দোকানদার। ওইসময়ই একদিন রাজারহাট থেকে ভ্যানে চাপিয়ে মাল নিয়ে আসার পথে দেখতে পেলাম সেই জিনিয়াকে। সদ্য যুবতীর রূপে। সত্যি আমি শিহরিত। খুব সন্তর্পণে ওর সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করি। তবে জিনিয়াও খুব চালাক। বুঝেশুনে তবেই গণ্ডী পার হবে। ততদিনে বুঝে গিয়েছি, নারায়ণপুরে কী ধরনের কারবারে মুনাফার সম্ভাবনা অধিক। এখানে বাতাসে যেমন সর্বক্ষণ রাজনীতি, তেমনি জিভের চাহিদাও হেথায় বেশ রসালো। অতএব, অচিরে মুদিদোকান রূপান্তরিত হলো 'হালুম-হুলুম'-এ। খুব কম দিনে নাম কিনল আমার রোস্তোঁরা। এত টাকা উপার্জন হতে থাকে, যা ছিল আমার কল্পনাতীত। বেদনা একটাই— মা আমার এই বাড়বাড়ন্ত দেখে যেতে পারেননি। মা চলে গেলেন। আর এসে গেল আর এক জন। স্বয়ং জিনিয়াস জিনিয়া দেবী। আগে দেখা হলে ফিসফিসিয়ে কথা বলত, এবার লিখে ফেলল একখানা তিনপাতার প্রেমপত্র। কী করি বলুন তো? বয়সে অনেক ছোট, রূপে ডানাকাটা পরি, তদুপরি সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট। তবুও নিজেকে সামলাতে পারিনি। সাত পাকে বাঁধা পড়ে গেলাম।'

মামা সশব্দে হেসে ওঠেন, 'আপনার বিয়েতে জনা কয়েক মন্ত্রী ও বাঘা আমলা এসেছিলেন। আমি সাক্ষী।'

আঁখি বলল, মিসেস সরকার সম্পর্কে কিছু বলুন। তারপর আমরা আজকের মতো উঠব।'

'জিনিয়া আমার বিবাহিতা স্ত্রী। আমি তার স্বামী। হিন্দু পরিবারে এ সম্পর্ক চিরায়ত। আমার যা কিছু সবই তো ওর। তবে বড্ড খরুচে। আর আমি কোনোদিনই মুক্তকচ্ছ হতে রাজি নই। তার উপর আবার শাসক দলের নেত্রী হবার স্বপ্ন দেখে। আমি আবার ওইসব দলাদলিতে নেই। আদর্শ কোথায়? নিজেরে মধ্যেই স্বার্থের গুঁতোগুঁতি, তোলাবাজি, সিন্ডিকেট। কী দরকার একজন গৃহবধূর এর মধ্যে ঢুকে নায়িকার রোল প্লে করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া? এই নিয়ে বচসা প্রথমে খানিক হবার পর একটা রফায় এসে গেলাম। আমরা কেউ কারোর ব্যাপারে নাক গলাবো না। আর জিনিয়া মাসে সাত হাজার টাকার বেশি হাতখরচা পাবে না।'

আঁখি মুখ টিপে হাসে, 'ওটাকে বাড়িয়ে দশ হাজার করুন।'

সরকারবাবুর জবাব, 'আবেদন করুক। বিবেচনা করে দেখব।'

অনুত্তমের স্থির দৃষ্টি সত্যনারায়ণবাবুর মুখের ওপর। সচরাচর একজন সফল ও ঝানু ব্যবসায়ীর মুখ থেকে এরকম অকপট আত্মবিশ্লেষণ শোনা যায় না। এরকম মানুষের সংখ্যা কমে আসছে।

'হালুম-হুলুম'-এর গদিতে ফিরে গিয়ে বসেছেন সত্যনারায়ণ সরকার।

আর এরা প্রত্যক্ষ করছে, সন্ধ্যায় নারায়ণপুরের বটতলাকে মানুষ ও যানবাহন কতটা জটিল করে তুলতে পারে। রিকশা, অটো, টোটো, বাইক, ভ্যানগাড়ি, ট্যাক্সি, পাঁচ-সাত মিনিট অন্তর অন্তর বাস এবং শত শত মানুষের ব্যস্ততা... প্রতিমুহূর্তে ছোট বড় সংঘর্ষের আশঙ্কা। ভিড়ভাট্টা এড়াতে অভিজ্ঞ মামা অনুত্তম ও আঁখিকে একটি গলিপথ ধরলেন। গলির পরিবেশটা যে সহনীয়, ভাবা ভুল। তবে ভিড়ের চাপ কম। ভেতর দিকে যত পরিবার, প্রায় সবই সংখ্যালঘুদের। রিয়্যালিটি এই যে, ইত্যাকার এলাকাগুলিতে সমাজবিরোধীদের সংখ্যা ও তৎপরতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গলির এই মুখটা শেষ হতেই সন্ধান মিলল একটি সবুজ ভূখণ্ডের। অদূরে একটা বাঁধানো পুকুরও রয়েছে। বোঝা গেল, এই মাঠে খেলাধুলা হয়। তবে এই মুহূর্তে এখানে কোনো বালক বা তরুণের দেখা মিলল না। পরিবর্তে নজর কাটে এক দীঘদেহী এক বৃদ্ধ। মাথায় ফেজ টুপি, পরনে লুঙ্গি। বড় বড় পা ফেলে বিড়বিড় করতে করতে কোনদিকে চলেছেন, জানা নেই। মামা বললেন, 'এই জায়গাটার একটা অলুক্ষণে ব্যাপার হলো, কোথা থেকে যেন কিছু অজানা লোকের আমদানি ঘটে। আবার তারা কোথায় যেন হারিয়েও যায়। সত্যনারায়ণবাবুও এই কথাটা বলেছিলেন।'

আরও খানিকটা পথ পাড়ি দেবার পর মামা সামান্য সময়ের জন্য দাঁড়িয়ে পড়লেন। আঙুল তুলে দেখালেন, পূব দিকে একটা বড় একতলা বাড়িকে। বললেন, 'ওই যে বাড়িটা, ওটাই হলো ফরিদ আহমেদের বাড়ি। সিন্ডিকেটের পাণ্ডা। আবার পার্টিরও একরোখা পতাকাবাহী। সরকারবাবুর কাছে তো শুনলে। কালকের পার্টির মিটিংয়ে পুরুষদের নিয়ে যাবে ফরিদ। আর মেয়েদের নিয়ে যাবে জিনিয়া। ওপর থেকে সব ঠিক করে

দেওয়া হয়।

একবার ছাপ পড়ে গেলে নিস্তার নেই। সকলের অলক্ষে এই দেশের গণতন্ত্র ধীরে ধীরে যেন কুঁকড়ে পড়ছে।'

মামা যখন এই কথাগুলি বলছেন, তখনই পুবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন জিনিয়া সরকার। তাঁর পাশে এক সুবেশ বলিষ্ঠ তরুণ। মামা ফিসফিসিয়ে বললেন, 'ফরিদ আহমেদ। কার মনের পটে কী আঁকা থাকে সবটাই অনুমানের বিষয়। তবে কিসের এত সখ্য? আমি পুরনো মানুষ। মন বড় কু গায়।'

ওদের সামনাসামনি হতে হলো না। ওই দু'জনে ততক্ষণে হাত ধরাধরি করে চলেছে ভিন্ন মুখে। প্রতিটি মুহূর্ত তাদের কাছে হয়তো বিন্দাস।

মাঝে মাঝে দমকা বাতাস। বাতাসে কান্নার আওয়াজ। কাকে যেন কবরখানার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দাফনের উদ্দেশ্যে। একটা পুলিশের গাড়ি ছুটে গেল। তারপর আরও একটা।

মামা বিড়বিড় করে কী যে বললেন, শোনা গেল না।

কী যেন এক নীল রশ্মি এসে নামছে তাঁর ওপর।

রাতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাদের আলোচনা। সাহিত্য-সিনেমা থেকে শুরু করে পাকিস্তানের জঙ্গি মদত। ভারতীয় বিমানহানায় কতজন জঙ্গি নিকেশ হলো, তা নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কূটকাচালির প্রসঙ্গ উঠতেই শান্ত মাতুল নিতান্ত এক রাগী মানুষে পরিণত হলেন। তিনবার জোরে টেবিলে কিল মারলেন ফুর্তিবাজ মানুষটাই। আলোচনার ওখানেই ইতি। যে যার পায়ের ওপর ভর দিয়ে শয়নকক্ষের দিকে অগ্রসর হয়।

বেশি রাতে শুয়েছিল তারা। ঘুম যখন ভাঙল, চরাচর তখন রৌদ্র কবলিত। থেকে থেকে শোনা যাচ্ছে একটা কোকিলেরই নাটুকে গলা।

আঁখি মুখ ধুয়েই ঢুকে পড়ে রান্না ঘরে। প্রতিটি বাসন সেখানে ঝকঝকে। নোংরা কিছু দেখলেই মামিমা কাজের মেয়েকে সাধারণত এমন ভাষায় ধমক দেন, যার কিছু অংশকে অশ্রাব্য মনে হতে পারে। আঁখি অবশ্য মেয়েটির সঙ্গে কথা বলল অন্তরঙ্গ সুরে। এমনকী ওকে এক কাপ চা করেও খাওয়ান। অনুত্তম জানে, আঁখি কোনোদিনই কেবলমাত্র সাংসারিক কূপমণ্ডুকতায় আবদ্ধা নয়। অত্যন্ত সামাজিক। সমাজের নিম্নতলবাসীদের আর্তনাদ সহজেই শুনতে পায়।

চায়ের টেবিলে বসে অনুত্তম মন্তব্য করে, 'মামিকে খুব মিস করছি।'

মামা বললেন, 'এই বয়সেও ওর কেন যে তে ব্যস্ততা!'

দূর থেকে একটা ক্ষীণ আওয়াজ এই সময় কানে আসে। নিশ্চয় পার্টির মিটিঙে লোক জোগাড়ের প্রয়াস ডালাপালা মেলতে শুরু করেছে। মনে আসছে কাল সরকারবাবু কীভাবে তার বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। খুব একটা খুঁটিনাটি বর্ণনায় না গেলেও অনুত্তম ও আঁখির বুঝতে অসুবিধা হয়নি, জিনিয়া সরকারের রাজনৈতিক কার্যকলাপ তাঁর কতটা অপছন্দের বিষয়। কী যেন একটা কলুষের ছায়া দেখতে পাচ্ছিলেন ভদ্রলোক।

বাংলা-ইংরেজি মিলিয়ে মোট চারটি দৈনিক খবরের কাগজ এই বাড়িতে ঢোকে। চারটি কাগজেরই শিরোবার্তা, 'মতুয়া মহাসঙ্ঘের সর্বজন শ্রদ্ধেয়া জননী বীণাপাণি দেবীর অমৃতলোক যাত্রা।'

মামা তাঁর দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বললেন, 'মতুয়াদের যাঁরা সত্যিকারের ক্ষতি করেছেন, তারাই এই দেশকে দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন। মা নিশ্চয় সেটা মনে রেখেছিলেন।

ঘড়ির কাঁটা ঘোরেচ এই মুহূর্তে সময় সকাল আটটা। মামার মোবাইলও ডাক ছাড়ে। ফোনটা তুলতে মামা একটু দেরি করলেন। অনুত্তম খেয়াল করে, আগত বার্তা মামাকে প্রথমে যেন স্তম্ভিত করে দেয়, তারপর তিনি কেঁপেও ওঠেন, '... সত্যনারায়ণ সরকার খুন হয়েছেন। ... দোকানের মধ্যে!... পিস্তলের গুলি! আমি আসছি, এখুনি আসছি ভাগ্নেকে নিয়ে।'

'কী হয়েছে, মামা?'

— আঁখি ও অনুত্তমের একই প্রশ্ন। মামা কিছুক্ষণ নিরুত্তর। যেন উন্মাদের শ্যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ বোবা ফোনটার ওপর। পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'কাল আমরা হালুম-হুলুম-এর মালিকের সঙ্গে কত গল্প করে এলাম। আর এইমাত্র তার কর্মচারী সদানন্দ জানালে, দোকানের মধ্যেই আবিষ্কৃত হয়েছে সরকারবাবুর গুলিবিদ্ধ প্রাণশূন্য দেহ। বিশ্বাস করতে পারছি না। আঁখি মা, তুমি বাড়িতেই থাকো। আমি ভাগ্নেকে নিয়ে এখুনি বের হচ্ছি।'

ভাড়া করা টোটো থেকে নামলেন মামা অনুত্তমকে নিয়ে। দেখলেন, রেস্তোরাঁর ঝাঁপ তখনও তোলা হয়নি। কিন্তু এক গণ্ডা পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। কৌতূহলী জনতা পুলিশের উপস্থিতি দেখে সরে গিয়েছে নজরের বাইরে। অনুত্তমের দৃষ্টি হঠাৎই আটকে যায় অদূরে একটি মিষ্টির দোকানের মাথায় লটকে থাকা বিজ্ঞাপনে। কন্ডোমের প্রচার। ছবিটা কিন্তু পর্নোগ্রাফির চেয়েও অশ্লীল।

রেস্তোরাঁর পাঁচ কর্মচারীই উপস্থিত। সকলের মুখে চোখে

আতঙ্ক। সত্যনারায়ণ সরকারের মতো নির্বিরোধ ভদ্র মানুষও খুন হতে পারেন! এইরকম ঘটনা যারা ঘটায়, তারা কোন মন্ত্রের ফসল?

কর্মচারীদের মধ্যে সিনিয়রমোস্ট সদানন্দ দাস পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বলছে। সদানন্দের বাঁ দিকটা অংশত অচল পক্ষাঘাতহেতু, কিন্তু ডান দিকটা এতই সচল যে যে কোনো আনকোরা কাজও চটপট করে ফেলে নিয়োগকর্তাকে আশ্বস্ত করতে সক্ষম। সেই ফোন করেছিল মামাকে। আবার সোশ্যাল মিডিয়ার লোকেরা এসে তাকেই পাকড়ায়। একজন্যর পর একজন। প্রশ্নে প্রশ্নে ফালাফালা কে। কারণ গৃহকর্ত্রী নাকি সাতসকালে চলে গিয়েছেন ময়দানে নারী ও শিশুদের বাহিনী নিয়ে। জমায়েতের ফাঁক পূরণে আপন দক্ষতা দেখিয়ে নজর কাড়তে চান হাইকমান্ডের। তিনি কী আদৌ জানেন, তাঁর স্বামী খুন হয়েছেন? সদানন্দ চেষ্টার ত্রুটি করেনি। কিন্তু জিনিয়াদেবীর ফোনের সুইস যে অফ। স্থানীয় থানার যে আধিকারিক এসেছেন, অনুত্তমকে তিনি বিলক্ষণ চেনেন। অনুত্তমকে দেখে যেন হাতে চাঁদ পেলেন। বিখ্যাত সি আই ডি অফিসার অনুত্তম চৌধুরী! কত জটিল কেসের মীমাংসা করেছে, আর উত্তাল গণস্তুতিতে তৃপ্ত হয়েছেন সরকার বাহাদুর।

অনুত্তমও চিনতে পারে। সুকান্ত বাগচি। বয়সে তরুণ, তবে যথেষ্ট দক্ষ। একেই বলে সোনায় সোহাগা।

'স্যার, আপনি! কী সৌভাগ্য!'

'আমি কাল এখানে এসেছি মামার বাড়িতে। কালই তো সন্ধ্যা থেকে বেশ রাত অবধি আমি, আমার স্ত্রী এবং মামা রেস্তোরাঁরার মালিক সত্যনারায়ণ সরকারের সঙ্গে সাতকাহন গল্প করে গেলাম। আর আজ শুনছি তিনি খুন হয়েছেন।'

'আমি নারায়ণপুর থানার চার্জে এসেছি মাত্র মাস তিনেক আগে। এখানে অপরাধজনিত কিছু বিপদসংকেত পেয়ে থাকি। রাজনৈতিক লোফারদের লোফালুফিটা খুবই চলে। কিন্তু মারদাঙ্গা, খুন-খারাপির রেকর্ড প্রায় পরিষ্কার। আপনাকে দেখতে পেয়ে মনে হলো অথৈ জল থেকে ডাঙায় উঠে পড়তে পারব।'

বাগচির কাঁধে হাত রেখে অকুস্থলে দিকে পা বাড়ায় অনুত্তম।

সত্যনারায়ণ সরকারের গুলিবিদ্ধ নিথর শরীরটাকে পাওয়া গেছে ঝাঁপবন্ধ হালুম-হুলুম-এর মধ্যেই। ল্যাপটপ সমেত ক্যাশের টেবিলটা ধরে রেখেছে তাঁর হালকা শরীরের একাংশকে। বাকিটা মেঝেতে লটকে আছে। দেখলে বোঝা যায়, তিনি খুনির সঙ্গে যুঝবার ফুরসতও পাননি। এখনও নামছে রক্তের ধারা। শীর্ণ শরীর থেকে অত রক্তের প্রবাহ প্রায় অভাবনীয়। বোতলকে একরকম মুখে ঢুকিয়ে আকণ্ঠ জলপান করে অনুত্তম। তারপর সুকান্ত বাগচির হয়ে নিজের কিছু ক্যারিশমা দেখাবার সূচনা। আনঅফিসিয়াল হলেও সে যা বলছে, পুলিশ তৎক্ষণাৎ তাকে কার্যকরী করছে। আর মামার পর্যবেক্ষণী শক্তি ততই হয়ে উঠছে ক্ষুরধার। মৃত সত্যনারায়ণ সরকারের দেহ প্রথম দেখতে পান কে?

তিনি সেই মুখ্য হালুইকর সদানন্দ দাস

মুখ-মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সদানন্দ যে বিবরণ পেশ করল, তার নিগিলিতার্থ এই রকম—

প্রতিদিনের মতো আজও সকাল সোয়া সাতটায় হালুম-হুলুম-এর সামনে এসে সদানন্দ খানিক অবাক, মালিক এখনও দোকানের ঝাঁপ তোলেননি কেন? অথচ কাল কানাঘুষোয় জানা গিয়েছিল, আজ আধঘণ্টা আগেই শাটার তুলবেন সরকারবাবু। কারণ, এই সময় তিনি দোকানের সামনে দাঁড়িয়েই দেখবেন, কীভাবে তাঁর স্ত্রী জিনিয়াদেবী পাড়ার মেয়ে-বউ-শিশুদের একরকম মার্চ করিয়ে নিয়ে চলেছেন পার্টির পতাকা ওড়ানো বাসের মধ্যে ঠেসে ঠেসে তুলতে।

সরকারবাবু এই পার্টি ত্রিসীমার মধ্যে না থাকলেও নিজের স্ত্রীর এমত তৎপরতা দেখার একটা আগ্রহ নিশ্চয়ই ছিল।

তাই হালুম-হুলুম-কে শাটারবদ্ধ দেখে সদানন্দ থমকে দাঁড়িয়ে ছিল এক দেড় মিনিট। সবে একটা বিড়ি ধরিয়েছে, এমন সময় তার ছোট মোবাইলটা বেজে ওঠে।

খোদ ম্যাডামের গলা।

'সদানন্দ, তোমার বাবু কী দোকান খুলে বসেছেন? ফোনে পাচ্ছি না কেন ওকে? ফোনটা বেজেই চলেছে!'

'শাটার তো তোলাই হয়নি।'

'বারে! একবার ডেকে দাও তোমার বাবুকে।'

সদানন্দ তখন বাড়ির প্রবেশপথে গিয়ে দাঁড়ায়। সেই কপাট যথারীতি বন্ধ। তিনবার কলিংবেল টিপবার পর দোতলা থেকে থপথপিয়ে নেমে এসে দরজা খুলে দিল রমা মাসি। সরকার পরিবারের কেবল রাঁধুনি নয়, সে যেন এই বাড়িরই একজন সদস্যা। অন্যতম সদস্যা।

লেখক মামা তাঁর প্রকাশিতব্য রহস্য উপন্যাসটিতে রমা মাসির যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেটাই এখানে তুলে ধরা হলো ঃ

রমা মাসির পুরো নাম রমা বণিক। বিধবা এই মহিলাকে

জোগাড় করবার কৃতিত্ব মিসেস জিনিয়া সরকারের। যাচ্ছেতাই রকমের স্থূলাঙ্গী। একতলা থেকে দোতলায় উঠতে অথবা দোতলা থেকে একতলায় নামতে তাঁর খুব কষ্ট। তবুও ধনী সরকার পরিবারে রান্নাবান্নার সঙ্গে এই কাজটাও নিষ্ঠার সঙ্গে করে চলেছে বছর পাঁচেক ধরে।

সেই মাসি হাঁপাতে হাঁপাতে সদানন্দকে জানাল, সকাল থেকেই এ বাড়িতে এত তোলপাড়, এতবার দরজা খোলা ও দরজা বন্ধ চলছে যে তার আর শক্তিতে কুলোচ্ছে না। এবার সে অন্য কোথাও কাজ খুঁজে নেবে। মাসি বলছে বটে, কিন্তু তার দু'চোখে কেমন বুঝি ব্ল্যাঙ্কলুক।

সদানন্দ বাড়ির ভেতর দিয়ে ঢুকল রেস্তোরাঁর অভ্যন্তরে। এবং প্রত্যক্ষ করল ওই দৃশ্য। চিৎকার করে বাইরে বেরিয়ে আসে। ম্যাডামকে ফোনে জানাবার কথা আর স্মরণে থাকে না। লোক জড়ো হয়। থানায় খবর যায়। মামাও ফোন পেলেন। কিন্তু আর ফোনে পাওয়া গেল না জিনিয়া সরকারকে। তিনি তো ময়দানে। নির্ঘাত ভাষণ শুনছেন, হাততালি দিচ্ছেন।..

পুলিশের গাড়ি আসতেই ভিড় পাতলা। এতে অনুত্তমেরও কাজের সুবিধা। পাঁচজন কর্মচারীই উপস্থিত। সদানন্দ, নির্মল, অসীম, বিশ্বরূপ, সুধীন্দ্র ও গৌতম।

সদানন্দকে জেরা করার পর্ব শেষ। বাইরে শাটার যেমন বন্ধ ছিল, বন্ধই থাকল। রেস্তোঁরার ভেতরের সবক'টা আলো জ্বালিয়ে চলছে পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ পর্যবেক্ষণ। গভীর থেকে আরও গভীরে ডুব দিচ্ছে অনুত্তম চৌধুরী। একটা জনপ্রিয় রেস্তোঁরার সকল বৈশিষ্ট্যকেও কবজায় আনতে সে যেন বদ্ধপরিকর। যে সমস্ত ভোজনরসিক লোকলস্কররা এখানে ঢুকে এই মাগ্গিগণ্ডার বাজারেও পকেট খালি করে যায়, সেইসব অবতারদের ঘ্রাণও পাচ্ছে হয়তো অনুত্তম। যত রকমের রান্নার বস্তু নিয়ে বড় বড় কাগজের প্যাকেটে তাদের ঢুকিয়ে লাল হরফে লেখা রয়েছে। মোমো, স্ন্যাক্স অ্যান্ড আদারস, স্যুপ, চাইনিস ভেজ, তন্দুর অ্যান্ড কাকাব, ফ্রায়েড রাইস, নুডুলস, চাইনিস নন ভেজ, ইন্ডিয়ান ভেজ, এক, ফিস, চিকেন, মাটন,

ডিফারেন্ট ড্রিঙ্কস..। কেবল অনুত্তম চৌধুরী কেন, তার সাতকুলেও প্রকৃত ভোজনরসিক বলতে কেউ নেই। তবুও তার মনে হলো, সে এমন একটা নির্জন দ্বীপে ঢুকে পড়েছে যেখানে কেবলমাত্র পেটুকরাই আপন আপন হৃদয়েশ্বরীকে নিয়ে আসে এবং ভোজনান্তে গাঢ় তৃপ্তি সরকারে ফিরে যায়। ব্যাগ বস্তা ঠোঙা ইত্যাদি সরাতে সরাতে অনুত্তম আবিষ্কার করল একটা কাঠের পাটাতন বসানো মইকে। রুদ্ধস্বরে অনুত্তম নিজেকেই প্রশ্ন করে, 'এটাকে ঢেকে রাখবার কী অর্থ?'

বলেই সুকান্ত বাগচির মুখের দিকে তাকায়, 'মই কেন আছে এ ঘরে?'

সুকান্ত বললেন, 'দরকার হয় নিশ্চয়।'

'লক্ষ্য করে দেখ, দুটো গুলির একটা চূর্ণ করেছে সরকারবাবুর খুলিকে। অন্যটা বিদ্ধ তাঁর ঘাড়ে। অর্থাৎ খুনি কোনো একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে গুলি করেছিল।'

'ঠিক এবং উঁচু প্ল্যাটফর্মটার ভূমিকার পালন করেছে এই লুকিয়ে থাকা ল্যাডারটা।'

অনুত্তম বলল, 'মইটা অবশ্য এই ঘরেই হয়তো রাখা থাকত। পেরেক ঠোকাঠুকি, মাল ওঠানো নামানো ইত্যাদির কাজে ব্যবহৃত হতো। আর যে খুনি, সে এই মইটার হদিশ রাখত। কেবল তাই নয়, সে সরকারবাবুর নিশ্চয় বিশেষ পরিচিত। সে কারণেই খুনি যখন মইয়ের দু-ধাপ কী তিন ধাপ উপরে উঠছে, সরকারবাবু তখনও আক্রান্ত হবার আশঙ্কা করেননি। উঁচু থেকে বুলেট ছুটে এলো। সরকারবাবু প্রাণ হারালেন। তারপরও খুনি স্থান ত্যাগ করেনি। মইটাকে বস্তা দিয়ে ঢেকে রেখেছে তদন্তকারীকে বিভ্রান্ত করতে। তিনটি সত্যকে দেখতে পাচ্ছি। প্রথম, খুনি সরকারবাবুর বিশেষ পরিচিত। দ্বিতীয়ত, খুনির একার পক্ষে অতটা কাজ করা সম্ভব ছিল না, তাকে সাহায্য করার জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তি মজুদ ছিল। তৃতীয়ত, গুলি চলল, অথচ শব্দ কেউ শুনল না, এটাই বা কেমন? হয়তো তখন অন্য কোনো কলরব প্রকট হয়ে ছিল এই ঘরে অথবা বাইরে।'

সুকান্ত বাগচি বললেন, 'এই এলাকায় সাতটা বাজবার আগে থেকেই শোরগোল চলছিল আজ। ময়দানে নিয়ে যাবার জন্য লোক টানাটানি।'

এরপর অনুত্তম যা করল, তাতে সুকান্ত বাগচিও হকচকিয়ে যান, যেহেতু এই কাজটা তাঁরই করা উচিত ছিল। যেন বিদ্যুৎ গতিতে দেয়ালে ঠেকিয়ে মইটার ওপর পা রেখে রেখে উঁচুতে উঠে যায় এবং প্রশস্ত ঘুলঘুলির মধ্যে রুমাল সমেত হাত ঢুকিয়ে বের করে আনে ছয় গড়ার একটি পিস্তল— যার আঁতুড়ঘর খোদ চীনে। সুকান্তর হাতে ওটাকে সাবধানে তুলে দিতে দিতে অনুত্তম বলে, 'সাবধান। আঙুলের ছাপ পেলেও পেতে পারো।'

অতঃপর দ্বিতীয় দফার জিজ্ঞাপর্ব। যাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, তাঁরা কেউই শাঁসালো নয়। আপাতভাবে মনে হবে, এরা কেউই খুনের সঙ্গে জড়িত হবার যোগ্য নয়। তবুও রেহাই নেই।

সদানন্দর পালা সাঙ্গ হয়েছে আগেই। এবার সেই পৃথুলা রমা মাসির পর্ব। বুড়ি রীতিমতো কাঁপছে। সংলাপ চালিয়ে যাবার মতো সামর্থ্য আছে কিনা সন্দেহ। এমন অস্থিরতা যেন তার কান দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে। সুকান্ত বাগচি তাকে জল খাওয়ালেন। তারপর শোনা গেল রমা মাসির গলা, 'আমাকে আবার কেন? আমাকে—'

অনুত্তম আচমকা দাবড়ে ওঠে, 'আপনিই তো সব জানেন। ওসব ন্যাকামি ছাড়ুন। সোজা হাজতে ঢুকিয়ে দেবো।'

রমা মাসির দু'চোখে নিশুতি রাতে ভূত দেখার আতঙ্ক, 'হাজত!'

'হ্যাঁ, হাজত। উঠতে বসতে রুলের গুঁতো।'

'না, না, বাপ আমার! না, না। যা জানি, সব কইবো। কিচ্ছুটি লুকোবো না।'

'আগে এই চেয়ারটাতে বসুন।'

রমা মাসি ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়ে।

অনুত্তম : রাতে ভালো ঘুম হয় আপনার?

মাসি : ঘুম আসতে চায় না। আসলেও কেমন যেন ছানাকাটা, ছানাকাটা। একটা ইঁদুর, কী একটা প্রজাপতিও ঘরে ঢুকলেও টের পাই।

অনুত্তম : বাঃ। এই তো বেশ গুছিয়ে বলতে পারছেন। তা আপনার এই যে ঘুমের অসুবিধা, এটা কখনো বাবু বা তার বউকে জানিয়েছেন?

রমা মাসি কিছুক্ষণ নিরুত্তর। নিজের বুককে কাপড় দিয়ে আরও খানিকটা আবৃত করে। এমন তার অভিব্যক্তি, যেন যথাযথ শব্দের অন্বেষণে আছে সে। ক্রমে শোনা গেল তার অভিমানী কণ্ঠস্বর, 'ওদের কী তা শোনার মতো মন আছে? নাই। এই ভূখণ্ডে আমার আপন বলতে কে? কেউ নয়।'

মাসি দম নেয়। অনুত্তম যুগপৎ বিস্মিত ও উল্লসিত। রমা মাসি তো সাধারণ নয়। ভাষার ওপরও দারুণ দখল। 'ভূখণ্ড'— এই শব্দটাই যেন অনুত্তমের কর্ণকুহরে মুহূর্ত কয়েক নৃত্যরত অবস্থায় থাকে। অনুত্তম শুনছে মাসির পরবর্তী কথাগুলি— 'ওরা নিজেদের মধ্যেই এটা-সেটা নিয়ে যা খিচ্ খিচ্ করত, আমার তো গায়ে কাঁটা দিত। আচ্ছা, এ এলাকায় কোনো বাড়িতে এত টাকা ঢোকে রোজ? তবু বাবু মামণিকে গুনে গুনে টাকা দেন, হিসেবও নেন। আগে কিন্তু এমনটি ছিল না। সেইসব দিনে কত ভাব আমি তাঁদের দেখেছি। সত্যি বলছি বাবু,

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভাব ভালোবাসা একেবারেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। যে কোনো অছিলায় ঝগড়া খিস্তি-খামারি। কাল ল্যাপটপের একটা ব্যাগ নিয়ে কী কথা কাটাকাটি।'

অনুত্তমের দুচোখে উজ্জ্বলতা বাড়ে। সুকান্তও বুঝতে পারে, অল্প আলাপেই বুড়ি যেন হড়পা বানে ভেসে যাচ্ছে। দুঁদে গোয়েন্দা এবার নাকে দড়ি দিয়ে ঠিক টেনে আনবেন সঠিক মুহূর্তে। অনুত্তম সিগারেট ধরায়। সিগারেটের গন্ধে যে রমা মাসির দুরবস্থা বাড়ে, সেটাও বোঝা গেল।

সিগারেট হাতে অনুত্তম উঠে দাঁড়ায়। নিজের চেয়ারটাকে সমকৌণিক করে রমা মাসির দিকে খানিক ঝুঁকে প্রশ্ন করে, 'তাঁর মানে, আপনি বলতে চাইছেন, সত্যনারায়ণ সরকার তাঁর স্ত্রী জিনিয়া সরকারের গুলিতেই প্রাণ হারিয়েছেন! তাই তো?'

রমা মাসি আর্তনাদ করে ওঠে, 'আমি এমন কথা কখন বললাম গা! আর ওটা হবেই বা কী ভাবে? মামণি মানে জিনিয়া বউদি তো তখন মিছিল সাজাবেন বলে পা বাড়াতে চলেছেন। যাবার আগে বাবুর সঙ্গে কী যেন বলতে বন্ধ দোকানে ঢুকলেন। বাইরে তখন মহা হল্লাগুল্লা। আর আমাকে তো নিজের কাজ নিজেকেই করতে হয়। রান্নাঘরে আছি। বউদিদির ডাক কানে এলো। কোনোরকমে নীচে নামলাম। বউদিদি বললেন, কোলাপসিবলটা টেনে দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিতে। এ কাজ তো আমিই করে থাকি। সেটাই করে আবার উঠে গেলাম রান্নাঘরে।'

টানা বলে গেল রমা মাসি। তারপরই আচমকা তার কান্নায় ভেঙে পড়া। কাঁদবার সময় মুখ গহ্বর খুলে যায়। দেখা গেল দুই সারি অটুট গুটকা খাওয়া বাদামি বর্ণের দাঁত।

বেমক্কা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হুংকার ছাড়ে অনুত্তম, 'এই বুড়ি, তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেব। গপ্প ফাঁদবার আর জায়গা পাওনি? পুলিশ কতটা তোমাকে নাজেহাল করতে পারে, জানো? ছুতো-নাতায় মিসেস সরকারের কাছ থেকে তো ভালোই মালকড়ি পেয়ে থাকো।'

আবার সেই আর্তরব, 'কী সব বলছেন?'

বুক চিতিয়ে চেয়ারে বসতে বসতে অনুত্তম বলে, 'একদম ঠিক বলছি। অত গুটকা কেনার পয়সা কে যোগায়? আজ বের হবার আগে মিসেস সরকার কত টাকা দিয়ে গেছেন তোমাকে? মিথ্যা বলার চেষ্টা করলে ঠেলতে ঠেলতে ঢুকিয়ে দেব লকারে।'

ফোঁপানো ও জড়ানো গলায় উত্তর এলো, 'কুড়ি টাকা।'

‘কে এনে দিল ওই টাকায় তোমার গুটকা?’

‘কেউ এনে দেয়নি, বাপ। আমি নিজেই কিনে এনেছিলাম সুমনের দোকান থেকে।’

‘সেটা কোথায়?’

‘বাস স্ট্যান্ডের কাছে।’

‘তার মানে, বাড়ির দরজা খোলা রেখেই চলে গেলে গুটকা কিনতে?’

বুড়ি নিরুত্তর। কাঁপুনি আবার বাড়ছে।

‘তখন সময় কত?’

‘সাড়ে সাতটা।’

‘তখনও নিশ্চয় ময়দানে যাবার লোকেরা ভিড় করে রয়েছে?’

‘ছিল তারা। কে কোন গাড়িতে উঠবে, তাই নিয়ে চেল্লাচেল্লি।’

‘আর তা থামাবার চেষ্টা করছেন ফরিদ আহমেদ এবং জিনিয়া সরকার। ঠিক বলছি তো?’

‘একদম ঠিক। এমনভাবে বলছেন, যেন সেই সময় আপনি ওখানেই ছিলেন।’

‘আমি যে আরও কিছু দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি বলেই তো উঠি উঠব করেও উঠতে পারছি না। আঁকশি দিয়ে নামিয়ে আনছি একটার পর একটা জ্যান্ত ছবি। এই বাড়িতে আজ সকাল থেকে কে কী করেছে, সব দেখতে পাচ্ছি এই খুনের ঘরে সাহেনশার মতো বসে থেকেও।’

‘দেবত্বর মতো, কিন্তু যেন বৈরাগ্যের গলায় কথাগুলি বলে গেল অনুত্তম চৌধুরী। মামার আগ্রহ ও সুকান্তের বিস্ময়— এই দুই মিলে তৈরি হয়েছে প্রচ্ছন্ন এক গর্বের ক্ষেত্র। প্রতিক্রিয়ারও একটা সময়সীমা থাকে। সেই সীমার মধ্যেই কোনো ভাবনা প্রসূত নয়, স্রেফ আতঙ্কপ্রসূত কম্পনে শিহরিত রমা মাসি এক রকম চিৎকার করে ওঠে, ‘কী দেখতে পাচ্ছেন?’

প্রতিক্রিয়ায় তীক্ষ্ণ হাসি হেসে অনুত্তম বলতে থাকে, ‘এই তো সেই পরিষ্কার নকশাটা। জিনিয়া সরকার পথে লাইন ম্যানেজমেন্টের কাজ ফেলে রেখে সাঁ করে ছুটে এসে গেলেন তোমার কাছে। ব্লাউজের ভেতর থেকে বের করে আনলেন এক থাবা পাঁচশো টাকার নোট। গুঁজে দিলেন সেইগুলিকে তোমার বুকের মধ্যে। কী হাসি হাসি মুখ তোমার! অত টাকা জীবনে দেখোনি। কী বুড়ি, তুমিও ছবিটা ঠিক দেখতে পাচ্ছো তো? নাকি আরও বিশদে বলতে হবে?’

রমা মাসির দুই চোখে অর্ধগোলাকৃতি রক্তের গুটি কয়েক দানা ঘুরছে। সে যেন কোনো প্রেক্ষাগৃহে বসে একটি খুনে দৃশ্য দেখছে। এই হাট্টাকাট্টা লোকটা তাকে সেই ছবিটা দেখিয়েই ছাড়বে— যে গোপন মনসবদারিতে সবটাই নিখুঁত নয়, কিন্তু প্রায় হুবহু। স্নায়ুর চাপে পর পর মাসিকে সামাল দিলেন সুকান্ত বাগচি। রমা মাসি বিড় বিড় করছে, ‘মোটেই এক থাবা পাঁচশো টাকার নোট নয়। মাত্তর তো সাতখানা একশত টাকার নোট। তবুও টাকা তো! আমি কী সাড়া না দিয়ে পারি!’

অনুত্তম টেবিলে চাপড় মারে, ‘ছিঃ ছিঃ ছিঃ, মাত্র সাতশো টাকার লোভে অত বড় মিসহ্যাপ। পিস্তল হাতে কানাকুঠুরির মতো দোকানটায় ঢুকে মইয়ের দু-ধাপে উঠে গুলি করে মারতে পারলে সরকারবাবুর মতো মানুষকে! ছিঃ!

মাসি এবার সত্যি চেয়ার থেকে পড়ে গিয়ে মেঝেতে গড়াগড়ি খায়, অস্ফুট গলায় বলতে থাকে, ‘আমি গুলি করিনি, বাবু। আমি কেবল পরে মইটাকে ঢাকাঢুকি দিতে সাহায্য করেছি। পিস্তল ওপরে রাখবার সময় মইটা যাতে নড়বড় না করে তার জন্য চেপে ধরেছিলাম ওর দুটো ধাপকে। সাতশো টাকার জন্য এটা তো করা যায়!’

অনুত্তমের গলাও চাপা, ‘জিনিয়া সরকার যে গুলি দুটো ছুঁড়লেন, শব্দ হয়নি?’

রমা মাসির জবাব, ‘হয়েছিল। কিন্তু বাইরে তখন বউদিমণির মেয়ে মানুষরা কোন গাড়িতে ছানাপোনাদের নিয়ে উঠবে, তাই নিয়েই খুব হল্লা করছিল। গুলির আওয়াজ কারোর কানে ঢোকেনি।’

জিনিয়া সরকারের খাস আলমারিটার তালা ভাঙতেই মিলে যায় প্রার্থিত সাবুদ। একখানা ঝাঁ চকচকে অ্যালবাম। ভেতরের পাতায় পাতায় ফরিদ আহমেদ এবং জিনিয়া সরকার। এমন সমস্ত ছবি, যাদের সঙ্গে তুলনীয় বিজ্ঞাপনের সেই অভিপ্রকাশ — যাদের অনুত্তমের মনে হয়েছে, পর্নোগ্রাফির চেয়েও অশ্লীল।

কান তো নিরবধি। দুপুর তিনটে নাগাদ সদানন্দের কমদামি ফোন হাঁক মারে। সুইস টিপতেই জিনিয়া সরকারের উৎকণ্ঠায় কম্পমান স্বর, ‘সব ঠিক আছে তো, সদানন্দ?’

সদানন্দ পুলিশ অফিসার সুকান্ত বাগচির দিকে তাকিয়ে চোখ টেপে, বলে, ‘সব ঠিক আছে বউদিমণি! কেবল বাবু সেই যে কোন ভোরে দোকানে ঢুকেছিলেন, আর বের হননি।’

বলেই ফোনটাকে বোবা করে দেয় সদানন্দ। ■

হিন্দু জাতীয়তাবাদের আখ্যান

জয়ন্ত ঘোষাল

প্রথম যেবার শ্রীনগর গিয়েছিলাম, সে বহুবছর আগের কথা। সেবার কাশ্মীরের প্রাচীনতম শিব মন্দিরটি দেখে এক অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল। অনেক সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে হয়েছিল। ইতিহাস বলে, সেই কোন সুদূর দক্ষিণ দেশ থেকে এসে শঙ্করাচার্য এই মন্দিরটি স্থাপনা করেন। সেদিন বারবার মনে হচ্ছিল, দিল্লিতে বসে কাশ্মীর বললেই মনে হয় এটি তো মুসলমান সমাজের ভূখণ্ড। চারার-ই-শরিফ বা হজরতবাল সর্বত্র গেছি, কিন্তু কাশ্মীর মানেই যে মুসলমান শাসনের ইতিহাস নয় সে কথা কেউ মনে করিয়ে দেয় না।

কলহনের রাজতরঙ্গিনী পড়লে বোঝা যায়, এই কাশ্মীর শহরটিতে কতখানি হিন্দুধর্মের প্রভাব ছিল। হিন্দু রাজাদের শাসনকালেও এই অবিভক্ত জম্মু কাশ্মীর লাদাখ সর্বত্র এক অসাধারণ বহুত্ববাদ ছিল। হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ সব রকমের মানুষ ছিল।

কলহনের রাজতরঙ্গিনী তদানীন্তন কাশ্মীরের সমসাময়িক ইতিহাসের দলিল। সেসময় সুশাসন যেমন ছিল, ঠিক তেমনভাবে অপশাসনও ছিল। এমন কোনো শাসন হয় না যেখানে সু আর কু-এর সহাবস্থান হয় না, এটাই ইতিহাসের নিয়ম। কিন্তু আজ স্বাধীনতার এতগুলো বছর পর মনে হচ্ছে মস্ত বড়ো ভুল হয়ে গেছে। কাশ্মীর থেকে হিন্দু উদ্বাস্তু পণ্ডিতরা জম্মুতে ও অন্য রাজ্যে পালিয়ে চলে আসতে বাধ্য হয়, তখন দেশের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সেই হিন্দু উদ্বাস্তুদের জন্য কতটা সময় দিয়েছিলেন? তখন কেন তিনি শেখ আবদুল্লাকেই খুশি রাখতে ব্যস্ত ছিলেন? তখনও কি তিনি দেশভাগের পর পাকিস্তানের কাশ্মীরি মুসলমানদের ওপর প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়ে চিন্তিত ছিলেন? সেদিন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যেভাবে হিন্দু উদ্বাস্তুদের নিয়ে সোচ্চার হন, এমনকী সর্দার প্যাটেলও যেভাবে কাশ্মীরের বিতাড়িত হিন্দুদের জন্য সোচ্চার হন, নেহরু তা হননি। উল্টে সেসময় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ নাগরিক সমাজ মনে করত যে, ভারতে হিন্দু মানে কংগ্রেস নয়, হিন্দু মানে হিন্দু মহাসভা। হিন্দু জাতীয়তাবাদ মানে হিন্দু সংকীর্ণতা। কিছু ধনী বানিয়া, যাদের শিক্ষাদীক্ষা নেই, ভালো করে ইংরেজিতে কথা বলতে পারে না, জুতো পরে না, খালি পায়ে হাঁটে, নিরামিষ খাবার খায়, আর ফলের রস খায়। উপন্যাসকার পল স্কট লেডি লিলি চ্যাটার্জির মতো এক patritian lady-র জবানিতে সেই সময় হিন্দুদের এভাবে বর্ণনা করা হয়। সম্প্রতি স্বপন দাশগুপ্ত তার

Awakening Bharat Mata : The Political Beliefs of the Indian Right গ্রন্থের ভূমিকায় এই ধরনের বহু তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন, যা থেকে জানা যাচ্ছে বিদেশি কূটনীতিক ও ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত অভিজাতরা ভারতীয় হিন্দুদের অশিক্ষিত কিছু বৈশ্যদের ব্যাপার বলে মনে করত। ভারতের অন্তরাত্মায় যে হিন্দু মনোভাব জীবিত ছিল, তা কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীকায় প্রবাহিত ছিল। কিন্তু তাকে অবজ্ঞা করেছিল এই অভিজাত ব্রিটিশ ভক্তরা। নেহরু নিজেও 'RSS mentality' বলে একটি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। সেদিন তাই নেহরু যে বহুত্ববাদের কথা বলেছিলেন, যে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র বা তারও আগে লন্ডনের ফেবিয়ান সমাজতন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত হন, তা ভারতে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে নেহরু ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের হিন্দু চেতনাকে অবজ্ঞা করেন। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির এই মানসিকতা কিন্তু আজও সেই একইভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। আর তাই আজ হঠাৎ দুর্বল এই শক্তি গেল গেল রব তুলে আর্তনাদ করেই চলেছে। নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে শুরু হয়ে এবার ২০১৯ সালে নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতাসীন হওয়ার পরও অভিযোগ উঠছে যে হিন্দি ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের নামে এক ধরনের সাম্প্রদায়িকতাকে ভারতে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এর ফলে ভারতীয় সমাজে রাজনৈতিক মেরুকরণ এবং অসহিষ্ণুতা বাড়ছে।

এই আখ্যানটি হলো নেহরুবাদী সুপ্রাচীন আখ্যান। জনসঙ্ঘ প্রথমে, পরে বিজেপি এবং ১৯২৫ সালের জন্মলগ্ন থেকে আর এস এস এই নেহরুবাদী আখ্যানটির বিরুদ্ধে এক পাল্টা হিন্দু জাতীয়তাবাদী আখ্যান তুলে ধরার চেষ্টা করছে। এই লড়াইটা আসলে চিরকালই ছিল, তবে মানুষের বিপুল ভোটে জেতার পর বিজেপি তাদের এতদিনের সযত্নে লালিত ভাবাদর্শকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করবে এ তো অত্যন্ত স্বাভাবিক এক ঘটনা। ফলে ভারতের রাষ্ট্র চরিত্র ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক না উদার গণতান্ত্রিক সেসব তো চলতেই থাকবে। মূল বিতর্ক তা নয়, মূল বিতর্ক হওয়া উচিত যে ভারতীয় সভ্যতার শিকড় এক হিন্দু ধর্ম চেতনার মধ্যে নিহিত আছে। সেই সহজ সরল ঐতিহাসিক সত্যকে আজ মানার সময় এসেছে কিনা ! অনেকে বলেন, নেহরুবাদী ভারত আখ্যানের বিরুদ্ধতায় মোদীর পাল্টা ভারত আখ্যানের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে। আসলে তা সত্য নয়। সত্য হলো, ভারতের আদি আখ্যান যেটি বেদ-উপনিষদ-গীতা থেকে আদি শঙ্করাচার্য রচনা করে দিয়ে গেছেন, সেটিকে ১৯৪৭ সালের পর কংগ্রেস নেতৃত্ব বিস্মৃত হয়ে বিদেশি পাশ্চাত্যবাদ এবং সমাজতন্ত্রকে ভারতীয় রাজনীতিতে আনেন, ক্রমশ সেটিকেই ভারতীয় মূলস্রোত বলে আখ্যা দেওয়া হয়। হিন্দু ধর্মের মধ্যেও নানা বৈচিত্র্য ছিল শৈব, বৈষ্ণব এবং শাক্ত। ন্যায় বৈশোষিক দর্শন থেকে কপিলের সাংখ্য চার্বাক মতবাদ এবং বৌদ্ধ দর্শনও দরজায় কড়া নাড়ে। হিন্দুধর্ম এমন এক ধর্ম যেটি কোনো একজন ব্যক্তির মতবাদ নয়, এ ছিল এক সভ্যতা। এ ছিল এক way of life। ভারতীয় জীবন চর্যা। তাই বিতর্ক হিন্দু ধর্মের মধ্যেও ছিল। বিতর্ক আলাপ-আলোচনা কাঙ্ক্ষিত, কিন্তু তার মানে হিংসা এবং অসহিষ্ণুতা নয়। বামপন্থী তথাকথিত উদারবাদীরা বলতে চান আর এস এস এই মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা এবং হিংসা নামক অস্ত্র প্রয়োগ করেছে। কতিপয় ব্যক্তি যদি গো-রক্ষক বা উগ্র হিন্দুত্ববাদী সেজে হিংসার ঘটনায় জড়িত হন, তাহলে কিন্তু সেই বিচ্ছিন্ন বিচ্যুতিকে সঙ্ঘের দর্শন বলে প্রচার করা অন্যায়। মাওবাদীরা হিংসার আশ্রয় নিলে সংসদীয় গণতন্ত্রে আস্থাশীল মার্কসবাদীরা বলেন, মাওবাদীদের হিংসা বিচ্যুতি। তবু হিন্দু কোনো সংগঠন তো এতটা বিচ্যুত হয়নি, যেখানে হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের জন্য কোনো ঘোষিত সশস্ত্র সংগঠন তৈরি করা হয়েছে।

মহাভারতে আছে, 'Sukshma Vivado Vipranam Shula Kshatro Jayayayao' অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা বিনম্র বিতর্কের মধ্য দিয়ে জয়-পরাজয়ের বিচার করেন আর ক্ষত্রিয়রা ভয়ংকর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। এমনকী, ম্যাক্স ওয়েবারের মতো সমাজতাত্ত্বিকও ভারত গবেষণা করে বলেছিলেন, 'It is an undoubted fact that in India, religious and philosophical thinkers were able to enjoy perfect, nearly absolute freedom for a long period. The freedom of thought in ancient India was so considerable as to find no parallel in the west before the most recent age'।

স্বাধীনতার আগে জাতীয় কংগ্রেসের মঞ্চ ছিল এক মুক্ত মঞ্চ। সেই কংগ্রেসে বালগঙ্গাধর তিলকের জাতীয়তাবাদী ভাবনা ছিল যাকে আজকাল তাত্ত্বিকরা অভিহিত করেন Tilak mechanism' আবার বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ যাদব থেকে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় পত্তনের প্রধান নেপথ্য শিল্পী মদনমোহন মালব্য, বল্লভভাই প্যাটেল— এঁরা সকলেই ভারতীয় হিন্দু ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে এগোতে চেয়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতাকে একেবারে ঝুঠা কমিউনিস্টদের মতো কখনোই বলবো না, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা জন্মসূত্রে প্রতিবন্ধী ছিল। অনেকে বলেন, স্বাধীনতা নয়, এ হলো

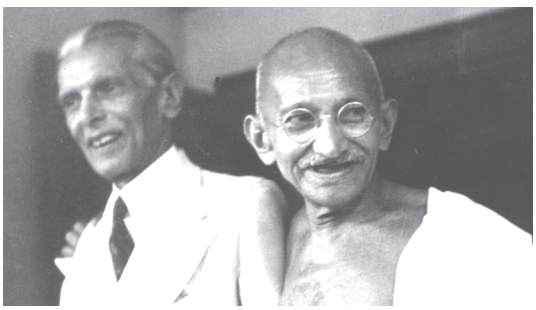

ক্ষমতার হস্তান্তর মাত্র। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মধ্যরাত্রে জন্ম নিয়েছিল এক ডোমিনিয়ন। একদিকে পশ্চাদপসরণ করেও ব্রিটেন নিজের স্বার্থ ভোলেনি, অন্যদিকে রণ-ক্লান্ত কংগ্রেস নেতৃত্বের এক অপ্রতিরোধ্য ভারতকে লড়তে হয়েছে দুই দিকে। একদিকে ছিল সাম্রাজ্যবাদ আর অন্যদিকে ছিল সাম্প্রদায়িকতা, এমনকী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গেও লড়তে হয়েছিল কংগ্রেস নেতৃত্বকে। সে সময় সাম্প্রদায়িকতাকে ব্রিটেনের কর্তৃপক্ষ প্রশ্রয় দিয়েছেন কিন্তু দুর্ভাগ্য বেশ কিছু কংগ্রেস

নেতা তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ব্রিটিশ কৌশলের ফাঁদে পড়ে যান। মুসলমান সমাজ সম্পর্কে রাজনৈতিকভাবে নরম মনোভাব নিতে গিয়ে কখন কীভাবে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠতার সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে, তা কংগ্রেস নেতারা টের পাননি। অমলেশ ত্রিপাঠীর মতো ঐতিহাসিকও লিখেছেন, গাঁধী, নেহরু ও সুভাষচন্দ্র ছাড়া সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক নেতা স্বাধীনতার আগে বোধহয় কাউকে বলা যায় না। এই সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে বিবাদ তাই সুপ্রাচীন। নতুন ঘটনা হলো, নরেন্দ্র মোদী ভারতের সিংহাসনে আসীন হয়ে প্রথম ঘোষণা করেছেন যে, এই সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের মূল স্রোতটিকে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে হবে, এটি হলো ভারতীয় কণ্ঠস্বর। অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী হবার পর কিন্তু এই ভারত চরিত্র নির্মাণ, বিনির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ নিয়ে বিতর্ক হয়নি, কিন্তু কেন হয়নি? আমার মনে হয়, প্রথমত, বাজপেয়ী জামানায় বিজেপির সরকার ছিল না, তখন জোট শরিক দলের নেতাদের শর্ত মেনে চলতে হতো তৎকালীন এনডিএ সরকারকে। দ্বিতীয়ত, বাজপেয়ী নিজেও নেহরু ভক্ত ছিলেন। তিনি যখন প্রথম সংসদীয় রাজনীতিতে পদার্পণ করেন তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। একদিন তো বাজপেয়ীর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ নেহরু নাকি বলেছিলেন, তুমি একদিন দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারো। বিদেশমন্ত্রী হয়ে বাজপেয়ী যখন ১৯৭৭ সালে সাউথ ব্লকে প্রথম প্রবেশ করেন, তখন কোনো অত্যুৎসাহী আমলা সাউথ ব্লকে রক্ষিত নেহরুর এক বিশাল চিত্র সরিয়ে দেন। বাজপেয়ী সেই ছবি না দেখতে পেয়ে অফিসারদের জিজ্ঞাসা করেন, নেহরুর সেই ছবিটি দেখা যাচ্ছে না কেন? বাজপেয়ীর নির্দেশে স্বস্থানে ছবিটি আবার বহাল হয়। এ ঘটনায় আমি মনে করি, বাজপেয়ী ঠিক কাজই করেছিলেন। নেহরুর ছবি সরিয়ে ফেলা, এ তো অনেকটা নকশালদের বিদ্যাসাগর মূর্তি ভাঙার মতো ভাবনা। নেহরু ভারতের ইতিহাসের এক সফল অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। নিরবচ্ছিন্ন ভারতের সমালোচনা করা অনাবশ্যক। আজ দলীয় রাজনীতিও বড়ো 'হ্যাঁ' অথবা 'না'-এই ধরনের সাদা এবং কালো দুই চরমপন্থী মনোভাবের দাসত্বের শিকার। নেহরুর গুরুত্ব স্বীকার করেও বলতে হবে, তিনি অনুসন্ধিৎসু চিত্তে ভারত আত্মার অনুসন্ধান করেছিলেন। কিন্তু গান্ধীর মতাদেশ থেকেও আসলে তিনি ছিলেন অনেক দূরে। বরং সুভাষচন্দ্র বসু এবং নেহরু দুজনেই সমাজতন্ত্র এবং পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষতার মডেল অনুসরণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ভারতীয় কমিউনিস্টদের প্রসঙ্গ আমাকে উত্থাপন করতেই হবে। দেখুন, ১৯২৫ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম, আবার এই ১৯২৫ সালে আর এস এসের মতো সংগঠনেরও জন্ম। আজ গোটা দেশে কোথায় মার্কসবাদীরা আর কোথায় সঙ্ঘ পরিবার। কেরল আর পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া কমিউনিস্টরা কোথাও নেই। পশ্চিমবঙ্গেও বিজেপি এক নতুন শক্তি হিসেবে মাথাচাড়া দিয়েছে। এমন তো ছিল না। গোটা দেশে ডাঙ্গের মহারাষ্ট্র, সুরজিতের পাঞ্জাব, সিতারামাইয়ার অন্ধ্রপ্রদেশ— কোথায় গেল সেই হারানো ক্ষমতা! দিল্লিতে আজও আছে অরুণা আসফ আলি রোড। অরুণা আসফ আলি দিল্লি পুরসভার প্রথম মেয়র হন। তখন দিল্লিতে জনসঙ্ঘ এবং আর এস এস দুর্বল শক্তি, আর আজ কমিউনিস্টরা কোথায়? কেন এমন হলো অনেকে অনেক ব্যাখ্যা দেন। কমিউনিস্টরা বলেন, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় ভারতীয় কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার করা এবং তারপর স্তালিনীয় আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারতীয় মার্কসবাদ প্রসারিত হতে পারেনি। আমি বলি, আর এস এস ভারত ভাবনাকে মূলধন করে সামাজিক উন্নয়ন ও বিকাশের পথে এগোলো। তাই পেয়েছিল জনসমর্থন, যা কমিউনিস্টরা করেনি। ১৯৪৭ সালের জুলাই, আগস্ট ও ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মার্চ-এর মধ্যে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নীতিতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। পি সি যোশীর নেতৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করে কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটব্যুরো বি আর রণদিভের নেতৃত্বকে গ্রহণ করে।

রজনী পাম দত্ত লন্ডনে থাকতেন। তিনি নেহরুর ভূয়সী প্রশংসা করলেন। জাতিপুঞ্জে নেহরুর ভূমিকারও প্রশংসা করেন তিনি।

তখন কমিউনিস্টরা ছিলেন নেহরুভক্ত, কিন্তু গান্ধী বিরোধী। আর সবচেয়ে বেশি বিরোধী ছিলেন সর্দার প্যাটেলের। কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য ছিল, দলের বাইরে বামপন্থী কংগ্রেসের ভেতরকার প্রগতিশীল সবাইকে নিয়ে সরকার গড়তে হবে। তবে রণদিভে অবশ্য এই কংগ্রেস প্রেমের নীতি বদলে দেন। আবার ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় মাউন্টব্যাটেন তো গান্ধীকেই দূরে সরিয়ে শেষ বোঝাপড়ায় নেহরুকে গুরুত্ব দেন। দেশভাগের সিদ্ধান্ত গান্ধীকে বাদ দিয়ে করা হয়েছিল। অমলেশ ত্রিপাঠীর মতো ঐতিহাসিকও লিখেছেন, গান্ধীকে ব্ল্যাকমেল করা হয়। দেশভাগ নিয়ে কথা বললে নেহরু-প্যাটেলরা ইস্তফা দেবেন এমন কথা গান্ধীকে বলা হয়েছিল।

আজ এত বছর পর নরেন্দ্র মোদী মানুষের সমর্থন নিয়ে এগোচ্ছেন। তিনি একদিকে আধুনিক নেতা। অর্থনীতিতে খোলাবাজারের সংস্কারে বিশ্বাসী। সরকারের সামন্ততান্ত্রিক ভূমিকাকে তিনিও অনেকটাই খর্ব করে দিচ্ছেন। অন্যদিকে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করে তোলাও তাঁর অগ্রাধিকার। সাধারণ ভাবে মানুষ জাতি, রাষ্ট্র ও সরকার— এই তিনটি বিভাগকে একই বলে মনে করেন। আসলে সরকার প্রশাসনের কেন্দ্র, কিন্তু জাতি অনেকটা মনস্তাত্ত্বিক সত্তার মতো। জাতির শরীরের উপাদন রাষ্ট্র ও সরকার, কিন্তু জাতি মানে জাতীয়তার এক বিমূর্ত ধারণা। অ্যারিস্টটলের রাষ্ট্রতত্ত্ব ছিল জৈব তত্ত্ব। সেখানে রাষ্ট্র প্রাণীর শরীরের মতো। বস্তুর মতো। কিন্তু নেশনের ধারণা হলো পুঁজিবাদের উন্মেষের প্রাক লগ্নে উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে। আজ মোদী এই জাতি ও জাতীয়তা ভাবনার পুনঃ পর্যালোচনা শুরু করেছেন। এতে সমস্যা কোথায়? বালগঙ্গাধর তিলক বলেছিলেন, শুধু স্বরাজ্য নয় হিন্দু ধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য শিবাজীর আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'তব ভাল উদ্ভাসিয়া তড়িৎ প্রভাব এসেছিল নামি /এক ধর্মরাজ্য পাশে খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দেবো আমি।' রবীন্দ্রনাথ একথা লিখেছেন, তবে মার্কসবাদীরা আজও শিবাজীকে বর্গী দস্যু বলে মনে করেন। পূর্ব ভারতে মুসলিম আলিবর্দি খাঁ তাদের আক্রমণ থেকে জনগণের জান-মান রক্ষা করেন। এখন প্রশ্ন হলো, গোটা দেশের মানুষদের মধ্যে যদি অভিমত সংগ্রহ করা হয়, পরীক্ষা হয়, তাহলে আমার কিন্তু মনে হয় সাধারণ ভারতীয় আমজনতা শিবাজী মহারাজকে 'দস্যু' বলে মনে করে না। তিনি মুঘলদের সঙ্গে লড়াই করেছেন, আবার ব্রিটিশ বিরোধী লড়াইয়েও তো শিবাজীকে ব্যবহার করেছিলেন চরমপন্থী তিলক।

আজ এত বছর পর যদি ভারতের জাতীয়তাবাদের হিন্দু উপাদান নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়, তবে তা অবশ্যই স্বাগত জানানো প্রয়োজন। একটা ছোট পুরনো গল্প শুনিয়ে লেখা শেষ করব। ব্রিটেনের সংসদে গিয়েছিলেন ভারতের সাংসদদের এক প্রতিনিধি দল। তখন লোকসভার স্পিকার ছিলেন রবি রায়। ব্রিটেনে অবস্থানকাল ওই প্রতিনিধি দল একটি নৈশভোজে গেছেন। দলে ছিলেন লালকৃষ্ণ আদবানি। টেবিলে ওর একপাশে বাসুদেব আচার্য, অন্যদিকে এক ইহুদি সাংসদ। টেবিলে খাবার দেওয়া শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু কেউ আহারে হাত দিচ্ছেন না। আসলে প্রথা ছিল চ্যাপলিন আসবেন। প্রার্থনা হবে, তারপর সংসদীয় নৈশ ভোজ শুরু। আদবানি বললেন, বাসুদেববাবু আপনি তো কমিউনিস্ট। নাস্তিক হওয়ার কথা। আর আপনি তো ইহুদি। তাহলে খামোখা খ্রিস্টান প্রথা সবাইকে মানতে হচ্ছে কেন? সে প্রশ্নের জবাব ছিল, লন্ডনে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজ খ্রিস্টানদের। তাই সংসদে এই প্রথা। পাশ্চাত্যবাদী, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ভারতীয়রা ব্রিটিশ প্রথা সম্পর্কে নীরব চিরকাল।

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক)

ধুলো

সন্দীপ চক্রবর্তী

বয়েস বাড়লে দৃষ্টি না দৃশ্য কোনটা বেশি ঘোলাটে হয়ে যায় রমেন রায়চৌধুরী ঠিক আন্দাজ করতে পারেন না। ঘরের দুটো জানালাই খোলা। সেই কখন থেকে তিনি ঠাহর করার চেষ্টা করছেন, এখন সকাল না সন্ধ্যা। কিন্তু দলা দলা কুয়াশা ছাড়া কিছুই চোখে পড়ছে না।

কোনো শব্দ কি শুনতে পাচ্ছেন? কান খাড়া করলেন রমেনবাবু। মনে হলো পাচ্ছেন। একটানা ঘড়ঘড় একটা শব্দ। এ শব্দ তার চেনা।

আশ্বস্ত হলেন রমেনবাবু। যাক। আজ তা হলে কফের জঞ্জাল সরিয়ে বুকের ভেতর হাওয়া খেলছে। নয়তো এখনই বুকে গরম তেল মালিশ করতে হতো।

এই এক জ্বালা। আলো আছে, মাটি আছে, জল আছে, কিন্তু হাওয়া নেই। অন্তত তার জন্য নেই। এ কী অনাসৃষ্টি কাণ্ড রে বাবা! পৃথিবীতে প্রাণী থাকবে আর তাদের নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত হাওয়া থাকবে না? এসব কথা মনে পড়লে রমেনবাবু রেগে যান। চাকর নন্দকে গালিগালাজ করেন। যেন নন্দর জন্যই তার শ্বাসকষ্ট।

সোনালদি গ্রামের লোকে বলে, বুড়োর ভীমরতি ধরেছে। তাদের অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। বয়েস হয়েছে বই কী রমেনবাবুর। গত চৈত্রে পঁচাত্তরে পা রেখেছেন। আধিব্যধিরও শেষ নেই। তাপমাত্রায় সামান্য হেরফের হলেই হাঁপের টান এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে মনে হয় এ যাত্রায় বুঝি আর টিঁকলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিঁকে যান। তার টিঁকে থাকার রহস্যভেদ করতে না পেরে গ্রামের ছেলেছোকরারা বলে, 'উনি কীভাবে যমদূতকে কলা দেখান উনিই জানেন।'

কথাটা ঠিক। রমেনবাবু জানেন। তার ধনুর্ভাঙা পণ। যতদিন না তার নিরুদ্দিষ্ট পুত্র শোভেন ফিরে আসে ততদিন তিনি এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবেন না। স্বর্গেও না।

উঠে বসলেন রমেনবাবু। এপাশ ওপাশ নজর করে বুঝলেন কুয়াশা আর নেই। দিব্যি দেখা যায়। হরিশচন্দ্রের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। বিশাল তৈলচিত্রের মধ্যে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছেন। আগে বাবার ছবিতে প্রণাম করে দিন শুরু করতেন রমেনবাবু। এখন আর করেন না। মৃত্যুর মতো মৃতদেরও তিনি মুছে ফেলতে চান। হরিশচন্দ্রের পাশে আরও তিনটি বিশাল তৈলচিত্র। শতাধিক বছরের দীর্ঘশ্বাসের ভারে কালো হয়ে গেছে রংয়ের আঁচড়। কেউ বলে দিলে জানা যায়, ছবিগুলো রমেনবাবুর পিতামহ গোপালচন্দ্র, প্রপিতামহ অনুকূলচন্দ্র এবং অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ প্রতাপচন্দ্রের।

ছবি দেখতে দেখতে রমেনবাবু হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। রাগ নন্দর ওপর। অনেকবার হতভাগা চাকরটাকে ছবিগুলো জঞ্জালের গাদায় ফেলে আসতে বলেছেন, কিন্তু সে ফেলেনি। রাগের চোটে বিড় বিড় করতে থাকেন রমেনবাবু। তোর কীসের এত টান রে শুয়োর। ওই মানুষগুলো তোর কে? যত্তসব মরাহাজা। আমাকে এখনও বিশ বছর বাঁচতে হবে। শোভেনের হাতের জল না খেয়ে আমি কোত্থাও যাব না।

রমেনবাবুর মনে হলো, খাট থেকে নেমে বাইরে যাওয়া দরকার। কিন্তু সাহস পেলেন না। খাটটা সাধারণ খাট নয়। পালঙ্ক বিশেষ। হরিশচন্দ্রের বিবাহে দানসামগ্রীর সঙ্গে এসেছিল। রমেনবাবুর মা তরুবালা তখন তেরো বছরের কিশোরী। মেয়ে এত উঁচু পালঙ্কে উঠতে পারবে না বলে রমেনবাবুর দাদামশাই অবিনাশ মিত্তির একটা নীচু জলচৌকি তৈরি করিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তরুবালা জলচৌকিতে পা দিয়ে পালঙ্কে উঠতেন।

রমেনবাবুর জীবনে ওঠার মতো আর কোনও শীর্ষদেশ অবশিষ্ট নেই। এখন শুধুই নামা। কিন্তু তার জন্যও তো নন্দর হাত, নয়তো তরুবালার জলচৌকির প্রয়োজন। অন্যথায় ভারসাম্য রাখতে না পেরে মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারেন। তিতিবিরক্ত হয়ে রমেনবাবু হাঁক পাড়লেন, 'নন্দ! অ্যাই নন্দ!'

নন্দর সাড়া পাওয়া গেল না। তার বদলে সাড়া দিল একটা কুকুর।

রমেনবাবু বুঝলেন নন্দ বাড়িতে নেই। সদর দরজা আগলে বসে আছে ফুলি। এ পাড়ার মাদি কুকুর। ফুলিকে ট্রেনিং দিয়েছে নন্দ। সে কোথাও গেলে ফুলি রমেনবাবুকে জানিয়ে দেয় নন্দ বাড়িতে নেই। তবে ফিরে আসবে এখনই।

টুকিটাকি কিছু কেনাকাটা করে নন্দ যখন বাড়ি ফিরল, রমেনবাবু তখনও খাটের ওপর থম মেরে বসে আছেন। চরাচরে লেপ্টে থাকা কুয়াশা এখন আর একেবারেই নেই। জানলার ওপারে রায়চৌধুরীদের বিশাল জমিদারবাড়ির ধ্বংসাবশেষ। সোনালদি, বোষ্টমপাড়া, সোনারচক, বাবুডাঙার লোকেরা এখনও এই বাড়িকে বলে রাজবাড়ি। অথচ যে দরবারঘরে বসে প্রজাশাসন করতেন অনুকূলচন্দ্র সেখানে এখন সাপখোপের আড্ডা। বিশাল বিশাল বট আর অশ্বত্থ ছাদ ফাটিয়ে মাথা তুলেছে আকাশে। বেঁচেবর্তে থাকা দুটি মাত্র ঘরে রমেনবাবু আর নন্দ থাকেন।

পায়ের শব্দ পেয়ে রমেনবাবুর সম্বিত ফিরল। নন্দকে দেখে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'এই যে আমার লাটসাহেব! কোন রাজকার্যটা করছিলেন শুনি?'

এই ধরনের সম্ভাষণের সঙ্গে নন্দ পরিচিত। চল্লিশ বছর হয়ে গেল তার এ বাড়িতে। রমেনবাবুর স্ত্রী অন্নপূর্ণাকে সাহায্য করার জন্য দশ বছর বয়সে এসেছিল। তারপর কত কী ঘটে গেল। শোভেন গৃহত্যাগ করল। অন্নপূর্ণা মারা গেলেন। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো রায়চৌধুরীদের সাধের রাজবাড়ি। থেকে গেলেন শুধু রমেন রায়চৌধুরী। তার আশা শোভেন ফিরবে। এবং ছেলেকে দেখে তিনি শান্তিতে মরতে পারবেন।

গালিগালাজ শুনে প্রথম প্রথম নন্দর রাগ হতো। এখন দুঃখ হয়। করুণা হয় মানুষটার জন্য। সে শান্ত গলায় বলল, 'কয়েকটা জিনিস ফুরিয়ে গিয়েছিল। তাই দোকানে গিয়েছিলুম।'

'দোকানে গিয়েছিলুম— তোকে এই ছবিগুলো ফেলে দিতে বলেছিলুম।

ফেলিসনি কেন?'

'আজ্ঞে, পূর্বপুরুষের ছবি ফেলে দেবেন?'

'আমার পূর্বপুরুষের ছবি আমি ফেলে দেব তাতে তোর বাপের কী রে শালা! যা বলছি তাই করবি।'

নন্দ কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বলল, 'বলছেন যখন তাই করব। ছবি না থাকলে গাল পাড়বেন কাকে?'

কেমন যেন থিতিয়ে গেলেন রমেনবাবু। কথাটা ভুল বলেনি নন্দ। কাউকে পোড়াতে না পারলে তো নিজেই নিজের আগুনে জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাবেন। বিচারক এসে দেখবে অপরাধী নেই। শাস্তিই সার হবে, জীবনে ক্ষমা আর জুটবে না।

রাজবাড়ির ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে রমেনবাবু মৃদু গলায় বললেন, 'তুই এখন যা নন্দ। আমায় একা থাকতে দে।'

দুই

বর্ষার শুরুতেই ক'দিন বেশ বৃষ্টিবাদলা হয়ে গেল। শীত আর বর্ষাকে নন্দর বেশি ভয়। এই সময় রমেনবাবু খুব কষ্ট পান। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। অসুস্থ হয়ে পড়লেন রমেনবাবু।

নিদারুণ শ্বাসকষ্টে কথা বন্ধ হয়ে গেল। সারাদিন বাতাসের খোঁজে মানুষটা ছটফট করেন আর বোবা চোখে চেয়ে থাকেন দূরে। এ দৃষ্টি নন্দ চেনে। মৃত্যুপথযাত্রী মানুষ মুক্তির জন্য ঈশ্বরকে ডাকে। রমেনবাবুর ঈশ্বর নেই। শোভেন আছে। রমেনবাবু ছেলেকে ডাকেন। একমাত্র সেই পারে অনুশোচনায় জর্জরিত মানুষটাকে মুক্তি দিতে।

সোনালদির সবে ধন নীলমণি ডাক্তার অবনী ঘোষ ভালো করে দেখেশুনে বলল, 'আমি ওষুধ দিতে পারি নন্দ, কিন্তু রোগ সারাতে পারব না। ওটা তোর কাজ তোকেই করতে হবে।'

নন্দ কিছু বলল না। কারণ কথাটা নতুন নয়। একবার হঠাৎই সে আজগুবি এক চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করে ফেলেছিল। অবনী ঘোষের নির্দেশে সেবারই প্রথম অক্সিজেনের সিলিণ্ডার এসেছিল বাড়িতে। কিন্তু দিনরাত নলের হাওয়া টেনেও রমেনবাবুর বুকের গুমোট কাটেনি। নেতিয়ে পড়া বৃদ্ধের বুকে গরম তেল মালিশ করতে করতে এমনিতেই নন্দ অনেক কথা বলে। সেদিন কী হয়েছিল কে জানে, আচমকা বলে ফেলেছিল, 'আপনার এরকম বিছানায় পড়ে থাকা চলবে না। উঠে বসতে হবে। শোভেনদা এসে যদি আপনাকে এই অবস্থায় দেখে কত কষ্ট পাবে বলুন তো।'

সেবার এই ঘটনার দুদিন পরেই উঠে বসেছিলেন রমেনবাবু। ব্যাপার-স্যাপার দেখে একদম ভ্যাবলা হয়ে গিয়েছিল নন্দ। এ আবার কী কাণ্ড রে বাবা! ভোজবাজি নাকি? তার সামান্য একটু সান্ত্বনায় কী আছে যে রমেনবাবু এরকম চাঙ্গা হয়ে উঠলেন? অবনী ঘোষ বুঝতে পেরেছিল রহস্যটা। বুঝিয়ে দিয়েছিল নন্দকে। তারপর রমেনবাবু যতবার অসুস্থ হয়েছেন অবনী ডাক্তার শুধু ওষুধ দিয়েছে। আর নন্দ দেখিয়েছে স্বপ্ন। যে মায়ার বাঁধনে রমেনবাবুর জীবন বাঁধা, তাতে দিয়েছে গিঁট। গিঁটের পরে নতুন গিঁট। বাঁধন শক্ত হতেই রমেনবাবুর শ্বাসকষ্ট একটু একটু করে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। উঠে বসেছেন তিনি। সুস্থ হবার পর যথেচ্ছ গালাগাল দিয়েছেন নন্দকে। মানুষটাকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনতে পারার আনন্দে ভরে গেছে নন্দর মন।

এইভাবেই চলছে গত পাঁচ বছর।

অবনী ডাক্তার চলে যাবার পর নন্দ কাজে লেগে পড়ল। এই শরীরে রমেনবাবুর স্নান করা চলে না। কিন্তু দাড়ি কামিয়ে দিতে হবে। নয়তো খেতে পারবেন না। নন্দ বসল দাড়ি কামাতে। তারপর রান্না। গলা ভাত আর জিরে পাঁচফোড়ন দিয়ে বানানো চারা মাছের ছোল। মা যেভাবে সন্তানকে খাওয়ায়, সেইভাবে খাওয়াতে খাওয়াতে নন্দ শুরু করল তার ডাক্তারি, 'শোভেনদার জন্য আমার দুঃখ হয়। আপনাকে কী দেখে গিয়েছিল আর এবার এসে কী দেখবে! মনে আছে, একসময় আপনি ঘোড়ায় চড়তেন? তখন এ তল্লাটে গাড়ি ছিল না। আপনার শুধু একটা সাদা রংয়ের ঘোড়া ছিল। বাপ রে, সে ঘোড়ার কী তেজ! হাওয়া কেটে তিরের মতো ছুটত। শোভেনদার ঘোড়ায় চড়ার খুব শখ ছিল। আপনি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। শোভেনদা ফিরে এসে যদি দেখে আপনি...'

আচমকা থেমে গেল নন্দ। ভালো করে দেখল রমেনবাবুকে। আশ্বস্ত হলো দেখে। দৃষ্টিটা আগের থেকে জীবন্ত। ঠোঁটের কোণে অল্প একটু হাসির আভাস। অর্থাৎ ডাক্তারিতে কাজ দিয়েছে। এইভাবে চালাতে হবে দু'তিনদিন। তবে রমেনবাবু কথা বলবেন। এই ব্যাপারটা নন্দ ভালো বোঝে না। হাঁপের রুগি তো সে কম দেখেনি। সোনালদিতেই তো দুজন আছে। টান উঠলে তাদের কারও কথা বন্ধ হয় না। কিন্তু রমেনবাবুর হয়। অবনী ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলে বলে, 'তোর অত জানার দরকার কী বাপু। তুই যেমন ডাক্তারি করিস, করে যাবি। দেখবি চলে যাওয়া কথা আবার ফিরে এসেছে।'

তা, ফিরে আসে বটে। কিন্তু কেন চলে যায় জানতে পারলে নন্দ কখনো যেতেই দিত না। রমেনবাবুর ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিকটুকু দেখতে দেখতে নন্দ ফিরে গেল ডাক্তারিতে, 'আমার কথা শুনে হাসি পাচ্ছে বুঝি! কেন, হাসি পাচ্ছে কেন? শোভেনদা কি ফিরবে না? সময় হয়ে গেছে। না এসে যাবে কোথায়?

দু'দিন পর রমেনবাবু সুস্থ হলেন।

সাধারণত রোগভোগের পর কথাবার্তা কম বলেন। কিন্তু এবার কথা ফিরে আসা মাত্র হাঁকডাক শুরু করে দিলেন। নন্দকে ডেকে বললেন, 'পণ্ডিতকে একবার খবর দে।'

কথাটা নন্দর পছন্দ হলো না। পণ্ডিত মানে শশধর মুখোপাধ্যায়। হাড়ে হারামজাদা শয়তান একটা। জ্যোতিষীগিরির নাম করে লোক ঠকায়। নন্দ দু'চোক্ষে দেখতে পারে না। কিন্তু রমেনবাবুর খুব বিশ্বাস। প্রত্যেকবার অসুখ থেকে ওঠার পর একবার ডাকবেনই। কাজ কিছুই না। শোভেনের ঠিকুজিটা এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন, 'কবে আসবে বলে মনে করছ?' শশধর ঝানু মাল। হাবিজাবি নানান অঙ্ক কষে বলবে, 'আজ্ঞে, এ বছরই একটা এসপার-ওসপার হয়ে যাবে কর্তা। আপনি কিছু ভাববেন না।' তারপর পঞ্চাশ টাকা ট্যাঁকে গুঁজে চটিতে ফটাস ফটাস আওয়াজ করে পিঠটান দেবে।

নন্দ বেজার মুখে বলল, 'ওকে আবার কেন? যা বলে কিছুই তো মেলে না।'

রমেনবাবু চটে গেলেন, 'তুই থামবি! ফলিত জ্যোতিষের কী বুঝিস তুই? বাজে না বলে এখনই যা। বল, খুব জরুরি দরকার। আজই যেন একবার আসে।'

শশধর এলো বিকেলে। রোগা সিড়িঙ্গে চেহারা। মাথাটা শরীরের তুলনায় বড়ো। বয়স ষাটের ওপরেই হবে। নাকের ডগায় নেমে আসা চশমাটা পিছনে ঠেলে দিয়ে সে ঠিকুজি পরীক্ষা করতে বসে গেল।

'কেমন আছে সেটা কি বলা যাবে?' রমেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

শশধর অমায়িক হেসে বলল, 'ছেলে আপনার ভালোই আছে কর্তা। ভালো চাকরি করছে। ছেলেপুলে পরিবার নিয়ে তার বেশ সুখের জীবন।'

রমেনবাবু বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, 'তাই নাকি! তা, সেটাই তো জীবনে দরকার। সুখ না থাকলে জীবনে আর কী থাকল! সোনালদিতে কবে আসবে কিছু দেখতে পাচ্ছ?'

'রথযাত্রার আগে আপনার বাড়িতে একটা পুত্র সমাগম যোগ আছে। তবে একটা কথা কর্তা। অভয় দেন তো বলি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলো না—'

শশধর চশমার কাঁচ মুছে বলল, 'যোগ যা আছে তা আছে। কিন্তু শুধু যোগে তো কাজ হয় না। তাকে কাজে লাগাতে গেলে কিছু উদ্যোগ আয়োজন করতে হয়।'

'হেঁয়ালি রাখো পণ্ডিত। যা বলার স্পষ্ট করে বলো।'

'আজ্ঞে কর্তা, গাছের আম গাছ তো আর আপনার হাতে দিয়ে যায় না। গাছের ডাল থেকে পাড়তে হয়। আমার কথার গ্যারিন্টি যদি চান তা হলে একটা পুত্রমঙ্গল যজ্ঞ করে ফেলুন। দেখবেন, পরের দিনই ছেলে আপনার বাবা বলে এসে পেন্নাম করবে।'

দু'দিন ধরে চিন্তা করলেন রমেনবাবু। শশধর এ প্রস্তাব আগেও দিয়েছে। তখন তিনি রাজি হননি। কিন্তু এবার পুত্রসমাগম যোগ রয়েছে। এই সময় যজ্ঞটা যদি করে নেওয়া যায় তা হলে হয়তো সত্যিই কাজ হবে।

একটা সুখের মুহূর্ত তৈরি হলো বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। টাকার চিন্তা বড়ো হয়ে উঠল। যজ্ঞ করার টাকা পাবেন কোথায়? জমিদার বাড়ির ছেলে বলে জীবনে চাকরি-বাকরি করেননি। ব্যবসাবুদ্ধিও ছিল না। পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া সম্পত্তি ভেঙে চালিয়েছেন চিরকাল। সুখ-অসুখ, পালা-পার্বণ, বারব্রত থেকে শুরু করে শোভেনের লেখাপড়া পর্যন্ত সবই হয়েছে সঞ্চয় ভেঙে। এখন থাকার মধ্যে আছে বিঘে তিনেক ধানজমি, এই রাজবাড়ি আর ব্যাঙ্কে কয়েক হাজার টাকা। এ হেন কুবেরের পুঁজি ভাঙলে দুটি প্রাণীর চলে কী করে!

সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে রমেনবাবু উত্তেজিত হয়ে পড়েন। অন্নপূর্ণার কথা মনে পড়ে। আজ সে যদি থাকতো তা হলে পরামর্শ করতে পারতেন। সবাই তাকে এই ধ্বংস্তূপে একলা রেখে কেটে পড়েছে। অভিমানে রমেনবাবুর চোখের পাতা ভিজে গেল।

সন্ধ্যে নামতে আর বিশেষ দেরি নেই। পূর্বদিকের মহলের হেলে পড়া বারান্দার দিকে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে তাকিয়ে ছিলেন রমেনবাবু। হঠাৎ কে যেন বলল, 'আমাকে কেন দোষ দিচ্ছ বাবা? আমি তো তোমাকে ছেড়ে যাইনি। তুমিই আমাকে চলে যেতে বলেছিলে।'

চমকে উঠলেন রমেনবাবু। কে কথা বলল? শোভেন ফিরে এলো নাকি? ঘরের ভেতর পাতলা অন্ধকার। নন্দ বোধহয় বাইরে গেছে। আলো জ্বালা হয়নি। হরিশচন্দ্রের পালঙ্কে বসেই রমেনবাবু হাঁক দিলেন, 'শোভেন এলি? কোথায় তুই বাপ! আমার সামনে আসছিস না কেন?'

কেউ সাড়া দিল না। অন্ধকারে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে খুঁজে পেলেন না রমেনবাবু। শোভেন আসেনি। তিনি ভুল শুনেছেন। এরকম আজকাল হয়। বাস্তব আর কল্পনায় কোনো পার্থক্য থাকে না।

কিন্তু শোভেন না আসুক, যে কথা রমেনবাবু শুনলেন সেটা কি মিথ্যে? শোভেন তো তারই কথায় বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিল। রমেনবাবু পুবের মহলের দিকে তাকালেন। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। অন্ধকারে সব ডুবে গেছে।

তিন

রাজবাড়ির ভাঙা বারান্দা অন্ধকারে ডুবে যায় বটে, কিন্তু অতীত ডোবে না। সে তার নিজস্ব আলো জ্বেলে ঠিকই

ভেসে থাকে। অনুশোচনায় দগ্ধ হৃদয় বারবার সেই আলোর সামনে নতজানু হয়।

রমেনবাবু নিজেকে প্রশ্ন করেন, 'আজ আমি এই রাজবাড়ির মতো ধুলো হয়ে গেছি। কিন্তু সেদিনও কী তাই ছিলাম?'

না, সেদিন তিনি অন্যরকম ছিলেন। বিপরীতও বলা যায়। তার জেদ ছিল। অহংকার ছিল। বংশগৌরব ছিল। কিন্তু সাহস ছিল না। সেই মারাত্মক অসংগতি ঢেকে রাখার জন্য তিনি গ্রামের মেঠো রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াতেন। রাইফেল কাঁধে নিয়ে শিকারে যেতেন। জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত করে দিয়েছিল সরকার। সংস্কারের অভাবে রাজবাড়িও একটু একটু করে ভেঙে পড়ছিল। তবুও তিনি বাইরের ঠাঁট বজায় রেখেছিলেন।

প্রায় অচল হতে বসা সংসারটা একার হাতে আগলে রেখেছিলেন অন্নপূর্ণা। না, অলস কর্মবিমুখ স্বামীর পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া সম্পত্তি ভেঙে মাছের মুড়ো খাওয়ার প্রতিবাদ তিনি কখনো করেননি। তার স্ত্রী-ধর্মে স্বামী দেবতা। দেবতার অপরাধ উপেক্ষনীয়। স্বাভাবিক ভাবেই শোভেনের লেখাপড়ার জন্য তাকে অনেকবার গয়নার বাক্সে হাত দিতে হয়েছে। শোভেন প্রতিবাদ করলে হেসে বলতেন, 'এত গয়না আমার কী হবে ভানু! ওই সাতনরি হার আর কঙ্কন চারটে থাকলেই হলো। ওগুলো দিয়ে আমি তোর বউয়ের মুখ দেখব।'

শোভেন কিছু বলত না। অন্নপূর্ণা বউয়ের প্রসঙ্গ তুললেই সে মনে মনে একটা মুখের ছবি আঁকত। কৃষ্ণকলি এক তরুণীর মুখ। আয়ত চোখ। কোমর ছাপানো চুল। শরীরের গড়ন খাজুরাহোর যক্ষিণীর মতো। নাম রূপমতী। সাঁওতাল পল্লির মেয়ে রূপমতী। তার অঙ্গে অঙ্গে ঝরনার উচ্ছ্বাস। হাসিতে মহুয়ার নেশা। চুলে করৌঞ্জ ফুলের বুনো গন্ধ। রূপমতীকে ছাড়া অন্য কাউকে বউ করার কথা ভাবতে পারত না শোভেন। অন্নপূর্ণার কথায় সে তার অনাগত সুখের কল্পনায় বুঁদ হয়ে থাকত।

পঁচিশ বছর আগের কথা। সোনালদির পশ্চিম দিকে তখন দুর্ভেদ্য জঙ্গল। এ দিককার লোকে বলে শালোপাড়ার জঙ্গল। শালগাছের প্রাচুর্যের কারণে এরকম নাম হয়ে থাকতে পারে। রমেনবাবুর প্রায়শই শালোপাড়ার জঙ্গলে যেতেন পাখি শিকার করতে। সঙ্গে অ্যাসিসট্যান্ট নন্দ। গাছের ডালে বসা পাখি গুলি খেয়ে মাটিতে পড়লেই রমেনবাবু বলতেন, 'নিরীহ পাখি মারতে আর ভালো লাগে না। বাঘ-ভালুক না মারলে আর কীসের শিকারি।'

নন্দ মনে মনে হাসত। মুখে কিছু বলত না।

রমেনবাবুর মৃগয়াক্ষেত্র ছিল লোনাপানির খাল পর্যন্ত। খাল পেরিয়ে ওপারে যাওয়ার সাধ্য রমেনবাবুর ছিল না। ওপারে সাঁওতালদের গ্রাম। গ্রামের নাম খালের নামে। লোনাপানি। খালপাড় দাঁড়িয়ে রমেনবাবু বলতেন, 'আর ওদিকে নয় নন্দ। এবার ফিরে চল।'

এই সীমালঙ্ঘন না করার পিছনে একটা ইতিহাস আছে। সাঁওতালরা সাধারণত শান্তশিষ্ট প্রকৃতির হয়। লোনাপানির সাঁওতালরাও তাই ছিল। নির্বিরোধী, শান্তিপ্রিয় আর প্রভুভক্ত। শাসকের সঙ্গে তারা কোনোদিন বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। দায়ে দরকারে জীবনপণ করে রক্ষা করেছে জমিদারকে। সেইসময় জমিদারদের নিজস্ব লেঠেল বাহিনী থাকত। দুর্বিনীত প্রজাদের মেরে ধরে বাগে আনাই ছিল তাদের কাজ। অনেক সময় আশপাশের অন্য জমিদারদের বাড়িতে ডাকাতির কাজেও ব্যবহার করা হতো লেঠেলদের। তবে সোনালদির লেঠেলদের প্রজাপীড়ন ছাড়া অন্য কোনো কাজ ছিল না।

প্রতাপচন্দ্রের আমলে কাজের পরিধি বাড়ল। প্রতাপচন্দ্র ছিলেন যেমন অত্যাচারী তেমনই লম্পট। বিশটা গ্রাম নিয়ে তার জমিদারি। নিজের জমিদারিতে কোনো সুন্দরী যুবতীর সন্ধান পেলে তার আর রক্ষে ছিল না। লেঠেলরা গিয়ে তাকে তুলে নিয়ে আসত। মেয়েটির বাবা, মা, ভাই— যেই বাধা দিক তার গঙ্গাযাত্রা ছিল অবধারিত। তারপর বাবুর শখ মিটে গেলে মেয়েটিরও ঠাঁই হতো লোনাপানির জলে। প্রজাকে মানুষ ভাবার শিক্ষা প্রতাপচন্দ্রের ছিল না। বরং তাদের কীটপতঙ্গের মতো অকিঞ্চিতকর ভেবে তিনি বেশ আমোদ অনুভব করতেন।

সাঁওতাল মেয়েদের ওপর প্রতাপচন্দ্রের নজর প্রথমেই কেন পড়েনি সেকথা বলা মুশকিল। তবে প্রথমে না পড়লেও একসময় পড়ল। আর একবার পড়ার পর পড়তেই থাকল। আনপড় জংলি সাঁওতালদের অনুনয় বিনয় প্রার্থনায় কান দেবার লোক প্রতাপচন্দ্র নন। তিনি জমিদার। প্রজার সঙ্গে তার খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। তিনি ভেবেছিলেন এইভাবেই চলবে। কিন্তু চলল না। কখন সাঁওতালদের চাপা ক্ষোভ বিদ্রোহে রূপান্তরিত হয়েছে, আর কখনই বা কেষ্টঠাকুরের মতো বাঁশি বাজিয়ে ফেরা সাঁওতাল যুবক সনাতন টুডু সেই বিদ্রোহের নায়কে পরিণত হয়েছে— প্রতাপচন্দ্র তার কোনো খবরই রাখতেন না। খবর পেলেন তখন, যখন তার অষ্টমবর্ষীয় পুত্র বিলাসচন্দ্র অপহৃত হলো। এবং যখন খাস দরবারে এসে সনাতন তার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'বিলাসবাবু আমাদের কাছে আছে বটেক। যদি তুই আমাদের কুনো মেইয়্যাছ্যালের ক্ষতি করিস তা হলে আমরা উয়ারে কেট্টে ভাসায়ে দুবো।'

প্রতাপচন্দ্র একমাত্র সন্তানের কথা ভেবে বিচলিত হয়ে পড়লেন। নিরীহ

সাঁওতালরা যে এমন কাণ্ড ঘটাতে পারে তিনি স্বপ্নেও কখনো ভাবতে পারেননি। বিলাসকে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে আনাই তখন তার প্রধান দায়িত্ব। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন সাঁওতাল মেয়েদের কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু সনাতন টুডু এবং তার দলবল মুখের কথায় বিশ্বাস করতে রাজি হলো না। তাদের সাফ কথা, অন্তত দু'বছর বিলাস লোনাপানিতে জামিন হিসেবে থাকবে। এর মধ্যে প্রতাপচন্দ্র যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না করেন তা হলে সাঁওতালরা বিলাসকে মুক্তি দেবার কথা ভাববে।

দরবারের সবাইকে হতভম্ব করে দিয়ে সনাতন টুডু বিদায় নিল।

সেই রাতেই শালোপাড়ার জঙ্গল মুখর হয়ে উঠল। দশজন বাছাই করা লেঠেল আর চারজন বন্দুকবাজ রওনা দিল লোনাপানির দিকে।

সিদ্ধান্তটা কিছুটা হঠকারী। রাতের জঙ্গলে সাঁওতালদের তিরধনুকের সঙ্গে মাত্র চারটে বন্দুক নিয়ে লড়াই করা বেশ কঠিন। লাঠি এ ক্ষেত্রে ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। প্রতাপচন্দ্র হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলেন। বিলাসচন্দ্রের জন্য দুশ্চিন্তা তো ছিলই। তার সঙ্গে ছিল অপমানের জ্বালা। অজ্ঞাতকূলশীল এক সাঁওতালের বিদ্রোহ তিনি যদি দমন করতে না পরেন, তা হলে রায়চৌধুরীদের মানমর্যাদা বলে আর কিছু থাকবে না। জমিদারি রক্ষা করাই দায় হয়ে উঠবে।

পরিকল্পনা অবশ্য খাটল না। রাত্রি তৃতীয় প্রহরে চারটে ডিঙি নৌকো ঘাটে এসে লাগতেই ছুটে এলো ঝাঁকে ঝাঁকে তির। লেঠেলদের সর্দার গণেশ মণ্ডল 'মা গো' বলে পড়ে গেল লোনাপানির জলে। বন্দুকধারীরা গুলি ছুঁড়ল বটে, কিন্তু কাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ল তারাই জানে। প্রতাপচন্দ্র যে ঝামেলা বাঁধাবেন, সনাতন আগেই বুঝতে পেরেছিল। সে আর তার সঙ্গীরা ডেরা বেঁধেছিল গাছের ডালে। খেলা শেষ করতে তাদের আধঘণ্টাও লাগল না।

পরেরদিন খবরটা হাওয়ার চেয়েও দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ল।

প্রতাপচন্দ্র ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়েছিলেন। বিলাসকে কী করে ফিরিয়ে আনবেন সেই ভাবনা ছাড়া তিনি অন্য কিছু ভাবতে পারছিলেন না। বৃদ্ধ নায়েব রাধামোহনকে পাঠালেন সনাতনকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত করার জন্য। কিন্তু সনাতনকে টলানো গেল না। রাধামোহনকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে সনাতন বলল, 'তু বড়ো ভালো লোক ঠাকুর। তুর পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকাইলে জীবনটা ধন্য হইয়ে যায়। কিন্তু উ রাজারে বিশ্বাস লাই। উয়ারে বল্যে দিস, যে কথা কইয়া দিছি তার লড়চড় হবেক লাই। বিলাস জামিন থাইকবেক।'

তখন ব্রিটিশ আমল। আর কোনো উপায় না দেখে প্রতাপচন্দ্র ব্রিটিশ সরকারের শরণাপন্ন হলেন। ম্যাজিসট্রেটের নির্দেশে পুলিশ সুপার মার্টিন হুইটম্যান নিজে এলেন তদন্ত করতে। সনাতনের ভাগ্য ভালো জাতে ব্রিটিশ আর কর্মসূত্রে পুলিশ অফিসার হলেও মার্টিন হুইটম্যান স্বভাবে ছিলেন ভদ্রলোক। না হলে সনাতনের ফাঁসি কেউ ঠেকাতে পারত না। প্রতাপচন্দ্র সেরকম প্রস্তাবই করেছিলেন। শুধু বিলাসকে ফিরে পেলে তার কাজ চলে না। জমিদারের মর্যাদাও ফেরত পাওয়া দরকার। তার জন্য সনাতনের গলায় দড়ি বেঁধে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেওয়াই সব থেকে ভালো উপায়। কিন্তু প্রতাপচন্দ্রের এক লক্ষ টাকা উৎকোচ গ্রহণের প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে মার্টিন হুইটম্যান বললেন, 'টেন সনাতন উইল বি বর্ন ফলোইং দা ডেথ অব ওয়ান সনাতন। ইউ ওয়ন্ট বি এব্‌ল টু বাই টেন মোর লাইভস বাবু! উতনা রুপেয়া তুমহারে পাশ নেহি হ্যায়। তার চেয়ে হামাকে কাম করিতে দাও।'

সনাতনকে ডেকে পাঠানো হলো। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ব্রিটিশ পুলিশ অফিসারের ডাক উপেক্ষা করা তত সহজ ছিল না। সনাতনও সে দুঃসাহস দেখালো না। মার্টিন হুইটম্যান বললেন, 'হাম তুমহারা পিতা সমান হ্যায়, মাই বয়। কোনো অন্যায় ঘটিলে সোজা হামার কাছে আসিবে। আয়াম আ ক্যাথলিক ক্রিশ্চান। আই সোয়ার ইউ, নাথিং রং উইল হ্যাপেন।'

সনাতন ভাষা বুঝল না বটে, কিন্তু ভাব বুঝল। হুইটম্যান সাহেবের মধ্যস্থতায় স্থির হলো, রায়চৌধুরী বংশের কেউ লোনাপানির খাল পেরিয়ে সাঁওতালদের গ্রামের দিকে যাবে না। নায়েব রাধামোহন যেতে পারবেন। তার হাতেই খাজনা তুলে দেবে সাঁওতালরা।

বাবার হাত ধরে বিলাস ফিরে এলো। কিন্তু জমিদারের ভয়ে বাঘে আর গোরুতে এক ঘাটে জল খাওয়ার হাড় হিম করে দেওয়া প্রবাদটা আর তত ভয়ঙ্কর থাকল না।

তারপর অনেকগুলো দশক কেটে গেছে। সোনালদি গ্রামের অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু একটা ব্যাপার অপরিবর্তনীয় থেকে গেছে। প্রতাপচন্দ্রের পর রায়চৌধুরী বংশের আর কোনো পুরুষ হুইটম্যান সাহেবের টেনে দেওয়া লক্ষ্মণরেখা পেরিয়ে লোনাপানি গ্রামে যাওয়ার সাহস দেখাননি। বস্তুত তারা ছোটবেলা থেকেই একটা ভয়কে সংস্কারের মতো লালন-পালন করতেন। যেন সাঁওতাল পল্লী একটা বর্জিত এলাকা। সেখানে গেলে মানুষ আর ফেরে না। কালক্রমে রায়চৌধুরীদের জমিদারির ভিত আরও দুর্বল হয়েছে। এবং তার সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ায় সংস্কারের ভিত হয়েছে

আরও মজবুত।

সেই মজবুত ভিতে শোভেন প্রথম আঘাত হেনেছিল। কারণ রূপমতী সনাতন টুডুর বংশের মেয়ে। শোভেন তাকে ভালোবাসে জানার পর রূপমতী খোলসা করেই তার পরিচয় দিয়েছিল। শোভেন বিন্দুমাত্র বিস্মিত হয়নি। যে কোনো মানুষের একটা পারিবারিক অতীত থাকবে। পরিচয়ও থাকবে। এমনই স্বাভাবিক বিশ্বাসে বলেছিল, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি রূপা। বিয়ে করতে চাই। তাই অতীতকে ভয় করে চলার কোনো দায় আমার নেই।'

বাড়িতে এই সম্পর্কের কথা জানত একমাত্র নন্দ। বেশ কয়েকবার সে শোভেনের দূতের কাজ করেছে। কিন্তু রমেনবাবু বা অন্নপূর্ণাকে বিন্দুবিসর্গ বুঝতে দেয়নি।

তবু রমেনবাবু একদিন জানতে পারলেন। সেদিন খবরের কাগজ নেবেন বলে রমেনবাবু ছেলের ঘরে ঢুকেছিলেন। টেবিলের ওপর একটি মেয়ের পেন্সিল স্কেচ দেখে তার পা আচমকাই থেমে গেল। ছোটবেলা থেকে শোভেনের ছবি আঁকার হাত দারুণ। এই ছবিও তারই আঁকা। কিন্তু মেয়েটি কে? পুরু ঠোঁট আর খোঁপায় করৌঞ্জ ফুলের বাহার দেখে রমেনবাবুর মনে হলো মেয়েটি সাঁওতাল।

শোভেন বাড়িতে ছিল না। ফিরতেই রমেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'মেয়েটি কে ভানু?'

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল শোবেন। সম্ভবত আসন্ন মুক্তিযুদ্ধের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করল। তারপর আগাগোড়া সব কথা খুলে বলল। এমনকী, সে যে রূপমতীকে বিয়ে করতে চায় সে কথাও গোপন করল না।

হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন রমেনবাবু। ভয়, দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তার একটা মিশ্র অনুভূতি তাকে অনেকক্ষণ কথা বলতে দেয়নি। কিন্তু তিনি রমেন রায়চৌধুরী। বিলীন হয়ে যাওয়া অভিজাততন্ত্রের জীবন্ত প্রতিনিধি। চিরকাল মন আর মুখের মধ্যে অপার ব্যবধান রক্ষা করে এসেছেন। অপ্রস্তুত ভাব কাটিয়ে উঠেই তিনি রাগে ফেটে পড়েছিলেন, 'তোমার সাহস তো কম নয় ভানু! একটা খুনির বংশের মেয়েকে তুমি এ বাড়ির বউ করতে চাও?'

শোভেন শান্ত সংযত ভঙ্গিতে

বলেছিল, 'আমরা লম্পট বলেই ওরা খুনি বাবা!'

কথাটা তিরের মতো রমেনবাবুর বুকে বিঁধেছিল। মুহূর্তের জন্য তিনি শোভেনের মধ্যে সনাতন টুডুকে দেখতে পেয়েছিলেন। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ প্রবাদ বাক্যটির কথা তিনি শুনেছিলেন। কিন্তু এ তো প্রহ্লাদের কূলে দৈত্য। বেজায় ভয় পেয়েছিলেন রমেনবাবু। সেদিন আর কোনো কথা বলেননি।

পরেরদিন থেকে শুরু হয়েছিল পাখি পড়ানো। রায়চৌধুরী বংশ বহু প্রাচীন বংশ। স্বয়ং বাদশাহ ঔরঙ্গজেব রায়রায়ান খেতাব দিয়েছিলেন। সেই দলিল এখনও আছে। রূপমতীর কোনো বংশমর্যাদা নেই। অর্ধসভ্য অর্ধশিক্ষিত সমাজে তার জন্ম। সে এই বাড়ির বউ হয়ে এলে লোকে ছিঃ ছিঃ করবে। ইত্যাদি।

শোভেন শুধু একটা কথাই বলেছিল, 'আমি শুধু মানুষ মানি বাবা। রূপাও আমার কাছে স্রেফ একজন মানুষ। তার বংশমর্যাদা নিয়ে আমি কী করব বলুন তো।'

তিন মাস কেটে গেল, কিন্তু কোনো মীমাংসা হলো না। রমেনবাবু মেয়েদের সঙ্গে পরামর্শ করাকে পুরুষত্বের হানি বলে মনে করতেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাকে অন্নপূর্ণার শরণাপন্ন হতে হলো। রূপমতীর ব্যাপারে এমনিতে অন্নপূর্ণার কোনো আপত্তি ছি না। ছেলে সুখী হলেই তিনি সুখী। কিন্তু গোল বাঁধল স্ত্রী-ধর্মে। তিনি রমেনবাবুর কথাগুলোই ছেলের কাছে উগরে দিলেন। শোভেন অবাক হলো না। এরকম যে হবে সে জানত। প্রতাপচন্দ্র মারা যাবার পর দুটো বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেছে। ভারত স্বাধীন হয়েছে। দেশভাগ হয়েছে। কিন্তু মেয়েদের প্রতি এ বাড়ির পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গী বিন্দুমাত্র বদলায়নি। পুরুষের প্রতি মেয়েদের দৃষ্টিভঙ্গীও থেকে গেছে একই জায়গায়।

অবশেষে রমেনবাবু প্রয়োগ করলেন তার ব্রহ্মাস্ত্র। তিনি ভেবেছিলেন শোভেন বি-এ পাশ করলেও এখনও চাকরি পায়নি। টাকাপয়সার ব্যাপারে ছেলে তার ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং এই একটি পথেই শোভেনকে ফেরানো সম্ভব। একদিন বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তুমি যখন ওই মেয়েটিকে বিয়ে করবেই তখন আমারও একটা কথা তোমার শুনে রাখা দরকার। এ বাড়িতে ওসব হবে না। বিয়ে করতে হয় বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে করো।'

অন্নপূর্ণা আর্তনাদ করে উঠলেন। কিন্তু রমেনবাবু পাত্তা দিলেন না। তিনি নিশ্চিত ছিলেন আলাদা সংসার পাতার পুঁজি যখন শোভেনের নেই, তখন সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিয়ে করার ঝুঁকি নিতে পারবে না। কিন্তু তাকে অবাক করে শোভেন বলেছিল, 'ভেবেছিলাম পূর্বপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার একটা সুযোগ আপনি আমায় দেবেন। কিন্তু আপনি যখন চান না তখন তাই হবে। আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েই রূপমতীকে বিয়ে করব।'

পরেরদিন একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করেছিল শোভেন। অন্নপূর্ণার কাতর অনুনয় তাকে ফেরাতে পারেনি।

মর্মাহত অন্নপূর্ণা পাঁচ বছর পর তার অসহনীয় স্ত্রী-ধর্ম থেকে মুক্তি পেয়ে বিদায় নেন।

থেকে যান শুধু রমেনবাবু।

চার

ধুলো -ধুলো - ধুলো

রাজবাড়ি ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে ধুলোর নীচে। সময় নিপুণ শিল্পীর মতো মুছে দিচ্ছে সব পাপ। জড়ো হওয়া অতীতের জঞ্জাল বাতাসের আঘাতে ছড়িয়ে পড়ছে দিকদিগন্তে।

রমেনবাবু নাকে একটা কাপড়ের টুকরো জড়িয়ে নিলেন। এই ধুলো যদি বুকের ভেতর সেঁধিয়ে যায় তাহলে কাশতে কাশতে দম বেরিয়ে যাবে। তারপর হয়তো হাঁপের টান উঠে তাকে ঠেসে ধরবে বিছানায়। আজকাল অসুখের ভাবনায় কাবু হয়ে পড়েন রমেনবাবু। মনের মধ্যে ভয় খলবল করে ওঠে। ভাঙাচোরা শরীর নিয়ে তিনি আর কতদিন এই ভয়ঙ্কর অসুখের মোকাবিলা করবেন? এরপর যখন টান উঠবে তখন যদি বুকের সব কলকব্জা খারাপ হয়ে যায়। জোর করে শোভেনের মুখটা মনে করার চেষ্টা করলেন রমেনবাবু। এটা একটা ওষুধ। শোভেনের মুখ বাতাসে ভেসে উঠলেই ভয় কেটে যায়। বিশ্বাস ফিরে আসে। শোভেন আসবে। নিশ্চয়ই আসবে। রমেনবাবু ছেলের হাত ধরে বলবেন, 'অনেক কষ্ট পেয়েছি বাপ! এবার আমায় ক্ষমা করে দে।'

দেখতে দেখতে কাপড়টা ধুলোয় ভরে গেল। এ ভাবে হবে না। রমেনবাবু হাঁক পাড়লেন, 'নন্দ! অ্যাই নন্দ! জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে যা।'

নন্দ ব্যস্ত ছিল। আজ শনিবার। আজই নাকি পুত্রমঙ্গল যজ্ঞ করার সেরা দিন। পাঁজি দেখিয়ে বুঝিয়ে গেছে শশধর পণ্ডিত। কালকেই যজ্ঞের বাজার করে এনেছে নন্দ। এখন সেসব গুছিয়ে রাখছিল। এক ধাক্কায় সাতশো টাকা গচ্চা গেছে বলে মেজাজ একটু তিরিক্ষে। জানালা বন্ধ করে বলল, 'যজ্ঞই যখন করবেন তখন কলকাতার কোনো ভালো পণ্ডিতকে বললে পারতেন।'

রমেনবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কেন, আমাদের পণ্ডিত খারাপ কীসে?'

'ভালো খারাপ বুঝি না। তবে এতদিন ধরে টাকা নিয়ে কাজ তো কিছু করতে পারেনি।'

'একদম বাজে কথা বলবি না হারামজাদা। টাকা নেয় তো কী হয়েছে? ও যখন বলেছে শোভেন ফিরবে, তখন ফিরবেই।'

নন্দ কিছু বলল না। বয়স যত বাড়ছে রমেনবাবু ততই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছেন। এমন একজন মানুষকে যুক্তি দিয়ে কিছু বোঝানো অসম্ভব।

শশধর পণ্ডিত এলো ঠিক দশটার সময়। রমেনবাবু বিছানায় শুয়ে কড়িকাঠ গুণছিলেন। মাথাটা সামান্য ঝাঁকিয়ে শশধর বলল, 'পেন্নাম হই কর্তা। সব কুশলমঙ্গল তো?'

কী হলো কে জানে। রমেনবাবু আচমকা বলে ফেললেন, 'বড্ড ধুলো পণ্ডিত। কী করা যায় বলো তো?'

শশধর ভ্যাবাচাকা খেয়ে চুপ করে গেল।

রমেনবাবুর ঘরেই যজ্ঞ হবে। ঘরটা ছোট। হরিশ্চন্দ্রের বিয়ে পালঙ্ক আর মেহগনি কাঠের একটা পেল্লাই আলমারির জন্য আরও ছোট দেখায়। অপরিসর মেঝেতে নন্দ যজ্ঞের সব জিনিসপত্র এনে রাখল। নিজের হাতে সব সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে যজ্ঞ শুরু করল শশধর। প্রথমে যজ্ঞপতির আবাহন। এই যজ্ঞের অধিপতি স্বয়ং মহাদেব। তাকে তুষ্ট করতে চেষ্টার ত্রুটি করল না শশধর। তার সামনের পাটির ভাঙা দাঁতের ফাঁক দিয়ে এলিয়ে পড়া সংস্কৃত উচ্চারণ শুনে মনে মনে তারিফ করলেন রমেনবাবু। ভাবলেন, যোগ্য ঋত্বিকের হাতেই যজ্ঞের ভার অর্পণ করেছেন। আগেকার কাল হলে মোটা পারিতোষিক দিতেন। এখন আর সেটা সম্ভব নয় বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রমেনবাবু।

ওদিকে যজ্ঞের শেষ লগ্নে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে শশধর অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে প্রদক্ষিণ শুরু করল। রমেনবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'ও কী করছ পণ্ডিত!'

'আজ্ঞে, মহাদেবের চারপাশে বাঁধন দিচ্ছি।'

রমেনবাবুর বিস্ময় আরও বাড়ল, 'বাঁধন দিচ্ছ! মহাদেবকে? উনি কী বাঁধা পড়বেন?'

'আজ্ঞে, পড়বেন। এক মাসের মধ্যে আপনার ছেলেকে ফিরিয়েও আনবেন। এই মাত্তর কথা হলো কি না।'

আড়াইশো টাকা দক্ষিণা নিয়ে শশধর বিদায় নিল।

একমাস। মানে তিরিশ দিন। রমেনবাবুর মনে দারুণ ফুর্তি। এই ক'টা দিন তিনি হেসেখেলে কাটিয়ে দেবেন। শশধর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এক মাসের মধ্যে মহাদেব শোভেনকে ফিরিয়ে আনবেন। একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ চাইলে কী না করতে পারে! এমনকী মহাদেবের সঙ্গে কথাও বলতে পারে।

শশধরকে অবিশ্বাস করেন না রমেনবাবু। শোভেনের ফিরে আসার কথায় সায় দিলে কাউকেই অবিশ্বাস করেন না। যে ছেলে পঁচিশ বছরে একবারও বাবার খোঁজ নেয়নি, একটা চিঠি পর্যন্ত কখনো লেখেনি— সে কোথায় আছে, কেমন আছে, আদৌ বেঁচে আছে কিনা!... এসব প্রশ্ন রমেনবাবুর মাথায় আসে না। অনুশোচনা যত তাকে জীর্ণ করে তিনি ততই শোভেনের ফিরে আসার কল্পনাকে আঁকড়ে ধরেন। তার অপরাধী মন সন্তানের কাছে ক্ষমাভিক্ষার জন্য গুমরে ওঠে। ঝাপসা হয়ে যায় দুচোখ। ধুলো হয়ে যেতে থাকা শোভেনের মুখটা বুকে টেনে নিয়ে আচম্বিতে বলে ওঠেন, 'আর যে পারি না বাপ! একবার আয়। আমায় মুক্তি দিয়ে যা।'

তবে আর কোনো চিন্তা নেই। বাঁধা পড়েছেন মহাদেব। তিনি কথা দিলে যে কথার নড়চড় হবার তো নেই।

আজ সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। বৃষ্টি এখনও নামেনি বটে, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই নামবে। নন্দ গিয়েছিল মাঠে। বিঘে তিনেক ধানজমি এখনও বেঁচেবর্তে আছে বলে সারা বছরের খোরাকিটা জুটে যায়। না থাকলে কী হতো ভগবানই জানেন। মাঠ থেকে ফেরার সময় ছুইমুদ্দির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

সাইকেল থেকে নেমে ছুইমুদ্দি বলল, 'ছালাম আলেকুম নন্দদা। খবর সব ভালো তো?'

'চলে যাচ্ছে রে। তোরা কেমন আছিস?'

'ব্যাস আল্লার মেহেরবানি। রাজাবাবু কেমন আছেন?'

'ভালো আছেন।'

ছুইমুদ্দি উদাস গলায় বলল, 'বড্ড কষ্ট পাচ্ছেন গো। আল্লা যদি নিয়ে নেন মানুষটা বেঁচে যায়।'

হাওয়ার ঝাপটায় নন্দ টাল খেল। চোখ তুলে চেয়ে দেখল মেঘের ভারে ঝুলে পড়েছে আকাশ। চঞ্চল হয়ে উঠল নন্দ। উদাস ছুইমুদ্দিকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে হনহন করে হাঁটা দিল বাড়ির দিকে।

আসলে নন্দ পালিয়ে গেল ছুইমদ্দির কাছ থেকে। রমেনবাবুর মৃত্যুর কথা শুনলে তার ভয় করে। রমেনবাবু তার ছাদ। তার দেওয়াল। তার শেকড়। নন্দর স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নেই। আত্মীয়-স্বজন নেই। বন্ধু নেই। থাকার মধ্যে আছে এক রাজবাড়ির ধ্বংসস্তূপ। আর আছেন রাজ্যহীন নিঃসঙ্গ এক রাজা।

সোনাপাড়ার মোড়ে বৃষ্টি নামল। বানডাকানো বৃষ্টি। মুহূর্তের মধ্যে উলোঝুলো হয়ে গেল চারপাশ। নন্দর মনে হলো, সে বোধহয় আর কখনও রাজবাড়িতে ফিরতে পারবে না। তাকে দেখতে না পেয়ে রাজাবাবু... ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল নন্দ।

কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি একটু কমল। ততক্ষণে নন্দ নিজেকে অনেকটাই সামলে নিয়েছে। মুখে বোকা বোকা হাসি। ছুইমুদ্দির কথা শুনে মাথাটা হঠাৎ পাগলাটে হয়ে গিয়েছিল। তার কাছেও যে অস্ত্রশস্ত্র আছে সে কথা মনেও

পড়েনি। এবার থেকে সে আরও ভালো ডাক্তারি করবে। শোভেনদাকে এমন জীবন্ত করে দেবে যে নন্দ নিজেই মিথ্যেটা ধরতে পারবে না। কার বুকের পাটা আছে রাজাবাবুকে নিয়ে যাক তো দেখি!

পাঁচ

অমাবস্যার দিন সোনালদিতে সাজো সাজো রব পড়ে যায়। এমনিতে এ তল্লাটে দেখার কিছু নেই। আছেন শুধু মা ভবতারিণী। প্রত্যেক অমাবস্যায় ধুমধাম করে মায়ের পুজো হয়। মেলা বসে। রায়চৌধুরীদের আদিপুরুষ সদাশিবচন্দ্র মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তন্ত্রাচার্য কালীকিঙ্কর চক্রবর্তী ছিলেন প্রথম সেবায়েত। এখনকার সেবায়েত রামতারক তারই বংশধর।

আজ অমাবস্যা।

নন্দ ঘরে ঢুকে দেখল রমেনবাবু আলমারি খুলে শোভেনের পুরনো জামাকাপড় ঘাঁটছেন। বিরক্ত হলো সে। এই এক নতুন বাতিক হয়েছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে বলেন, 'আমায় খাট থেকে নামিয়ে দে।' তারপর আলমারি খুলে জামাকাপড় ঘাঁটতে বসে যান। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, 'শোভেন এসে কী পরবে আগে থাকতে ঠিক করে রাখতে হবে না?'

মুশকিল হলো নন্দ ডাক্তারি করে অসুখ সারাতে পারে কিন্তু বাতিক সারাতে পারে না।

গলা খাঁকারি দিয়ে নন্দ বলল, 'বলছিলুম কী আজ তো অমাবস্যা। বাড়ি থেকে সিধে যাবে তো না কি?'

আগে মন্দিরের খরচপত্তরও রাজবাড়ি থেকেই যেত। পুজোর সময় রাজা উপস্থিত থাকতেন। প্রতাপচন্দ্র থেকে হরিশ্চন্দ্র— সবাই নিজের হাতে পাঁঠা বলি দিতেন বলে শোনা যায়। সেসব দিন আর নেই। তাও অন্নপূর্ণা যতদিন ছিলেন মায়ের আলতা সিঁদুর আর একটা ভালো শাড়ি পাঠাতেন। রমেনবাবুর আমলে শুধু সিধে যায়।

জামাকাপড় সরিয়ে রমেনবাবু কাঁচুমাচু মুখে বললেন, 'সেটা কি ঠিক হবে নন্দ? এখন তো মহাদেবের আশ্রয়ে আছি, ভবতারিণীকে সিধে পাঠালে তিনি যদি রেগে যান?'

'সে আবার কী কথা! মহাদেব আর ভবতারিণী আলাদা নাকি?'

'আলাদা নয় বলছিস? বেশ তবে দিয়ে আয় সিধে। আর বেটিকে একটু বলিস, বড্ড ধুলো। ধুলোয় আমার কষ্ট হয়।'

সন্ধ্যে হতেই বেরিয়ে পড়ল নন্দ। পুজো দ্বিতীয় প্রহরে। নন্দ তখন থাকতে পারবে না। এখন রামতারক চক্রবর্তীর জিরেনের সময়। নন্দ একান্তে তাকে কিছু বলতে চায়।

সেদিন বৃষ্টির মধ্যে মাথাটা ধাঁধিয়ে যাবার পর থেকেই কথাটা নন্দর মনে হচ্ছে। ছুইমুদ্দির আগে কত লোকই তো রমেনবাবুর রোগভোগের কথা বলেছে। মরণ হলে মানুষটা যে মুক্তি পাবে সে কথাও তো নতুন কিছু নয়। সেসব কথায় ভয় নন্দ অবশ্যই পেয়েছে। তেমন তেমন লোক হলে আগ বাড়িয়ে ঝগড়াও করেছে। কিন্তু সেদিনের মতো ভেঙে পড়েনি। ধাঁধিয়ে যায়নি তার ইহকাল-পরকাল। এর কারণও বের করে ফেলেছে নন্দ। বয়স যত বাড়ছে তার আত্মবিশ্বাস কমে যাচ্ছে। তার মন একটা মিথ্যেকে আর সত্যি ভাবতে পারছে না। বানানো সত্যের জায়গায় দিনদিন প্রখর হয়ে উঠছে প্রকৃত সত্য। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সত্য। কোথায় যাবে সে? শেষ জীবনটা কি ভবতারিণী মন্দিরের চাতালে বসে ভিক্ষে করে কাটবে?

না, তা হতে পারে না। নন্দ মনে মনে চিন্তা করল। তার শক্তি চাই। মিথ্যেকে সত্যি বানাবার শক্তি। তাকে ডাক্তারি করতে হবে। শোভেনের ফিরে আসার কল্পনাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আরও অনেকদিন, অনেক বছর রমেনবাবুকে মাতাল করে রাখতে হবে।

রামতারক তান্ত্রিক মানুষ। কত গুহ্যবিদ্যা জানেন। নন্দর ধারণা, তার পায়ে একবার কেঁদে পড়লে তিনি তাকে ফেরাবেন না। তিনি আশীর্বাদ করলেই নন্দর মন আবার তরতাজা হয়ে উঠবে।

মন্দিরের চাতালে ম্যারাপ বাঁধা। বর্ষাকাল বলে এই ব্যবস্থা। রাত একটু বাড়লে ভক্তরা আসতে শুরু করবে। মায়ের পুজোর সময় চাতালে এত ভিড় হয় যে তিলধারণের জায়গা থাকে না।

ভিখু গয়লানি চাতালে ঝাঁট দিচ্ছিল। ওকে দেখে নন্দর মনটা উদাস হয়ে গেল। কত বয়েস হবে ভিখুর? চল্লিশ-বিয়াল্লিশ তো বটেই। শরীরের গড়ন এখনও বেশ ভরাট। ছেলেবেলায় শোভেনদা যখন ঘোড়ায় চড়ে কোশাকুশির মাঠ পেরিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে যেত, নন্দ বসে থাকত গাছের নীচে। অপেক্ষা করত শোভেনদার জন্য। ভিখুর বাবা মদনকাকার বাড়ি ছিল কাছেই। নন্দকে একা বসে থাকতে দেখে ভিখু ছুটে এসে বলত, 'আমার সঙ্গে পুতুল খেলবে নন্দদা?' কতদিন ভিখুর সঙ্গে পুতুল খেলেছে নন্দ। পুতুলের বিয়ে দিয়েছে দু'জনে। পুতুল-কন্যে শ্বশুরবাড়ি চলে যাওয়ার পর একেবারে আসল বাবা-মা'র মতো দুঃখ পেয়েছে। একটা পরিপূর্ণ সংসারের ছবি সেই বয়সেই ভিখু এঁকে দিয়েছিল। খেলা ভেবে নন্দ ছবিটা তুলে রাখেনি। রোদেজলে সেই ছবি নষ্ট হয়ে গেছে।

এতদিন পর আজ হঠাৎ নন্দর নিজের ওপর করুণা হলো। ভাগ্য করে সে একটা মানবজীবন পেয়েছিল। কিন্তু কিছু করা হলো না।

নন্দ ভেবেছিল ভিখুর সামনে যাবে না। কিন্তু কী এক আশ্চর্য আকর্ষণে চলে গেল। ভিখু তাকে দেখতে পায়নি। নন্দ বলল, 'ভালো আছিস ভিখু?'

ভিখু অকৃত্রিম আনন্দে হেসে বলল, 'ওমা, নন্দদা যে! কদ্দিন পর দেখা হলো। এক গেরামে থাকি কে বলবে!'

নন্দ আবার প্রশ্নটা করল। মুহূর্তের মধ্যে ভিখুর হাসিটা পালটে গেল, 'কী জানি কেমন আছি। তুমি কেমন আছ নন্দদা?'

'বিয়ে করলি না কেন ভিখু?'

ভিখু অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল নন্দর মুখের দিকে। তারপর মাথা নীচু করে বলল, 'কী জানি কেন করলুম না।'

রামতারক নিজের ঘরে বসে কী একটা বই পড়ছিলেন। মন্দিরের পুরোহিত হলেও নানা বিষয়ে তাঁর আগ্রহ। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে গ্রামে একটি লাইব্রেরি করেছেন। মাঝে মাঝে সেখানে গিয়েও পড়াশোনা করেন।

নন্দ ঘরে ঢুকে বলল, 'রাজবাড়ি থেকে সিধে এনেছি তারক ঠাকুর।'

রামতারক বই থেকে মুখ তুলে নন্দকে দেখে বললেন, 'ও তুই! ওই টেবিলে থালাটা রাখ। তারপর, রাজাবাবুর কী খবর?'

'আজ্ঞে ভালোই আছেন।' কথাটা বলেই নন্দ রামতারকের পা জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমার বড়ো বিপদ তাকরঠাকুর। দয়া করে একটা উপায় বলে দ্যান।'

রামতারক নন্দকে স্নেহ করেন। গ্রামের আর পাঁচজনের মতো তিনিও বিশ্বাস করেন, অন্নপূর্ণা মারা যাবার পর নন্দ যেভাবে রমেনবাবুকে বুক দিয়ে আগলে রেখেছে তার জন্য কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। কিন্তু রমেনবাবু যদি ভালো থাকেন তাহলে নন্দ কোন বিপদের কথা বলছে? রামতারক বুঝে উঠতে পারলেন না।— 'আরে হতভাগা পা ছাড়। সব কথা খুলে বল। কী হয়েছে তোর?'

নন্দ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলতে আরম্ভ করল। এসব কথা সে আগে কখনো কাউকে বলেনি। অবনী ডাক্তার মানা করে, 'খবরদার এ কথা পাঁচকান করিসনি নন্দ। লোকে জানতে পারলেই ব্যাগড়া দেবে। ইহকাল পরকালের বচন ঝাড়বে। একটা মান্যিগন্যি লোককে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তুই ক'টা মিথ্যে কথা বলছিস, এতে অন্যায় তো কিছু নেই।'

নন্দও জানে অন্যায় নেই। তবে স্বার্থ আছে। অবনী ডাক্তারের স্বার্থ দু'পয়সা রোজগার। এদিকে নন্দকে দিয়ে ডাক্তারি করায় আর ওদিকে নিজের ডাক্তারখানায় বসে বলে, 'আমার চিকিৎসাতেই তো রাজাবাবু সুস্থ আছেন। কথাটা সত্যি কি না একবার নন্দকেই জিজ্ঞাসা করে দ্যাখো না।'— এসব কথা শুনে ভিন গাঁ থেকে রুগিরা এসে ভিড় করে। নন্দর কানে সবই আসে। সে রা কাড়ে না। তার নিজের স্বার্থও তো বড়ো কম নয়।

সব কথা বলার পর নন্দ বলল, 'আমার মনের জোর ফিরিয়ে দ্যান তারক ঠাকুর। যাতে আমি আরও ভালোভাবে ডাক্তারি করতে পারি।'

রামতারক হেসে বললেন, 'তুই বুঝি ভাবছিস তোর ডাক্তারির জন্য রাজাবাবু বেঁচে আছেন?'

'আজ্ঞে, অবনীবাবু তো তাই বলেন।'

'মিথ্যে কথা বলে অবনী ডাক্তার। মা রেখেছেন বলে রাজাবাবু আছেন। যেদিন মা টেনে নেবেন সেদিন তোর ডাক্তারি কিস্যু করতে পারবে না।'

এ তল্লাটে রামতারককে সবাই বাকসিদ্ধ বসে মানে। তিনি যা বলেন, তাই ফলে যায়। নন্দ পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একটা কথাও বলতে পারল না।

রামতারক বললেন, 'ভবিষ্যৎ নিয়ে তোর খুব চিন্তা না রে? ভয় কী! রাজাবাবু যখন থাকবেন না তখন মায়ের মন্দিরে এসে থাকিস। মায়ের কাজ করবি আর দুবেলা প্রসাদ পাবি।'

'জীবন এত সহজ নাকি গো ঠাকুর?' কথাগুলো নন্দ মনে মনে বলল। মুখে কিছু বলতে পারল না। চোখের দৃষ্টি থমকে রইল রামতারকের পায়ে। তার আশ্রয় এত কাছে ছিল সে জানতে পারেনি। জানলে তাকে ডাক্তার সাজতে হতো না। কান্না পাচ্ছিল নন্দর। কষ্ট হচ্ছিল রমেনবাবুর জন্য। তার কষ্ট রমেনবাবুকে মিথ্যে স্তোকবাক্য বলার জন্য নয়। সন্তানকে ভোলাবার জন্য মা তো কতই ছল করেন। কিন্তু সেই ছলনায় যখন স্বার্থ এসে মেশে তখন আর মা হয়ে ওঠা হয় না। নন্দ পারেনি মা হতে। কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। রামতারকের পায়ের কাছে বসে বলল, 'এখন আমি কী করব বলে দ্যান।'

রামতারক তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'আমায় কিছু বলতে হবে না। সময় হলে মা-ই তোকে সব বলে দেবেন।'

ছয়

শশধর পণ্ডিতের দেওয়া এক মাস সময়ের অর্ধেক কেটে গেল। এখনও শোভেনের দেখা নেই। রমেনবাবু দিন-দিন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছেন। উঠতে বসতে নন্দকে গালাগাল দেন। নন্দ বিশেষ সাড়াশব্দ করে না। মুখ বুজে কাজ করে যায়। আগেও সে বেশি কথা বলত না, সেদিন মন্দির থেকে ঘুরে আসার পর থেকে আরও চুপচাপ হয়ে গেছে। ফাঁক পেলেই ভবিষ্যতের ভাবনায় তলিয়ে যায়। তারক ঠাকুর তাকে মায়ের কাজ করার কথা বলেছেন, কিন্তু কী কাজ বলেননি। মন্দিরে কত কাজই তো থাকে। বাজারহাট, রান্নাবান্না, বাসনপত্তর মাজাধোওয়া— ভাবতে ভাবতে নন্দর

মন ঘুরে যায় ভিখুর দিকে। আর ঠিক তখনই ধুলোয় ভরে যাওয়া তার মনের আনাচেকানাচে মাথা তোলে দু-একটা কচি চারা। সবুজ পাতারা হাওয়ায় দোল খায়। ফুল ফোটে। নন্দ মুখ ফিরিয়ে নিতে চায় কিন্তু পারে না। স্পষ্ট শুনতে পায়, ভিখুর গলা, 'আমার সঙ্গে পুতুল খেলবে নন্দদা?' আধবুড়ো নন্দ ফিসফিস করে বলে, 'খেলব'।

শ্রাবণ মাস পড়তেই নন্দর নির্নিমেষ প্রশান্তিতে বাধা পড়ল। টানা চারদিন উথালপাতাল বৃষ্টি। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। কত মাটির ঘর যে ভেঙে পড়ল আর কত টিনের চাল যে উড়ে গেল তার ঠিক নেই। রাজবাড়ির অবস্থাও খুব খারাপ। নোনা ধরা দেওয়ালে জলের দাগ। জানলার পাল্লার ফাঁকফোকরে বৃষ্টি ছাঁট। রমেনবাবুর ঘরে দু'দণ্ড দাঁড়ালে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

বিপদ আঁচ করে নন্দ কম্বল বের করল। গলা পর্যন্ত কম্বলে ঢেকে রমেনবাবু বললেন, 'এটা ভালো করেছিস। বড্ড শীত করছিল।'

নন্দ কিছু না বলে চলেই আসছিল, রমেনবাবু ডাকলেন, 'নন্দ। তুইও কি আমার মতো চতুর্দিকে ধুলো দেখছিস?'

দীর্ঘদিনের অভ্যেসবশত নন্দ ডাক্তারি শুরু করতে যাচ্ছিল, শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। রামতারক তাকে ডাক্তারি করতে বারণ করেছেন। মা ভবতারিণীর নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে বলেছেন। সে তাই করবে। রমেনবাবুর মাথায় হাত বুলিয়ে নন্দ বলল, 'কোথাও তো ধুলো নেই বাবু। ওসব আপনার মনের ভুল। ঘুমিয়ে পড়ুন দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।'

রমেনবাবু ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু নন্দর চোখে ঘুম এলো না। মাথায় দুশ্চিন্তার পাহাড়। রমেনবাবু অসুখে পড়বেনই। তখন সে কী করবে? চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? সহ্য করতে পারবে মানুষটার কষ্ট? বিদ্রোহ করে উঠল নন্দর মন, 'তা হয় না। আমি পারব না ঠাকুর। একটা বাপ-মা মরা অনাথ ছেলেকে ওই মানুষটা আশ্রয় দিয়েছিল। মা বলত, শোভেন আমার বড়ো আর তুই ছোট। মায়ের জন্য কিছু করতে পারিনি কিন্তু ওই বুড়ো লোকটা যদি আমার ক'টা মিছে কথা শুনে চাঙ্গা হয়, তাতে দোষ কী ঠাকুর।'

দোষগুণের বিচার হলো না। নন্দও কিছুক্ষণ পর অনুভব করল তার বিদ্রোহী মন কখন যেন শান্ত হয়ে গেছে। বিশ্বাসের সেই জোর নেই। উৎসাহ নেই। মন যেন বলতে চায়, 'মিছে কথা বলে কাজ নেই। তারক ঠাকুরের কথাই ঠিক। বাবুর আয়ু আছে বলেই এখনও টিঁকে আছেন। তোমার ডাক্তারিতে বাবু সেরে যায়, এসব তোমার অহঙ্কার।' নন্দ জোর করে বলতে চাইল, 'একটা মানুষ যদি সুস্থ হয়ে ওঠে তো অহঙ্কারই সই।' কিন্তু বলা হলো না। চোখের সামনে ভিখুর সুন্দর মুখটা দেখে নন্দর কথা আটকে গেল।

নন্দর অনুমান মিথ্যে নয়। পরের দিনই রমেনবাবু অসুখে পড়লেন। প্রবল কাশি আর হাঁপের টান। এই দুই শত্রুর সঙ্গে নন্দর পরিচয় আছে। কিন্তু এবার রমেনবাবু জ্বরও বাধিয়ে বসলেন। গায়ে হাত দিলে হাত পুড়ে যায় এমন জ্বর।

অবনী ডাক্তার রুগি দেখে দায়সারা ভাবে বলল, 'ওষুধে আর রাজাবাবুর কাজ হবে না। যা করার তোকেই করতে হবে।'

'তা হয় না ডাক্তারবাবু। আপনি যদি না পারেন আমাকে তাহলে সদরে বড়ো ডাক্তারবাবুর কাছে যেতে হবে।'

গেঁয়ো অশিক্ষিত একটা চাকরের কাছে অবনী ডাক্তার এই জবাব আশা করেনি। তার চেয়েও বড়ো কথা, রমেনবাবুর নাম ব্যবহার করে সে বিস্তর রোজগার করেছে। এখন যদি সদরের ডাক্তার এসে গুড় খেয়ে বেরিয়ে যায়, ভিন গাঁয়ের লোক আর তাকে মানবে না। সম্ভাব্য লোকসানের কথা চিন্তা করে অবনী ডাক্তার হেসে বলে, 'আহা আমি পারব না সেকথা কখন বললুম। সর, দেখি কী করতে পারি।'

রমেনবাবুর জ্ঞান নেই। কথা আছে না নেই ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। অবনী ডাক্তার নতুন প্রেসক্রিপশন লিখল। যাবার সময় বলে গেল, 'ওষুধগুলো এখনই নিয়ে এসে খাওয়াতে শুরু কর। আর কাত্তিকের ওষুধের দোকানে আমি বলে দিচ্ছি, একটু পর গিয়ে একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে আসবি। দুগ্গা, দুগ্গা।'

সিলিন্ডার এলো। নন্দ এসব জানে। হাওয়ার কল খুলে যত্ন করে রমেনবাবুর নাকে লাগিয়ে দিল নলদুটো। তারপর বুকে কান ঠেকালো। হ্যাঁ, ধুকপুক করে চলছে বটে হৃদয়টা। একটু আগেও রমেনবাবু খাবি খাচ্ছিলেন। বিদঘুটে ঘড়ঘড় শব্দটা শুনতে শুনতে নন্দ ভাবছিল, মানুষ তার শরীরে জল ধরে রাখতে পারে, খাবার ধরে রাখতে পারে, কিন্তু হাওয়া কেন পারে না। এখন আর সেই ঘড়ঘড় শব্দটা নেই। ঘরের ভেতর কোনো শব্দই নেই। বাইরে শুধু ঝড়ের সোঁ সোঁ শব্দ।

দু'দিন পর রমেনবাবু কথা বললেন। নন্দ রুটি সেঁকছিল। হঠাৎ কানে এলো রমেনবাবুর গলা, 'তোমাকে তো বললুম শোভেনের হাতে জল না খেয়ে আমি কোথাও যাব না। তুমি এখন যাও বড়ো বউ।'

চমকে উঠল নন্দ। উনুন থেকে চাটুটা নামিয়ে ঘরে গিয়ে দেখল রমেনবাবুর চোখ বন্ধ। কিন্তু ঠোঁট নড়ছে। তিনি জড়িয়েমড়িয়ে একই কথা বলে চলেছেন। নন্দ কপালে হাত দিয়ে জ্বর

দেখল। জ্বর এখনও আছে। তবে কলের হাওয়ার গুণে শ্বাসকষ্টটা নেই। কিন্তু জ্বর যদি আরও বাড়ে? এত রাতে নন্দ কার কাছে যাবে? অবনী ডাক্তার শ্বশুরবাড়ি গেছে। ফিরবে পরশু। ভয়ে নন্দর মুখ শুকিয়ে গেল। রমেনবাবুর কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলল, 'বাবু! ও বাবু! আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?'

'কে? কে রে?'

'আজ্ঞে, আমি নন্দ।'

'তুইও বুঝি আমাকে নিয়ে যেতে এসেছিস? শালা তোকে বলিনি, আমি কোথাও যাব না।'

নন্দ কান্না চেপে বলল, 'আপনাকে কোথাও যেতে হবে না। আপনি এখানেই থাকবেন।'

রমেনবাবু খুশি হয়ে বললেন, 'তা হলে যা। শোভেন তার ঘরে আছে। ওকে পাঠিয়ে দে। গিয়ে বল, বুড়ো বাপ ক্ষমা চাইবে বলে বসে আছে। ওর ক্ষমাই যে আমার গঙ্গাজল!'

নিজের ঘরে এসে নন্দ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। লুটিয়ে পড়ল বিছানায়। এখন সে কী করবে? কোথা থেকে নিয়ে আসবে শোভেনকে? শিশুর মতো কাঁদতে কাঁদতে সে বলল, 'বাবুকে আর কষ্ট দিসনি মা। সময় যদি হয়ে গিয়ে থাকে এবার নিয়ে নে।'

রাত বাড়তে থাকল। রাতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ল রমেনবাবুর বিলাপ। ছেলের কান্না শুনে বললেন, 'রেলগাড়ি ভেঙে গেছে তো কী হয়েছে গোপাল! আবার আমি কিনে দেব।' ছেলে ঘুমের মধ্যে রূপকথার রাক্ষসকে দেখে ভয় পেয়েছে। রমেনবাবু বললেন, 'রাজপুত্র আবার কাঁদে নাকি! সে তো তলোয়ারের এক কোপে রাক্ষসের গলা কেটে ফেলবে।'

রমেনবাবুর কথা ভালো বোঝা যায় না। তবুও নন্দ কান খাড়া করে রইল। যদি ঘোর কাটে। যদি রমেনবাবু তাকে ডাকেন। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটল না। নন্দর মনে হলো, আর কোনো ঘটনা ঘটবে না। রমেনবাবুর জীবনের ঘটনাস্রোত থেমে গেছে। শেষ বাঁধনটা যদি কেউ খুলে দেয় তা হলে খড়ির দাগ বোধহয় আজ রাতেই মুছে যাবে।

ঘরের ভেতর অন্ধকার নিশ্চল হয়ে

দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। রমেনবাবুর চেতনা পুরোপুরি লুপ্ত হয়নি। ধুলোয় ঢাকা একটা পর্দা পেন্ডুলামের মতো দুলছে। হালকা হলুদ একটা আলো। সনাতন টুডুর অট্টহাসি। রূপমতীর প্রেম! শোভেনের গৃহত্যাগ। রমেনবাবুর ঠোঁট নড়ে উঠল, 'একবার আয় না বাপ। তুই না এলে আমি কেমন করে যাই!'

এই মিনতি রমেনবাবু অনেকবার করেছেন। কেউ সাড়া দেয়নি। কিন্তু এবার ঘরের নিশ্চল অন্ধকারে কীভাবে যেন মৃদু সাড়া পড়ল। দূরে কোথাও বাজ পড়ার শব্দ মিলিয়ে গেল একটু একটু করে। জানলার ফাঁক দিয়ে আচমকা ঢুকে পড়া ঠাণ্ডা হাওয়ায় নিভে গেল লণ্ঠনের শিখা। আর ঠিক তখনই রমেনবাবুর কানে আছড়ে পড়ল ছোট্ট একটা ডাক, 'বাবা!'

রমেনবাবু রুগ্ন। দুর্বল। জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন। ডাক একটা শুনেছেন কিন্তু কার ডাক বোঝেননি। ভাবলেন, মরণ কি জীবনকে বাবা বলে ডাকে? কে জানে মরণ জীবনের সন্তান কি না! চারপাশটা এমন হলুদ হয়ে গেল কী করে? হলুদের ওপারে ওই যে তোরণ দেখা যায়, ওটাই কি স্বর্গ? 'একবার ছেলেটাকে দেখতে চেয়েছিলুম। তাও দিলে না ঠাকুর?'

'বাবা, আমি শোভেন।'

রমেনবাবু যেন ডুবতে ডুবতে ভেসে উঠলেন। হলুদ পৃথিবীটা দপ্ করে নিভে গেল। অনন্ত অন্ধকারে ভাসতে ভাসতে বললেন, 'কে? সনাতন? তোমাদের মেয়েকে আমার ছেলে ভালোবাসে সনাতন। ওকে মেরো না।'

'আমি সনাতন নয় বাবা। শোভেন। আপনার ভানু।'

'ভানু এইচিস? এত দেরি করলি কেন বাপ?'

'আজ সকালেই খবর পেলাম। তাই আসতে দেরি হয়ে গেল।'

'আমাকে ক্ষমা করেছিস তো? বুড়ো বাপের অপরাধ মনে রাখতে নেই সোনা। এবারকার মতো ক্ষমা করে দে।'

'কীসের ক্ষমা বাবা! আপনার তো কোনো দোষ ছিল না। ভাগ্যের দোষে যা হবার হয়েছে।'

রমেনবাবুর চেতনা আবার দিশা হারাল। শুধু শোভেনের ক্ষমার জন্য রমেনবাবুর চেতনা বাসায় ফিরেছিল। সারা জীবনের তপস্যার ফসলে নৌকো বোঝাই হওয়া মাত্র নোঙর উঠল। রমেনবাবু স্খলিত স্বরে বলে উঠলেন, 'আমি এমন ধুলো হয়ে যাচ্ছি কেন রে ভানু! আমাকে ধর তুই। ধরে রাখ।'

শোভেন হাত বাড়াবার আগেই রমেনবাবু বিদায় নিলেন।

সকাল হলো। ভোজবাজির মতো দুর্যোগও কেটে গেল। নন্দ এতক্ষণ রমেনবাবুর পায়ের কাছে বসেছিল। তার মন পাথর। মাথাটা ফাঁকা। সে নিবিষ্ট মনে একটা মাছির দিকে তাকিয়ে আছে। মাছিটা রমেনবাবুর খোলা মুখগহ্বরের চারপাশে উড়ছে। মাঝে মাঝে বসছে ঠোঁটের ওপর। আবার উড়ছে।

কিন্তু হঠাৎ একসময় মাছিটাকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। আর ঠিক তখনই নন্দর মনে হলো কেউ কি তার কথা বিশ্বাস করবে? বিশেষ করে রামতারকের কথা চিন্তা করে সে অস্থির হয়ে উঠল। রামতারককে সে কথা দিয়েছিল ডাক্তারি করবে না। মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের সঙ্গে আর কোনো প্রতারণা করবে না। কিন্তু রমেনবাবুর কষ্ট সে সহ্য করতে পারেনি। তাই কথাও রাখতে পারেনি।

নন্দ ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। শোভেনের পোশাক ছেড়ে নিজের পোশাক পরে নিল। তারপর রমেনবাবুর পা জড়িয়ে ধরে বলল, 'কাল শোভেনদা আসেনি বাবু। আমিই শোভেনদা সেজেছিলাম। আমারই মিছিমিছি ক্ষমায় খুশি হয়ে আপনি সগগে গেছেন। তার জন্য যে শাস্তি আমার পাওনা হয় দ্যান। যদি আপনার থেকেও আমার কষ্টের মরণ হয় তো তাই সই। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এবার অন্তত আমি নিজের স্বার্থে আপনাকে ঠকাইনি। আপনার কষ্ট সইতে পারিনি বলে বাঁধন খুলে দিয়েছি।'

বেলা একটু বাড়লে নন্দ বাইরে বেরিয়ে একজনকে বলল, 'কাল রাতে রাজাবাবু মারা গেছেন। গাঁয়ের সবাইকে খবরটা একটু দাও তো ভাই।'

লোকটা পড়ি কি মরি হয়ে গ্রামের দিকে ছুটল।

খোলা আকাশের দিকে তাকাল নন্দ। একটা মুখ খোঁজার চেষ্টা করল। ভিখুর মুখ। ঝলমল করে উঠল ভিখু। দু'দিন আগেও ভিখুর কথা ভেবে, রামতারকের দেওয়া আশ্রয়ের কথা ভেবে নন্দ কত খুশি হয়েছে। কিন্তু আজ এই মন কেমন করা সকালে আকাশে ভিখুর মুখ দেখে তার কিছু মনেই হলো না। যেন ভিখুকে সে চেনেই না। যেন ভিখুর কথা ভেবে এই বুড়ো বয়সে ঘরদুয়ারের স্বপ্ন সে দেখেইনি।

অবাক হলো নন্দ। আকাশের ভিখুর দিকে ছড়িয়ে দিল দু'হাত। হাত কোথাও পৌঁছলো না। নতুন এক ভয় ঘিরে ধরল নন্দকে। সে ঠগ। প্রতারক। যদি সে ভিখুর ওপরেও ডাক্তারি করে ফেলে? যদি ধুলোয় ধুলোয় ভরে দেয় ভিখুর চোখ? যদি মিথ্যে স্বপ্ন দেখিয়ে ভিখুকেও বেঁধে ফেলে কোনো অবান্তর প্রতিজ্ঞায়? বড্ড কষ্ট পাবে ভিখু। স্বর্গের ডাক আসবে, কিন্তু নরক ছেড়ে যেতে পারবে না। নন্দ আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তা হয় না রে ভিখু। পুতুলখেলা আমার ভাগ্যে নেই। থাকলে ঠিক খেলতুম।'

কিছুক্ষণের মধ্যে গোটা সোনালদি গ্রাম ভেঙে পড়ল রাজবাড়ির সামনে। কিন্তু নন্দকে কোথাও দেখা গেল না। ■

এক যোদ্ধা সন্ন্যাসী

বিজয় আঢ্য

মাননীয় মন্টুদা,

আমি উত্তরকাশী যাচ্ছি। কখন ফিরব জানি না। আপনাদের পরিচালনায় কল্যাণ আশ্রমের কাজের শ্রীবৃদ্ধি হোক ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই।

— নবকুমার সরকার

এক-দু লাইনের ছোট্ট চিঠি। চিঠিটা পড়ে বলরামদার চোখের কোণ দুটো চিক্ চিক্ করে উঠল।

১৯৭৮ সাল। তখন পশ্চিমবঙ্গ তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কাজ সদ্য শুরু হয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বরিষ্ঠ প্রচারক শ্রদ্ধেয় বসন্তরাও ভট্ট তখন এই কাজের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁরই প্রেরণায় এই বছরে নবকুমার সরকার পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের পুরুলিয়া জেলার বাগমুণ্ডি প্রকল্পের কাজে যোগ দেন। বাগমুণ্ডি ব্লকের অযোধ্যা পাহাড়ের বিভিন্ন গ্রামের চতুর্থ শ্রেণী উত্তীর্ণ ছাত্রদের নিয়ে একটা ছাত্রাবাস গড়ে তোলা হয়েছে। তবে আর পাঁচটা ছাত্রাবাসের মতো এটা নয়। বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের পড়াশোনা ছাড়াও এখানে রয়েছে শারীরিক শিক্ষা, ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও নৈতিক শিক্ষারও ব্যবস্থা। এই কাজের জন্য চাই অনুভবী ও শিক্ষিত যুবক। যাঁরা এই কাজকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করবেন। বাগমুণ্ডিতে

এই কাজে এগিয়ে এলেন প্রথমে দু'জন যুবক— নবকুমার সরকার ও বর্ধমানের মদন মিত্র। মাস চারেক পর তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন বাঁকুড়ার বড়জোড়ার বলরাম সাঁতরা মানে মন্টুদা।

হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার হরিণখোলা নদীর ধারে ভুঁয়েড়া গ্রাম। ১৯৫১ সালের ১১ নভেম্বরে এই গ্রামেই নবকুমারের জন্ম। বাবা গান্ধী অনুরাগী স্বর্গীয় বিভূতিভূষণ সরকার। মা প্রমীলা দেবী। মা-র বয়স এখন প্রায় নব্বই ছুঁই ছুঁই। বিভূতিবাবু প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আরামবাগের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী বি কে রায়ের ফার্মে তিনি চাকরি করতেন। বদলির চাকরি। তাই কখনো কোলাঘাট, কখনো তারকেশ্বর, কখনো বা আরামবাগ। শেষমেষ বালিবেলা গ্রাম হয়ে কামারপুকুর। সাত ভাই। সাত ভাইয়ের মধ্যে নবকুমার দ্বিতীয়। বড়ো ভাই সুকুমার সরকার একসময় সঙ্ঘের প্রচারক ছিলেন। কোলাঘাট ইউনিয়ন হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা; সেসময় সাইকেল চালাতে গিয়ে পড়ে গেলে নবকুমারের বাম হাতটা ভেঙে যায়, সেই হাত এখনও ঠিক সোজা হয়নি। এরপর কালীপুর স্বামীজী হাইস্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক, কামারপুকুর কলেজ ও পরে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিদ্যায় এম এস সি।

এই সময়কার অর্থাৎ স্বামীজীর ছোটবেলাকার কিছু ঘটনা যা তাঁর ভাইঝি স্বাগতা সরকার স্বামীজীর কাছ থেকে শুনে লিখে রেখেছিলেন, তা এইরকম— স্বামীজীর বয়স তখন দু'বছর। দাদার পিছু পিছু পুকুরপাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ আর দাদাকে দেখতে পেলেন না। পরিবর্তে যা দেখলেন তা শুনে আমাদেরও গা শিউরে উঠবে। একটা সাপ স্বামীজীর দিকে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তবে একটু পরেই সাপটা নিজে থেকেই সরে গেল। ছোটবেলাকার কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী জানিয়েছেন, মা হাতে করে দু-গাল খাইয়ে দিলে তবেই ঘুমতে যেতেন।

যখন তিনি কলেজের ছাত্র, ১৯৭১-এর শেষের দিকে, সহপাঠি নির্মলচন্দ্র মাইতির সঙ্গে আরামবাগের বটতলার (থানার) কাছে পাঁচুবাবুর বাড়ির নীচতলার এক কুঠুরিতে স্থানীয় সঙ্ঘ (আর এস এস) কার্যালয়ে গেছিলেন। সেই কুঠুরিতে একটাই জানালা— বাড়ির ভেতরের দিকে। কোনো লম্বা মানুষ হাত তুললে কড়িকাঠে ঠেকে যায়। একটা জোগাড় করা ছোট স্ট্যান্ড ফ্যান আছে বটে, তবে সেটাকেই মাঝে মাঝে হাওয়া দিতে হয়। সেই কার্যালয়ে সঙ্ঘের একজন প্রচারক থাকেন, বছরখানেক হলো তিনি কাটোয়া থেকে বদলি হয়ে এখানে এসেছেন। নির্মলের সঙ্গী বন্ধুটির সঙ্গে পরিচয় হলো। বুশ শার্ট আর ফুলপ্যান্ট পরা এক যুবক। খুব শান্ত। খুব আস্তে আস্তে কথা বলে। শহরের পাশে বালিবেলা গ্রামে তার বাড়ি। সেই পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয়েছে। বালিবেলা গ্রামে শাখা শুরু হয়েছে। তাদের পরিবারের সব ভাইয়েরাই ক্রমে সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তিনি নিজে সঙ্ঘের দ্বিতীয় বর্ষ ও অন্যান্য ভাইয়েরাও সঙ্ঘ শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। পুরো পরিবারই সঙ্ঘময় হয়ে গিয়েছে। জরুরি অবস্থার সময় (১৯৭৫-১৯৭৭) এই পরিবারই ছিল একটা আশ্রয়স্থল। নবকুমার নিজেও বর্ধমানে সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করে কয়েক মাস কারাবন্দি ছিলেন। এরপর কয়েক মাস বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলে শিক্ষকতাও করেন।

'The Caravan' পত্রিকা ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ তারিখের সংখ্যায় লীনা গীতা রঘুনাথ-এর 'Swami Aseemanand's radical service to the Sangha' শীর্ষক এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। প্রতিবেদনটি স্বামী অসীমানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লেখা। ২০১১ সালের জানুয়ারির প্রথমদিকে আম্বালার সেন্ট্রাল জেলে নেওয়া এই সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে লেখিকা নিজেই জানিয়েছেন যে, গত দু-বছরেরও বেশি সময়ে তিনি যে চারটি সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এটি তার প্রথম সাক্ষাৎকার "This was the beginning of the first of four interviews..".

কলকাতায় এসে স্বস্তিকার তৎকালীন সম্পাদক বিজয় আঢ্য-র সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে এই প্রতিবেদক জানিয়েছেন, অসীমানন্দ ও তাঁর পরিবার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অনুগামী ছিলেন। তাঁর গান্ধীবাদী পিতৃদেব আর এস এসের বিষয়ে সতর্ক করে দিলেও "The balance of Aseemananda's beliefs tilted dramatically during his twenties, under the mentorship of two Sangha members"। তাঁদের একজন সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের তৎকালীন প্রান্ত প্রচারক স্বর্গীয় বসন্তরাও ভট্ট। প্রতিবেদকের ভাষায়, ... "fiercely dedicated to the mission of the RSS, but had a soft, disarming charisma"।

স্বামী অসীমানন্দের পরিবার এতটাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুরাগী ছিল যে শ্রীআঢ্য নিজেই স্বীকার করেছেন, "It was infact from his house that I read all the major literature on Vivekananda'। এই বাড়ির বইয়ের আলমারিতে একনাথ রানাডে সম্পাদিত 'A Rousing call to the Hindu Nation' বইটিও ছিল। অসীমানন্দ তাঁকে বলেছিলেন, রামকৃষ্ণ মিশনের মতে প্রত্যেক ধর্ম সমান। তাঁরা খ্রিস্টমাস, ইদ পালন করে, আমিও তা করি। তখন শ্রী আঢ্য তাঁকে বলেছিল, স্বামী বিবেকানন্দ এরকম বলেছিলেন বলে তিনি বিশ্বাস করেন না। রানাডের বইটা নিয়ে তিনি স্বামীজীর লেখা সেই উদ্ধৃতিটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যেখানে বলা হয়েছিল— "Every man going out of the Hindu pale is not only a man less, but an enemy the more"। প্রতিবেদক জানিয়েছেন, অসীমানন্দ তাকে

মা ও ভাইদের সঙ্গে স্বামী অসীমানন্দ।

বলেছিলেন, 'I got a huge shock after reading this'। তারপর বেশ কিছুদিন তিনি চিন্তাভাবনা করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, তার সীমিত ক্ষমতায় বিবেকানন্দের শিক্ষাকে অনুভব বা সম্পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তখন থেকেই মনস্থ করেছিলেন 'I will follow it all my life'।

এক বছরের কিছু পরে হঠাৎ একদিন বর্ষার সন্ধ্যায় বাগমুণ্ডির ছাত্রাবাসে তিনি ফিরে এলেন। পরনে গৈরিক বসন। না, নবকুমার সরকার নন, এখন তিনি স্বামী অসীমানন্দ। ছাত্রাবাসে আনন্দ আর ধরে না। অনেকদিন পর তাদের প্রিয়জনকে কাছে পেয়েছেন। বলরামদাও খুব খুশি। অনেক জমে থাকা কথা দু'বন্ধুর মধ্যে হলো। কলকাতা থেকে বেরিয়ে তিনি প্রথমে উত্তরকাশী গিয়েছিলেন। উত্তরকাশীর বিস্তৃত এলাকার পর্বতে অসংখ্য গুহা, কন্দর। সেখানে সব সাধু-সন্তাদের বাস। ঈশ্বর সাধনায় মগ্ন। চারিদিক শান্ত সমাহিত। এখানে বিচরণ করলে শরীর মনে এক প্রসন্নতা নেমে আসে। এই উত্তরকাশীতেই একদিন এক বঙ্গভাষী সাধকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। বয়সে যুবক ওই সাধুর নাম পরমানন্দ গিরি। এই সাধকের জীবনেও অনেক অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ। কিন্তু সেসব অন্য প্রসঙ্গ।

স্বামী পরমানন্দ তাঁর গুরুদেবের গুহায় স্বামী অসীমানন্দকে নিয়ে যান। অতি দুর্গম সেই স্থান। বছরে একবার মাত্র গুরুদেব সেই গুহার বাইরে আসেন। বয়স প্রায় তিনেশা বছর বলে অনুমান। নগ্নদেহী এই গুরুদেব আহার করেন না বললেই চলে। বায়ু সেবনেই জীবিত থাকেন। শরীরের দিকে কোনো খেয়াল নেই। তাঁর জটা মাটি স্পর্শ করেছে। স্বামী অসীমানন্দ ও স্বামী পরমানন্দ হয়ে উঠলেন পরস্পরের গুরুভ্রাতা। পরবর্তীকালে স্বামী পরমানন্দ বর্ধমান জেলার রায়নার কাছে বনগ্রামে পরমানন্দ মিশন নামে এক আশ্রম স্থাপন করেন। অসীমানন্দ তাঁর কাছেই সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন।

সন্ন্যাস জীবনের পরম্পরা অনুসারে স্বামী অসীমানন্দজী স্থির করলেন, পরিব্রাজক হিসেবে তিনি সারা দেশ পরিভ্রমণ করবেন। দেশের মানুষকে খুব কাছ থেকে জানাই এই পরিব্রাজক জীবনের উদ্দেশ্য। আক্ষরিক অর্থেই কপর্দক শূন্য হয়ে তিনি পথে পা বাড়ালেন। কারও কাছেই নিজের প্রয়োজনের জন্য কোনো কিছুই চাইবেন না, এমনকী ক্ষুধার অন্ন বা পরিধেয় বস্ত্রও। সমাজের মানুষই তাঁর এই ব্রতের কথা বুঝে নিজেরাই পাথেয় সংগ্রহ করে তাঁকে দেবেন— এই বিশ্বাস তাঁর ছিল। কিন্তু তাঁর এই বিশ্বাস থাকলে কী হবে, পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর জন্য যে কিছু করা দরকার, সমাজের বেশিরভাগ মানুষেরই তেমন ধারণা ছিল না। কোনো কোনো দিন তাই অভুক্তই থাকতে হয়েছে। পরিধেয় বস্ত্রেও ফাটল ধরেছে। সব মিলিয়ে সত্যিই এক করুণ অবস্থা। অনেকটা ভিখারির মতো। কিন্তু এই অবস্থাতেও বিশেষত ওড়িশা আর ঝাড়খণ্ডের বনবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে পরিভ্রমণ করে দেশ ও সমাজের প্রকৃত

অবস্থাটা অনুভব করার চেষ্টা করেছেন। এই পরিব্রাজন কালে কয়েকজন সাধু-মহাত্মার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তাঁর পরিব্রাজক জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি করে সাধু-সন্তরা তাঁকে এই ব্রত ত্যাগ করে তাঁদের সহযাত্রী হতে বলেছিলেন। কেননা, বর্তমান সমাজ পরিব্রাজক ব্রতের মাহাত্ম্য বোঝে না। তাই এখন এই ব্রত মেনে চলা খুব কঠিন। তবুও স্বামীজী আপন ব্রতেই অটল রইলেন। সাধু-সন্তদের পরামর্শের সারবত্তা বুঝেও তিনি পরিব্রাজক ব্রত থেকে বিরত হলেন না এবং শেষপর্যন্ত তা সম্পন্নও করলেন।

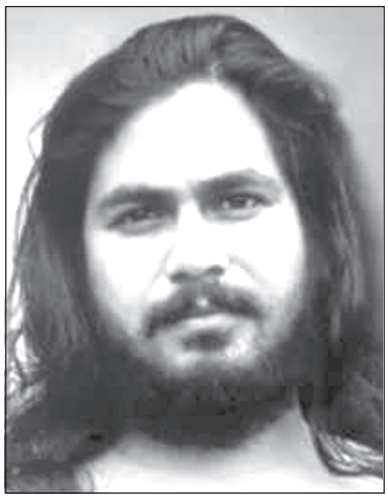

পরমানন্দ গিরি

বসন্তরাও ভট্ট

এই পরিব্রাজনের সময় অমরকণ্টকে বাবা কল্যাণদাসজী মহারাজের সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়েছিল। পরিব্রাজক ব্রত শেষ হতেই স্বামী অসীমানন্দ অমরকণ্টকে কল্যাণদাসজীর আশ্রমে উপস্থিত হলেন। নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বনবাসী ছাত্রদের ছাত্রাবাস পরিচালনার অভিজ্ঞতার কথাও জানালেন। কল্যাণদাসজী তখন নিজেদের আশ্রমের সেই ছাত্রাবাস পরিচালনার দায়িত্ব অসীমানন্দজীকে দিলেন। এই আশ্রমে আরও অনেক সাধুসন্ত থাকতেন। আহারের সময় আশ্রমের সাধুসন্তরা আলাদা পঙ্‌ক্তিতে বসতেন। স্বামীজী কিন্তু বিষয়টা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। স্বভাবতই এ নিয়ে কথা উঠল। কল্যাণদাসজীও স্বীকার করলেন, ভোজনের সময় সাধুসন্তরা যে আলাদা বসেন তাতে কোনো অন্যায় নেই। তাঁরা আলাদা বসতেই পারেন। এই বিধান দিলেও কল্যাণদাসজী নিজে কিন্তু বনবাসী বালকদের পঙ্‌ক্তিতে গিয়ে বসলেন। তাঁর এই আচরণেই স্পষ্ট হয়ে গেল সাধুসন্তদের জন্য আলাদা কোনো পঙ্‌ক্তির প্রয়োজন নেই।

স্বামীজী অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গেই আশ্রমের কাজ দেখভাল করছিলেন। ছাত্রদের প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। এই সময় একদিন উজ্জয়িনীর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সন্ন্যাসী স্বামী ভাস্করানন্দজী কল্যাণদাসজীর আশ্রমে এলেন। স্বাভাবিকভাবেই ভাস্করানন্দজীর সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় ঘটল। পরিচয়সূত্রে স্বামীজী একথাও জানালেন যে, এই অমরকণ্টকেই রায়পুরের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী আত্মানন্দজীর সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়েছে। ছত্তিশগড়ের বস্তার জেলার অবুঝমাড়, নারায়ণপুর এলাকার বনবাসীদের সেবার জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে তখন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছিল। আত্মানন্দজী অবুঝমাড়ে সেবা কাজের জন্য স্বামীজীকে যেতে অনুরোধ করলেন। আত্মানন্দজীর পরামর্শ মতোই স্বামীজী ও ভাস্করানন্দজী অবুঝমাড়ের উদ্দেশে রওনা দিলেন। সত্যি বলতে কী, নারায়ণপুরে মিশনের কাজ তখন সবে শুরু হয়েছে। থাকার ব্যবস্থাও ঠিকমতো হয়ে ওঠেনি। গ্রামের বনবাসীদের ঝুপড়ির মধ্যেই থাকতে হতো। অবুঝমাড়ের বনবাসীদের ভাত রান্না করে খাওয়ার অভ্যাস তখনও হয়নি। জঙ্গলে যে ফলমূল বা অন্য যা কিছু পাওয়া যায়, তা খেয়েই তারা জীবন ধারণ করত। যেখানে স্বামীজীরা থাকতেন, তাদেরই একটি মেয়ে তাদের ভাত রান্না করে দিত। বাস্তবে মেয়েটি ভাত রান্না করতেও জানত না। কেননা, ওই দরিদ্র বনবাসীদের সংসারে ভাত খাওয়াটাও ছিল একরকম বিলাসিতা। একটা পাত্রে জল ঢেলে সে উনুনে বসাত আর জলটা যখন ফুটত তখন তাতে চালগুলো ঢেলে দিত। ভাত এভাবেই রান্না করতে হয় বলে তার মনে হয়েছিল। তারপর তা স্বামীজীদের দিয়ে বলতো, এটা আপনাদের, আমি খাব না। অনেকভাবে বোঝানোর পর শেষপর্যন্ত মেয়েটি খেতে রাজি হলো। কীভাবে ভাত রান্না করতে হয় স্বামীজীরা তাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

একদিন বীজাপুর যাওয়ার সময় মেয়েটি স্বামীজীর কাছে পয়সা চাইল। স্বামীজী ভাবলেন, রান্না ইত্যাদি কাজ করে দেওয়ার জন্য বোধ হয় সে পয়সা চাইছে। স্বামীজী মেয়েটিকে দশটা টাকা দিলেন। একী! স্বামীজী দেখলেন, মেয়েটি বাজার থেকে একটা মাটির ঘড়া কিনে নিয়ে এসেছে। স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন, ঘড়া নিয়ে কী করবে? মেয়েটি বলল, এই ঘড়ায় করে আপনাদের জন্য জল আনব। আর পাঁচটা টাকা ফেরত দিয়ে বলল, এটা বেঁচেছে। স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি নিজের জন্য কী এনেছ? মেয়েটি বলল, বাজার গিয়ে আমার জন্য আবার কী আনব? আপনাদের ঘড়া কেনার জন্যই তো বাজারে গিয়েছিলাম।

অবুঝমাড়ে বনবাসীদের মধ্যে একশ্রেণীর মানুষ ছিলেন, যাদের

গায়ের রং ফর্সা। এদেরই সঙ্গে স্বামীজীর একবার দেখা হলো। তাদেরই একজন এগিয়ে এসে স্বামীজীর সঙ্গে করমর্দন করে ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করল— হাউ ডু ইউ ডু? স্বামীজী খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন। স্বামীজী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথা থেকে ইংরাজি ভাষা শিখলে? লোকটি বলল, এক ইংরেজ সাহেব এখানে এসেছিলেন। সে আমাকে অসমে নিয়ে গিয়েছিল। অসমে তার চা-বাগান ছিল। আমি সেখানে অনেকদিন কাজ করেছি। সাহেব যখন নিজের দেশ বিলেত যাচ্ছিল তখন আমাকেও নিয়ে গেল। স্বামীজী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি সেই দেশে এই পোশাকে গিয়েছিলে? সে বলল, না সাহেব, এভাবে যাইনি, জামাপ্যান্ট পরে গেছিলাম। স্বামীজী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সেই দেশে থাকলে না কেন? সে বলল, নিজের দেশই ভালো সাহেব। স্বামীজী আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি জামাপ্যান্ট পরছ না কেন? সে বলল, নিজেদের লোকেদের সামনে ওই পোশাক পরতে ভালো লাগে না। নিজেদের পোশাকই (ল্যাঙ্গট) পরতে ভালো লাগে।

এইসময় বস্তারে নকশালদের কাজ শুরু হয়েছে। বনবাসীরা অত্যন্ত সরল হলেও পুলিশের ঝুট ঝামেলা থেকে নিজেদের বাঁচাতে তারা এক উপায় বার করেছিল। তাদের অবস্থা ছিল অনেকটা শাঁখের করাতের মতো। একদিকে নকশাল, অন্যদিকে পুলিশ। যেদিকেই যাক না কেন, দুদিকেই বিপদ। পুলিশ এসে নকশালদের খবরাখবর জিজ্ঞাসা করলে নকশালরা বাঁ দিকে গেলে তারা ডানদিকে গেছে বলত। নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য আজও তারা এরকমই সব উপায় অবলম্বন করে আছে।

একবার পুলিশ আসার খবর পেয়ে গ্রামের সব লোক পালিয়ে গেল। স্বামীজী কিন্তু গ্রামেই থেকে গেলেন। স্বামীজী পুলিশের কাছে নিজের পরিচয় জানালেন। পুলিশ চলে যাওয়ার পর আবার সব লোক গ্রামে ফিরে এলো। স্বামীজী তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা পুলিশ দেখে পালিয়ে গেলে কেন? বনবাসীরা জানায়, পুলিশ গ্রামে এসে তাদের খুব মারধর করে।

একবার এই অঞ্চলের এক গ্রামে এক ব্যক্তির সঙ্গে স্বামীজীর দেখা হলো। বনবাসীদের মতোই খালি গায়ে ও ল্যাঙ্গট পরে আছে। সে স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করল— আপনি কে?

আমি এখানকারই একজন।

কিন্তু আপনি তো এখানকার নন?

স্বামীজী বললেন, আমি দিল্লি থেকে এসেছি। বনবাসীদের জীবন ভালোভাবে জানার জন্য এখানে আমার আসা। এটাই আমার গবেষণার বিষয়।

স্বামীজী বস্তারের অবুঝমাড়ে প্রায় দু'বছর ছিলেন। সেখানে একবার ম্যালেরিয়া রোগে গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই রোগ সারাতে গিয়ে তাকে যে ওষুধ খেতে হলো, তার সাইড এফেক্ট-এ তিনি মোটা হয়ে গেলেন। নারায়ণপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমে দু'বছর থাকার পর তিনি আবার সুস্থ জীবন ফিরে পেলেন। নারায়ণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমকে ঘিরে তখন নানা কর্মদ্যোগ শুরু হয়েছে। বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ছাত্রাবাস, অতিথি নিবাস, অধিকারী ও পদাধিকারীদের নিবাস তৈরি হয়েছে। তখন বস্তারের কালেক্টর ছিলেন বি ডি শর্মা। তাঁর সঙ্গে কর্মরত প্রশাসনিক অধিকারী ও কর্মচারীদের আবাসে যেসব বনবাসী মেয়েরা কাজ করত, এদের সংস্পর্শে এসে তাদের অনেকেই সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়েন। কালেক্টর শর্মাজী এইসব সন্তানসম্ভবাদের আইন মোতাবেক বিবাহের বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু ঘটনা হলো, এইসব সরকারি কর্মচারীদের যখন স্থানান্তর হতো তখন তারা স্ত্রী ও সন্তানকে ছেড়ে দিয়ে চলে যেত। এর ফলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সন্তানদের ভর্তি করাতে গিয়ে এইসব বনবাসী মায়েদের সমস্যার মধ্যে পড়তে হতো। সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য পিতার নাম লেখা বাধ্যতামূলক ছিল। একজন ভর্তি হতে এসে কিছুতেই পিতার নাম বলতে পারল না। ফলে সমস্যা তৈরি হলো। তখন স্বামীজী নিজেই এগিয়ে এসে শিশুটির পিতার নামের স্থানে নিজের নাম লিখে দিলেন। বিদ্যালয়ে শিশুটির ভর্তির পথ সুগম হলো।

প্রায় বছর পাঁচেক বস্তার এলাকায় থাকার পর আবার তাঁর মনে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কাজ করার ইচ্ছা জাগলো। কলকাতায় এসে স্বামীজী মাননীয় বসন্তরাও ভট্টর সঙ্গে দেখা করলেন। মাননীয় বসন্তদা দীর্ঘ ১৭ বছর বাংলায় সঙ্ঘের প্রান্ত প্রচারক ছিলেন। জরুরি অবস্থা উঠে গেলে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের বাংলা-সহ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের সংগঠন সম্পাদকের দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়। সেই সূত্রেই মাননীয় বসন্তদার সঙ্গে দেখা করে তিনি নিজের ইচ্ছার কথা জানালেন। এইসময় আন্দামান-নিকোবরে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কাজের বিস্তারের বিষয়ে ভাবনাচিন্তা চলছিল। আন্দামান-নিকোবরে তখন ছত্তিশগড়, রায়গড়, সরগুজা, রাঁচি, গুমলা, লোহারদাগা থেকে বহু জনজাতি মানুষ শ্রমিক হিসেবে গিয়েছিল। আন্দামান-নিকোবরে এদের রাঁচিওয়ালা বলা হতো এবং এদের বস্তিগুলোকে রাঁচি বস্তি নামে পরিচিত ছিল। এছাড়া অন্ধ্রপ্রদেশের আদিলবাদ, সিরকাকুলাম থেকেও বহু শ্রমিক সেখানে কাজ করতে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে মাননীয় বসন্তদা আন্দামানে গিয়ে সেখানকার বনবাসী সমাজের স্থিতি সরেজমিনে দেখে এসেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন, আন্দামানে বনবাসীদের মধ্যে সেবাকাজের জন্য কাউকে পাঠাতে হবে। তিনি এই কাজের জন্য স্বামীজীকে আন্দামানে যেতে বললেন। এই কাজের প্রস্তুতির জন্য বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কেন্দ্র যশপুরে স্বামীজীকে পাঠালেন। যশপুরে স্বামীজী এক বছর ছিলেন। আশ্রমে ছাত্রদের বালকদের পড়ানোর দায়িত্ব

তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি রামায়ণও গভীরভাবে অধ্যয়ন করলেন। নিজের কথা ও ব্যবহারের কারণে স্বল্প দিনের মধ্যেই তিনি বালকদের প্রিয় হয়ে উঠলেন। ছাত্রদের পড়াশোনার মানও এতে অনেকটা উন্নত হলো।

যশপুর আশ্রমে একবছর থাকার পর পরিকল্পনামতো তিনি আন্দামানে পৌঁছালেন। আন্দামানে রাঁচি বন্ধুরা অচ্ছ্যুত ছিলেন। সমাজের এক ধারে তাদের ঠাঁই ছিল। কারও সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল না। তাই তাদের মধ্যে কাজ করার দরকার ছিল। স্থানীয় লোকেদের ধারণা, রাঁচির জনজাতিরা খ্রিস্টান। তারা হিন্দু নয়। কেননা, তারা হিন্দুদের কোনো উৎসব পালন করে না। তাদের বসতিতে কোনো মন্দিরও ছিল না। তারা রবিবার দিনে চার্চে যায়, খ্রিস্টানদের মতো ২৫ ডিসেম্বর দিনটিকে বড়দিন হিসেবে পালন করে। নিজেদের ছেলেমেয়েদের নামও খ্রিস্টানদের মতো রাখে। এইরকম এক পরিস্থিতির মধ্যে স্বামীজী রাঁচি এলাকা থেকে আসা জনজাতিদের মধ্যে কাজ শুরু করলেন। দৈনিক বা সাপ্তাহিক ভজন-কীর্তন শুরু হলো। কাজ শুরুর সময় অনেকরকম অসুবিধার মুখোমুখি হতে হলো। একদিন বিকেলে রাঁচি বসতির একজনের ঘরে তিনি পৌঁছালেন। জঙ্গলের ধারেই সেই ঘর। সেই ঘরের বাসিন্দাদের সঙ্গে তাঁর আগে থেকে পরিচয় ছিল না। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। জঙ্গলের পথ দিয়ে চলার সময় কখন যে জামাকাপড়ে জোঁক ঢুকে গেছে তা টের পাননি। পরে জামাকাপড়ে রক্ত দেখে টের পেয়েছিলেন তার শরীর থেকে রক্ত বের হচ্ছে। সেই ঘরে তখন এক মহিলা ছিলেন। তিনি জানালেন, ঘরের পুরুষ মানুষটি এখন নেই। একটু পরে ফিরবে। মহিলার কথাটা বুঝতে স্বামীজীর অসুবিধা হলো না। স্বামীজী ঠিক কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। অনেকটা পথ হেঁটে এসেছেন। আবার সন্ধ্যাও নামছে। ভাগ্য ভালো বলতে হবে, এমন সময় ঘরের পুরুষ মানুষটি ফিরে আসায় সেই ঘরে আশ্রয় মিলল। যেখানে কোনো পরিচিতি নেই সেখানে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এরকম ঝুকি নেওয়া ছাড়া অন্য আর কী বা উপায় আছে?

আর একদিনে ঘটনা। স্বামীজী রাঁচি বসতির কোনো এক গ্রামে যাচ্ছিলেন। এবারে অবশ্য যেখানে যাচ্ছেন তার নাম ঠিকনা ছিল। যিনি তাঁকে যেতে বলেছিলেন তিনিও সেখানে পরে যাবেন বলে জানিয়েছেন। কথামতো স্বামীজী বিকেলের দিকে সেই ঘরে পৌঁছালেন। কিন্তু সেই ঘরের যিনি কর্ত্রী ছিলেন তিনি একটু ভয় পেয়ে গেলেন। এই দূর গ্রামে সাধু-সন্তরা কখনো আসে না। যারা আসে তারা সাধুর বেশে বাজে লোক। ঠকিয়ে চুরি করে নিয়ে পালায়। স্বামীজী নিজের ও যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন তার কথা বললেও মহিলার মন থেকে ভয় গেল না। অগত্যা স্বামীজীকে অন্য আর এক গ্রামে এক পরিচিতর বাড়ি যেতে হলো। একটু পরে স্বামীজীকে যিনি পাঠিয়েছিলেন, তিনি উপস্থিত হলে সেই মহিলা বললেন, তিনি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। কেননা, সবাই এরকমই বলে। মহিলা যেন একাজ করেছেন বলে একটু আত্মপ্রসাদই লাভ করলেন।

তিনি লক্ষ্য করলেন, খ্রিস্টান মিশনারিরা আন্দামান-নিকোবরের বনবাসীদের সরলতার সুযোগ নিয়ে তাদের ধর্মান্তরণ করছে। তিনি স্থির করলেন, এদের আবার স্বধর্মে ফিরিয়ে আনতে হবে। এজন্য শতকষ্ট হলেও এই বনবাসীদের মধ্যেই থাকতে হবে। সংকল্প মতো কাজও শুরু করলেন। ধীরে ধীরে তাদের মন জয় করলেন। দীর্ঘ তিন বছরের চেষ্টায় তাদের একাংশ পরম্পরাগত ধর্মে ফিরে এলো। বনবাসী পরিবারগুলি থেকে বালকদের নিয়ে পোর্ট ব্লেয়ারের একটি ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা করলেন। এর আগে হিন্দু সন্ন্যাসীরা আন্দামানে গেছেন, কিন্তু দর্শক হিসাবে। অথচ খ্রিস্টান মিশনারিরা সবসময় বনবাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেছে। স্বামী অসীমানন্দ সাড়ে চার বছর আন্দামানে ছিলেন। এরকম অত্যাধিক পরিশ্রমের ফলে মায়াবন্দরে তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এজন্য তাঁকে স্থানীয় সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

স্বামীজীর এই সম্পর্কের ফলে রাঁচি বসতিতে রামনবমী, কৃষ্ণজন্মাষ্টমী, রক্ষাবন্ধন, হোলি, দীপাবলী, বসন্ত পঞ্চমী প্রভৃতি উৎসব ক্রমশ শুরু হলো। রাঁচি জনজাতিদের পরম্পরাগত উৎসব করমা, জিতিয়া হতে লাগল। আন্দামান-নিকোবরের রাঁচি বসতিতে যে জনজাতিরা রয়েছে, তারা যে হিন্দুই তা ক্রমশ স্থানীয় মানুষরা বুঝতে পারল। রাঁচি বসতির এইসব উৎসবে অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক, কেরল থেকে আসা জনজাতিরাও ক্রমশ শামিল হতে শুরু করল। পোর্টব্লেয়ার, রঙ্গত, বকুলতলা, মায়াবন্দর, ডিগলিপুর, লিটল আন্দামানের মতো প্রমুখ স্থানগুলিতে হনুমানজয়ন্তী বিপুল উৎসাহে জাঁকজমকের সঙ্গে হতে লাগল। ভজন, কীর্তন, শোভাযাত্রা হতে লাগল। পোর্ট ব্লেয়ারে প্রথমবার রামনবমী উপলক্ষে বিশাল মিছিল বের হলো। প্রায় দশ হাজার মানুষ সেই মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানকার হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করার জন্য স্বামীজী পোর্ট ব্লেয়ারে সম্মিলন কক্ষ-সহ একটি মন্দির নির্মাণের ব্যবস্থা করলেন। সেই সঙ্গে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের আন্দামান শাখার একটি বিধিবদ্ধ সমিতিও গঠিত হলো।

আন্দামান নিকোবরে স্বামীজীর কাজের পরিণাম দেখে তাঁর উপর বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের অখিল ভারতীয় শ্রদ্ধা জাগরণ প্রমুখের দায়িত্ব দেওয়া হলো। তিনি তখন থেকে সমগ্র দেশে বনবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে গিয়ে শ্রদ্ধা জাগরণ কাজের বিস্তার করতে লাগলেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ডিমাসা, কার্বিয়াংলঙ, ডীফু, উমরাংসু, হাফলং, নায়বাংগ প্রভৃতি অঞ্চলগুলিতে বনবাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেন। সেইসঙ্গে ত্রিপুরার বনবাসী

অঞ্চলগুলিতেও পরিভ্রমণ করলেন। ডিমাসা জনজাতির আরাধ্য দেবতা শিবরায় (ভগবান শিব)-এর ভজন সংগ্রহ করে কয়েকটি গ্রামে দৈনিক বা সাপ্তাহিক ভজন-কীর্তন শুরু করলেন। অসমে শ্রদ্ধা জাগরণের কাজের সময় এক মহিলা তাঁর সঙ্গে কাজ করতে চাইলেন। স্বামীজী ওই মহিলাকে অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে এভাবে কাজ করা তাদের পদ্ধতি নয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ওই মহিলার উদ্দেশ্য ফাঁস হয়ে গেল। আর কোনো উপায় না দেখে ওই দুষ্ট মহিলা স্বামীজীর কাছে ক্ষমা চেয়ে বিদায় হলো।

স্বামীজী এরপর দক্ষিণের প্রদেশগুলিতে পরিভ্রমণ শুরু করলেন। অন্ধ্রপ্রদেশের আদিলবাদ, সিরকাকুলম, মহবুবনগর-সহ বিশাখাপট্টনম জেলায় মাসাধিককাল ধরে বনবাসী সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেন। ভজন-কীর্তন ও রামায়ণ গানের মাধ্যমে জাগরণের কাজ চলতে লাগল। খুন্টি ও সিমডেগা জেলাতেও গেছিলেন। যশপুর ও গুমলা জেলার পাশে বারাবনী, মোফরাগ্রামে লাবা ও শঙ্খ নদীর সংগমস্থলে শঙ্খেশ্বর মহাদেবের মন্দির নির্মাণ করে মহাশিবরাত্রিতে মেলার আয়োজন করলেন। যশপুর ও সিমডেগা — এই দুই জেলারই কাছাকাছি জায়গায় সারদা ধাম প্রতিষ্ঠা করে সারদা উৎসব শুরু করলেন। এইসব এলাকার বেশিরভাগ মানুষই মজদুর ও অবহেলিত শ্রেণীর। তবুও তাদের মধ্যে দেবদেবীর প্রতি, মা গঙ্গার প্রতি ভক্তির কোনো অভাব ছিল না। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দিনাজপুর জেলার গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করে শ্রদ্ধা জাগরণ কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার জেলার চা-বাগানগুলিতে সম্পর্ক স্থাপন করে শ্রদ্ধা জাগরণ কেন্দ্রের কাজ শুরু করেছিলেন। ছত্তিশগড়ে বস্তার জেলার সঙ্গে স্বামীজীর সম্পর্ক আগে থেকেই ছিল। এই সময় বস্তার জেলা পরিভ্রমণের সময় তিনি 'ফিসচুলা' রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে নারায়ণপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের অতিথি নিবাসে কিছুদিন থাকেন। স্বামীজী চলে যাওয়ার পর একদিন একটি মেয়ে স্বামীজীর খোঁজ করতে সেই হাসপাতালে এলেন। সেখানকার কর্মচারীরা জানায় যে, স্বামীজী কয়েকদিন আগেই হাসপাতাল থেকে চলে গিয়েছেন। একথা শুনে ওই মেয়েটি কেঁদে ফেলল। বলল, স্বামীজী আমার পিতাজী। আমি তো এতদিন পিতাজী হিসেবে স্বামীজীর নামই বলে এসেছি। কর্মচারীরা তখন মেয়েটিকে নিয়ে অতিথি নিবাসে যায়। স্বামীজীর সঙ্গে মেয়েটির সাক্ষাৎ হলো। মেয়েটি বলল, ইতিমধ্যে সে দ্বাদশ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাঁর মা এক মুসলমানকে বিবাহ করেছে। সে নিজেও এখন মায়ের কাছে রয়েছে। তার বিবাহ বেনারসে হচ্ছে। স্বামীজী এসেছেন শুনে সে দেখা করতে এসেছে।

মধ্যপ্রদেশের মণ্ডলা, বেতুল, খরগোন, খাণ্ডওয়া, ধার, ঝাবুয়া, আলিরাজপুর ইত্যাদি বনবাসী অধ্যুষিত জেলাগুলিতে স্বামীজী শ্রদ্ধা জাগরণ কাজের বিস্তার ঘটাতে লাগলেন। বনবাসীরা তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে আদরযত্ন করতেন। শ্রদ্ধা জাগরণের কাজে এরপর তিনি মহারাষ্ট্রের নন্দওয়ার, নাসিক, ধুলে, জলগাঁও, ভুসওয়াল অঞ্চলের বনবাসী গ্রামগুলিতে পরিভ্রমণ করেন। পাশাপাশি গুজরাতের ডাংস, ধরমপুর, বলসাড় জেলা, কর্ণাটকের কুর্গ, সোলুগা, মহীশূর জেলাতেও যান। সিদ্ধি, গৌলী জনজাতিদের সঙ্গেও সম্পর্ক স্থাপন করেন। তামিলনাড়ুর উঠি, সেলম, কেরলের ওয়ানাডে, কুরচা, কুকেসা জনজাতিদের গ্রামে বনবাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন।

এভাবে সারা দেশের বিভিন্ন এলাকায় বনবাসী অঞ্চলে প্রবাস করে স্বামীজী শ্রদ্ধা জাগরণের কাজে গতি সঞ্চার করেন। এই সময় স্বামীজীর মনে এক ভাবনার উদয় হলো। এরকম নিরন্তর পরিভ্রমণ না করে কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসে শ্রদ্ধা জাগরণের কাজ করাই ভালো বলে তাঁর মনে হলো। স্বামীজী তাঁর ইচ্ছার কথা বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের তৎকালীন অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক ভাস্কররাওজীকে জানালেন। স্বামীজী নিজের পরিকল্পনা মতো গুজরাতের ডাংস জেলায় গেলেন। গুজরাত বনবাসী কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে ওয়াঘাইতে বালকদের ছাত্রাবাস ছিল। স্বামীজী সেখানেই নিজের কেন্দ্র স্থির করলেন। সেটা ১৯৯৬ সাল। গুজরাতের দক্ষিণে ডাংস একটা ছোট জেলা। লোকসংখ্যা খুব বেশি হলে ২ লাখ। বেশিরভাগই মানে ৯৩ শতাংশই জনজাতি। ব্রিটিশ আমল থেকেই সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজকর্ম নিষিদ্ধ। খ্রিস্টান মিশনারিদের রমরমা। তারা ডাঙ্গসকে 'পশ্চিমের নাগাল্যাণ্ড' বলত। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মতো এখানেও কাজ করা ছিল খুব বিপজ্জনক।

ডাংস জেলার ভীল, কোঙ্কণা জনজাতি অধ্যুষিত গ্রামে গ্রামে গিয়ে তিনি তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে লাগলেন। ওইসময় কোনো সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতেই সবাই ওঠাবসা করতেন। স্বামীজী কিন্তু ভীল বনবাসীদের ঘরে থাকতেই পছন্দ করতেন। বলতেন, তোমরা যা খাও তাই খাবো। নাগলী রুটি আর বরী-র ভাত তাদের সঙ্গে বসেই খেতেন। আর রাতে ঘরের পাশে খোলা জায়গায় খাটিয়া পেতে শুতেন।

তিনি দেখলেন, ওই জেলাতে খ্রিস্টান মিশনারিরা ব্যাপকভাবে তাদের কাজের জাল বিস্তার করেছে। সেখানকার বনবাসী সমাজকে ভুল বুঝিয়ে পরিবারের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে। কোনো বনবাসী পরিবারের চাই ভাইয়ের দুই ভাইকে ভুল বুঝিয়ে ধর্মান্তরিত করে বিভেদ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। তাদের পিতার স্বর্গবাস হলে হিন্দু দুই ভাই দাহ করতে চাইলে অন্য দুই ভাই কবর দিতে চায়। এই পারিবারিক ঝগড়া ক্রমে ব্যাপক আকার নিয়েছে। স্বামীজী তাই

বনবাসীদের মধ্যে থেকেই তাদের মন জয় করতে শুরু করলেন। ডাঙ্গস জেলাকে খ্রিস্টান জেলাতে পরিবর্তিত করার যে ষড়যন্ত্র খ্রিস্টান মিশনারিরা করেছিল, তা ব্যর্থ হলো। এজন্য অবশ্য স্বামীজীকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়েছিল। সেসময় খুব ভোরে উঠে স্বামীজী স্নানাদি সেরে নিতেন। সামান্য কিছু মুখে দিয়ে বনবাসীদের সঙ্গে সম্পর্কের জন্য বেরিয়ে পড়তেন। বনবাসী গ্রামে দুপুরবেলা সবাই কাজকর্মের জন্য বাইরে চলে যেত। তাই দুপুরের আহারের কোনো ঠিক ছিল না। যদি পাওয়া যেত তো খেতেন, নচেৎ রাতে যেখানে থাকতেন সেখানেই খেতেন। খাওয়া-দাওয়ার এই অনিয়মের জন্য পেটের অসুখ শুরু হলো। তবে তাতে শ্রদ্ধা জাগরণের কাজে কোনো ছেদ পড়ল না। গ্রামে গ্রামে গিয়ে ভজন-কীর্তনের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জাগরণের কাজ চলতেই লাগল। এইসময় ঘরে ঘরে হনুমানজীর ফটো টাঙ্গানো, গলায় হনুমানজীর ছবি যুক্ত লকেট পরানোর কাজ শুরু হলো। যে গ্রামে রাত্রিবাস করতেন সেখানে ভজন-কীর্তন, হনুমান চালিশা পাঠ, আরতি ও কথকতা হতো।

এক কথায়, আন্দামানের মতো এখানেও তিনি একই পদ্ধতিতে কাজ করেছিলেন। আশ্রমের ছাত্রাবাসে ফুলচাঁদ বাবলো নামে এক ছাত্রকে তাঁর সহায়ক হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। কোন গ্রামে গেলে তাদের কাজ সহজে করা যায় এবং তাদের কাজের কিছু সহযোগীও পাওয়া যাবে— এই বিষয়ে ফুলচাঁদের পরামর্শ খুব কাজে লাগত। তিনি ও তাঁর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে সপ্তাহখানেক থাকতেন এবং গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিশে যেতেন। হিন্দু ধর্মের কথা বলতেন, হুমানজীর লকেট দিতেন, হনুমান চালিশার কপি দিতেন। ভজন গাইতেন। আর খ্রিস্টান ধর্ম যেন কখনো গ্রহণ না করে এ বিষয়ে সাবধান করে দিতেন। যারা খ্রিস্টান থেকে হিন্দু হতে চায় তাদের তালিকা তৈরি করতেন। যখন তিনি ও তার সঙ্গীরা অন্য গ্রামের দিকে আবার পা বাড়াতেন, তখন তারা এক রকম নিশ্চিত থাকতেন এই গ্রামের কুটিরগুলিতে গেরুয়া পতাকা উড়তে থকবে।

বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় বালাসাহেব দেশপাণ্ডের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ১৯৯৮ সালের ২৬ ডিসেম্বর গুজরাতের ডাঙ্গস মহকুমার ডোলদাতে এক বিরাট হিন্দু সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। কোলাপুর থেকে করবীর শংকরাচার্য এই সম্মেলনে এসেছিলেন। প্রায় তিন চারশো খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী দুষ্কৃতী এই সম্মেলন বানচাল করে দেওয়ার জন্য হামলা চালায়। ফলে এক উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ১৪৪ ধারা জারি হয়। স্বামীজী মঞ্চ থেকে বারবার সবাইকে শান্ত থাকার অনুরোধ জানান। সভা শেষ পর্যন্ত সম্পন্ন হলেও সংবাদ মাধ্যম ঘটনার বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করে। প্রচার করা হয়, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ও চার্চের উপর আক্রমণ করা হয়েছে। কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি সোনিয়া গান্ধী ডাংসে আসেন। কিন্তু তিনি শুধু সেখানকার চার্চে যান এবং তাদের কথা শুনেই সংবাদ মাধ্যমকে জানান যে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের উপর প্রবল অত্যাচার হয়েছে।

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী দেবেগৌড়া ও লালুপ্রসাদ যাদবও ডাঙ্গসে যান। তাঁরা শুধু খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সমবেদনা ব্যক্ত করে ফিরে আসেন। এর কিছুদিন পর ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি অটলবিহারী বাজপেয়ীও বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য ডাঙ্গসে আসেন। ওইসময় সুপরিচিত সর্বোদয়ী নেতা ধেনুভাই স্বামী অসীমানন্দের প্রশংসা করে বলেন, বনবাসী মানুষদের সেবা করার জন্য তাঁর মতো মানুষ এর আগে এখানে কখনো আসেননি। কেউ অসুস্থ হয়েছে জানতে পারলে তিনি গাড়ির ব্যবস্থা করে তাকে হাসপাতালে পাঠাতেন। পুরো এলাকার মানুষের সুখ দুঃখের সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। ডাংস পরিব্রমণ করে এসে মাননীয় অটলজী খ্রিস্টান মিশনারিদের কাজকর্মের বিষয়টি জাতীয় স্তরে তুলে ধরলেন। আসল সত্যটা জানতে পেরে সারা দেশ হতবাক হয়ে গেল। সেবার আড়ালে খ্রিস্টান মিশনারিরা যে আদতে হিন্দুদের ধর্মান্তর করে চলেছে, তা প্রকাশ্যে এসে গেল। যাদের গ্রেপ্তার করে মামলা দায়ের করা হয়েছিল তা প্রমাণের অভাবে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হলো। এরপর ১৯৯৯ সালে হলগুড়িতে যে হিন্দু সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল, স্থানীয় প্রশাসন অবশ্য তার সুরক্ষার ব্যবস্থা পুরোপুরি করেছিল। এইভাবে একের পর এক হিন্দু সম্মেলনের সাফল্য অসীমানন্দের সাংগঠনিক নৈপুণ্যকেই তুলে ধরে। সুপ্ত হিন্দুত্বের জাগরণের জন্য তাঁর বক্তব্য ছিল অত্যন্ত প্রভাবশালী। ১৯৯৯-র জানুয়ারি সংখ্যায় The Week পত্রিকায় প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে অসীমানন্দ জানিয়েছেন, 'দারিদ্র্য দূরীকরণ বা উন্নয়নের বিষয় নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে চান না, বরং "We are only trying to uplift the tribals spiritually"।

অসীমানন্দ ডাংস-কে ভারতের অন্যতম একটা সুন্দর জায়গা বলে মনে করতেন। "You should see it during the monsoon'. Aseemananda told me in Ambala Jail"। একসময় যে ডাঙ্গস ছিল ধূসর, ফাঁকা বনাঞ্চল, আজ "miles and miles of world class highways carved into the mountains. These were built by the government of Aseemanand's most political patrons, Narendra Modi".।

গুজরাটের ডাংসের পর মহারাষ্ট্রের নন্দওয়ার, নাসিক, ধুলে জেলার বনবাসী অধ্যুষিত জায়গাগুলিতে স্বামীজী নিজের কাজকর্মকে কেন্দ্রীভূত করলেন। এইসময় স্বাধীনতা সংগ্রামী অবারে গুরুজীর সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎকার হয়। কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী

নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে প্রদীপ প্রজ্বলন অনুষ্ঠানে।

জানান, চার্চের স্কুলগুলিতে ১৫ আগস্ট ও ২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবস পালন করা হয় না। অবারে গুরুজী কিন্তু স্বামীজীর কথা বিশ্বাস করতে চাইলেন না। স্বামীজী তখন কিছু না বললেও পরে একদিন অবারে গুরুজীকে সঙ্গে নিয়ে চার্চ পরিচালিত একটি স্কুলে গেলেন। স্কুলের অধিকারীর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের কথাবার্তার পর অবারে গুরুজী জিজ্ঞাসা করলেন, এই স্কুলে ১৫ আগস্ট বা ২৬ জানুয়ারি পালন করা হয় কিনা? ওই স্কুলের অধিকারী বললেন, না, আমরা তা পালন কেন করব? এ তো খ্রিস্টানদের উৎসব নয়। স্কুলের অধিকারীর কথা শুনে অবারে গুরুজীর চোখ খুলে গেল। তিনিও স্বামীজীর কাজের সহযোগী হলেন। স্থানে স্থানে বনবাসী সম্মেলনের আয়োজন হতে লাগল। খ্রিস্টান মিশনারিরা এতদিন বনবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে নিজেদের জায়গির ভেবে এসেছে। এখন হিন্দু সংগঠনগুলি সেই এলাকায় কাজ শুরু করেছে। তাই খ্রিস্টান মিশনারিদের বিরোধিতা শুরু হলো। এক এক সময় এই বিরোধিতা প্রবল আকার ধারণ করে। যেমন ডাংসে। কিন্তু এতে পরিণাম ভালো হয়েছে। ছিন্দওয়াড়া, উপমওয়াড়া, নওয়াপুর ইত্যাদি নানা এলাকায় হিন্দু সমাজ জাগরিত হয়েছে। বিশাল সংখ্যায় হিন্দুর উপস্থিতিতে জাঁকজমকের সঙ্গে হিন্দু সম্মেলন হয়েছে।

এই সময়েই গুজরাটের সুবীর নামে এক গ্রামে স্বামীজী গিয়েছেন। সেখানে এক পরিচিত বনবাসী এসে স্বামীজীকে বলল, অল্প কিছু দূরে একটা টিলা আছে। এখানকার লোকে ওই টিলাকে চমক ডোগরী বলে। সেখানে শবরী মাতা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে ফল খাইয়েছিলেন। কখনো কখনো একটা জ্যোতি ওই টিলার থেকে উপরে যেতে দেখা গেছে। প্রচলিত বিশ্বাস, শবরী মাতা জ্যোতি হয়ে স্বর্গে গিয়েছেন। এই কারণে লোকে ওই ডোগরিকে চমক ডোগরি বলে। বনবাসী বন্ধুটির কথা শুনে স্বামীজী তারই সঙ্গে চমক ডোগরিতে গেলেন। সেই টিলার উপর তিনটে শিলাখণ্ড রয়েছে। জনশ্রুতি হলো, এই তিনটি শিলাখণ্ডের একটিতে শ্রীরাম ও দ্বিতীয়টিতে লক্ষ্মণ বসেছিলেন। আর তৃতীয় শিলাখণ্ডে শবরী মাতা বসে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে ফল খাইয়েছিলেন। স্বামীজী এই পবিত্র স্থলে একটি মন্দির নির্মাণের সংকল্প করলেন। শবরী মাতার একটি মূর্তি তৈরি করে প্রতিষ্ঠা করা হলো। পূজার্চনা শুরু হলো। ভক্তরা যাতে বহু সংখ্যায় মন্দিরের সম্মুখে সমবেত হতে পারে তার জন্য টিলা কেটে সমতল তৈরির চেষ্টা হলো। ২০০২ সালে সেইখানে মুরারিবাপুর রামকথা গানের আয়োজন হলো। টিলার নীচে পাঁচ হাজার লোকের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হতে পারে এমন কাঠামো তৈরি হলো। সন্ত ভুর বাপু ও তাঁর গোষ্ঠীর উপর ভোজন ব্যবস্থার দায়িত্ব দেওয়া হলো। সব মিলিয়ে শবরী ধাম এক তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠল।

মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের পর স্বামীজী এবার মধ্যপ্রদেশের দিকে

মন দিলেন। বিশেষত, মধ্যপ্রদেশের ধার, ঝাবুয়া, আলিরাজপুর জেলার বনবাসী এলাকাগুলিতে। ওইসব গ্রামের মানুষের সঙ্গে তিনি মাসাধিককাল থেকেছেন। ঝাবুয়া অঞ্চলের গ্রামগুলিতে তিনি ঘরে ঘরে মন্দির তৈরির পরিকল্পনা করেন। ঘরে ঘরে হনুমানজীর ছবি লাগানো হয়। হনুমানজী বা অন্য দেবদেবীর ছবি সংবলিত লকেট মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ইন্দোর শহরের প্রায় পাঁচশো যুবক-যুবতীকে এই লকেট বিতরণের জন্য বনবাসী গ্রামগুলিতে পাঠানোর পরিকল্পনা করা হয়। এইসব গ্রামে একাকীই যেতে হবে। বনবাসী পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। এইরকম যখন কথাবার্তা চলছে তখন একজন কলেজ ছাত্রী তাদের সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুলল। সেইসময় ঝাবুয়াতে এক মিশনারি নানকে ধর্ষণ করা নিয়ে খুব শোরগোল চলছিল। স্বামীজী তখন বলেছিলেন, বনবাসী অঞ্চলে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে সুরক্ষার গ্যারান্টি তিনি নিজেই দিচ্ছেন। আপনার কিছুই হবে না। স্বচ্ছন্দেই যেতে পারেন। তবে ইন্দোর শহরে আপনার সুরক্ষার গ্যারান্টি অবশ্য তিনি দিতে পারবেন না। স্বামীজীর এই তেজোদৃপ্ত প্রত্যুত্তরে কর্মীদের মনোবল অনেকটাই বেড়ে গেল। তারা দ্বিগুণ উৎসাহে বনবাসী গ্রামগুলিতে গিয়ে শ্রদ্ধা জাগরণের কাজ করতে লাগলেন। ঝাবুয়া জেলার প্রায় সব পরিবারেই হনুমানজীর ছবি শোভা পেতে লাগল। ২০০৪ সালে ঝাবুয়াতে বিরাট হিন্দু সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রায় ৫ লক্ষ বনবাসী এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন আর এস এসের তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক কে এস সুদর্শন।

আমাদের দেশের বনবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে মানুষের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে খ্রিস্টান ও মুসলমানরা তাদের নিজেদের ধর্মে ধর্মান্তরিত করছিল। এই ধর্মান্তরণের লক্ষ্য ছিল শুধু ধর্মান্তরিতদের উপাসনা পদ্ধতিরই পরিবর্তন নয়, সেই সঙ্গে তাদের জাতীয়তারও পরিবর্তন। অর্থাৎ এদেশের মানুষকেই ধর্মান্তরণের মাধ্যমে দেশের শত্রুতে পরিণত করা। এই ধর্মান্তরণ তাই অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার বলে হিন্দু সমাজের সচেতন মানুষেরা মনে করেছিলেন। আর তার প্রতিরোধের জন্য ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে গুজরাটের ডাংস জেলার সুবীর গ্রামে শবরী ধামে শবরী কুম্ভের আয়োজন করা হয়েছিল। তিনদিন ধরে চলা এই কুম্ভে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ এসেছিলেন। এটা ছিল হিন্দুর অধিকার রক্ষার স্বার্থে হিন্দু ঐক্যের প্রদর্শন।

সামাজিক ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তি, সাধু-সন্তরা এই কুম্ভে যোগ দিয়ে মিশনারিদের ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বলেছিলেন। যারা ধর্মান্তরিত হয়েছে তাদের আবার স্বধর্মে ফিরিয়ে আনার অর্থাৎ 'ঘর বাপসী'র পরামর্শ দিয়েছিলেন। শবরী কুম্ভের বিশাল মঞ্চের পিছনে ছিল বিশাল চিত্র— যেখানে শ্রীরামচন্দ্র দশানন রাবণের দিকে শর নিক্ষেপ করছেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, রামের কাছ থেকে বনবাসীদের আলাদা করে দেওয়ার যে কোনো চেষ্টাই ব্যর্থ হবে।

হিন্দু সমাজের সুরক্ষার জন্য তাঁর এই আপোশহীন সংগ্রামের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০০৫ সালে কলকাতা বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের পক্ষ থেকে স্বামী অসীমানন্দজীকে 'স্বামী বিবেকানন্দ সেবা সম্মানে' ভূষিত করা হয়। ওই বছরই ১০ ডিসেম্বর জয়পুরে শঙ্কর স্মৃতি সমিতি স্বামীজীকে 'শ্রীগুরুজী সেবা সম্মান' দিয়ে সংবর্ধনা জানায়। ফলে সারা দেশে বনবাসী ক্ষেত্রে স্বামীজীর প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধার ভাব নির্মাণ হয়। স্বামীজী মনে করতেন, ধর্মান্তরকরণের ভাবনাকে সমূলে বিনষ্ট করে দেওয়া দরকার। তিনি লোকেদের সামনে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বলতেন, আপনারাই বলুন, যেখানে ১০০ মুসলিম পরিবারের মধ্যে ১টি হিন্দু পরিবার থাকে সেখানে ওই হিন্দু পরিবারটির কি দশা হয়? আর অন্যদিকে তাকিয়ে দেখুন, ১০০ হিন্দু পরিবারের মধ্যে ১টি মুসলিম পরিবার থাকলেও তাদের কোনো অসুবিধা হয় না।

ত্রেতা যুগে ভগবান শ্রীরাম নিজেই রাবণ বধ করেছিলেন। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ নিজে অস্ত্র ধারণ করেননি, কিন্তু পাণ্ডবদের সঙ্গে ছিলেন। আর কলিযুগে জগন্নাথদেব নিজে কিছুই করেন না, কেননা তাঁর হাতই তো নেই, তিনি শুধু দ্রষ্টা। এমনকী তাঁর চোখের পলকও পড়ে না। আন্দামান-নিকোবর ও গুজরাটের ডাংসে কাজ করায় স্বামীজী নিজেই সমাজ জাগরণ কাজের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আবার মহারাষ্ট্রের নন্দওয়ার, নাসিক, ধুলিয়া জেলায় সমাজকে সঙ্গে নিয়েই সেই কাজ করেছেন। মধ্যপ্রদেশের ঝাবুয়াতে সমাজকে সামনে রেখে জাগরণের কাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আর ঝাবুয়াতে যে বিরাট হিন্দু সম্মেলন হলো, সেখানে তাঁকে কোথাও দেখা গেল না। পাশের গ্রামের একটি দলের সঙ্গে তিনি এসেছিলেন। আবার তাদের সঙ্গে ফিরে গিয়েছেন। শবরী কুম্ভের সময় তিনি সমাজকে সামনে রেখে নিজে পিছনে থেকে কাজ করেছেন। শবরী কুম্ভের সময়ও কোথাও তাঁকে দেখা যায়নি। বনবাসী সমাজের মধ্যে থেকেই নেতৃত্ব নির্মাণ করে হিন্দু জাগরণের কাজ করে গিয়েছেন।

এদেশে কেন্দ্র সরকারে আসীন ধর্মনিরপেক্ষ শাসক দলগুলি স্বামীজীর কাজকে অনেক চেষ্টা করেও রুখতে পারেনি। বরং ডাংস ও ঝাবুয়াতে তা করতে গিয়ে তাদের নিজেদের মুখ পুড়েছে। শেষপর্যন্ত পি চিদাম্বরম ও দিগ্বিজয় সিংয়ের মতো কংগ্রেসীরা 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদ' 'গৈরিক সন্ত্রাস' তত্ত্ব তৈরি করে স্বামীজীকে দমন করার ষড়যন্ত্র করেছে। হিন্দু সন্ত্রাসবাদের মাস্টার মাইন্ড হিসেবে স্বামীজীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই কংগ্রেস-চালিত ইউ পি এ সরকার গ্রেপ্তার করতে পারে— এই আশংকা তিনি করেছিলেন।

তাঁর আশংকা সত্য হয়েছিল। তাঁর বয়স তখন প্রায় ষাট। অত্যাধিক পরিশ্রমে শরীরটাও তেমন ভালো যাচ্ছে না। একটু বিশ্রামের আশায় তিনি হরিদ্বারের কাছে একটা গ্রামে গিয়ে উঠলেন। আর এর কিছুদিন পরেই ২০১০ সালের নভেম্বরে সিবিআই তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে রাখা হয় হায়দ্রাবাদ জেলে।

মায়ের সঙ্গে।

অসীমানন্দের গ্রেপ্তারের পরিপ্রেক্ষিতে চার্জশিটে যেসব অপরাধের উল্লেখ করা হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল খুন, খুনের চেষ্টা, ক্রিমিন্যাল কন্সপিরেসি, রাষ্ট্রদ্রোহ— মোট পাঁচটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা যাতে ১১৯ জন নিহত হয়েছিল। কিন্তু এসবই ছিল অভিযোগ, আইন মাফিক তাকে অভিযুক্ত করা হয়নি (but not yet formally accused)। এসব অভিযোগ প্রমাণিত হলে শাস্তি হতো মৃত্যুদণ্ড।

'Caravan'-এর প্রতিবেদক ২০১৪ সালের জানুয়ারি, স্বামী অসীমানন্দর সঙ্গে তার শেষ সাক্ষাৎকারে একটা মজার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনি সাক্ষাৎ করতে গেলে স্বামীজী তাকে চা-খাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তার উত্তর দেওয়ার আগেই সামান্য অপরাধে বন্দি এক কিশোর প্লাস্টিকের কাপে চা এনে তাঁকে দেয়। অসীমানন্দ সেই কিশোরটিকে বুকে টেনে নিয়ে বলেন, 'এটা আমার ছেলে। ক'দিনের মধ্যেই ও ছাড়া পাবে।' তারপর কিশোর ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠে বলেন, 'এই চা-ওয়ালা একদিন নরেন্দ্র মোদী হয়ে উঠতে পারে।'

সাক্ষাৎকার চলার সময় জেল অফিসার মাঝে মধ্যেই কথাবার্তায় বাধা দিয়ে অসীমানন্দকে বলছিলেন— তিনি কী করছেন? অসীমানন্দ বলছিলেন— 'জেলে থাকার সময় তাঁরা সবাই আমাকে বলছেন যা হয়েছে তা ভালোই হয়েছে ('They all tale me 'Jo hua accha hua')।

দীর্ঘ সাত বছর অকথ্য অত্যাচার সহ্য করেও তিনি নিজের বিশ্বাসে অটল ছিলেন। সত্য একদিন না একদিন প্রকাশ পাবেই, হিন্দু সন্ত্রাস-এর ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব ফাঁস হবেই— এই বিশ্বাস তাঁর ছিল। শেষপর্যন্ত সত্য— তাঁর বিশ্বাসেরই জয় হয়েছে। দেশের আদালত তাঁকে সব অভিযোগ থেকে নিঃশর্তে মুক্তি দিয়েছে।

মুক্তির পর মাত্র একদিনের জন্য তিনি তাঁর মাতৃদেবীকে প্রণাম করার জন্য কামারপুকুরে এসেছিলেন। মা তাঁকে জানিয়েছিলেন— 'সত্যের জয় হলো। তিনি এবার শান্তিতে মরতে পারবেন।' তখনই তাঁর সঙ্গে এই লেখকের ফোনে কথাবার্তা হয়েছিল— মুখোমুখি দেখা হয়নি। সেই সময় স্বস্তিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন— 'হিন্দু বিরোধীদের সর্বশক্তি দিয়ে পরাজিত করতে হবে। যে কাজ গোড়া থেকেই করছি, সে কাজই করে যাব। সন্ন্যাসী আছি এবং থাকবও।' মুক্তির পর কোনো সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া তাঁর এই প্রথম সাক্ষাৎকার (স্বস্তিকা, নববর্ষ সংখ্যা, ১৪২৬; ১৫ এপ্রিল, ২০১৯)।

স্বস্তিকা এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। এরপরও আর (রিপাবলিক) ভারত, সুদর্শন চ্যানেলে তাঁর সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছে। তিনি যে এক আপোশহীন সংগ্রামী ও একই সঙ্গে সন্ন্যাসী— এইসব সাক্ষাৎকারে সেটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অসীমানন্দ এখন অসীম আনন্দের সন্ধানে এক যোদ্ধা সন্ন্যাসী।

তথ্যসূত্র :

১। পূজ্য স্বামী অসীমানন্দজী মহারাজ এক ব্যক্তিত্ব— জগদেওরাম ওরাঁ, সর্বভারতীয় সভাপতি, বনবাসী কল্যাণ আশ্রম।
২। 'The Caravan' পত্রিকা, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪।
৩। সুকুমার সরকার (সম্পর্কে দাদা)।
৪। স্বাগতা সরকার (সম্পর্কে ভাইঝি)।
৫। স্বস্তিকা, নববর্ষ সংখ্যা, ১৪২৬ (১৫.৪.২০১৯)।
৬। বলরাম সাঁতরা (বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের প্রাক্তন পূর্ণকালীন কার্যকর্তা)।

With Best Compliments
from :-

A

Well

Wisher

মোদীকে সম্মানিত করছেন সৌদি আরবের সুলতান।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এক জাতি এক দল এক নেতা

সুজিত রায়

সযত্নে ট্রিম করা দাড়ি। চোখে রিমলেস চশমা। আধুনিক শুধু নয়, অত্যাধুনিক মোদী কোট আর ঝকঝকে নিখুঁত ইস্ত্রি করা কুর্তা-চোস্তায় সজ্জিত নরেন্দ্র দামোদারদাস মোদীর মূর্তি ফুটে ওঠে থ্রি ডি প্রযুক্তিতে। সরাসরি ভোটারদের দরজায় পৌঁছে যাচ্ছেন। প্রশ্ন করছেন, 'আপনারা কি সত্যি মনে করেন আমি মৃত্যুর সওদাগর?' সমবেত কণ্ঠে জনগণের জবাব আসছে— 'না'। ফেসবুক, টুইটারে তাঁর অনুগামীর সংখ্যা দু'কোটি। নিজস্ব ওয়েবসাইট, ব্লগ সবই নিয়মিত আপডেটেড। অত্যাধুনিক ডিজিটাল ইন্ডিয়ার স্বপ্নের ফেরিওয়ালার প্রচারে নিয়োজিত মার্কিন জনসংযোগ সংস্থা অ্যাপকে

ওয়ার্ল্ডওয়াইড। আর মোদীর সরাসরি জনসংযোগ হ্যাংগ আউট। প্রগতির প্রতিরূপ, বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রতীক, পুরুষকারের উজ্জ্বল নজির নরেন্দ্র মোদী বলছেন— 'সৌগন্ধ মুঝে ইস মিট্টি কি, ম্যাঁয় দেশ নেহি মিটনে দুঙ্গা, ম্যায় দেশ নেহি ঝুঁকনে দুঙ্গা।' ব্র্যান্ড মোদীর ঝকঝকে শিলমোহরে মিশছে সুর— 'মেরী ধরতি মুঝসে পুছ রহি, কব মেরা কর্জ চুকাওগে, মেরী অম্বর মুঝসে পুছ রহি, কব আপনা ফর্জ নিভাওগে... হাঁ ম্যাঁয়নে কসম উঠাই হ্যায়, ম্যাঁয় দেশ নেহি বিকনে দুঙ্গা।' বলিউডের তিন নক্ষত্র প্রসূন যোশী, আদেশ শ্রীবাস্তব আর সুখবিন্দর সিং-এর সৃষ্টিতে বুঁদ মিডিয়া। টেলিভিশন স্ক্রিনে, এফ এম চ্যানেলে, বিলবোর্ড, হোর্ডিং-এ, মোবাইল স্ক্রিনে স্যোশাল মিডিয়ার পাতায় পাতায় একটাই বার্তা— 'অব কি বার, মোদী সরকার।'

বিজেপি নয়, মোদী সরকার। বিজেপির মতো সংগঠিত দল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মতো রেজিমেন্টেড একটি সামাজিক সংগঠন— সব কিছু ছাড়িয়ে ছাপিয়ে মাথা উঁচু করে হাত নাড়ছেন নরেন্দ্র মোদীর কাটআউট। গান্ধীজী, বল্লভভাই প্যাটেল, নেহরু, ইন্দিরা, নরসিমা--- কেউ নেই কোথাও। অবিশ্বাস্য এবং অবিস্মরণীয়। এমন ৩৬০ ডিগ্রি প্রচারাভিযানে কি চমকে যায়নি কর্পোরেট ব্র্যাণ্ডগুলিও?

হ্যাঁ, ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের চমকটা ছিল এমনই। চাহিদা ছাড়া কোনো প্রোডাক্টের ব্র্যান্ড ইমেজ সাফল্য পায় না। মোদী যদি হন সেই ব্র্যান্ড ক্যাম্পেনের প্রোডাক্ট আর যদি সেই ক্যাম্পেন সাফল্য পায় তাহলে তো মেনে নিতেই হবে— মোদীর সাফল্য তাঁর চাহিদা থেকেই। চমকে গিয়েছিলেন তাঁরাও যাঁরা এতদিন সর্ষের মধ্যে ভূত দেখেছেন। যাঁরা এতদিন অন্ধের মতো বিশ্বাস করে এসেছেন, নরেন্দ্র মোদী 'মওত কী সওদাগর'। রহস্যটা কোথায়? মোদীর হাতে কি ছিল আলাদিনের কোনো আশ্চর্য প্রদীপ? নাকি কোনো জাদুদণ্ড, যার মায়াবী ছোঁয়ায় 'বিনাশপুরুষ' রাতারাতি 'বিকাশপুরুষ' হয়ে গেলেন?

না— এ ছিল 'মোদী ম্যাজিক' যার পিছনে ছিল মোদীর জীবনের পঞ্চাশ বছরের সাধনা, ভাবনা, ইচ্ছে, সততা আর পরিকল্পনা। সেটাই মোদী ম্যাজিক। এবং এক ঝটকায় কুপোকাত এতদিনের ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের নামাবলী গায়ে ধর্মনিরপেক্ষতার জপমালাধারী যত্ত সব ভণ্ড রাজনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক দল। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত। মোদীর ইউ এস পি বা ইউনিক সেলিং প্রোপাজিশন ছিল সেটাই যার স্লোগান ছিল— 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'। ১৯৯১ আর ১৯৯৬ থেকে একেবারে প্যারাডাইম শিফ্ট। তখন মোদী ছিলেন না। ব্র্যান্ড প্রোডাক্ট ছিলেন রাম। স্লোগান ছিল— 'আপকা ভোট রাম কে নাম।' হ্যাঁ, স্লোগান ছিল— 'হাম সৌগন্ধ রাম কী খাতে হ্যাঁয়, মন্দির ওহি বনায়েঙ্গে।' ২০১৪ সালে মোদী বুঝেছিলেন— রামের নাম ভাঙিয়ে আর জনগণকে বশে রাখা যাবে না। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে। তাই আর এস এসের একনিষ্ঠ সেবক হয়েও বলে দিয়েছিলেন— 'দেবালয় সে শৌচাগার জরুরি হ্যায়।' এখন ভারতবর্ষে দরকার উন্নয়ন। আক্ষরিক অর্থে উন্নয়ন— চাষের ক্ষেতে জল, গ্রামের বুকে রাস্তা, চাকরির জন্য কলকারখানা। কলকারখানার জন্য বিদ্যুৎ, শিক্ষার জন্য স্কুল-কলেজ, স্বাস্থ্যের জন্য পরিচ্ছন্নতা, দূষণ বিরোধী শৌচালয় আর রান্নাঘর, বেঁচে থাকার জন্য আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি আর একজন মডেল— রোল মডেল।

রোড মডেল হয়েই ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে তিনি ভারতবর্ষের সামনে এক বিশ্বাসের জন্ম দিতে পেরেছিলেন— মেলাবেন, তিনি মেলাবেন। মেলাবেন আসমুদ্র হিমাচল উন্নয়নের জোয়ারে। না ভর্তুকির উন্নয়ন নয়, সেই উন্নয়ন যা জীবনকে চিনতে শেখায়। জীবনের পাঠশালায় প্রত্যাশী ছিলেন সকলেই— জোতদার, জমিদার, কৃষক, শ্রমিক, কারখানা মালিক, খুচরো ব্যবসায়ী, বিদ্বজ্জন, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বেকার, ছাত্রছাত্রী, গৃহবধূ, চাকুরিজীবী, মুটে, মজুর, ধর্মপ্রাণ পুরোহিত, মৌলানা, বিশপও।

যতই চিৎকার হোক না কেন, তাঁর শ্রেণী চরিত্র এবং গণচরিত্র নাকি ফ্যাসিবাদেরই নামান্তর— হ্যামলিনের বাঁশির সুরে ভেসে গেছে সব চিৎকার, সব স্লোগান, সব অভিযোগ-অনুযোগ। মানুষ 'আচ্ছে দিন'-এর প্রতীক্ষায় ছিল— সেই 'আচ্ছে দিন' মানে শুধু রাজনীতির স্থিতিশীলতাই নয়, অপশাসন, কুশাসন, অর্থনীতির অবনমন, মূল্যবৃদ্ধি, লাগামছাড়া দুর্নীতির চাপে রিক্ত, জর্জরিত, অবসাদগ্রস্ত দেশকে বিকাশের সুফল পৌঁছে দেওয়া।

না, সবটা পূরণ হয়নি। ২০১৪ থেকে ২০১৯— অর্থনৈতিক সংস্কারের পথে আচমকা নোটিশে কোটি কোটি কালো টাকাকে নিঃশেষ করে দেওয়া, কর আদায়ে নতুন চিন্তাভাবনা— জি এস টি-র প্রবর্তন ইত্যাদি ইস্যুগুলিকে হাতিয়ার করে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি কিছুটা হলেও ফয়দা তুলেছিল। কিন্তু মানুষকে ভুল বোঝানোর কৌশল ফুৎকারে উড়ে গেছে। কারণ এ ধরনের যুগান্তকারী অর্থনৈতিক সংস্কারের সুফল আটকে রাখা যায়নি। সত্যটা সামনে আসতেই কেটে গেছে কুহেলিকা। এ বাতাস কী পরম সূর্যকরোজ্জ্বল। স্বপ্নের ফেরিওয়ালার দৃঢ় অঙ্গীকার— প্রায় যতদূর ভালো মানবসমাজ গড়ে দিয়ে যাব, সার্থক হলো।

২০১৪ থেকে ২০১৯--- টানা পাঁচ বছরের নানা টানাপোড়েনের পর যখন ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়ল, মনে হলো যেন কোনো মন্ত্রপূত জলের ছোঁয়ায়

আচমকা ঘুম ভেঙে জেগে উঠে বসল ভারতবর্ষের সব বিরোধী দল। সেই একই বস্তাপচা স্লোগান— 'খুনি মোদী আর না', 'দাঙ্গাবাজ মোদী আর না', 'আদানি-আম্বানিদের কাছে দেশকে বেচে দেওয়া মোদী আর না'।

ক'দিন আগেই বিজেপি গোহারান হেরেছে হিন্দি বলয়ে— উত্তরপ্রদেশে, মধ্যপ্রদেশে, রাজস্থানে, ছত্তিশগড়ে। বিরোধী শিবির ছত্রভঙ্গ হয়েও উজ্জীবিত— এবার মোদীর ব্র্যান্ড ইমেজকে বাঁচায় কে দেখতে চাই। তার ওপর একটার পর একটা অবিশ্বাস্য অভিযোগ— রাফালে দুর্নীতি, পুলওয়ামার সেনা হত্যা, ব্যাঙ্ক জালিয়াতি এবং জালিয়াতদের ফেরার হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। দৃশ্যত ভারতবর্ষ বিভ্রান্ত। শ্যাম রাখি না কুল রাখি— ভাবতে ভাবতেই ঘোষণা হয়ে গেল নির্বাচনী নির্ঘণ্ট। এবং ২০১৪ সালে মোদীর দুরন্ত প্রচার কৌশলকে টেক্কা দিতে বিরোধী শিবির তোলপাড় হয়ে উঠল ভোটব্যাঙ্কের সমঝোতা গড়ে তুলতে। সবচেয়ে বেশি লম্ফঝম্প করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ তাঁর সখ হলো, এবার তিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন আর রাজ্যে তার চেয়ারে বসিয়ে যাবেন ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। অতএব সপা, বসপা, আর জে ডি সহ দেশের যত বিরোধী দল সবাইকে টেনে আনলেন ব্রিগেডের মঞ্চে 'এক সাথে গাহি গান'-এর মন্ত্রে দীক্ষিত হতে। একজোট না হলে এবার মোদীকে হারানো সহজ ছিল না। কারণ নোটবন্দি, জি এস টি, রাফাল, পুলওয়ামা— কোনোটাই বিরোধীদের অস্ত্রে শান দিতে পারেনি। অতএব টেনিস কোর্টের একদিকে থাকুক মোদী একা, অন্যদিকে বাকি সবাই। ব্যাপারটা যে জলবৎ তরলং ছিল না— মমতা সেটা বুঝে গেলেন দু-একদিনের মধ্যেই। আর মমতার অঙ্কটাও ধরে ফেললেন ধড়িবাজ শরদ পাওয়ার, সপা, আর জে ডি-র নব্য কর্ণধার তেজস্বী সহ সকলেই। সুতরাং ওপর ওপরে 'একসঙ্গে আছি' বাতাটা পৌঁছালেও জনগণ বুঝে নিল শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলিটা হবে না। তার ওপর তখনই ফাটলো মোদী বোমা— 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' শ্লোগানের সঙ্গে জুড়ল আরও দুটি মোক্ষম শব্দ 'সবকা বিশ্বাস।'

ভোটের আগে থেকেই হাওয়াটা বোঝা যায়নি তা নয়। যদিও এবার 'ব্র্যান্ড মোদী' ইমেজের পিছনে ছিল না কোনো বিশেষজ্ঞের হাত। নিজেই ছিলেন নিজের তথা দেশের ভাগ্য নির্ধারক। দলের চেয়ে ব্যক্তি বড় নয়। বিশেষ করে বিজেপির মতো কঠোর সংগঠনে। কিন্তু না। এবার বিজেপির ভোট হয়েছে মোদীর নামে। কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর দেওয়া তকমা 'চৌকিদার' নিজের গায়ে সেঁটে সর্বত্র ভোট ভিক্ষা করেছেন মোদীজী। যত প্রার্থী, যত নেতা, যত কর্মী সব রাতারাতি দায়িত্ব নিয়েছেন দেশরক্ষার চৌকিদার হিসেবে। একটা ৭০ বছরের মানুষ এক মাসেরও কম সময়ে এক লক্ষ পাঁচ হাজার কিলোমিটার পরিভ্রমণ করে ১৪২টা নির্বাচনী সমাবেশে পৌঁছে গেছেন এই কঠোর গ্রীষ্মের দাবদাহকে উপেক্ষা করে। কারণ মোদীজী বুঝেছিলেন— বিরোধীদের এবারে নির্বাচনের কৌশল ছিল বিজেপি বিরোধিতা নয়, মোদী বিরোধিতা। মোদীর বিরুদ্ধে প্রচার চালাও। মোদীকে অপমান কর পদে পদে। মানুষের সামনে ২০১৪ সালের আকাশছোঁয়া মানুষটাকে যেভাবে

তিন তালাক বিরোধী বিল পাশ হওয়ার পর মুসলমান মহিলাদের আনন্দ।

পারো টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে আনো। মাথা নিচু করে দাও। পুরনো স্লোগান 'মওত কী সওদাগর নরেন্দ্র মোদী' ধ্বনিকে ফিরিয়ে আনো। মোদীজীর কাছে এটা ছিল চ্যালেঞ্জ। তাই নির্বাচনটা দলের নয়, হলো নিজের নামে। মোদীর নামে। নতুন ব্র্যাণ্ড আইকন। গেরুয়া ঝড়ে ভেসে গেল দেশ। বিজেপি একাই ৩০৩। মোদী একাই একশ পেরিয়ে হাজার।

অভাবনীয়। কিন্তু সত্যি। উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে যেখানে বিজেপি প্রায় মুছে গিয়েছিল সেখানে ৮০ আসনের ৫৯টি মোদীজীর দখলে। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ফের হাতের মুঠোয়। ঝাড়খণ্ডেও নয় নয় করে ছটা আসন। উত্তর-পূর্ব ভারত প্রায় গোটাটাই। ওড়িশাতে, বাংলাতেও অভাবনীয় সাফল্য। যারা এক্সিট পোল সমীক্ষা করেছিলেন তাদেরও সবার মুখ উজ্জ্বল। পশ্চিমবঙ্গের ঘাসফুল মুখ ঘষছে মাটিতে। আর নতুন দিনের ভোরে দীঘি আর পুকুরের জলে জলে হাসছে গেরুয়া পদ্ম। বাংলা ছিল মোদীজীর কাছে এবার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অশালীন নির্বাচনী প্রচারের জবাব দিতে তাই মোদীকে বারে বারে আসতে হয়েছে। দলের সভাপতি অমিত শাহকে পাঠাতে হয়েছে বারে বারে। আর মমতার তিক্ত ভাষণের জবাবে ততোধিক তীক্ষ্ণ হয়েছেন মোদীজী। না, ভাষায় নয়। কৌশলে। এবং শেষ পর্যন্ত বাংলার রাজনৈতিক পটচিত্রে ফুটে উঠেছে অন্য ছবি— যে ছবির নাম 'পরিবর্তন।'

এমন একটা নির্বাচনী ফলাফল যতটা আনন্দের ঠিক ততখানিই দুঃশ্চিন্তার। দুঃশ্চিন্তার, কারণ মানুষের প্রত্যাশার চাপ। মোদীজী— তোমার কথায়, তোমায় ভোট দিয়েছি অকাতরে। নোটবন্দি ভুলে গেছি, জি এস টি ভুলে গেছি। কৃষকের আত্মহত্যা ভুলে গেছি। রাফায়েল দুর্নীতি ভুলে গেছি। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায়মান চিত্তকে বগলচাপা দিয়ে শুধু তোমার কথা শুনেছি। তোমার কথায় দেশকে ভালোবেসেছি। তোমার কথায় সন্ত্রাসবাদ আর সন্ত্রাসবাদের জননী-জঠর পাকিস্তানকে ঘৃণা করতে শিখেছি। এবার আমাদের চাওয়ার পালা।

এতে অন্যায় কিছু নেই। এটা আবদার নয়। অধিকার। কিন্তু মানুষের এই অধিকারে মোদী সাড়া দেবেন কোন অধিকারে?

উত্তর একটাই 'এক জাতি, এক দল, এক নেতা'র অধিকারে। একথা বলার কারণ ২০১৯-এর নির্বাচনী ফলাফল ভারতবর্ষের রাজনৈতিক গতিপথের এক নতুন দিশা, এক নতুন নিশানা। আগামী দিনে ভারতবর্ষের সমাজ, ভারতবর্ষের রাজনীতি, ভারতবর্ষের সংস্কৃতি হাঁটবে এক নতুন পথে যে পথে পরম্পরার ঐতিহ্য থাকবে অক্ষুণ্ণ অথচ আধুনিকতাকে বরণ করে নেওয়ায় কোনো আন্তরিকতার অভাব হবে না। আগামী দিনের ভারতবর্ষ মানে — এক জাতি, এক প্রাণ, এক জাতি, এক আইন, এক দেশ, এক দল এবং অধিকারের ভারতবর্ষ। আরও বড় সত্য— আগামী দিনের ভারতবর্ষ এক জাতি এক নেতার ভারতবর্ষ। ২০১৪ যা পারেনি, ২০১৯ তা পেরেছে। ভারতবর্ষের মানুষের সচেতন ভারতবর্ষ ২০১৯-এ প্রমাণ করেছে— বিস্মৃতির অভিশাপ কাটিয়ে ভারতবাসী জাতীয়তাবাদকে ফের চিনে নিতে পেরেছে। নিজস্ব সত্তা হিন্দুত্বকে চিনতে পেরেছে। ভারতবাসী নিজের প্রকৃত স্বরূপকে জানতে পেরেছে। সুতরাং একথা সুনিশ্চিত, আগামী দিনে ভারতবর্ষের মানুষ হাঁটবে সবাই হাতে হাত ধরে এক লক্ষ্য পথে। আর হাতে হাত মিলনের সেই জাতীয়তাবাদের মন্ত্রধ্বনিতে ছিটকে যাবে আঞ্চলিকতাবাদ। মেকি ধর্মনিরপেক্ষতা, লঘু এবং সংকীর্ণ ভোটব্যাঙ্ক তৈরির ঘৃণ্য রাজনীতি আর মিথ্যা অধিকারবোধের আস্ফালন। এক জাতি এক প্রাণ ভারতবাসী এবার হাঁটবে একক নেতৃত্বের পায়ে পায়ে আত্মবিভ্রান্তি, আত্মপ্রবঞ্চনা আর আত্মপ্রচারের অভিশাপ মুক্ত হয়ে। সে নেতার নাম নরেন্দ্র নাম নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী।

কে এই নরেন্দ্র মোদী, যিনি পরপর তিনবার গুজরাটবাসীর হৃদয় জয় করে গুজরাটকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিয়ে ২০১৪ সালে জয় করলেন গোটা ভারতকে। আবার ২০১৯ সালে গোটা ভারতবাসীকে? এই প্রশ্নের সামাজিক উত্তর বলে দেবে সবাই। কিন্তু দর্শনের অর্থে? উত্তর একটাই— অপার বিস্ময়। কারণ মোদীর জীবনের প্রতিটা পৃষ্ঠা, তাঁর মুখের প্রতিটা শব্দ, তাঁর হাঁটার প্রতিটা পদক্ষেপ, তাঁর ভাবনাচিন্তার প্রতিটা সূত্র, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর প্রায় নিখুঁত ধারণা, তাঁর পাণ্ডিত্য, তাঁর জাতীয়তাবাদের ভাবনা, তাঁর রুচি, তাঁর বিশ্বাস— সবই বিস্ময় জাগায়। জাগায়, কারণ ভারতীয় রাজনীতিতে নরেন্দ্র মোদী এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। কেন ব্যতিক্রমী? কারণ, তিনিই একমাত্র ভারতীয় রাজনীতিবিদ যাঁকে বিরুদ্ধ সমালোচনার তিরে বিদ্ধ হতে হয়েছে সবচেয়ে বেশি। অথচ সেই তিনিই সবাইকে পিছনে ফেলে ভারতবাসীর কাছ থেকে স্বর্ণহার উপহার পেয়েছেন সবচেয়ে বেশি। কারণ তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি অপরাধ না করেও 'মৃত্যুর সওদাগর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন, কিন্তু ক্ষমা চাননি। বলেছেন, 'কিসের ক্ষমা? আমি অপরাধী হলে আমায় ফাঁসিতে ঝোলানো হোক।' কারণ, তিনিই একমাত্র মানুষ যিনি বলতে পারেন 'আমার কোনো পরিবার নেই। চুরি করব কার জন্য?' কারণ, তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি রাজনৈতিক গুজবের সবচেয়ে বড় শিকার, অথচ তাঁর জীবনে ঠাঁই পায়নি প্রতিহিংসা, বিদ্বেষ। 'বিস্ময় পুরুষ' বলেই তাঁকে বুঝতে ভুল হয়। চিনতে ভুল হয়। রাগ হয়। হিংসা হয়। আর যাঁরা বুঝে যান, তাঁরা বিস্মিত হন। ঠিক যেমনটি হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে। কত মিথ্যে রটনা— সন্ন্যাসী হয়েও তিনি গোমাংস খান, বেশ্যাবাড়িতে রাত

জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে মোদী ও ট্রাম্প।

কাটান, বিদেশিনীদের নিয়ে পার্টি করেন, মদে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকেন রাস্তাঘাটে, মঠের নামে বাগানবাড়ি বানালেন— আরও কত কী? স্বামীজী তাঁদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। বলেছেন, যীশুখ্রিস্টের সুরেই—' প্রভু তাঁদের আশীর্বাদ করুন। ভ্রাতৃগণ, কোনো ভাল কাজই বিনা বাধায় সম্পন্ন হয় না। কেবল যারা শেষপর্যন্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে লেগে থাকে, তারাই কৃতকার্য হয়।'

নরেন্দ্র মোদীও হেঁটেছেন একই পথে। বলেছেন, 'I am a detached person'। ন্যাংটার আবার বাটপারের ভয়! তাই ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে আগে কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী রাহুল গান্ধী যখন ভোটে হেরে গেলে মোদী কী করবেন বলে প্রশ্ন তুলেছিলেন, মোদী নির্দ্বিধায় বলতে পেরেছিলেন— 'আমি তো চা বিক্রি করেই পেটের ভাত জুটিয়ে নেব। আপনি কী করবেন, ভেবে নিন।' গুজরাটের খাঞ্জি পরিবারের চাওয়ালার অতীতকে লুকোননি মোদী। তাই প্রথমবারে প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার আগে বিজেপি সংসদীয় দলের সভায় নিঃসঙ্কোচে বলতে পেরেছিলেন— 'আমার মতো গরিব ঘরের কেউ যে এখানে এসে পৌঁছাতে পারল এটাই ভারতীয় গণতন্ত্রের মাহাত্ম্য।' না, মোদী নিজেকে মহান করেননি। মহান করেছেন দেশের গণতন্ত্রকে।

মা বলে সম্বোধন করেছেন নিজের দেশ আর দলকে। প্রধানমন্ত্রীর পদকে 'পদ' বলে আখ্যা না দিয়ে বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী কোনো পদ নয়, দায়িত্ব। আমি পদে নয়, দায়িত্বে বিশ্বাসী।'

দায়িত্বে বিশ্বাসী বলেই দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দলীয়ভাবে সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন মানুষের। 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশের' সঙ্গে 'সবকা বিশ্বাসটা'ও আদায় করে নিয়েছেন সবাইকে পিছনে ফেলে। ভারতবর্ষের ২৪২৫টি ছোট বড় নানা মত নানা পরিধানের রাজনৈতিক দলগুলির মুখে চুনকালি মাখিয়ে মেরুকরণের রাজনীতিকেও পিছিয়ে দিয়েছেন অনেকটাই। হিসাব যেখানে বলছে এনডিএ ৩৫৭, বিজেপি একাই ৩০৩, ইউ পি এ ৯৭, কংগ্রেস এককভাবে ৪৯, তারপর আর 'মেরুকরণ' শব্দটা ব্যবহার করা যায় কীভাবে? সুতরাং নিশ্চিত হয়ে গেছে— ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এক জাতি এক নেতা তত্ত্বের অভিমুখী। অথবা আরও একটু স্পষ্ট করেই বলা যায়— 'এক জাতি এক নেতা একতা' তত্ত্বের অভিমুখী।

এমন নেতা কী সত্যিই পেয়েছে ভারতবর্ষ? এর আগে? কখনো? যিনি জোর গলায় বলতে পারেন, আমি গর্বিত। আমি হিন্দু। যিনি জোর গলায় বলতে পারেন, ভারতবর্ষ ভারতবাসীর, অনুপ্রবেশকারীর নয়। যিনি পাক-সন্ত্রাসবাদের জবাব দিতে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ঢুকে গিয়ে বোমা ফেলে সন্ত্রাসবাদের ঘাঁটি ধ্বংস করে পাক প্রশাসনের গালে সপাটে থাপ্পড় মারতে পারেন। যিনি চীনকে বাধ্য করেন আন্তর্জাতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে পাক সন্ত্রাসবাদী

মাসুদ আজহারকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী হিসেবে মেনে নিতে। যিনি পারেন গোটা বিশ্বকে সন্ত্রাসবাদী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের লড়াইকে সমর্থন জানাতে। যিনি কালোবাজারি রুখতে একরাতেই নিকেশ করে দেন কালো টাকার সব খেলা। যিনি তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা রাফাল দুর্নীতির অভিযোগে জবাব দেন, এটা প্রমাণ করেন যে গোটা অভিযোগটাই ছিল সাজানো। যিনি মানুষের মধ্যে বিশ্বাস জাগাতে পারেন, চলতি বছর থেকেই ধাপে ধাপে এগোবে ভারত এবং ২০৩০ সালে ভারত হবে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি। যিনি মানুষের মনে নির্ভরতা জাগাতে পারেন, ভারতবর্ষ থেকে দুর্নীতি বিদায় নেবেই। দেশ এগোবে শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, সামাজিক সুরক্ষায়। দেশের মেয়েরাও হয়ে উঠবে দেশের সম্পদ। যিনি সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী কিন্তু দেশের স্বার্থে সংখ্যালঘুদের বেআইনি অনুপ্রবেশকে রুখতে কঠোরহস্ত। যিনি মনে করেন, যুবশক্তির উন্নয়ন মানে দেশের বন্ধ্যামুক্তি। সর্বোপরি যিনি হিন্দুত্ববাদী ভাবনার একনিষ্ঠ শরিক হয়েও মনে করেন, দেবালয় নয়, ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে দরকার শৌচালয়। তাঁর হাত ধরেই গোটা দেশ জুড়ে চলে স্বচ্ছ ভারত অভিযান, আয়ুস্মান প্রকল্প, উজ্জ্বলা প্রকল্প, মুদ্রা যোজনা, স্টার্ট আপ প্রকল্প। আর মানুষের কাছে পৌঁছে যান 'মন কী বাত' রেডিও অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্যের মাধ্যমে। সরাসরি মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে।

আগামী পাঁচ বছর ভারত হবে একদল (এন ডি এ-র উপস্থিতিকে মান্যতা দিয়েই) এক নেতার প্রশাসন। অন্য দল অন্য নেতৃত্ব ধীরে ধীরে উবে যাবে জলীয় বাষ্পের মতো। কারণ, অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মানুষ বুঝে গেছে, এবার পাল্টানো দরকার। গণতন্ত্রের নামে বুজরুকির শিকার আর হতে চান না মানুষ। এবার 'চলো পাল্টাই' স্লোগান তুলে মানুষ এক দল এক নেতার ওপরেই ভরসা রেখেছে, শুধু বিজেপি এবং মোদীজীর ওপর সম্মান প্রদর্শন করেই নয়, পরোক্ষে মোদীজী এবং তাঁর দলকে এই হুঁশিয়ারি বুঝিয়ে দিয়েছে যে, মোদীজীই যেমন হবেন পরিবর্তিত ভারতবর্ষের মুখ, তেমনই মোদীজীই বাধ্য থাকবেন মানুষের প্রশ্নের জবানবন্দি দিতে। একদলীয় এক নেতার প্রশাসনের সেটাই পরম্পরা।

তবে সমালোচকরা কিছুটা সংকুচিত। কারণ, তাঁদের অভিজ্ঞতা বলে, বিশ্বে এমন বহু নজির রয়েছে যেখানে এক দলের এক নায়ক একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর শুধুই একনায়ক বা স্বৈরতান্ত্রিক প্রশাসকে পরিণত হয়েছেন। ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে 'এক দল এক নেতা' নীতি প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেলে সেই সম্ভাবনাও স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। অনেক সমালোচক আবার ইন্দিরা গান্ধীর উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, গণদেবতার প্রত্যাশা পূরণের চাপ নিতে না পেরে নিজের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার জন্য অসামান্যা প্রতিভাবান প্রশাসক ইন্দিরা গান্ধীও স্বৈরাচারের পথে হেঁটেছিলেন। তার যোগ্য জবাব দিয়েছিল মানুষ।

মোদীজীর ওপর প্রত্যাশার চাপ যথেষ্ট, কারণ এবার ভোটে পরোক্ষ প্রাপ্তিও অঢেল। এই সমালোচনার জবাব একটাই— ইন্দিরার ভারতের সঙ্গে মোদীর ভারতের আকাশ-পাতাল ফারাক। ইন্দিরার ভারত সমাজবাদের শিকলে আবদ্ধ থেকেও বিশ্ব রাজনীতিতে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই লড়েছে। মোদীর ভারত সমাজবাদের বস্তাপচা তত্ত্ব ছুঁড়ে না ফেলেও আজকের বিশ্বায়নের সমাজের পুঁজিবাদকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে না। সুতরাং লড়াইয়ের ময়দানের চেহারাটাই স্বতন্ত্র্য। যাঁরা মোদীকে চেনেন, জানেন, তাঁরা বলেন, মোদী চিরকালই লম্বা রেসের ঘোড়া। তিনি ভালোভাবেই জানেন জনগণের মন্দিরে 'গণদেবতা' থেকে 'গণশত্রু'তে পরিণত হতে বিশেষ সময় লাগে না। জনগণ বড় বেশি অস্থিরমতি।

তবে তিনি যে বিশ্বাস করেন মানুষকে। তাই বলতে পারেন— 'লোকে মনে করে উন্নয়ন হলো সরকারের দায়িত্ব। আমি মনে করি উন্নয়ন হলো জনআন্দোলন। সাধারণ মানুষই উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করেন। তাঁরাই উন্নয়ন পরিচালনা ও রূপায়ণ করেন।' তিনি বলতে পারেন— 'Each and every citizen of my state is the initiator, creator, implementor; this is what the citizen is doing and because of that reasons we can actually set a goal'।

মানুষের ওপর এমনভাবে বিশ্বাস অর্পণ করে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করার কথা আর কোন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন কবে? তিনিই তো ২০১৪ সালে বলেছেন— স্বাধীনতার সময়ে ভারতবাসী চেয়েছিল একটা ভালো সরকার। তারপর ৬৭ বছর কেটে গেছে। ...'but people are still asking - why don't we have good governance in our country?'

ভারতবর্ষ নরেন্দ্র মোদীকে পাঁচ বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করেছে। তারপর নতুনভাবে নির্ভরতা স্থাপন করেছে। ভারতবাসী পরীক্ষায় বিশ্বাসী, সমীক্ষায় বিশ্বাসী। সেখানে মোদীজী সসম্মানে উত্তীর্ণ।

২০১৯ সালের ভারতবর্ষ এক নতুন ভারতবর্ষ। নতুন প্রশাসন। নতুন রাজনীতি। নতুন চিন্তাধারা। নতুন ভারতবর্ষের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতি একটাই— 'এক জাতি এক নেতা'— অবিচ্ছেদ্য দুটি সত্তা। ভারতীয় এবং নরেন্দ্র দামোদারদাস মোদী।

সনাতন হিন্দুধর্ম ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

১৮১৭ সালের ১৬ মে। অমাবস্যার দিন। সূর্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে ঠাকুরবাড়িতে যাগযজ্ঞ চলছে। এইরকম সময় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হলো। পিতা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এক বর্ণময় ব্যক্তিত্ব। কার ঠাকুর কোম্পানির সর্বেসর্বা। শিলাইদহের নীলকুঠি, কুমারখালির রেশমকুঠি, রানিগঞ্জের কয়লাখনি আর রামনগরের চিনির কারখানার মালিক। শিক্ষা ও কৃষির উন্নতি, মেডিকেল কলেজ স্থাপন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বিচিত্র জনহিতকর কার্যে তাঁর দেশভক্তির পরিচয় বিধৃত।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জননী দিগম্বরী দেবী ছিলেন পরমাসুন্দরী। তাঁর মুখের আদলে ঠাকুরবাড়ির জগদ্ধাত্রী প্রতিমার মুখমণ্ডল তৈরি হতো। তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণা। ভোর চারটের সময় উঠে গঙ্গাস্নান, তারপর জপমালা নিয়ে এক লক্ষ জপ, সন্ধ্যায় পঞ্চাশ হাজার হরিনাম।

সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপ্রতিমা দিগম্বরী দেবীর চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং ব্যক্তিত্ব ছিল লক্ষ্যণীয়। স্বামী দ্বারকানাথ ব্যবসার প্রয়োজনে সাহেববিবিদের সঙ্গে পানাহার করতেন। অনেক কাকুতি মিনতি করেও দ্বারকানাথকে নিরস্ত করতে না পেরে দিগম্বরী দেবী তার প্রতিবাদ করেন।

ভোরবেলা নিদ্রিত অবস্থায় স্বামীকে প্রণাম, কখনো কখনো আত্মীয় স্বজনের দাবি-দাওয়া কিংবা চাকরির উমেদারি করতে স্বামীর কাছে দরবার করা— এছাড়া আর কোনো সম্পর্ক রাখেননি। শোনা যায়, স্বামীর সঙ্গে দেখা করার পর সাতঘড়া গঙ্গাজলে স্নান করে নিজেকে শুদ্ধ করতেন। এমনকী স্বামী বর্তমান থাকা অবস্থায় একাদশীর ব্রত পালন করতেন।

এই পিতামাতার পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শৈশবে তিনি দিদিমা অলকাসুন্দরীকে খুব ভালোবাসতেন। ছেলেবেলায় দিদিমা ছাড়া আর কাউকে জানতেন না। শোওয়া বসা খাওয়া সব তাঁর সঙ্গে। প্রতিদিন ভোরবেলা গঙ্গাস্নান করে শালগ্রাম শিলার জন্য ফুলের মালা গাঁথতেন, সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তে পিতামহীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে সূর্যার্ঘের মন্ত্র পাঠ করতেন। মাঝে মাঝে সারারাত দিদিমার সঙ্গে হরিবাসরে কীর্তন শুনতেন। অলকাসুন্দরীর স্বহস্তে তৈরি হবিষ্যান্ন ভোজন করতেন। হিন্দু স্কুলে যাবার পথে ঠনঠনিয়ার কালীমূর্তিকে প্রণাম করতেন। আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন— 'প্রতিদিন যখন বিদ্যালয়ে যাইবার পথে ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া পাঠের পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য বর প্রার্থনা করিতাম, তখন মনের এই বিশ্বাস ছিল যে, ঈশ্বরই শালগ্রাম শিলা, ঈশ্বরই দশভূজা দুর্গা, ঈশ্বরই চতুর্ভুজা সিদ্ধেশ্বরী।'

দিদিমা তাঁকে বলেছিলেন— 'আমার যা কিছু আছে তোমাকেই দেব।' এই বলে একটি বাক্সের চাবি তুলে দেন দেবেন্দ্রর হাতে। পরে সেই বাক্সের ডালা খুলে তিনি পেয়েছিলেন কয়েকটি মোহর। শুধু এই মোহর কয়েকটি নয়, তিনি দিদিমার কাছ থেকে পেয়েছিলেন আরও অনেক কিছু।

পিতা দ্বারকানাথ তখন অর্থ যশ, প্রতিপত্তির শীর্ষে। ব্যবসার প্রয়োজনে সাহেবমেমদের জন্য বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা হতো। ছেলে দেবেন্দ্রনাথ স্বাভাবিক ভাবেই ভোগবিলাসে মত্ত হলেন। দ্বারকানাথ ছেলের আচরণে বিচলিত। যশোরের রামনারায়ণ চৌধুরীর কন্যা সারদাসুন্দরীর সঙ্গে পুত্রের বিয়ে দিয়ে দিলেন। কাজের মধ্যে রাখলে ছেলের মতিগতি ফিরবে— এই আশায় ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ভার দিলেন। শেষমেষ বাড়ির সমস্ত দায়িত্ব বড় ছেলের হাতে তুলে দিয়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রবাসে বেরিয়ে পড়লেন। দেবেন্দ্রনাথের বিলাসের প্রমোদে ডুবে থাকার সময়কাল মাত্র তিন বছর।

১৮৩৬ সাল, দিদিমা অলকাসুন্দরী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বৈদ্য জানালো আর কোনো আশা নেই। রোগীকে আর গৃহে রাখা যাবে না। গঙ্গাতীরে নিয়ে যাবার জন্য সকলে অলকাদেবীকে বাড়ির বাইরে নিয়ে এলো। অলকাদেবী আরও বাঁচতে চান। অন্তর্জলী যাত্রায় যেতে নারাজ। তিনি বললেন, 'যদি দ্বারকানাথ বাড়িতে থাকিত, তবে তোরা কখনোই আমাকে লইয়া যাইতে পারতিস নে।' কে কার কথা শোনে। নিমতলা শ্মশান। গঙ্গাতীরে একটি চালাঘরে দিদিমাকে রাখা হলো। তিন দিন তিন রাত। সঙ্গে নাতি দেবেন্দ্রনাথ। চালাঘরে চাটাইয়ের উপর বসে আছেন। পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় জগৎ সংসার প্লাবিত। সারারাত দেবেন্দ্রনাথের চোখে ঘুম নেই। হৃদয়ে এক অপার্থিব আনন্দ জ্যোৎস্না। বিলাসিতার মোহ থেকে মুক্তি। ঐশ্বর্যের বন্ধন থেকে মুক্তি।

দিদিমার শ্বাস উপস্থিত হলো। সকলে ধরাধরি করে দিদিমাকে গঙ্গাজলে নামালো। উচ্চৈঃস্বরে সবাই মিলে বলতে লাগল 'গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম - গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম'— দিদিমা 'হরিবোল হরিবোল' বলতে বলতে আকাশের দিকে আঙুল ঘোরাতে ঘোরাতে পরলোকে চলে গেলেন। দিদিমা যেমন তাঁর ইহকালের বন্ধু তেমনি পরকালেরও বন্ধু। দিদিমা নাতিকে অন্য পথের নির্দেশ দিয়ে গেলেন। দিদিমার মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ জ্ঞানমার্গের সাধক। একদিকে গভীর মনোযোগ দিয়ে সংস্কৃত ভাষার চর্চা করছেন। অন্যদিকে নেক, হিউম প্রমুখ পাশ্চাত্যের জড়বাদী দার্শনিকদের রচনাবলী পাঠ করছেন। এইসব জড়বাদী দর্শনের মূল কথা হলো—শরীরের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার হ্রাসবৃদ্ধি, শরীরের মৃত্যুতে আত্মার লয়। কিন্তু এই মতের সঙ্গে কোনো দিক দিয়েই দেবেন্দ্রনাথের মনের ভাবনার ঐক্য হচ্ছে না।

অন্যদিকে ঠাকুরবাড়িতে ধুমধাম করে দুর্গাপুজো হচ্ছে। সন্ধ্যাবেলা আরতির সময় পিতা দ্বারকানাথ স্বয়ং ঠাকুরদালানে উপস্থিত। পিতার ভয়ে দেবেন্দ্রনাথ মন্দিরে হয়তো যাচ্ছেন, কিন্তু ডিরোজিওর হিন্দু কলেজে পড়া দেবেন্দ্রনাথ প্রতিমাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম না করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকছেন। এ এক কঠিন ধর্মসংকট। এ শুধু পিতার সঙ্গে পুত্রের মতামতের বিরোধ নয়; এ শুধু বৃদ্ধতন্ত্রের সঙ্গে তারুণ্যের সংঘাত নয়। এ হলো সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সনাতন ধর্মের জয় ঘোষণা। প্রথা সংস্কারের নাগপাশে আবদ্ধ হিন্দু ধর্মের সংস্কার মুক্তির সূচনা।

এই অন্তর্দ্বন্দ্বের মুহূর্তে, এই ধর্মসংকটের মুহূর্তে তাঁর হাতে এসে পড়ল ঈশোপনিষদের একটি ছিন্নপত্র; যাতে লেখা ছিল—

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা, মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং।।

এর মানে কী? তিনি ছুটলেন সংস্কৃত পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে। বিদ্যাবাগীশ বললেন— 'সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরের দ্বারা মণ্ডিত। কাজেই সমস্তকিছু ত্যাগ করে এক অপার অনন্ত ঐশ্বরীয় আনন্দ উপভোগ করো।' তিনি যার সন্ধান করছিলেন, তাই হাতে পেলেন। শুরু হলো রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে নিয়মিত উপনিষদ অধ্যয়ন। ধীরে ধীরে উপনিষদের উপর কিছু অধিকার জন্মালো। সমধর্মী বন্ধুদের নিয়ে উপনিষদের আলোচনার জন্য প্রতিষ্ঠা করলেন তত্ত্ববোধিনী সভা। ক্রমে ক্রমে শুরু হলো তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা। এই পাঠশালা হয়তো শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পূর্বরূপ। তারপর ব্রাহ্মসমাজে যোগদান। অবশেষে ১৮৪৩ সালের ২১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ২০ জন সঙ্গী নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যাবাগীশের কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিলেন।

দীক্ষা গ্রহণের পর দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে মন দিলেন।

এই সময় একদিকে খ্রিস্টান পাদরিগণ প্রথা সংস্কারে আচ্ছন্ন হিন্দুধর্ম এবং হিন্দু সমাজকে নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করে চলেছে। অন্যদিকে দেশীয় সমাজপতি পণ্ডিতগণ প্রথা ও সংস্কারকে অভ্রান্ত বলে মনে করে— আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরছেন। এই দ্বিমুখী আক্রমণে হিন্দু সমাজ ও হিন্দুধর্ম দুর্বল হয়ে পড়ছে। এইসব আঘাত থেকে হিন্দু ধর্ম এবং হিন্দু সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য দেবেন্দ্রনাথ সচেষ্ট হলেন। সনাতন ঔপনিষদিক হিন্দুধর্মের আদর্শ প্রচার করার জন্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রতিষ্ঠা এবং পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি শুরু করলেন। তখন স্কটল্যান্ডের মিশনারি ডফ সাহেব কলকাতায় হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে অক্লান্ত প্রচার করছিলেন। তিনি ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে আনতেন। এবং হিন্দু সমাজ ও হিন্দু সংস্কৃতি নিয়ে নানারকম কুৎসা রটনা করতেন। এইসময় ডফ সাহেব এককানি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানির নাম 'Indian and India's Missions'। এই গ্রন্থে ডফ হিন্দুধর্ম এবং বেদান্তের যথেষ্ট নিন্দা করেন।

দেবেন্দ্রনাথ অতিশয় ক্ষুব্ধ হলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ডফের বইয়ের তীব্র প্রতিবাদ করলেন। এইসময় অন্যান্য মিশনারি পত্রিকায় হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করে যেসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো সেগুলিকেও সমুচিত জবাব দিতে লাগলেন। পরে মহর্ষির এই প্রতিবাদ প্রবন্ধগুলি একত্র সংকলিত হয়ে 'Vedantic Doctrines Vendicated' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এরপর খ্রিস্টধর্মের কুসংস্কার কুপ্রথা ইত্যাদিকে সমালোচনা করে দেবেন্দ্রনাথ লেখেন 'Rational Analysis of the Gospel' নামে একখানি গ্রন্থ। এই বই দু'খানি প্রকাশিত হবার ফলে দেশের শিক্ষিত লোকে মিশনারিদের স্বরূপ বুঝতে পারল। খ্রিস্টধর্মের অযৌক্তিকতা এবং বেদান্তধর্মের সারবত্তা অনুধাবন করল।

এইসব বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটল। ডফ সাহেব, অভিভাবকগণের প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাঁর বিদ্যালয়ের চৌদ্দ বছর বয়স্ক ছাত্র উমেশচন্দ্র সরকার ও তার এগারো বছর বয়স্কা বালিকা পত্নীকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করলেন। এই উমেশচন্দ্র ছিলেন 'কার ঠাকুর কোম্পানি'র কর্মী রাজেন্দ্রনাথ সরকারের পুত্র। এই সংবাদ শুনে দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত হন। তিনি গর্জন করে বললেন, 'অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক পর্যন্ত খ্রিস্টান করিতেছে? তবে রোস, আমি ইহার প্রতিবিধান করিতেছি।'

শুধু বাদ-প্রতিবাদ নয়, তিনি লক্ষ্য করলেন 'পাদ্রিরা আপনাদিগের ধর্ম প্রচার জন্য নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে, পাঠশালা সকল স্থাপন করিতেছে। আর আমাদিগের দেশের দরিদ্র সন্তানদিগের অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত একটিও উত্তম পাঠশালা নাই।' তাঁর এই প্রয়াসেরই পরিণতি 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়' এইসময় প্রতিদিন দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু সমাজের সম্ভ্রান্ত নেতৃস্থানীয় রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল প্রমুখ ব্যক্তিদের অবিলম্বে হিন্দু ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি করে বিদ্যালয় স্থাপনের অনুরোধ করেন।

দেবেন্দ্রনাথের এইসব প্রচেষ্টায় আর মিশনারিদের ভ্রান্তি এবং দুর্ব্যবহারে সকলের মন উত্তেজিত হলো। এই মহা আন্দোলনে নিদ্রিতপ্রায় হিন্দু সমাজ জেগে উঠল। খ্রিস্টধর্মের প্রচারবেগ মন্দীভূত হলো। ডফ সাহেব নিরাশ অন্তঃকরণে এ দেশ ত্যাগ করে চলে গেলেন।

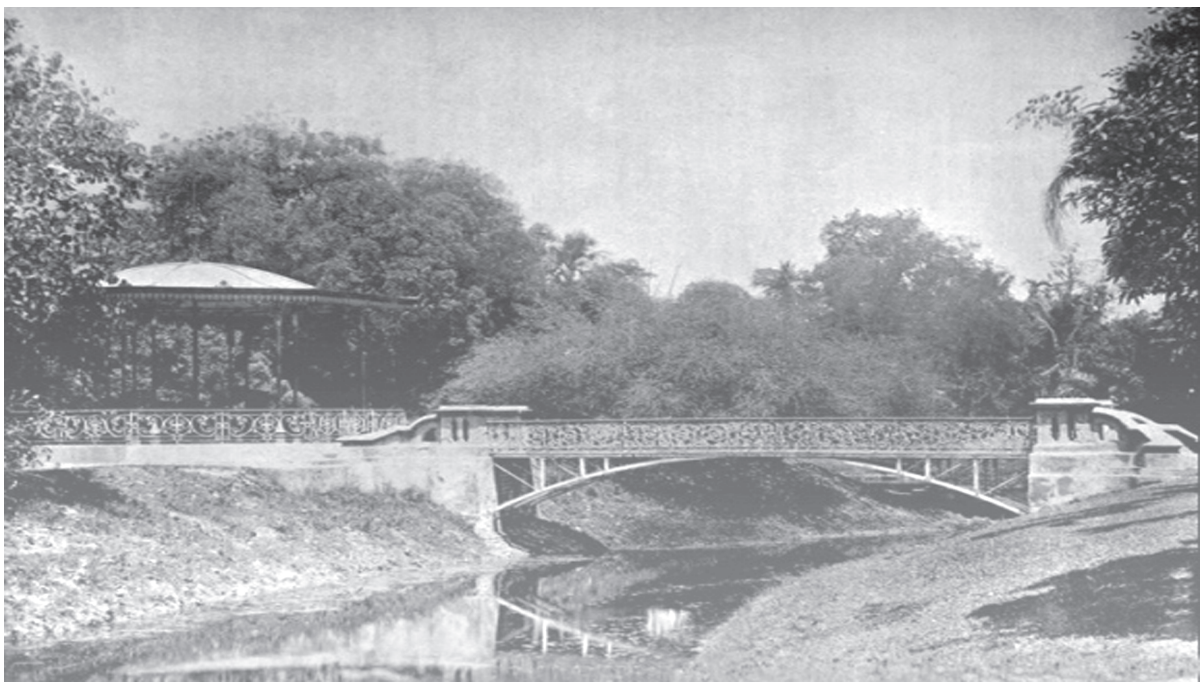

বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ির একাংশ।

দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু ধর্মসংস্কার এবং হিন্দু সংস্কৃতি রক্ষার কাজে যত মনোযোগী হলেন, বৈষয়িক ব্যাপারে ঔদাসীন্য ততই বেড়ে চলল। পিতা দ্বারকানাথ তখন বিদেশে। বিষয়কর্মের প্রতি পুত্রের কোনো মনোযোগ নেই— এই অভিযোগ তাঁর কাছে অবশ্যই পৌঁছেছিল। প্রিন্স দ্বারকানাথ পুত্রকে তীব্র ভর্ৎসনা করে একটি চিঠিতে লিখেলেন— 'আমার সকল বিষয়সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায় নাই, ইহাই আমার আশ্চর্য বোধ হয়। তুমি পাদ্রিদের সহিত বাদ-প্রতিবাদ করিতে ও সংবাদপত্রে লিখিতেই ব্যস্ত, গুরুতর বিষয় রক্ষা ও পরিদর্শন কার্যে তুমি স্বয়ং যথোচিত মনোনিবেশ না করিয়া তাহা তোমার প্রিয়পাত্র আমলাদের হস্তে ফেলিয়া রাখো। ভারতবর্ষের উত্তাপ ও আবহাওয়া সহ্য করিবার শক্তি আমার নাই, যদি থাকিত আমি অবিলম্বে লন্ডন পরিত্যাগ করিয়া তাহা নিজে পর্যবেক্ষণ করিতে যাইতাম।'

দেবেন্দ্রনাথ মর্মাহত হলেন। ভয়ঙ্কর এক অন্তর্দ্বন্দ্ব। বিমর্ষ চিত্ত। কিছুতেই মনে শান্তি পাচ্ছেন না। স্থির থাকতে পারছেন না। অস্থির মনে ভরা বর্ষার ভয়ঙ্কর পদ্মানদীতে সপরিবারে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। শুরু হলো প্রচণ্ড ঝড়-ঝঞ্ঝা-তুফান, মাঝি ভয় পেয়ে হাল ছেড়ে দিল। মহর্ষি অবিচল। ঈশ্বরের উপাসনা করে চলেছেন। বোধহয় করুণাময় ঈশ্বরের আশীর্বাদে সেদিন তিনি রক্ষা পেলেন। এই ঝড় কি কোনো বিপদের পূর্বাভাস? হৃদয়ে আতঙ্ক নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। অকস্মাৎ বজ্রপাত। খবর পেলেন বিলেতে পিতা দ্বারকানাথের মৃত্যু হয়েছে।

পিতার মৃত্যুর দেড় বছরের মধ্যে তাঁদের ব্যবসা ও ব্যাঙ্কের পতন হলো। তখন তাঁদের হাউসের মোট দেনা এক কোটি টাকা। আর পাওনা সত্তর লক্ষ টাকা। অর্থাৎ তিরিশ লক্ষ টাকার অসংস্থান।

দ্বারকানাথ ভবিষ্যৎ চিন্তা করে এমন বন্দোবস্ত করে গিয়েছিলেন যে, পিতৃঋণ পরিশোধ না করলে, পাওনাদাররা দেবেন্দ্রনাথের উপর কোনো চাপ সৃষ্টি করতে পারত না। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ গাড়ি, ঘোড়া, দামি দামি আসবাবপত্র নিলামে বিক্রি করে পিতার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করলেন। শুরু হলো অনাড়ম্বর জীবনযাপন। পিতা দ্বারকানাথের একদিনের ডিনারে খরচ হতো ৩০০ টাকা। এখনকার দিনে যার মূল্য ৬০ হাজার টাকা। আর পুত্র দেবেন্দ্রনাথের ডিনারের খরচ দাঁড়ালো চার আনা। এখনকার দিনে প্রায় ৫০ টাকা। এইসময় দেবেন্দ্রনাথ শুধু ডাল আর রুটি খেয়ে থাকতেন। তবে ঠাকুরবাড়িতে এই কৃচ্ছ্রসাধন চলেছিল মাত্র ছয় মাস। এর মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ব্যবসা বাণিজ্য থেকে সরে এসে শুধু জমিদারি দেখাশোনা করে পারিবারিক সম্মান ও আভিজাত্য বজায় রেখেছিলেন। শোনা যায়, এই সময় শোভাবাজারের রাজবাড়িতে একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে শহরের বিত্তবানরা এসেছেন বহুমূল্য রত্নসম্ভারে সজ্জিত হয়ে। এককালের বিত্তবান দেবেন্দ্রনাথ কীভাবে উপস্থিত হবেন— এই নিয়ে সকলের কৌতূহল। জুড়িগাড়ি এসে থামল। সাদাসিধা পরিচ্ছদ শুভ্র ধুতি চাদর। পায়ে একজোড়া সাদা নাগরা জুতো। তার উপর বহুমূল্য মুক্তো বসানো। অন্যেরা যেসব মণিমুক্তা গলায়, মাথায় ধারণ করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ তাকে পায়ে স্থান দিয়েছেন। এরপর শুরু হলো পরিব্রাজকের জীবন। সঙ্গে নিলেন কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথকে। সুউচ্চ হিমালয় শৃঙ্গে অনেক রাত্রে গায়ে একখানি লাল চাদর জড়িয়ে হাতে মোমবাতি নিয়ে নিঃশব্দে তিনি এগিয়ে চলেছেন উপাসনা করতে। পুত্রকে পাশে দাঁড় করিয়ে সূর্যোদয়ের ব্রাহ্মমুহূর্তে উপনিষদ পাঠ করছেন। এইভাবেই পুত্র রবীন্দ্রনাথের হৃদয়বীণায় উপনিষদের সুরটি বেঁধে দিয়েছিলেন মহর্ষি।

মহর্ষির অনবদ্য গদ্যরচনা আধ্যাত্মিক তথা সাহিত্যের সম্পদবিশেষ। মহর্ষির 'আত্মজীবনী' গ্রন্থে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনদর্শন প্রতিফলিত। পার্বত্য নদী দেখতে দেখতে তিনি লিখেছেন— 'এখানে নদী কেমন নির্মল ও শুভ্র। ইহার জল কেমন স্বাভাবিক পবিত্র ও শীতল। এ কেন তবে আপনার এই পবিত্র ভাব পরিত্যাগ করিবার জন্য নীচে ধাবমান হইতেছে? এ নদী যতই নীচে যাইবে ততই পৃথিবীর ক্লেদ ও আবর্জনা ইহাকে মলিন ও কলুষিত করিবে। তবে কেন এ সেই দিকে প্রবল বেগে ছুটিতেছে?' বস্তুত পার্বত্য নদী সমতলে এলে পশু-পাখী-মানুষের উপকারে লাগবে। সমাজের মঙ্গল হবে। নদীর জল লোকে পান করবে। ফসল ফলবে। নদীর চূড়ান্ত লক্ষ্য সাগরসঙ্গমে মিলিত হওয়া। মানুষের উপকার করতে করতেই একদিন নদী সমুদ্রে উপনীত হবে। তেমনি সমাজ সংসার ছেড়ে নির্জনে পর্বতে সাধনা নয়। ঈশ্বর যেন মহর্ষিকেও আদেশ দিলেন সংসারে প্রত্যাবর্তন করে সমাজ সংসার তথা মানুষের উপকার করার জন্য। এই জীবনদর্শনই কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে—

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তি স্বাদ।

'আত্মজীবনী'তে মহর্ষি যখন লেখেন ঃ 'এই ক্ষণভঙ্গুর দুঃখময় সংসারে কাহার ভাগ্যে কখন কী ঘটে, তাহা কে বলিতে পারে?' তখন তা হয়ে ওঠে ভগবদগীতার ভাষ্যরূপ। গীতায় বলা হয়েছে—

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বিতরাগ ভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।।

দুঃখের দিনে যিনি উদ্বিগ্ন হন না, আবার সুখের দিনে যিনি আত্মহারা হন না। যাঁর রাগ, ভয়, ক্রোধ কিছুই নেই, তিনিই স্থিতধী, তিনিই মহর্ষি। তাঁর জীবন ঈশ্বরময়, আনন্দময়। মহর্ষির এই জীবনদর্শন আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হোক। আমাদের জীবন ঈশ্বরময় আনন্দময় হয়ে উঠুক। ▮

NAVYUG®
COGGED, VEE & POLY BELTS

Environmental Friendly
ISO 14001 : 2015 Certify Unit

NAVYUG

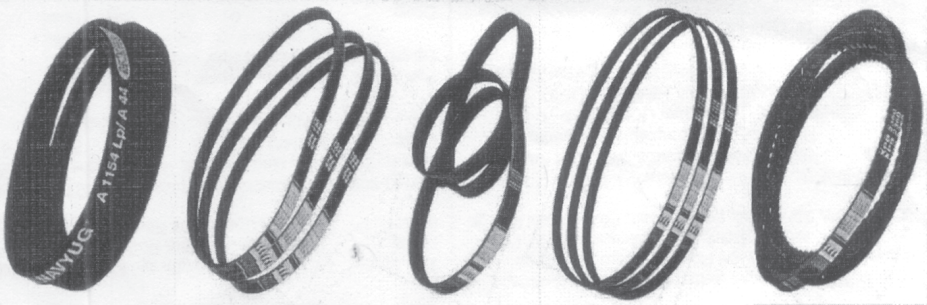

ACCREDITED
Management System
Certification
MSCB-119

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

IS : 2494
ISI
CM/L NO. 9065679

BSCIC Certifications BSCIC Private Limited.
ISO 9001:2008

RECOGNISED STAR EXPORT HOUSE BY GOVT. OF INDIA

Manufacturers & Exporters of : Vee, Cogged & Poly Belts
For Industrial & Automotive Application

Winners of Export Excellence Awards from AIRIA & CAPEXIL

Supplies to OEMs, Railways, STUs, ASRTU, BHEL etc.

NAVYUG (INDIA) LIMITED

G.T. ROAD, BYE-PASS, JALANDHAR-144 009 (PB.)
Phones : 0181-4299900/ 01/ 02/ 2420551
E-mail : info@navyugbelts.com Website : navyugbelts.com

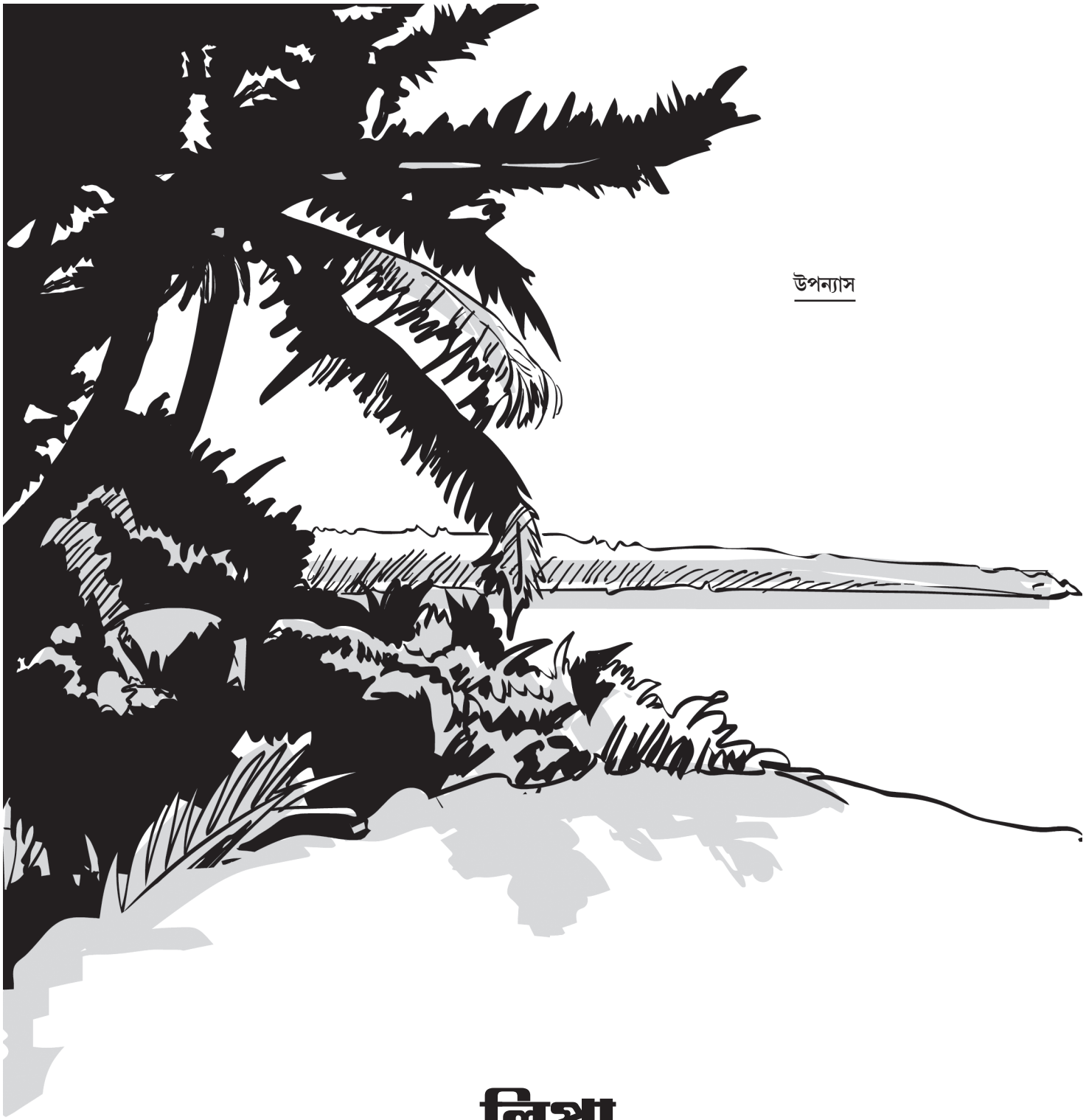

উপন্যাস

লিপা

জিষ্ণু বসু

প্রথম দৃশ্য

অ্যাবেডিন জেটি গাছের ছায়ায় একটা কাঠের বেঞ্চ। এক শ্বেতাঙ্গিণী একা বসে। একমনে তাকিয়ে আছে রস আইল্যান্ডর দিকে। একটু দূরে একজন ডাব বিক্রি করছে। একটি ভারতীয় ছেলে, পরনে জিনস্ আর টি শার্ট। ডাবওয়ালাকে বলল, ' দো দেনা আচ্ছাসা।'

'মালাই ইয়া পানি।'

'নেহি, সির্ফ পানি।' বলেই ছেলেটি একবার তাকালো বেঞ্চের দিকে। এখনও একমনে রসের দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটি। ডাবওয়ালা দুটি কচি ডাব কেটে দেয়। স্ট্র লাগায়। ছেলেটি দু'হাতে দুটি ডাব নিয়ে এগিয়ে আসে বেঞ্চের দিকে। ডান হাতের ডাবটি মেয়েটির দিকে এগিয়ে দেয়। মেয়েটি একবার হাসে। দু'হাতে ডাবটা নেয়, অস্ফুটে বলে, 'থ্যাঙ্কস্।'

বলেই আবার তাকায় রসের দিকে। ডাবে একটা চুমুক দিয়ে ছেলেটি বলে, 'আন্দ্রেয়া, কী এত ভাবছ?'

আন্দ্রেয়া একবার ফিরে দেখে, একটু চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, 'নাঃ, কিছু না।'

এবার মেয়েটি ফিরে তাকায় ছেলেটির দিকে, 'কাল আমাকে সেলুলার জেল দেখাবার সময় তোমাকে ভীষণ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। বিশেষ করে সাভারকরের সেল। ফাঁসির মঞ্চ, ফাঁসির আগে স্নানের জায়গা।' এবার একটু হাসে আন্দ্রেয়া, 'আমার তো ছাদে উঠে ভয়ই করছিল। এতদিন পরে হাতের কাছে একটা জলজ্যান্ত ইংরেজ মেয়ে পেয়ে আমাকে সমুদ্রে ছুঁড়ে না ফেলে দেয়।'

সুপ্রাজ একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'না, না। উত্তেজিত হব কেন?'

আন্দ্রেয়া তখনও হাসছে, 'জানো, সানফ্রানসিসকোর আলকাটরাজ জেল আর এই সেলুলার জেলের অনেক মিল আছে। দুটোই দ্বীপের মধ্যে। সেই ছোট ছোট সেল, অন্ধকার, দ্বীপের মধ্যেই অফিসারদের বিনোদনের ব্যবস্থা— সবই প্রায় এক। একটাই পার্থক্য।'

সুপ্রাজ তাকায়, 'কী পার্থক্য?'

'ওখানে যারা আলকাটরাজ বানিয়েছিল এখনও তারাই দেশ চালাচ্ছে। তাই সেখানে গাইডরা জেল কর্তৃপক্ষের প্রশংসাই করে। আর সেলুলার জেল যে কয়েদিদের জন্য বানানো হয়েছিল, সেই ভারতীয়রা আজ নিজেদের দেশ শাসন করছে। তাই সেলুলার জেলের গাইড অত্যাচারের বর্ণনাতে কোনো অংশ ছাড়ে না।'

সুপ্রাজ প্রসঙ্গ ঘোরাতে চায়, 'ছেড়ে দাও, তোমার প্ল্যান বলো। প্রফেসর লেসিং তো বলেছিলেন তোমার মাস দুয়েক লাগবে।'

আন্দ্রেয়া এবার দুষ্টুমির হাসি হাসে, 'হ্যাঁ, লেসিং তো তোমার প্রেমে পাগল। বুড়ি আমাদের এমফিলের সোস্যাল অ্যানথ্রোপলজি ক্লাসে কম করে পঞ্চাশবার বলেছে, এমনকী কম্যুনিটি যদি কেউ ঠিকঠাক বোঝে তো আমার সুপ্রাজ।'

সুপ্রাজ যেন একটু লজ্জা পায়, 'ঠিক, ম্যাডাম খুব ভালোবাসেন আমায়। একেবারে ছেলের মতো। কেমব্রিজে আমার পোস্টডকের দিনগুলো সত্যিই দারুণ ছিল। আমি গিয়েছিলাম হ্যারি ইংলন্ডের কাছে। তারপর আসলে লিসিংয়ের সঙ্গেই কাজে জুড়ে গেলাম।'

'সুপ্রাজ তুমি টিচিং ছেড়ে সরকারি মিউজিয়ামের কিউরেটর হয়েছ শুনে খুব ক্ষেপে গিয়েছিলেন লিসিং। ডিপার্টমেন্টের সবাই অবাক হয়েছিল।'

একটু থামল আন্দ্রেয়া। তারপর খুব ধীরে ধীরে বলল, 'আজ বুঝেছি, তুমি ঠিকই করেছ। বিশেষত, কাল সন্ধ্যা থেকে।'

'কেন, কাল সন্ধ্যেবেলা কী হলো?' সুপ্রাজ চোখ মেরে বলল, 'কোনো হ্যান্ডসাম জারোয়া ছেলের প্রেমে পড়লে নাকি; ?'

আন্দ্রেয়া হাতে ডাবটা উঠে গিয়ে ডাস্টবিনে ফেলে এসে বলল, 'না, সুপ্রাজের থেকে বেশি হ্যান্ডসাম আর পোর্টব্লেয়ারে কাকে পাব?' তারপর একটু চুক চুক করে মুখে শব্দ করে বলল, 'সরি, তোমার সঙ্গে তো আমার প্রেম করা যাবে না। অ্যাকর্ডিং টু হিন্দু কাস্টমস্। তুমি তো আমার ডিপার্টমেন্টাল এলডার ব্রাদার। কী যেন বললে সেদিন, দা-দা।' বলেই হাসতে লাগল।

বেলা বাড়ছে। লোকজনের আনাগোনাও বাড়ছে জেটিতে। খাবারের সন্ধানে দুটো সিগাল সামনে ঘুরছে। আন্দ্রেয়া সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'ছেলে নয়, মেয়ে। একটা মেয়ের প্রেমে পড়েছি। হ্যাঁ, সে আন্দামানিজ।'

সুপ্রাজ একটা গলা খেকরি দিয়ে বলল, 'ওঃ, মেয়ে! তা ভালো।'

'তুমি লিপার নাম শুনেছ, সুপ্রাজ?'

'লিপা সেটা কে? মানে কী বস্তু? কোন জায়গা?' সুপ্রাজ ভাবছে হয়তো উচ্চারণের বিভ্রাটে এমন কোনো নতুন শব্দ বলছে আন্দ্রেয়া।

'তুমি কী ভাবছ আমি জানি। ভাবছ আমি কী শুনতে কী শুনেছি? কোনো জায়গার নাম হয়তো আমি ভুল উচ্চারণ করছি। আমি ঠিকঠাক উচ্চারণ করছি। আমি ১৯-২০ বছরের একটা মেয়ের কথা বলছি, যার নাম লিপা।'

'কে সে?'

'ওরা এক পা দু'পা করে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। গাড়িতে উঠতে উঠতে আন্দ্রেয়া বলল, 'অ্যাবেডিনের যুদ্ধ তো জানো?'

'সেটা কে না জানে? এই ডক ঘাট, এই বাজার চার রাস্তার মোড়ে বিজয়স্তম্ভ— সবই ওই যুদ্ধের নামে। অ্যাবেডিনের যুদ্ধেই ইংরেজরা জিতেছিল। তারপর থেকেই গ্রেট আন্দামানিজরা ক্রমে বিলুপ্তির পথে চলে গেল।'

'ঠিক তার সঙ্গে একটি মেয়ের নাম জড়িয়ে আছে— আচ্ছা, আজ বিকালে তুমি কখন ফ্রি হবে?'

সুপ্রাজ গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে, 'আজ মিউজিয়াম বন্ধ। কিন্তু অ্যাডমিনিসট্রেটিভ কাজকর্ম আছে। আজ পাঁচটার পরে আমি প্রি। ফ্রি লাইক আ বার্ড।'

'এসো না আজকে আমার ওখানে। মনটা সত্যি খুব ভারী হয়ে আছে। একটা দারুণ জিনিস পড়াব। ঠিক অ্যানথ্রোপলজির মেটেরিয়াল হয়তো নয়, তবে গভীর জীবনবোধের পাঠ। আসবে?'

গাড়ি গেস্ট হাউসের দিকে ছুটছে, 'একজন স্বর্ণকেশী সুন্দরী তন্বী ইংরেজ দুহিতা সান্ধ্য আসরে নিমন্ত্রণ করছেন। সসেজ আর আয়রন ব্রিউ... জোরে হাসতে থাকে সুপ্রাজ।

আন্দ্রেয়া হাসে না, 'আয়রন ব্রিউ শেষ হয়ে গেছে।'

দ্বিতীয় দৃশ্য

পাহাড়ের উপরে সাজানো গেস্ট হাউস। একটা গাড়ি ঢুকল। গাড়ি পার্ক করে নামল সুপ্রাজ। গায়ে পায়জামা পাঞ্জাবি। আন্দ্রেয়া ব্যালকনিতেই দাঁড়িয়ে ছিল। সুপ্রাজ কাছে আসতেই বলল, 'কোথায় বসবে?'

'যেখানে বলবে। বাগানে জলপাই গাছের নীচে সুন্দর ছাতা খাটানো আছে।' আন্দ্রেয়া থামিয়ে দিয়ে বলল, 'না। ওখানে হবে না। এখুনি আলো কমে আসবে। আর একটু লেখাপড়া করতে হবে।'

'আবার লেখাপড়া? ভালো মেয়েদের নিয়ে এই সমস্যা! গুড গার্লস গো টু হেভেন...'

আন্দ্রেয়া কথাটা ধরে নিয়ে বলল, 'অ্যান্ড ব্যাড গার্লস গো এভরিহোয়ার। জানা আছে। আপাতত আমার ঘরে চলো।'

সাজানো করিডোর দিয়ে এগিয়ে চলে দুজনে। টবে ক্যাকটাস, টেরাকোটার ট্রাইবাল স্কাল্পচার, ঝোলানো পটে অর্কিড।

দরজা খোলে আন্দ্রেয়া। ঘরে ঢোকে। নীচু সেন্টার টেবিলের দুদিকে চেয়ার। সেন্টার টেবিলে ক'টা বই আর কিছু কাগজ ছড়ানো।

সুপ্রাজ একটা প্যাডক কাঠের ভারী চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলে, 'খিদে পেয়েছে তো! স্নেকস্ অ্যান্ড...'

'সব আসছে।' আন্দ্রেয়া একেবারে গা এলিয়ে দিয়ে আরাম করে বসে।

মিনিটখানেক দুজনেই চুপ। আন্দ্রেয়া শুরু করে, 'আচ্ছা সুপ্রাজ, ভারতীয় হিসেবে কী তুমি গর্বিত?'

'অবশ্যই। সভ্যতা, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম সব ক্ষেত্রেই ভারতীয়দের প্রচুর অবদান।'

'আমিও একজন ব্রিটিশার হিসাবে অত্যন্ত গর্বিত। আমার দেশ পৃথিবীতে মানুষের সভ্যতা তৈরিতে অনেক অবদান রেখেছে। আজও আমি তা মনে করি।' বলেই থেমে যায় মেয়েটি। আবার কিছুক্ষণের নীরবতা।

'কিন্তু এখন যেন মনে হচ্ছে সারা পৃথিবীকে সভ্য করার দায়িত্ব আমাদের কেউ দেয়নি। আর কে সভ্য, কে অসভ্য সেটা বোঝার জন্য একটা দরদি মন লাগে। কেবল কেতাবি বিদ্যাতে হয় না। কাল থেকে যেন মনে হচ্ছে যে পৃথিবীকে ভোগ করার লোভ থেকেই মানুষ এক একটা জাতির উপর এই 'অসভ্য' তকমা লাগায়। মানবিক গুণ হয়তো সভ্যদের থেকে তথাকথিত অসভ্যদের বেশি।'

কফি সঙ্গে খাবার নিয়ে এল একটি অল্পবয়সি ছেলে। আন্দ্রেয়া সুপ্রাজের পছন্দ জেনে গেছে, তবু বলল, 'একটা?'

সুপ্রাজ কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, 'কী এমন পড়লে কাল সন্ধ্যায়? কী সেই ডিভাইন ভার্সেস?'

'ডিভাইন? হ্যা ডিভাইন বটে' আন্দ্রেয়া টেবিল থেকে একটা প্রিন্ট আউট বের করে।

সুপ্রাজ দেখে পুরাতন একটি পত্রিকা। দ্যা লন্ডন গ্যাজেট। 'লুক ডাডা ইতিহাসটা আমাদের পূর্বপুরুষ তোমাদের থেকে অনেক ভালো লিখত। এটা ১৮৬০ সালের মার্চ মাসের। মানে সিপাহি বিদ্রোহের মাত্র তিন বছর পরে। কার্লমার্কস বা দামোদর সাভারকরের ভাষায়, দ্যা ফাস্ট ওয়ার অব ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স।'

তৃতীয় দৃশ্য

('বার্ডস আই ডিউতে' আন্দামান। দ্বীপ, সাগর, ম্যানগ্রোভ, জঙ্গল। ধীরে ধীরে 'জুমইন' হয়ে নেমে আসছে।)

ভাষ্য : আন্দামান। বঙ্গোপসাগরের বুকে একেবারে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি দ্বীপ। তার মধ্যে দুটিই সবচেয়ে বড়ো। গ্রেট আন্দামান দ্বীপটা লম্বায় ১৪০ মাইল আর চওড়ায় ২০ মাইল। মহা বিদ্রোহের পরে পরেই কয়েদিদের সংশোধনের জন্য এই আন্দামানের উপর নজর পড়ল সরকার বাহাদুরের। যেসব কয়েদিদের আনা হলো তাদের অনেকেরই ধারণা ছিল যে, এই দ্বীপটা বাঙ্গলা বা অন্ততপক্ষে বার্মার থেকে খুব বেশি দূরে নয়। এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে সাঁতরে যেতে পেরে তারা আরও উৎফুল্ল হয়ে উঠল। জঙ্গল এত ঘন যে প্রায় দুর্ভেদ্য মনে হতো। লম্বা তিরের মতো সোজা তিরিশ-চল্লিশ ফুট উঠে যাওয়া গাছগুলোর গোড়া একফুটের বেশি মোটা নয়। কিন্তু পাকানো দড়ির মতো একে অপরকে জড়িয়ে উঠে গেছে উপরে। যা কিছু পাতা সব একেবারে গাছের মাথায়। আর নীচের দিকে না আছে শাখা প্রশাখা না আছে পাতা। পুরো দ্বীপটা জুড়েই মোটামুটি ৫০০ মিটার উঁচু একটা পর্বতশ্রেণী। গোটা দ্বীপেই ঘাস খুব কম। আর ভীষণ জলের অভাব। আছে শুধু ছোট ছোট খানাখন্দ। সেগুলো বর্ষাকালে ভরে যায়, তবে গরমের সময় একেবারে শুকিয়ে যায়। সেখানে কোনো বন্যপ্রাণী নেই। কেবল ইঁদুর, সাপ আর সামান্য কিছু শূকর ছাড়া। আর আছে আদিম জনজাতি। ১৭৯১ সাল থেকেই সভ্য মানুষ এদের খবর জানে। তবে এই দুধনাথ তেওয়ারি ছাড়া আর কেউ

এদের কাছ থেকে বেঁচে ফেরেনি। এখন মূলত তিনটে দ্বীপে আমরা ঘাঁটি গেড়েছি। রোজ আইল্যান্ড, চাথাম আইল্যান্ড আর ভাইপার আইল্যান্ড। এখানেই প্রায় ১৬০০ জন বিদ্রোহী সেপাইকে বন্দি করে আনা হয়েছে। জায়গাটা কয়েদিদেরও পছন্দ নয়, আর কর্তৃপক্ষেরও নয়। কয়েদিরা পালাতে গিয়ে অনেকেই হাত-পা ভেঙেছে, কেউ বা পালিয়ে যাবার পাগলামিতে নিজের জীবনটাও হারিয়েছে। জায়গাটা সত্যিই ভয়াবহ। ইউরোপীয়দের জন্য তো বটেই। এমনকী যে কোনো সভ্য মানুষের জন্য এই দ্বীপ আর জঙ্গল সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাতছানি। যাই হোক, চাষবাস শুরু হয়েছে। নতুন জমিতে শশা, পালং শাক আর অপূর্ব কুমড়ো ফলেছে। গর্জন তেল হয় যে গাছ থেকে সেই ১০০ ফুট উঁচু সোজা লম্বা গাছ, কোনো শাখা প্রশাখা নেই। কেবল মাথায় পাতার বাহার। জঙ্গলের কাঠ ভীষণ শক্ত, কুড়োল একেবারে পাথরের মতো ঠিকরে আসে। সুবিধা একটাই, সাদা পিঁপড়ে গাছের ভেতর গভীর গর্ত করে ফেলেছে। তাই ভেতরে বারুদ দিয়ে ফাটিয়ে দেওয়া যায়। কয়েদিরা তাদের শ্রমের বিনিময়ে বেতন পায়। আর বাকি ব্যবস্থা, তারা নিজেরাই করে নেয়। পোর্ট ব্লেয়ার বন্দরের কাছেই একটা বসতি তৈরি করাই এই ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই গ্রেট আন্দামানে কয়েদিরা থাকে আর একটু দূরে সুরক্ষিত রস আইল্যান্ড হলো কর্তৃপক্ষের থাকার জায়গা। অনেকটা স্কটল্যান্ডের আরগিল সায়ারের ওবান আর কেইরার মতো পোর্ট ব্লেয়ার আর রসের দূরত্ব ৮০০ ইয়ার্ড। ভালো সাঁতার জানা কারও কাছে এই দূরত্ব অতিক্রম করা কঠিন কিছু নয়।

কয়েদিদের মধ্যে বহু জাতের লোক ছিল। বদমাশদের মধ্যে যেমন মণিপুরের যুবরাজ ছিল, এক হতভাগ্য আধা বাঙ্গালি আধা অসমিয়া ছিল, যে চট্টগ্রাম বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। ছিল বালান্দশাকার জমিদারবাবু যিনি এককালে সরকারকে এক লক্ষ টাকা খাজনা দিতেন। তেমন ছিলেন শাহজাহানপুরের এক ডেপুটি স্কুল ইন্সপেক্টর। সকলের জন্য এক ব্যবস্থা। কয়েদি জাহাজে ওঠার পর থেকেই সকলে জাত খুইয়েছে। কারণ, একই কল থেকে ইউরোপীয় রক্ষীদের হাতে তাদের জল খেতে হচ্ছে। তবে আন্দামানে আসার পরে হতভাগ্যদের তাদের জাতিধর্ম বজায় রাখার সুযোগ দেওয়া হতো। একজন তো আসার সময় 'সীসিকনেসের' ভান করে ডেকের দিকে আসে, তারপর অশান্ত সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে মারা যায়। কয়েদিদের চোখে, ওই লোকটি এই ভয়ানক জায়গায় না এসে পথেই আত্মহত্যা করে বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। এই মৃত্যু, দ্বীপে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন, মনুষ্যজগৎ থেকে বহু দূরে এই দ্বীপান্তর আর গ্রেট আন্দামান দ্বীপের ভয়ানক সব অভিজ্ঞতা একের পর এক ঘটতে থাকে। বন্দিদের কেউ কেউ কয়েক ঘণ্টার জন্য পালিয়েছিল, কেউ বা কোনোমতে দুদিন টিকে ছিল জঙ্গলে, তারপর ভয়ে ফিরে এসেছে। স্বাভাবিকভাবেই তাদের আবার নিয়ে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। দু-তিনদিনের মধ্যে না ফিরলে তাকে মৃত বলে ধরে নেওয়া হতো। এমনই একজন ফিরে আসা কয়েদি জেল সুপারকে বলেছিল যে সে জঙ্গলিদের সঙ্গে টানা দু'দিন ছিল। তবে তার বক্তব্যে এতটাই অসঙ্গতি ছিল যে সেটা বিশ্বাস করাটা বেশ কঠিন। আর সেই বর্ণনা এই দুধনাথ তেওয়ারির অভিজ্ঞতার সঙ্গে আদৌ মেলে না। দুধনাথের কাহিনিতে সন্দেহের প্রায় কোনো অবকাশই নেই।

দুধনাথ তেওয়ারি, নেটিভ ইনক্যান্টির ১৪ নং রেজিমেন্টের সিপাহি ছিল। বিদ্রোহী ও বেআইনিভাবে পালিয়ে যাওয়ার জন্য গ্রেপ্তার হয়। ঝিলাম কমিশনে তার শাস্তি ঘোষণা হয়, যাবজ্জীবন কারাবাস। আইনের ভাষায়, 'Transportation for life and labour in iron'। তাকে ১৮৫৮ সালের ৬ এপ্রিল পোর্ট ব্লেয়ারে শাস্তির জন্য আনা হয়। মাত্র ১৭ দিনের মধ্যেই দুধনাথ রস আইল্যান্ড থেকে পালায়। তারপর ১ বছর আর ২৪ দিন আন্দামানের জঙ্গলিদের সঙ্গে থেকে ১৮৫৯ সালের ১৭ মে আবার ফিরে আসে পোর্ট ব্লেযারের কাছে আবেদিনে। সেই দুধনাথের বর্ণনা ড. ওয়কার নিজে সরকারের কাছে পাঠিয়েছেন। তার অনেকটা অংশই প্রকাশের যোগ্য নয়। সেগুলো কেবল ব্লু বুকেই থেকে যাবে।

চতুথ দৃশ্য

(গেস্ট হাউসের ঘর। চায়ের সরঞ্জাম, খাবার প্লেট ইত্যাদি নিতে ঢুকেছিল একটি বেলবয়। ছেলেটি সেগুলো নিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় সুপ্রাজ বলে, 'থোড়া পানি ভেজনা।' ছেলেটি মুখ ঘুরিয়ে, 'জী স্যার' বলে বেরিয়ে যায়।)

আন্দ্রেয়া হাসতে হাসতে বলে, 'ন্যারেশনটা একদম পারফেক্ট কলোনিয়াল রুলারদের বয়ানে। এদেশটার শাসন যেন তাদের স্বাভাবিক অধিকার। দুটো জিনিস আমার দারুণ মজা লেগেছে। একটা হলো জঙ্গলে জানোয়ার বলতে ইঁদুর, সাপ, কয়েকটা শূকর আর আদিম জনজাতি। মানে ওরা মানুষই নয়। আর মহা বিদ্রোহে ধরে আনা সবাইকে কয়েদি না বলে একেবারে 'বদমাশ' বলেছে। আমি ওই ইংরাজি শব্দটাই কখনো শুনিনি। তারপর ডিকশেনারিতে দেখলাম। এখন আর ইংরাজিতে কেউ ওটা ব্যবহার করে না। তোমরা করো।'

'কোন শব্দ? বদমাশ? আলবাত করি। বাংলা, হিন্দি সবেতেই চলে।'

আন্দ্রেয়া, 'কিন্তু ওটা ওল্ড ইংলিশ। যাক, তোমাদের দেশভক্ত

লোকদের আমরা খুব অত্যাচার করেছিলাম। সরি।'

সুপ্রাজ কথাটা ঘোরাবার চেষ্টা করে, 'ধুস্, এত বছর আগের তোমার দেশের কোন অত্যাচারী কী করেছিল, আর তাকে সমর্থন করে লন্ডন চেম্বারর্স গেজেট কী লিখেছিল... ছাড়ো।' একটু থেমে আবার বলে, 'আর একটা বিষয় সিপাহি বিদ্রোহের মতো বড়ো বিপ্লবের সময় অনেক ভুল লোকও স্বদেশী বিপ্লবী হিসাবে পুলিশের হাতে চলে আসে। তারা না ছিল বিপ্লবী, না ছিল দেশভক্ত।'

'আমাদের পাড়াতে এক ভদ্রলোক স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে পেনশন পেতেন। তাঁর মধ্যে কখনো দেশপ্রেমের কিছু দেখিনি। একবার কৌতূহল বশত তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, উনি কীভাবে ৪২'এর আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। অনেক খোঁচাতে শেষে বললেন, তার এক দূর সম্পর্কের জামাইবাবু মেদিনীপুর থেকে কলকাতায় এসে তার বাড়িতে একরাত ছিলেন। পুলিশ পরেরদিন দুপুরে এসে সেই বিপ্লবীকে না পেয়ে আমাদের পাড়ার সেই ভদ্রলোককে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। আর এক রাত্রি হাজতবাসও হয়। সেই সূত্রে...'

আন্দ্রেয়া একটু অবাক হয়েই শুনছিল। খুব বেশি কিছু বুঝছিল না বলেই মনে হল।

এবার সুপ্রাজ হেসে ফেলে, 'তবে কেটা বিষয় তোমাদের দেশের লোকেরা এসেই বুঝে গিয়েছিল। সেটা হলো আমাদের আসল অসুখটা কোথায়।'

'কী আবার অসুখ?'

সুপ্রাজ জলের বোতল থেকে গ্লাসে জল ঢালে। তারপর বলে, 'জাতপাত। জাতিভেদ। ওই কয়েদিদের আসল পরিচয় ভারতীয় নয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, জমিদার, ইনফ্রান্টির মাহার। আর এদের প্রধান দুঃখ দ্বীপান্তরের নয়, আসল দুঃখ জাত যাবার। কারণ, দ্বীপান্তর তো এক জীবনের আর জাত গেলে তো জন্ম জন্মান্তরের ক্ষতি। সত্যি সাম্রাজ্যবাদী

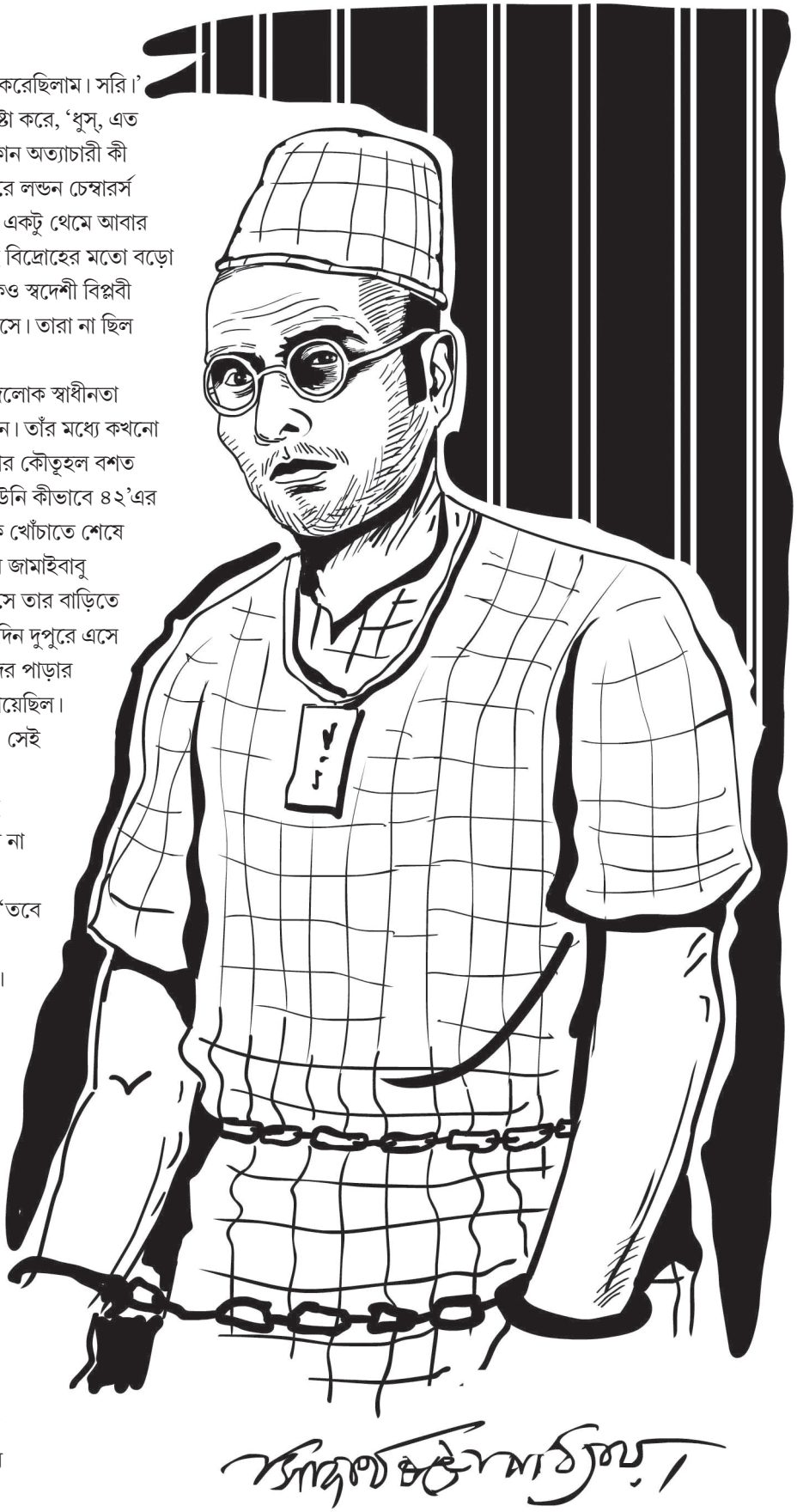

হিসাবে এই পর্যবেক্ষণটা আমার মনে হয় খুব ইন্টেলিজেন্স হয়েছে।'

'আমরা ইন্টেলিজেন্স না হলে পাঁচ হাজার বছরের একটা সভ্য জাতিকে নেটিভ বলে শাসন করা যায়।'

পঞ্চম দৃশ্য

আকাশ থেকে তোলা আন্দামানের দৃশ্য। ধীরে ধীরে নীচে এসে জঙ্গলের মধ্যে নেমে এল দৃশ্যপট।

প্রায় ১৮৪টা দ্বীপের এই দ্বীপপুঞ্জ বহুদিন থেকেই মানুষের আগ্রহের জায়গা। আন্দামান নামটাও সংস্কৃত শব্দ হনুমান থেকেই সম্ভবত এসেছে। কারণ, পঞ্চদশ শতকের ইতালীয়রা, ডাচ নাবিকরাও এই দ্বীপপুঞ্জকে ওই নামেই উল্লেখ করত। ইউরোপের মশলা ব্যবসায়ীদের কাছে ভারত আর মিয়ানমারের মাঝের এই সমুদ্রপথ খুবই আকর্ষণীয় ছিল। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাছি পর্যন্ত ডেনমার্ক আর অস্ট্রিয়া এর দখল নিয়ে টানাটানি করত। কিন্তু সমস্যাও কম ছিল না। দক্ষিণ-পশ্চিম আর উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর যুগ্ম প্রভাবে কখনো কখনো সমুদ্র হয়ে উঠত অতি ভয়াবহ। কত ইউরোপীয় জাহাজ ডুবেছে এই আন্দামান সাগরে। জাহাজডুবিতে যে দু-চারজন নাবিক বেঁচে গিয়েছিল, তাদের অভিজ্ঞতা আরও ভয়াবহ। দ্বীপগুলো আদিম জনজাতিতে ভর্তি। তারা বিদেশি সভ্য ভদ্র লোক দেখলেই বিষমাখা তির আর বর্শা নিয়ে তেড়ে আসত।

এই আদিম জনজাতিদের বেশিরভাগই নিগ্রিটো। আফ্রিকার অধিবাসীদের মতো কুচকুচে কালো। এরা এমন বিচ্ছিন্ন দ্বীপে এলো কীভাবে? একটা তত্ত্ব ছিল যে, আরব দাস ব্যবসায়ীরা জাহাজে করে আফ্রিকার মানুষদের নিয়ে যাচ্ছিল। মাঝপথে জাহাজডুবিতে এরা এখানে থেকে গেছে। কিন্তু জারোয়া, গ্রেট আন্দামানিজ, ওঙ্গি, সেন্টিনেলিজ— এরা নৃতাত্ত্বিকভাবেও একেবারে এক নয়। তাই জাহাজডুবির কথা সত্যি হলেও অনেকবার জাহাজডুবি হতে হবে। তাছাড়াও জারোয়াদের ব্যবহৃত শামুকের খোলা ইত্যাদির সি-১৪ পরীক্ষা করে দেখা গেছে, তারা আরবদের দাস ব্যবসা শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই ওখানে আছে। আজকের বিজ্ঞানীরা অবশ্য পরিষ্কার বলেন, গ্রেট আন্দামানিজ, ওঙ্গি, জারোয়া বা সেন্টিলেনিজরা ভারত মহাসাগরে বহু হাজার বছর ধরেই আছে।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে অবশ্য বসবাস করত মঙ্গোলয়েড আদিম জনজাতি। নিকোবর বহুদিন দখল করে ছিল ডাচেরা। ১৮৪৫ সাল নাগাদ নেপলিয়নিক যুদ্ধে হেরে নিকোবর থেকে ডেনমার্ক পাততাড়ি গোটায়। এরপর সবক'টি দ্বীপেই ইংরেজের অধিকার।

এলাকাটাতে মাঝে মাঝেই জাহাজডুবি হয়। বিপদে পড়া জাহাজগুলোকে একটা বন্দরের সুবিধা দেবার লক্ষ্যেই ভারতীয় নৌবাহিনীর লেফট্যানেন্ট ব্লেয়ার সাহেবকে সর্বপ্রথম আন্দামানে পাঠানো হয়। সাহেব আজকের পোর্টব্লেয়ারে ঘাঁটি গাড়েন বটে, তবে জনজাতিদের আক্রমণে বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেননি। বরং পোর্ট কর্নওয়ালিসের উপর ইংরেজ বেশি ভরসা করত। বার্মার যুদ্ধের সময়ও ওই বন্দরই ব্যবহার করে ইংরেজরা।

পোর্টব্লেয়ার বন্দর ঠিকঠাক মতো ব্যবহার করার কথা ভাবা হলো মহা বিদ্রোহের পরে। মহা বিদ্রোহ ইংরেজ কোম্পানিকে একটা বড়সড় ধাক্কা দিয়েছিল। কানপুর রেজিমেন্টের মতো ঘটনা ইংরেজ মায়েদের বুক কাঁপিয়ে দিয়েছিল। বিশেষত, হেনরি নেলসনের সেই বিখ্যাত ছবি 'ইস্ট ওয়ার্ড হো', যেখানে অফিসার আর সেনাদের বৌয়েরা কোলে বাচ্চা নিয়ে জাহাজঘাটায় বিদায় দিতে এসেছে। জাহাজ ১৮৫৭ বিদ্রোহের পরে ভারতে যাবে বিদ্রোহ মোকাবিলায়। সেই সঙ্গে মার্গারেট কোয়াডের তার শাশুড়িকে লক্ষ্ণৌ থেকে লেখা চিঠি। বিদ্রোহের সময় ভারতীয় সেপাই বা অন্যান্য নেটিভদের আচরণের বর্ণনা।

তাই বিদ্রোহ শেষ হবার পরে কোম্পানি বা ইংরেজদের প্রবল হিংসা, আক্রোশ আর ঘৃণা পুঞ্জিভূত হয় ভারতীয়দের বিরুদ্ধে। যারা মহা বিদ্রোহের সময় কোনোভাবে যুক্ত ছিল বা সহযোগিতা করেছিল, তাদের নরকে পাঠানোর ব্যবস্থা ছিল প্রথম কাজ। তখনই আবার মনে এল আন্দামানের কথা। ১৮৫৮ সালের মার্চ মাসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম 'স্ট্রিম ফ্রিগেট' প্রায় দুশো জন কয়েদিকে নিয়ে পোর্ট ব্লেয়ার পৌঁছাল। সঙ্গে এলেন ডক্টর জেমস্ ওয়াকার আগে দু-একটা ছাউনি গোছের কিছু ছিল কিন্তু ওই আন্দামানের ঝটপট বেড়ে ওঠা জঙ্গলের দাপটে সেগুলোকে কোনো কাজে লাগানো গেল না। বলতে গেলে প্রায় খোলা আকাশের নীচেই এনে ফেলা হয়েছিল ওই শ'দুই কয়েদিকে। ডক্টর ওয়াকার দক্ষ ছিলেন, কিন্তু অপরিণামদর্শিতা তাকে হারিয়ে দিল। প্রথম থেকেই কয়েদিরা পালাতে শুরু করল। কিছু লোকের ধারণা কিন্তু আন্দামান বার্মার সঙ্গে স্থলপথে যুক্ত। সেই আশায় পালিয়ে অনেক লোক মরল। কেউ সাপের কামড়ে, কেউ না খেতে পেয়ে, কেউ বা আদিম জনজাতিদের হাতে। যারা পালিয়ে গিয়ে ফিরে এসেছিল তাদেরও ফাঁসিতে লটকে দেওয়া হলো। এর মধ্যে আরও জাহাজ আসতে থাকল। শত শত বন্দি। কিন্তু কোনো ব্যবস্থাই নেই। ফলে সাল মাসে মোট সাতশো নেটিভের মধ্যে মাত্র চারশো লোক টিকল। এতদিন মহারানির চোখ পড়েছে ভারতের দিকে। ইউরোপের সব কাগজে লেখা হচ্ছে। বড্ড অত্যাচার করছে কোম্পানি। ভারতের গভর্নর জেনারেলের কাছে অভিযোগ গেল ওয়াকারের নামে। ডাক্তার ওয়াকারকে একটু ধাতানো হলো। বলা হলো, কয়েদিদের মধ্যে যাদের ব্যবহার

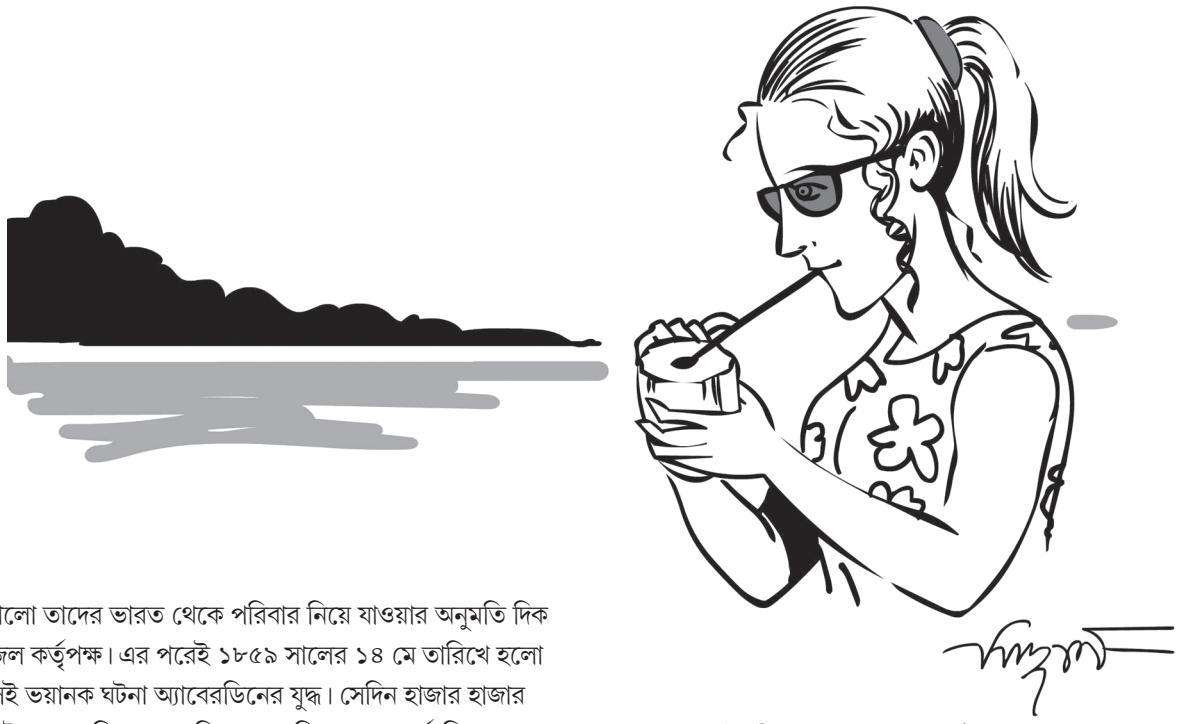

ভালো তাদের ভারত থেকে পরিবার নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিক জেল কর্তৃপক্ষ। এর পরেই ১৮৫৯ সালের ১৪ মে তারিখে হলো সেই ভয়ানক ঘটনা অ্যাবেরডিনের যুদ্ধ। সেদিন হাজার হাজার গ্রেট আন্দামানিজ জনজাতির মানুষ তির-ধনুক, বর্শা নিয়ে আক্রমণ করে ইংরেজ স্কন্ধাবার। ইংরেজের বন্দুক সহজেই প্রায় আড়াই হাজার জনজাতিকে মেরে অ্যাবেরডিনের যুদ্ধ জিতে যায়। ডাক্তার জেমস ওয়াকার অবশ্য আর বেশিদিন আন্দামানে থাকেননি। তার জায়গায় এলেন কর্নেল জে সি হাউথন।

কিন্তু এর মধ্যে অনেকটা না বলা কথা আছে। অনেক সম্মান, প্রেম আর বিশ্বাসঘাতকরা কথা। যার কিছুটা অংশ প্রকাশিত হয় লন্ডন চেম্বারস্ জার্নালের পপুলার লিটারেচার (সাইন্স অ্যান্ড আর্টস)-এর মার্চ ২৪, ১৮৬০ সংখ্যায় শিরোনাম 'অ্যাডপর্টেড ইন আন্দামান।'

ষষ্ঠ দৃশ্য

মহা বিদ্রোহের পরে কলকাতা, মাদ্রাজ, করাচি, সিঙ্গাপুর আর বার্মা থেকে কাতারে কাতারে বন্দি আসতে থাকে। প্রথমে তাদের চাথাম দ্বীপ পরিষ্কার করতে পাঠানো হয়। ড. ওয়াকার রস দ্বীপে হেডকোয়ার্টার্স বানানোর প্রস্তাব দিলেন। ১৮৫৮ সালের ৭ মে রস দ্বীপের অনুমোদন মিলল। ৬ নভেম্বর সেখানে এক হাজার কয়েদি থাকার মতো ব্যবস্থা তৈরি হলো। রস, চাথাম, ভাইপার আর পোর্ট ব্লেয়ার চার জায়গাতেই সংশোধনাগার তৈরি হলো। ড. ওয়াকার আরও ১০,০০০ কয়েদি পাঠাতে বললেন। কারণ, সকাল সন্ধ্যা লোক মারা যাচ্ছিল। তার ডায়েরির পাতায়, 'ব্যাটারা পালাবার জন্য উৎগ্রীব। আমি ওদের মার্কো পোলোর বই থেকে পড়ে শোনালাম, এখানে ২০০টিরও বেশি দ্বীপে আদিম মানুষে ভরা। তারা তাদের উপজাতির না হলেও ধরে মেরে দেয়, তারপর কেটে খেয়ে ফেলে।'

শুরুতে আটজন ইংরেজ অফিসার, একজন ভারতীয় ওভারসিয়ার, দুজন দেশীয় ডাক্তার আর পঞ্চাশজন দেশীয় রক্ষী নিয়ে ড. ওয়াকার দ্বীপে পৌঁছালেন। সঙ্গে ৭৭৩ জন ভয়ানক আসামি। এই ৭৭৩ জনের সর্বশেষ হিসাব এরকম হয়েছিল, টোটাল রিসিভ্ড ৭৭৩, হাসপাতালে মৃত্যু ৬৪ জন, পালিয়ে যাওয়ার পরে আর পাওয়া যায়নি ১৪০ জন, আত্মহত্যা করে ১ জন, পালিয়েছিল তারপর খুঁজে পেয়ে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল ৮৭ জনকে। শেষ পর্যন্ত হাতে ছিল ৪৮ জন।

১ এপ্রিল ১৮৫৯, একদল বন্দি বন্দুক, ছুরি আর কুঠার নিয়ে হামলা করে। একজন রক্ষীকে নিকেশ করে, সুপারিটেনডেন্ট ড. ওয়াকার কোনোক্রমে প্রাণে বাঁচেন।

সেই সঙ্গে চলত বুনোদের আক্রমণ। ওই এপ্রিল মাসেরই ৬ তারিখে ২৪৮ জন কয়েদি যখন চাথামের উপকূলে কাজ করছিল, তখন প্রায় ২০০ জনের মতো বুনোদের একটা দল আক্রমণ করল। তিরের আঘাতে মারা গেল তিনজন কয়েদি।

১৪ এপ্রিল ১৮৫৯ পরবর্তী আঘাত প্রায় দেড় হাজার আদিম জনজাতির লোক তির-ধনুক, কুঠার, ছুরি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুটো ভাগে প্রায় ৪৪৬ জন কয়েদি ছিল। কয়েকজন রান্নাবান্না করছিল। সেদিন জনা চারেক মারা যায় আহত হয়েছল ৬-৭ জন।

১৮৫৯ সালের এপ্রিল মাসটা ড. ওয়াকারের জন্য দুঃস্বপ্নের ছিল। প্রায় ১০০ জন পাঞ্জাবি কয়েদি বিদ্রোহ করল। ড. ওয়াকারের ভবলীলা সাঙ্গ হওয়ার জোগাড় হয়েছিল। কী কারণে

সাজা না পাওয়া কয়েদিরা ওয়াকারের পক্ষ নিল। কোনোমতে বেঁচে গেলেন সুপার।

এপ্রিল মাসটা কাটার পরেই যে ঘটনা ঘটল তা আন্দামানের ইতিহাসে তো বটেই, সারা পৃথিবীতে যেখানে যেখানে ইংরেজ বা অন্য ইউরোপীয় উপনিবেশ ছিল সকলের চক্ষু স্থির হয়ে গেল। ৬ মে ১৮৫৯, সকালবেলা এসে হাজির দুধনাথ তিওয়ারি। গায়ে একটা সুতোও নেই। নিম্নাঙ্গ ঢেকে রেখেছে গাছের বাকল দিয়ে। কোনোমতে ওয়াকারের অফিসের সামনে এসে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল। কেউ একজন জল নিয়ে এল ড. ওয়াকারের ইশারায়। পাক্কা একবছর ২৪ দিন কেটে গেছে। দুধনাথ পালিয়েছিল জেল থেকে। দুধনাথ একটু ধাতস্থ হয়ে যা বলল সেটা আরও মারাত্মক। ঠিক ১০ দিন পরে সারা আন্দামানের একটি জনজাতি একসঙ্গে আক্রমণ করবে পোর্ট ব্লেয়ার। ১৭ মে ঠিক মাঝরাতে হাজার হাজার গ্রেট আন্দামানিজ আক্রমণ করবে পোর্ট ব্লেয়ার।

'কিন্তু তুমি বাপু এত খবর জানলে কীভাবে?'

ডাক্তার ওয়াকারের চোখেমুখে সন্দেহ। 'আমি জানি, আমি সত্যি বলছি।' এক লহমায় নিজেকে উজাড় করতে চায় দুধনাথ, 'আমি ছিলাম তো ওদের সঙ্গে, ওরা আসছে। সব দ্বীপে দ্বীপে ওরা খবর পাঠিয়েছে। অনেক অনেক বুনো একসঙ্গে আসছে। তোমাদের রাতের অন্ধকারে শেষ করে দেবে। আমি সত্যি বলছি সাহেব, সত্যি বলছি। বিশ্বাস কর।'

চায়ের কেটলি পেয়ালা পিরিচ এসে গেছে টেবিলে। ড. ওয়াকার চায়ের পেয়ালায় একটা লম্বা চুমুক দিলেন। সেনাবাহিনীতে থাকার সময় থেকেই চা তার খুব প্রিয়। আরাম কেদারায় দু-তিনবার দোল খেয়ে বললেন, 'বেশ তো, ভালো কথা। কিন্তু তারিখ, সময়, কোথায় আক্রমণ করবে সব ঠিকঠাক বুঝলে কী করে? তুমি কী ওদের ভাষা জানো?'

'হ্যাঁ, আমি ওদের পুরো ভাষা জানি। সব কথা বুঝতে পারি। বলতে পারি। আমি তো বিয়ে করেছি ওদের মেয়েকে।'

'বিয়ে? ম্যারেজ? আই মিন ইউ...'।

দুধনাথ ভাবলেশহীন ভাবে বলল, 'হ্যাঁ, এই এগারো মাসের মতো হলো। মাগির পেট হয়েছে, বাচ্চা হবে।'

ড. ওয়াকার লোহার মতো মানুষ। এই জঙ্গলে সাপখোপ, বিদ্রোহী, জঙ্গলি নিয়ে আরও কঠিন, কঠোর নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছেন। কিন্তু তার চোখটাও কুচকে এলো, 'মানে? তাহলে তুই আমাদের সাহায্য করতে এলি কেন? আমি তো কিছুই...'।

দুধনাথ সাপের মতো বুকে হেঁটে ওয়াকারের প্যাডক কাঠের আরামকেদারার একেবারে কাছে এগিয়ে গেল। জড়িয়ে ধরল আরাম কেদারার একটা পা। তারপর ভরসা করে শ্বাস নিয়ে বলল, 'আমরা তো মানুষ, সভ্য মানুষ। আর আপনারা আমাদের আরও সভ্য করার জন্য এদেশে এসেছেন। আমি সভ্যদের সঙ্গে থাকব, এটাই চিন্তা করলাম।'

ওয়াকার প্যাডক কাঠের আরাম কেদারায় দুলছেন, চা পান করছেন। আর শুনছেন।

'আমি আর পারছিলাম না সাহেব। দম বন্ধ হয়ে আসছিল। আমি সভ্য মানুষের সঙ্গে থাকব। সারা জীবন জেলে থাকব। কালাপানির এপারেই মরব। কিন্তু তোমাদের মতো সভ্য জাতির প্রতি যে বেইমানি করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত করব। তাই ফিরে এলাম সাহেব। তৈরি হতে হবে। ওইদিন ঠিক মাঝরাতে ওরা আসবে। তৈরি হতে হবে সাহেব।'

ওয়াকার উঠে দাঁড়ালেন। বজ্র নির্ঘোষে হুংকার দিলেন, 'আবদুল্লা! আবদুল্লা! সবকো গ্রাউন্ড মে বুলাও।'

দুধনাথের কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছিল। ১৭ তারিখ মাঝরাতে আক্রান্ত হলো অ্যাবেডিন ঘাঁটি। হাজার হাজার গ্রেট আন্দামানিজ ঝাঁপিয়ে পড়ল। তির-ধনুক, বল্লম, কুঠার হাতে। কিন্তু ইংরেজ প্রস্তুত ছিল। বন্দুকের গুলিতে মরতে লাগল শত শত স্থানীয় জনজাতির মানুষ। প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দেশী নৌকোও এনেছিল ওরা। মৃত্যুর সংখ্যা যখন হাজার ছাড়িয়ে গেল, তখন ওরা হাল ছেড়ে দিল। ছুটে, নৌকো, ডুঙ্গিতে করে পালাতে লাগল বাকি বেঁচে থাকা লোকেরা। ইংরেজ জিতে গেল অ্যাবেডিনের যুদ্ধ, মধ্যরাত, ১৭মে ১৮৫৯।

সভ্য ইংরেজ দুধনাথ তেওয়ারির কৃতজ্ঞতার প্রতিদান দিল। মুক্ত করা হলো দুধনাথকে। দুধনাথ বাড়ি ফিরে এলো। ইংরেজ কোম্পানির দেওয়া টাকা পয়সায় ভালো ঘরদোর বানাল। তারপর স্বজাতিতে বিয়ে করল। তারা সুখে শান্তিতে জীবনযাপন করতে লাগল।

সপ্তম দৃশ্য

প্রায় জানোয়ারের মতোই জীবন কাটছিল সকলের। সকাল থেকে উঠেই হাড়ভাঙা পরিশ্রম। জঙ্গল কাটা, মাটিতে গর্ত করা, মাল তোলা সন্ধ্যা পর্যন্ত। আর কী ভীষণ জঙ্গল। পোকামাকড় সাপ কী নেই! কয়েকদিন পরপর জঙ্গলিরা ধেয়ে আসে তির-ধনুক নিয়ে। খাওয়াও প্রায় পশুর মতোই। কখনো কোনোমতে সেদ্ধ করা, কখনো বা কাঁচাই।

জাতপাত রক্ষার প্রায় কোনো সম্ভাবনাই নেই। এখান থেকে বের হতেই হবে। সেটা প্রতিদিন সকালেই মনে হয়। কত তারিখ, কী বার আর মনে থাকে না। এখন তো কোন মাসও ভুলে যায় মাঝেমধ্যে। আর আন্দামানের আবহাওয়াতেও গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত কী নেই। এমনকী শীতও নেই। প্রতিদিনই কেউ না কেউ রোদে কাজ করতে করতে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে।

তারপর তাকে ধরাধরি করে হাসপাতালে। পরদিন শুনছে মরে গেছে লোকটা।

নেহাত কপালের গেরো, তাই দুধনাথ এই নরকে এসেছে। এইসব বিদ্রোহ দেশ, আজাদি কোনোকালেই দুধনাথকে টানতো না। ইনফ্রান্টিতে কাজ করতে গিয়েছিল দুটো পয়সার মুখ দেখবে বলে। কানপুর ক্যান্টনমেন্ট যখন জ্বলছে, দুধনাথ তেওয়ারির কোনো তাপ উত্তাপ ছিল না। কিন্তু লোভে পাপ! একদিন সন্ধ্যায় সাত আটজন সিপাহি আর একজন সুবেদার এলো। দুধনাথের হাতে ধরিয়ে দিল একমুঠো কয়েন। একদম চকচকে রানির ছবিওয়ালা। দুধনাথের চোখ চক্‌চক্ করে উঠল। মালখানার চাবি সাহেব কোথায় রাখে সেটা পরম বিশ্বাসী দুধনাথই জানত। বন্দুক বেরও হলো, কিন্তু পরদিন সকালেই কানপুরের রেজিমেন্ট থেকে একশো সৈন্য এসে বিদ্রোহীদের নিকেশ করে দিল। কার্যকারণ যোগে জালে পড়ে গেল দুধনাথ। কালাপানি পার হতে হলো। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কত জন্ম ধরে করতে হবে কে জানে?

কয়েকদিন ধরেই পরিকল্পনা চলছিল। পালাতে হবে। পালাতেই হবে। আবদুল্লা কানপুর ক্যান্টনমেন্টে রান্নার কাজ করত। পৃথিবীর যে কোনো বিষয়েই আবদুল্লার অগাধ জ্ঞান। আবদুল্লার খালতো ভাই জাহাজে কাজ করত। তার কাছ থেকেই শুনেছিল, আন্দামানের এই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে দশ বারো মাইল যেতে পারলেই বার্মা। আর বার্মা মুলুকে ইংরেজের রাজত্ব নেই। একবার পৌঁছাতে পারলেই কেল্লা ফতে।

ভোরবেলাতেই বের হয়ে পড়েছিল ওরা। একজন প্রহরীর মাথায় আলতো চেলা কাঠের বাড়ি। খোলা হলো লোহার দরজা। পিলপিল করে বের হয়ে এলো ওরা। মোট একশো চল্লিশ জন।

মুক্তি! মুক্তির কী আনন্দ! বন্দিদশা থেকে বের হয়ে একবার ভালো করে খোলা আকাশের দিকে তাকালো দুধনাথ। একবার ইচ্ছে হলো ঘাসের উপর শুয়ে আকাশটা দেখে চোখ ভরে নিতে। কিন্তু সেই সময় কোথায় পালাতে হবে। দক্ষিণ দিকে ছোটে। মাত্র দশবারো মাইল! ব্যাস!

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এত বড় দলের পাঁছ-ছয় জন নেতা হয়ে গেল। দক্ষিণ দিকটা ঠিক কোন দিকে এটা একটা বড় সমস্যা। প্রথমে মনে হলো সমুদ্র তীর ধরে গেলেই দক্ষিণ হবে না। কিন্তু দুপুর যখন গড়িয়ে এলো তখন বোঝা গেল ধারণাটা ভুল। বেলাভূমি নিজের খেয়ালে গেছে একেঁবেঁকে। দুপুরের জন্য কিছু খাবার ওরা এনেছিল। সেটা ভাগ করার সময় প্রায় মারামারির উপক্রম। যাই হোক খুব বেশি সময়ের বিষয় নয়। আর তো মাত্র কয়েক ঘণ্টার বিষয়। তারপরেই বার্মা।

কিন্তু সন্ধ্যার আগেও বার্মা সীমান্ত এলো না। সবার মনেই হতাশা। আবদুল্লা তখনও বলছে, বারো মাইল এখনও শেষ হয়নি। এদিকে খাবারও ওরা বিশেষ আনেনি। বিকেলে যখন চনমনে খিদে তখন ব্যারাকপুর রেজিমেন্টের তিন-চারজন কী একটা পেয়ারার মতো ফল খেয়েছিল। তার কিছুক্ষণ পর থেকেই ওরা বমি করতে শুরু করে। ওদের অসুস্থতার জন্যও পুরো দলের যাত্রার গতি কমে গেল। দুজনে মিলে এক একজনকে কাঁধে নিয়ে এগোতে লাগল।

সন্ধ্যায় ওরা সমুদ্রের তীরে একটা জায়গায় রাত কাটাবে ঠিক করল। প্রথমদিকে ওরা ভেবেছিল ওয়াকার হয়তো ওদের খোঁজে লোক পাঠাবে। কিন্তু দুপুর পর্যন্ত পেছনে কোনো বন্দুকের আওয়াজও শোনেনি ওরা।

কিন্তু কেন লোক পাঠালো না ওয়াকার? এর আগে যারা পালিয়েছিল কয়েকজনকে ধরে এনে ফাঁসিতেও ঝুলিয়েছিল শয়তানটা। আজ হয়তো এতজন একসঙ্গে পালিয়েছে বলে হাল ছেড়ে দিল। নাকি ওর মাথায় অন্য কিছু কাজ করছে? যাগ্গে যাক। জীবনে আর কখনো আর ওর সঙ্গে দেখাই তো হবে না।

সমুদ্রের তীরে যে জায়গায় ওরা রাত্রে থাকার ব্যবস্থা করল, সেখানে বিশাল উঁচু উঁচু সি-মহুয়ার গাছ। সেই মহীরুহের তলায় ঝরা পাতার উপরে শুয়ে পড়ল সবাই। রাতে বৃহৎ বনস্পতির মাথার ঝাকড়া পাতার মধ্যে থেকে দূরে কালো আকাশের মধ্যেকার একটি দুটি তারা। সারাদিনের ক্লান্তি, মুক্তির আনন্দ, আগামী ভবিষ্যতের অজানা হাতছানি— এইসব ভাবতে ভাবতে কখন ঘুম এসে গেল। সাপখোপ বিছেটিছের কথা একবার মনে এসেছিল বটে, তবে ঘুমের নেশায় আর সেই ভয় খুব বেশিক্ষণ মাথায় থাকার সুযোগ পেল না।

দুধনাথের ঘুম ভাঙল প্রবল চিৎকারে। ভোরের আলো সবেমাত্র ফুটছিল। ঘুমের চটকা কাটতেই বোঝা গেল কী সর্বনাশ হয়ে গেছে। জঙ্গলিদের একটা বিরাট দল তির-ধনুক নিয়ে আক্রমণ করেছে দুধনাথদের। সকলেই ঘুমিয়ে ছিল। ঘুমন্ত মানুষগুলোকে নির্বিচারে তির মারছে আক্রমণকারীরা। কে যেন দুধনাথের কাধে থাপ্পড় মেরে বলল, 'ভাগ! জলদি ভাগ যা।'

দৌড় দৌড়। জঙ্গলের গাছ, কাঁটায় পা ক্ষতবিক্ষত। কিন্তু থামলেই সাক্ষাৎ মৃত্যু। যে দলটা দুধনাথের সঙ্গে একই দিকে পালিয়েছিল তাতে মোট বত্রিশজন ছিল। অনেকক্ষণ পরে একটা জলাশয়ের পাশে ওরা থামল। একেবারে মুখ ডুবিয়ে জল খেল সকলে। কী শান্তি! ওরা মরেনি। বাঁচার কী ভীষণ আনন্দ! কিন্তু ওদের দুজনের তির লেগেছে। গভীরভাবে ক্ষত হয়ে গেছে ওদের। একজনের পায়ের থাইতে আর একজনের ঘাড়ের কাছে। ওরা প্রায় চলতেই পারছে না। অন্যরাও ভীষণ ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত। কিন্তু কোথায় খাদ্য? জলের সন্ধানে দলটা সমুদ্র থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছে। তাই কচ্ছপ বা অন্য সহজ খাবারের সন্ধান নেই। ওরা গোল হয়ে বসেছিল। সকলের মাথায় চিন্তা, এরপর কী হবে? ফিরে গেলে খাবার পাবে? কিন্তু দু-দিনের জন্য। তারপর ফাঁসিতে লটকে দেবে। এখনও যারা কেবল ফলমূল খাচ্ছে তাদের জন্য বিশেষ কিছু নেই। চেনা পরিচিত ফল এই জঙ্গলে প্রায় নেই

বললেই চলে। হঠাৎ পাশের জঙ্গলটা একটু নড়েচড়ে উঠতেই সকলে ভয়ে ছিটকে গেল। কিন্তু তখনই আসল ঘটনা বুঝে চার-পাঁচজন ঝোপটার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। একটা বড়সড় বন্য বরাহ। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে খালি হাতে কাবু করে ফেলল একটা বড় দাঁতাল বন্য বরাহকে।

বিকেলের দিকেই সাপ কামড়াল দুধনাথের একই ক্যান্টনমেন্টের রবিপ্রসাদকে। রবি গাছের তলায় পড়ে থাকা নারকোল কুড়িয়ে আনতে গিয়েছিল। পাকা কেউটের কামড়ে একটা মানুষ কীভাবে মারা যায়, চোখের সামনে সন্ধ্যা পর্যন্ত দেখল সবাই। রবির চোখের আলো প্রথমে ঝাপসা হয়ে এল। কথা জড়িয়ে জড়িয়ে বন্ধ হয়ে গেল। তারপর সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা আর তার সঙ্গে আপ্রাণ বাঁচার জন্য চিৎকার। দিনের আলো নিভে এলো।

রাত্রে ওরা ঠিক করল যে সারারাত পালা করে পাহারা দেবে। জঙ্গলিরা এলে যেন সবাইকে আগে থেকে সতর্ক করতে পারে। মাঝরাত পর্যন্ত পাহারা দিয়ে যখন শুতে এলো দুধনাথ তখন রবির নিথর শরীরের দিকে একবার অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকল। যাদের তির বিঁধেছিল, তারা এখনও গোঁগাচ্ছে। তবে গলার স্বর ক্ষীণ হয়ে আসছে।

ভোররাতে কারও ডাকে ঘুম ভেঙে গেল দুধনাথের। সবাই পালাচ্ছে। দুধনাথও উঠে ওদের সঙ্গে যোগ দিল। কে যেন বলল, 'যে তিনজন পড়ে রইল? চৌধুরী এখনও বেঁচে আছে...'

কালু ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, 'তুই থেকে যা। আমরা পরে এসে তোদের নিয়ে যাব।'

শুরু হলো আবার যাত্রা। অজানা পথে যাত্রা। ক্লান্ত শরীর, সারা শরীরে কাটা ছেঁড়া তবু বসলেই মৃত্যু। কিন্তু খুব বেশিদূর ওরা যেতে পারল না। একটু এগোতেই একেবারে সামনে এসে গেল জনা পঞ্চাশেক জঙ্গলি। আবার আক্রমণ। আবার মৃত্যু চিৎকার।

এবার কী মনে হতে দুধনাথ মাটিতে শুয়ে পড়ল। তারপর সাপের মতো বুকে হেঁটে সরে এলো অনেকটা দূরে। তারপর নিচু হয়ে ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়ে আসতে গিয়ে পড়ল একটা খাদের মধ্যে। খাদের মধ্যে নিজেকে একদম সেঁধিয়ে দিয়ে দেখতে থাকে দুধনাথ। নির্দয়ভাবে এক এক কুরে খুন করল তার সঙ্গীদের। তারপর জঙ্গলিরা তন্নতন্ন করে খুঁজল চারদিক। প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে ছিল দুধনাথ। একটু শব্দ, একবার সন্দেহ হলে আর নিস্তার নেই।

অনেকক্ষণ দেখে একদম নিশ্চিন্ত হয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল দলটা। তারপরেও মাথা তুলতে ভয় করছিল দুধনাথের। হঠাৎ খাদের মধ্যেই কে যেন তার পেটের কাছে খোঁচা মেরে বলল, 'উঠ, অব চলে গয়ে।'

দুধনাথ আঁতকে উঠে চিৎকার করে উঠে বলল— 'কৌন?'

লোকটা দুধনাথের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখ চেপে ধরল, 'চোপ, চিল্লাও মত।'

দুধনাথ এবার দেখল একজন নয়, দু-দুজন কয়েদি। অখিলেশ আর ভোগেন্দ্র। ওরাও একই সঙ্গে জেল থেকে পালিয়েছিল।

এবার তিনজনের পথ চলা। এই ক'দিনে জঙ্গলে বাঁচার বেশ কিছু কায়দা রক্ত করে নিয়েছে দুধনাথরা। খাওয়ারও বেশ কিছু জিনিস চিনে গেছে তারা। বোধহয় দিন তিনেক ওরা একসঙ্গে ছিল। ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসছে বার্মাতে পৌঁছানোর স্বপ্ন। কোনো দিকেই কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

সেই দিনটাও শুরু হয়েছিল ভালোভাবেই। সকালবেলা ওরা পেট ভরে খেয়েছিল কুলের মতো খুব মিষ্টি ফল। পাশে একটা মিষ্টি জলের ঝরনা। পেট ভরে জল পান করল তিনজনে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটু তন্দ্রা মতো এসে গিয়েছিল। এমন সময়ই সেই অঘটন ঘটল।

হঠাৎ দেখল একটা বড় জঙ্গলিদের দল এদিকে এগিয়ে আসছে। তিনজন পরস্পর পরস্পরকে সতর্ক করার আগেই একেবারে পঙ্গপালের মতো ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একেবারে বুকে তির এসে বিঁধল ভোগেন্দ্রর। অখিলেশ বর্শার আঘাতে আর্তনাদ করে উঠল। দুধনাথ দেখছে একটা বড় দল তার দিকে ধেয়ে আসছে। তাতে ছেলে মেয়ে সবাই আছে। তির ছুটে এলো দুধনাথের দিকেও, পাঁজরের হাড় ছুঁয়ে গেল। লুটিয়ে পড়ল দুধনাথ। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা তির বিঁধল পায়ে। দুধনাথের শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু ও ওদের কথা শুনতে পাচ্ছে।

আগেও লক্ষ্য করেছিল যে বুনোরা তির নষ্ট করে না। তির মারার পরে মৃত শিকারের গা থেকে তির খুলে আবার পিঠের তূণে রেখে দেয়। দুধনাথের কাছে এগিয়ে আসছে পায়ের শব্দ।

দুধনাথের পায়ের তির টেনে খোলার সময় লোকটা বুঝতে পারল ও বেঁচে আছে। বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই ও আবার তির তাক করল দুধনাথের দিকে।

আকুল দুধনাথ মরিয়া হয়ে আর্ত চিৎকার করে উঠল, 'নেহী! মত মারিয়ে।' দুটো হাত জোড় করে কাকুতি মিনতি করতে থাকে। কিন্তু সামনে সাক্ষাৎ মৃত্যু। ধনুকের ছিলে ক্রমে পিছিয়ে যাচ্ছে। যে কোনো মুহূর্তে এগিয়ে আসবে মৃত্যু।

হঠাৎ এক নারী কণ্ঠ ঝংকার দিয়ে উঠল, 'বোনীল, বোনীল' (শান্ত হও, শান্ত হও।)।

মেয়েটা ছুটে এসে ঘাতক পুরুষের হাত চেপে ধরল।

অষ্টম দৃশ্য

আজ সকালে উঠেই, লিপার মনটা খুশিতে ভরে গিয়েছিল। ঝরনার জলে মুখ ধুয়ে উপরে তাকিয়েই দেখে দেবী দাঁড়িয়ে। একদম পেটের কাছে এত্তোবড় একটা ডিমের থলি নিয়ে যেন আট হাত দিয়ে ওকে আশীর্বাদ করার জন্যই দাঁড়িয়ে আছেন। ওর চেনা বুলবুলটা তখনই ওর গালের কাছ থেকে উড়ে গেল। যেন বলে গেল, 'কী গো, খুব আনন্দ দেখছি!'

লিপা প্রায় নাচতে নাচতে ঘরে ফিরে এলো। মা সকালে ওর জন্য একটু সিনি রেখেছিল। ও সিনি খেতে খুব ভালোবাসে না, তবু মা বললে খেতেই হয়।

বাটি শেষ হতে না হতেই বাইরে হাঁকডাক শুরু হয়ে গেল। আজ ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে টেরো শিকারে যাওয়ার কথা। লিপার বর্শার হাত খুব ভালো। বিশ হাত দূরে ছুটন্ত কোনো শুয়োরকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে পারে লিপা।

লিপা এক চুমুক জল পান করেই বাইরে ছুটে বের হলো। কুড়ি-বাইশ জনের দল চলল সমুদ্রের দিকে।

দ্বীপে জীবন কত শান্তির ছিল। দক্ষিণের অসভ্য জারোয়ারা মাঝেমধ্যে এদিকে এসে পড়ত ঠিক, তবে সেরোবুলের ভয়ংকর মানুষরা ওদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারত না কখনোই। সেরোবুলে না আছে ভালো তির, আর বর্শাও নেই। শুধু টং-এর তৈরি অস্ত্রই ওরা ব্যবহার করে।

লিপার ঠাকুমা বলেন, তখন মকরশা দেবীও অনেক কাছে ছিলেন। ওদের খুব ভালোবাসতেন। কিন্তু ওদের সময়ই যে কেন এমন বিপদ হলো? বাইরের থেকে কত দস্যু এলো। ওরা জঙ্গল কাটছে, এখানকার লোকেদের মারছে, আর ওদের কাছে আগুন বের করা তির আছে।

প্রতিদিন সকাল যেন নতুন করে ভয় নিয়ে আসে। আজ আবার কোন এলাকা দখল করে নিল দস্যুরা। এই সবক'টা আগন্তুককে না মারা পর্যন্ত লিপাদের শান্তি নেই।

টেরো, মানে কচ্ছপই ওদের প্রধান খাদ্য। এর সঙ্গে ফলমূলও খায়। শুয়রের মাংস, নোনা জলের মাছ, মিষ্টি জলের মাছ। বোল বলে মিষ্টি জলের মাছ সবারই খুব প্রিয়।

লিপাদের দলটা ছোটখাট পশুপাখি শিকার করতে করতে হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে সমুদ্রের দিকে যাচ্ছিল। আজ দু-তিন দিনের মতো টেরো শিকার করে আনতে হবে। কিন্তু কিছু দূর এগোতেই দেখল, তিন তিনটে দস্যু শুয়ে আছে।

দেখা মাত্রই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। তিরে ঝাঁঝরা করে দিল তিনটেকে। কিন্তু বীরা একটার পা থেকে তির তোলার সময়ই দস্যুটা কেঁদে কঁকিয়ে উঠল। বীরা ওর চোখ লক্ষ্য করে তির মারছে, কিন্তু তখনই লিপার মনটা কেমন করে উঠল।

লিপা ঝাঁপিয়ে পড়ে বাধা দিল। লিপা এই দলের দলপতির মেয়ে। শিকারে দলপতি নেই, তাই লিপার কথাই শেষ কথা।

কিন্তু কী করা হবে দস্যুটাকে?

একটু ভেবে লিপা বলল, নিয়ে চলো সঙ্গে করে। টং মানে গাছের ডালে বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে আসা হলো লোকটাকে।

সমাজে এই প্রথম কোনো জ্যান্ত দস্যুকে ঢোকানো হলো। মাকরশা দেবী দেখে পাতার আড়ালে লুকিয়ে গেলেন।

নবম দৃশ্য

লোকটা বাঁচবে কিনা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ওকে এখানে নিয়ে আসার পরেও আর এক প্রস্থ অশান্তি হয়েছে। লিপার বাবা দলের সর্দার সবচেয়ে প্রথমে তার কাছে এসে নালিশ জানালো দলের ছেলেরা। কিন্তু লিপাকে সবাই চেনে। ওর জেদের কথাও জানে। তাছাড়া লিপার গুণে ওদের দলের তো বটেই অন্য দ্বীপের বো জনজাতিরাও মুগ্ধ।

লিপা বুড়ো ওলার কাছ থেকে গাছ গাছড়ার গুণের কথা শুনেছে। তারপর ও নিজের ক্ষমতায়, আর অধ্যবসায়ে একটু একটু করে আয়ত্ত করেছে ওই মহৌষধের বিজ্ঞান। আজ লিপার হাত মানে মাকরশা দেবীর আশীর্বাদ। দূর দূর দ্বীপ থেকেও অসুস্থ মানুষকে নিয়ে আসে। লিপা এক বছরে বাচ্চা থেকে সত্তর বছরের বৃদ্ধকে একইভাবে সেবা করে চিকিৎসা করে।

এই দস্যুটার শরীরের অনেক জায়গায় গভীর ক্ষত হয়ে গেছে। পাঁজরের কাছে তিরটা যে কারণেই হোক পিছলে গেছে ওটা সেরে যাবে। কিন্তু কোমরের নীচে যে ক্ষতটা হয়েছে সেটা অত্যন্ত গভীর। সেটা নিয়েই চিন্তা।

এই ধরনের ক্ষতের জন্য ওলা বুড়ো একটা গাছের শিকড়ের কথা বলেছিল। কিন্তু সেটা পাওয়া যায় বোয়া দ্বীপে। ওখানে সমুদ্রের ধারে অনেক বেটাফো। সেই বেটাফো মানে ঝোপঝাড়ের মধ্যেই আছে এই মৃতসঞ্জীবনী গাছ। যে কোনো ক্ষত কয়েকদিনে শুকিয়ে দেয়।

আজ তাই সকাল থেকেই লিপা ঠুঙ্গি নিয়ে বের হয়েছে। যেতে হবে বোয়া দ্বীপে। অনেক সময় লাগবে।

সত্যি খুব ভাগ্য ভালো লিপার। সারাদিনের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। যে গাছের শিকড় খুঁজতে গিয়েছিল, পাওয়া গেছে সেটা। সেই সঙ্গে আরও কিছু গাছের লতাগুল্মও নিয়ে এসেছে ও। সারা দিনের পরিশ্রমের শেষে যখন ও ফিরে এলো, তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা।

দস্যুটাকে যে বিছানায় শোয়ানো ছিল সেখানে গিয়ে লিপা ডাক দিল। লোকটা কোনো সাড়াশব্দ করল না। বেশ জোরে জোরে চিৎকার করে ডাকল লিপা। কোনো উত্তর নেই।

লিপার শিরদাড়া দিয়ে যেন একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল। তবে কী? ও এবার একটু একটু করে এগিয়ে এলো, কপালে হাত দিয়ে দেখল, বেঁচে আছে। কিন্তু গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে।

সেই রাতটা লিপার জীবনে একটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ও প্রথমে মাথায় জল দিয়ে অনেকক্ষণ ধুইয়ে দিল। তারপর সেই মহৌষধি বেটে অতি যত্নে প্রলেপ দিয়ে দিল।

রাতের প্রহরে প্রহরে ওষুধ তৈরি করে মুখ হাঁ করিয়ে খাওয়াতে থাকে লোকটাকে। ধীরে ধীরে জ্বর কমে গেল। বাইরে চাঁদ উঠেছে। সন্ধ্যায় একপশলা বৃষ্টিও হয়ে গেছে। চাঁদের আলোয় ভিজে জঙ্গল, প্রকৃতি, বিশ্বচরাচর।

লোকটা হঠাৎ কী যেন বলে উঠল। 'পানি, পানি'। লিপা ওর কাছে গিয়ে বোঝার চেষ্টা করল। তারপর বুঝতে পারল ও জল চাইছে। কিন্তু এই ওষুধের পরে তো জল দেওয়া যাবে না।

তাহলে উপায়? অনেক ভেবে লিপা একটা লম্বা পাতার বোঁটা নিয়ে এলো। তারপর জলে ডুবিয়ে ডুবিয়ে এক ফোঁটা এক ফোঁটা করে বেশ কিছুটা পরে পরে মুখে দিতে থাকল। তৃষ্ণার্ত মানুষটা একটু পরে আর সহ্য করতে না পেরে, লিপার হাতটা ধরে ফেলল। লিপা লোকটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। খুব নরম স্বরে কিছু বলল। লোকটা কিছু বুঝল না।

লিপা এবার হাতের ইশারায় জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম কী?'

দস্যু অস্ফুটে উত্তর দিল, 'দুধনাথ।'

বাইরে একটু একটু করে আলো ফুটছে। পাখিরা জানিয়ে দিয়ে গেল, সকাল হয়ে গেছে। লিপার চোখও জড়িয়ে এসেছিল বসে থেকে। পাখির ডাকে চোখ খুলল। লোকটা ঘুমিয়ে পড়েছে। গায়ে হাত দিয়ে দেখল জ্বর নেই।

লিপা ধীরে ধীরে বাইরে বের হয়ে এলো। ধীর পায়ে এগিয়ে এলো সেই ঝরনাটার ধারে। এর পাশের প্রতিটা বড় গাছ, ছোট ঝোপ, কাঠবেড়ালি, বুলবুল পাখি— সবাই যেন ওকে কিছু বলতে চাইছে। ও পাথরের খাঁজ বেয়ে নীচে নেমে এলো। পায়ের নীচে কুলকুল করে বইছে জলের ধারা। লিপা নীচু হয়ে বসে, একহাতে অঞ্জলি ভরে জল নিয়ে মাকরশা দেবীকে স্মরণ করে মনে মনে বলল, 'দুধনাথ যেন বেঁচে যায়।' তারপর হাতের জলটা খেয়ে নিল।

সকালে বাসি মুখে তিনবার কোনো মনের ইচ্ছা নিয়ে ঝরনার জল খেলে সেটা পূর্ণ হয়। লিপা তিন অঞ্জলি জল পান করে উপরে উঠে এলো।

একটা নীল পাখি ওর কাঁধে এসে বসল। আবার 'পিক' করে শব্দ করে উড়েও গেল।

এটা আবার কী পাখি! আগে তো কখনো দেখেনি লিপা!

দশম দৃশ্য

লিপার বিয়ের ঘটনায় বো সম্প্রদায়ের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। এই প্রথম কোনো বো মেয়ে একজন বিদেশিকে বিয়ে করল। দলপতি পুতিহার উপরও কম চাপ ছিল না। তবে দুধনাথ ছেলেটাও বেশ ভালো। বো উপজাতির লোকেরা কখনো এক জায়গায় থাকে না। ওরা এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলে, এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে ঘুরে বেড়ায়। দুধনাথও একটু সুস্থ হওয়ার পর থেকে ঘুরে বেড়াতো লাগল লিপাদের দলের সঙ্গে। দুধনাথের পরনের জামা-কাপড় ছিঁড়ে পর্দাফাই হয়ে গিয়েছিল। একদিন দলের ছেলেরা জোর করে সেই ছেঁড়া জামা-কাপড় ওর গা থেকে খুলে নিল। সেদিন থেকে বো ছেলেদের সঙ্গে ওর বন্ধু দৃঢ় হয়ে গেল। দুধনাথও ওদের সঙ্গে একইভাবে ঘুরতে লাগল।

তবে দলপতি পুতিহার সম্ভবত দুধনাথের হাতে কোনো অস্ত্র দিতে বারণ করেছিল। তাই একদিন দুধনাথ ধনুক ধরে একটু নাড়াচাড়া করতেই দু'জন এসে ওর হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিল। পুতিহার হয়তো দস্যুদের বংশের কাউকে আশ্রয় দিলেও আসন্ন বিপদের কথা ভেবেছিল। তাই অস্ত্রে হাত দেওয়া মানা ছিল দুধনাথের।

লিপা যেদিন বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিল, শুনেই পুতিহার রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে গিয়েছিল। অসম্ভব, এটা কিছুতেই হতে পারে না। খবরটা দ্রুত ছড়িয়ে গেল। দু'জন বো ছেলে দুধনাথকে ধরে মারধর করাও শুরু করেছিল। কিন্তু এখন দুধনাথের বন্ধু হয়েছে তারা বেশ কিছু। তারা দুধনাথকে বাঁচিয়ে সমুদ্রের ধারে নিয়ে গেল।

শেষপর্যন্ত ঠিক হলো বিয়ে হবে লিপার, দুধনাথের সঙ্গেই হবে। বো সমাজের প্রথামতো শুরু হলো তোড়জোড়। হাজার নিয়ম-কানুন।

ছেলে আর মেয়ে দু'জনকেই সাতদিনের ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে। যেতে হবে নির্জন জায়গায়। সামান্য ফল খেতে পারবে। কিন্তু বো সমাজের আসল খাবার টেরো মানে কচ্ছপ খেতে পারবে না এই সাতদিন।

বিয়ের অনুষ্ঠানে পুতিহার আর তার স্ত্রী খুব নাচল, তারপর খুব কাঁদল। মেয়েকে বিয়ের পরে দেখভাল করার জন্য নিমা নামে আর একটি মেয়েকেও সঙ্গে দিলেন বো সর্দার।

খাওয়ার ব্যবস্থাও হলো এলাহি। চারজন জোয়ান ছেলে মাথায় করে নিয়ে এলো ইয়া বড়ো বড়ো টেরো। উল্টে থাকা টেরোগুলো তাদের নৌকোর হালের মতো চারটে পা নাড়াচ্ছে ফটাস ফটাস করে। বো উপজাতির সকলে খেয়ে, নেচে, গেয়ে ঘরে চলে গেল।

সন্ধ্যার পরে নিমা ওদের বাসর সাজিয়ে দিল। দুধনাথ এখন সহজে কথা বলতে পারে লিপার সঙ্গে। বরং লিপাদের ভাষাতেই অত শব্দ নেই। তবে লিপার ছটফটে চলন আর তীক্ষ্ণ চোখের ভাষা অর্ধেক কথাই বলে দেয়।

লিপা বলেই ফেলল। ও খুব ভাগ্যবতী। ওর বর সভ্য সমাজের থেকে এসেছে। কত সুন্দর। কত আদব কায়দা জানে ওরা। লিপা সারা জীবন ধরে শিখবে ওদের জীবনচর্যা। লিপা দুধনাথের যোগ্য বউ হয়ে উঠবে। মাকরশা দেবীর নামে দিব্যি করে কথা দিল লিপা।

দুধনাথেরও কী মনে হলো সেদিন, সব কথা বলল। ওদের পরিবার, গ্রাম, বড় হওয়া। সবশেষে বলল, ভারতবর্ষের কথা। একটা দেশ। দেশ কী জিনিস সেটা অবশ্য অনেক চেষ্টা করেও লিপাকে বোঝানো গেল না। কিন্তু ইংরেজ বোঝানো গেল। ইংরেজের আক্রমণ শুনে লিপার চোখ বড় বড় হয়ে উঠল। তারপর সিপাহি বিদ্রোহ, ওদের কালাপানি সাজা, দুধনাথের কষ্ট, লিপার চোখ ছল ছল করে উঠল। গায়ে হাত রেখে একটা দীর্ঘশ্বাস

ছাড়ল লিপা।

হঠাৎ নিমা মুখ ঢুকিয়ে বলল, 'তোমাদের কিছু লাগবে?'

অপ্রস্তুত দুধনাথ একটু ছিটকে গেল। লিপা কিন্তু শান্ত, ধীরভাবে বলল, 'না রে, কিছু লাগবে না। দরকার হলে তোকে ডাকব।'

নিমা খিলখিল করে হেসে চলে গেল।

একাদশ দৃশ্য

সমুদ্রের ধারে একা বসে আছে দুধনাথ। এই জঙ্গলের জীবন এখন তার অসহ্য লাগছে। সামনে বেশ কিছুটা অংশে সমুদ্র স্থলভাগের ভেতরে ঢুকে এসেছে। সেখানে ভর্তি হয়ে আছে কাঁকড়া গাছের জঙ্গল। সেই ম্যানগ্রোভের দিকে তাকিয়ে ছোট ছোট নুড়ি ছুঁড়ছে দুধনাথ। সত্যি আর ভালো লাগছে না।

লিপার গর্ভে সন্তান আসছে শুনে লিপা আনন্দে হেসে, নেচে, কেঁদে একশা। সেদিন থেকেই কেন যেন দুধনাথের ভীষণভাবে অপছন্দ হতে থাকে লিপাকে। গ্রামে কারও সন্তান হবে, কেউ বাবা হবে খবর পেলে লোকেরা কত আনন্দ পায়। মিঠাই খাওয়ায়। মিঠাই? ভাবতেই হাসি পেল দুধনাথের। এখানে তো সব কিছুতেই টেরো। কচ্ছপ। কত রকমের কচ্ছপ। বমি এসে যায়। নিজে বাবা হবে শুনে যেন বিরক্ত লাগছে দুধনাথের।

দুধনাথ যত লিপাকে উপেক্ষা করতে থাকে, বউ যেন তত বেশি করে ওকে ভালোবাসতে থাকে। ওর খাওয়া, সবরকম সুবিধা, যেন কোনো ত্রুটি না হয়। আর প্রতি মুহূর্তে আপশোস করে, সভ্য সমাজের মতো হয়ে উঠতে পারল না লিপা। কিন্তু লিপা নিশ্চয়ই একদিন ওর যোগ্য বউ হয়ে উঠবে। ঠিক হয়ে উঠবে।

কিন্তু এর মধ্যে আরেকটা অশান্তি হয়েছে। নিমা ওই দম্পতির সঙ্গে সঙ্গেই থাকত। মনপ্রাণ দিয়ে ওদের সেবা করত। কিন্তু লিপা পোয়াতি হওয়ার পরে নিমার সঙ্গে দুধনাথের ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। নিমা ঠিক চাইছিল না এইসব। কিন্তু দুধনাথ-লিপাকে ও দেবতাদের মতোই ভক্তি করে। তাই ধীরে ধীরে দুধনাথ মানিয়ে নেয় নিমাকে। ওদের সম্পর্কটাও অনেকটা এগিয়ে যায়।

সেদিন লিপার শরীরটা খুব খারাপ লাগছিল। এইসময় বোল বলে একটা মিষ্টি জলের মাছের ঝোল খাওয়ায় বো উপজাতির মেয়েদের। কিন্তু বোল মাছটা রান্না করতে গিয়ে একটু নষ্ট করে ফেলেছিল নিমা। হয়তো সেই কারণেই শরীরটা খুব খারাপ লাগছে আজ বিকেল থেকেই।

'নিমা। নিই-ই মা-আ...' অনেকক্ষণ ধরে ডকেছে। উত্তর না পেয়ে ওই কষ্টের মধ্যেই ও উঠে এসে খুঁজতে থাকে নিমাকে। তখনই ওদের ঘনিষ্ঠ অবস্থায় ধরে ফেলে লিপা।

সেই রাতটা কেবল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। দুধনাথকে কিচ্ছুটি বলেনি। দুধনাথই অনেক পরে বোঝাতে এসেছিল, 'বিয়ের সময় তো, তোমার সঙ্গেই নিমাকে দিয়েছিল... তাই আমি ভেবেছিলাম...।'

আগুনে ঘিল পড়ল। লিপা একবার ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'দূর হয়ে যাও। চলে যাও আমার সামনে থেকে।'

দুধনাথ দাঁড়িয়ে আছে। লিপা এরপর চোখ মুছে কেটে কেটে বলল, 'এটাই বুঝি তোমাদের সমাজের নিয়ম? সবাইকেই মারো ফোং মনে করো। এটাই কি সভ্যতা? আমরা যা করি তাই বলি। সাহস করে বলি।'

আবার ডুকরে ওঠে লিপা। 'নিমাকে তো আমাদের সেবার জন্য দিয়েছিল। ও আমাকে কত ভালোবাসে, আমার বোন, আমার মেয়ে। ওর কতবড় ক্ষতি করে দিলাম আমি। আমার সঙ্গে কোনো বো ছেলের বিয়ে হলে আমি এত পাপ করতাম না। আমায় ক্ষমা করো। ক্ষমা করো দেবী। মাকরশা দেবী।'

তারপর থেকে দুধনাথের সঙ্গে লিপার সম্পর্ক খুব শীতল হয়ে গেছে। খুব প্রয়োজন হলেই লিপা কথা বলে।

অনেকক্ষণ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিল দুধনাথ। হঠাৎ খেয়াল করল একটা বড়সড় কালো মাকড়সা আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে একেবারে কাছে এসে গেছে। দুধনাথ প্রাণীটাকে মন দিয়ে দেখল। তারপর হাতের পাথরের টুকরোটা দিয়ে সজোরে আঘাত করল। থেঁতলে গেল ছোট্ট প্রাণীটা।

দুধনাথ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল। অনেক পুরনো রাগ, ক্ষোভ একসঙ্গে জমে থাকলে যেমন স্বর বের হয়, অস্ফুটে বলল, 'দেবী, ফুঃ!'

হঠাৎ লক্ষ্য করল সমুদ্রতীরে খুব গোলমাল হচ্ছে। পাহাড়ের উপর থেকে দেখল বেশ কতগুলো ডুঙ্গিতে করে বো জনজাতির প্রচুর মানুষ ওদের দ্বীপে আসছে। সবাই উত্তেজিত। তির, ধনুক, বল্লম, বর্শা, সড়কি, লাঠি নিয়ে কেমন যেন যুদ্ধে যাওয়ার সাজে আসছে।

সেদিন বিকেলের মধ্যে প্রচুর উপজাতি মানুষ এসে জড়ো হল ওই দ্বীপে। দুধনাথ দেখল একটা বড় সভা আয়োজিত হচ্ছে। তখন দুপুর গড়িয়ে বিকাল। দুধনাথ চোরের মতো চুপিচুপি গিয়ে দাঁড়ালো পিছনে।

এখন এক একটি দলের প্রধানরা বক্তব্য রাখছে। সকলের রাগ ওই সাদা চামড়ার দস্যুগুলোর ওপর। একজন তো বুঝিয়ে বলল, দ্বীপবাসীরা ভুল করে শত শত বাদামি মানুষদের মেরেছে। ওই বাদামি মানুষদের ওই সাদাগুলো বন্দি করে রেখেছে। এর প্রতিকার করতে হবে। প্রতিশোধ নিতে হবে সাদাদের বিরুদ্ধে।

অনেক আলোচনার পর ঠিক হলো, ওই সাদাদের মেরে

বাদামি বন্দিদের মুক্ত করা হবে। তারপর ওদের সিদ্ধান্ত নিতে দেওয়া হবে যে ওরা দ্বীপে থাকবে না চলে যাবে। দ্বীপে থাকতে চাইলে থাকতে দেওয়া হবে। তবে উপজাতিদের বশত্য স্বীকার করতে হবে।

কিন্তু ওরা সাদাদের সঙ্গে এঁটে উঠবে কীভাবে! সাদাদের কাছে বন্দুক আছে। আগুন, গুলি এসবের সঙ্গে তির-ধনুক নিয়ে পারা যাবে না।

তবে উপায়? উপায় একটা আছে বটে। কিন্তু খুব সাবধানে, সতর্কতার সঙ্গে করতে হবে। মাঝরাত্রে আক্রমণ করা হবে রোজ আইল্যান্ডে। যেখানে সাদা চামড়ার দস্যুগুলো থাকে। যখন ওরা ঘুমিয়ে থাকবে তখনই নিকেশ করা হবে ওদের। জেগে উঠে বন্দুক দাগার আগেই সব খেল খতম।

ঠিক হলো একেবারে সোরাবুল মানে উত্তরের জারোয়াদের ভয়ংকর বনের থেকে একেবারে দক্ষিণ পর্যন্ত যত জায়গায় ওদের উপজাতির মানুষ আছে খবর দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে লাগোয়া দ্বীপগুলোতেও। সব্বাই এক হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া হবে। জয় নিশ্চিত!

দুধনাথ পেছন থেকে নিঃশব্দে সরে এলো। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। পায়ের কাছে গর্জন মুখর সমুদ্র। উপরে তারা ভরা আকাশ। সমুদ্রের ওপারে দুধনাথের জেলা, তার গ্রাম, তাদের বাড়ি।

দুধনাথ তো আসলে সভ্য মানুষ। ইংরেজ আরও সভ্য। সভ্য সমাজের এতবড় ক্ষতির সময় তার কোনো ভূমিকা থাকবে না?

দিন দুয়েকের খাবার সঙ্গে নিল দুধনাথ।

মাথাটা ছোট থেকেই খুব খোলতাই দুধনাথের। এই কয়েক মাসে এই দ্বীপটা কয়েকবার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ঘোরা হয়ে গেছে। সেইসঙ্গে অনেকগুলো কাছাকাছি দ্বীপেও।

ওর অনুমান মতো দিন দুয়েকের পথ। সভ্য সমাজের ত্রাণ করার ভার নিজের মাথায় নিয়ে তারা ভরা আকাশের নীচে বনের পথে এগিয়ে চলল সে।

অন্ধকার আকাশেরও একটা আলো থাকে। তারাই সেই আলোয় উত্তর দিক লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেছে কয়েদি ওরফে দুধনাথ তেওয়ারি।

দ্বাদশ দৃশ্য

দরজায় দুবার ঠোকা দিয়ে অফিস ঘরের ভেতরে ঢুকে এল আন্দ্রেয়া। একটা জার্নালে চোখ বোলাচ্ছিল সুপ্রাজ। আন্দ্রেয়াকে দেখে চশমাটা খুলে টেবিলে রাখল।

'হঠাৎ এই অসময়ে?' হেসে জিজ্ঞাসা করল।

আন্দ্রেয়া একটুও হাসল না। একটু সময় চুপ করে থেকে বলল, 'তোমার আজ সন্ধ্যায় কোথাও যাওয়া আছে?'

'না। কেন?'

'আজ একজনের বাড়িতে চা খেতে যাব।'

'চা খেতে? কোথায়? কার বাড়িতে?'

'বোলা, গ্রেট আন্দামানিজ মেয়ে। পুলিশে চাকরি করে। আজ যেতে বলেছে।'

সুপ্রাজ আকাশ থেকে পড়ল। 'তুমি গ্রেট আন্দামানিজ মেয়ে পেলে কোথা থেকে? আর তোমাকে নেমতন্নও করল?'

আন্দ্রেয়া একটু রহস্যময় হাসি হাসল। তারপর একেবারে প্রাণ খুলে হেসে বলল, 'অর্চনা হর্ষে। পোর্ট ব্লেয়ার বিবেকানন্দ কেন্দ্র স্কুলের দিদিমণি। উনিই ব্যবস্থা করেছেন।'

সুপ্রাজ চোখ বড় বড় করে বলল, 'সত্যি ইংরেজদের ক্ষমতা আছে, মানতেই হবে।'

আন্দ্রেয়া একটু লজ্জা পেল, 'আরে না, না। বাসে আলাপ। অনেকদিন থেকেই। বিবেকানন্দ কেন্দ্রের স্কুলে কয়েকজন গ্রেট আন্দামানিজ পড়ে। অর্চনাদির ফোন নম্বর ছিল। ওনাকে বললাম, ব্যাস, ব্যবস্থা হয়ে গেল।'

তারপর একটু আদুরে স্বরে বলল, 'এক কাপ কফি হবে না স্যার? সরি ডাডা।'

কফি আসার পরে আন্দ্রেয়া মগটাকে নিয়ে একবার ঠোঁটে ছোঁয়াল। তারপর সিপ না নিয়েই আবার টেবিলে রাখল। 'জানো সুপ্রাজ, একটা জিনিস আমার মন থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না।'

কফিতে গভীর চুমুক দিয়ে সুপ্রাজ বলল, 'কী সেটা?'

'দুধনাথ চলে যাবার পরে লিপা কী ভাবল? কী কী হতে পারে?'

সুপ্রাজ একটু সময় নিয়ে বলল, 'দেখ, আবেদিনের যুদ্ধে গ্রেট আন্দামানিজ, মূলত বো উপজাতির বেশিরভাগ অংশই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে প্রায় শেষ হয়ে গেল আন্দামানের সবচেয়ে বড় জনগোষ্ঠী।'

'আর দুধনাথ চলে যাওয়ার কয়েকদিন পরেই তো সেই যুদ্ধ হয়েছিল। লিপা ভাবতেই পারে যে দুধনাথও যুদ্ধে গিয়েছিল। আর অন্যদের সঙ্গে সেও মারা গেছে।

আন্দ্রেয়া মুখে একটা চুক্ চুক্ শব্দ করল, কফির মগে একটা চুমুক দিল। আনমনে কিছু বলল। তারপর বেশ কিছুটা সময় নিয়ে বলল, 'না, আমার তা মনে হয় না। দুধনাথ চলে যাওয়ার প্রায় এক সপ্তাহ পরে অ্যাবোডিনের যুদ্ধ হয়েছিল। এই এক সপ্তাহ লিপা অবশ্যই দুধনাথকে খুঁজেছে। খুঁজে খুঁজে কোনো হদিশ মেলেনি। অ্যাবোডিনের যুদ্ধে যেভাবে ইংরেজরা সতর্ক ছিল, তাতে যে কারও সন্দেহ হবেই যে কেউ আগে থেকে খবর দিয়ে দিয়েছিল। আর লিপার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ের পক্ষে কার্যকারণ বোঝাটাও

খুব কঠিন কিছু হবে বলে তোমার মনে হয়?'

বেশ কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে থাকে। একটা পিন পড়লেও শোনা যাবে।

আন্দ্রেয়া নিস্তব্ধতা ভেঙে বলল, 'ভেবে দেখ, একটা মেয়ের মনে কী হবে। যাকে ভালোবেসে প্রাণ দান করল, যাকে বিয়ে করে নিজের সবটুকু দিল, যাকে সভ্য মানুষ বলে দেবতার আসনে বসিয়েছিল, সেই মানুষটা তার নিজের উপজাতির সঙ্গে এরকম নিষ্ঠুর আচরণ করল। ওর ভালোবাসার এই প্রতিদান পেল মেয়েটা!'

বো সমাজে সেদিন কী ভীষণ হাহাকার। কারও স্বামী মারা গেছে, কারও সন্তান, কারও ভাই, কারও বা স্বামী-সন্তান-ভাই সবাই মারা গেছে। আর এতকিছুর জন্য দায়ী যে তার সন্তানই নিজের গর্ভে ধারণ করে সকলের সামনে ঘুরছে লিপা। সেই লজ্জায়, ঘৃণায় তবে কী লিপা আত্মহত্যা করেছিল?

অফিসের সময় শেষ। সুপ্রাজ গাড়ি বের করল। আন্দ্রেয়া গাড়িতে বসে বলল, 'জঙ্গলিঘাটের দিকে যাব।'

গাড়ি এগিয়ে চলল জঙ্গলিঘাটের দিকে। আন্দ্রেয়া একটা বড় ঝিনুক হাতে নিয়ে মন দিয়ে দেখছিল। সেই ছোট্ট ঝিনুকটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সত্যি বলতে কি জানো, লিপা যদি আত্মহত্যা করে থাকে, তবেই বেঁচে গিয়েছিল। কারণ এর পরে গ্রেট আন্দামানিজদের পুরুষের সংখ্যা ভীষণভাবে কমে যায়। আর পুরুষহীন সমাজে মেয়েদের উপর আসে প্রচণ্ড অত্যাচার। ওই মেয়েদের এই জনহীন দ্বীপে যৌনদাসী হিসাবে ব্যবহার শুরু হয়। এর ফলে সিফিলিস আর হামে কাতারে কাতারে গ্রেট আন্দামানিজ মহিলার মৃত্যু ঘটে। সেই অবর্ণনীয় অত্যাচারের শিকার হয়েছিল হয়তো লিপা!

বিবেকানন্দ কেন্দ্র স্কুলটা একেবারে পোর্ট ব্লেয়ার এয়ারপোর্ট গেটের উল্টোদিকে। সেখানকার দিদিমণি অর্চনা হর্ষেকে গাড়িতে তুলে নেওয়া হলো।

মিনিট দশেকের মধ্যে পৌঁছে গেল, ওই গ্রেট আন্দামানিজ পরিবারে। অর্চনা দিদিমণি বেল বাজাতেই দরজা খুলে দিলেন এক ভদ্রমহিলা। দেখেই বোঝা গেল উনি আদিম জনজাতির নন। আন্দ্রেয়া যেন একটু হতাশই হলো। ও কিছু বলতে যাচ্ছিল, অর্চনা ওকে থামিয়ে বললেন, 'ও সুনেত্রা, বোনার বৌদি। সুনেত্রা ঝাড়খণ্ডের মেয়ে। এ বাড়ির বউ।'

'আর বোনা? ও নেই বাড়িতে?' আন্দ্রেয়ার গলায় উৎকণ্ঠা।

'আছে, আছে। সাজছে একটু। মেমসাহেব দেখতে আসবে শুনেছে।'

একটু পরে হলুদ সালোয়ার কামিজে এল আন্দমান পুলিশের কন্সটেবল বোনা।

একেবারে পেটানো চেহারা। ছোট করে কাটা চুল। কিন্তু সুপ্রাজ অবাক হয়ে দেখছিল একটা অদ্ভুত মিষ্টি আদুরে ভাব আছে। এসে বসল সোফায়, আন্দ্রেয়ার চোখে বিস্ময়। ওকেই প্রথমে বলল, 'নমস্তে।'

মেয়েটি অবশ্য ভীষণ লাজুক। দশটা কথায় একটা কথা বলে। তবে ওর কথার ঘাটতি পুসিয়ে দিচ্ছিল ওর বৌদি সুনেত্রা। সুনেত্রা দেখা গেল শ্বশুরবাড়ির এনপাইক্লোপিডিয়া। বোনা অ্যাবেদিন যুদ্ধের নামটুকুই খালি শুনেছে। সুনেত্রা প্রায় সবটাই জানে তবে লিপার কথা জানে না।

কথায় কথায় একটু দেরিই হয়ে গেল। সুনেত্রা বলল, 'রাতে খেয়ে যাও আমাদের বাড়িতে। আজ কচ্ছপের মাংস হয়েছে।'

আন্দ্রেয়া বলে উঠল, 'টেরো?'

এতক্ষণে বোনা যেন একটু সপ্রতিভ হয়ে বলল, 'হ্যাঁ টেরো। আমি বানিয়েছি। আমি খুব ভালো রান্না করি।' বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল।

একেবারে নিকশ কালো প্রতিমার মতো আদলে মিষ্টি মুখটা। হাসতেই দুই গালে টোল পড়ল। সাদা ঝকঝকে দাঁত, কালো মুখমণ্ডলে এক বহু পুরাতন আবহ নিয়ে এলো। সুপ্রাজেরও মনে হল অষ্টাদশী লিপাই যেন হাসছে।

হঠাৎ আন্দ্রেয়া চেয়ার থেকে উঠে গেল বোনার কাছে। সোফায় বসা বোনাকে অবাক করে দিয়ে মাটিতে বসে পড়ল। তারপর বোনার হাতদুটো ধরে হঠাৎ কাঁদতে শুরু করল ইংরেজ দুহিতা।

তারপর বেশ জোরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল। ঘরের সকলে একটু অবাকই হলো। সুনেত্রা, অর্চনাদিদি আর সুপ্রাজ।

সুপ্রাজ কেবল বুঝতে পারছে। ড. ওয়াকারের হয়ে ক্ষমা চাইছে আন্দ্রেয়া। কিন্তু সুপ্রাজের কী করা উচিত। দুধনাথের পক্ষ থেকে একজন ভারতীয় হয়ে ওর কী ক্ষমা চাওয়া দরকার? পাঁচ প্রজন্ম পরে ক্ষমা করবেন কী লিপা? ▮

With Best
Compliments from :-

A
Well Wisher

বিভিন্নবাবা গল্পের সত্যজিৎ-কৃত চিত্ররূপ।

রসরাজ রাজশেখর

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

পৌরাণিক যুগে ভারভূমিতে আবির্ভাব হয়েছিল পরশুরামের। প্রথমেই তাঁর নামের অনুষঙ্গ হিসেবে মনে পড়বে কুঠারের কথা। সেই প্রাচীনকালের ঘটনার পৃষ্ঠভূমি ও ইতিহাসে উল্লেখিত নরহত্যার কার্যকারণ ছিল ভিন্ন। একালের 'পরশুরাম' ছদ্মনামে খ্যাত রাজশেখর বসুর জন্ম হয়েছিল বর্ধমানের কাছে শক্তিগড়ে তাঁর মাতুলালয়ে ১৮৮০ সালে। তিনি উত্তরকালে পরশুরাম ছদ্মনামে তাঁর কলম সঙ্গী করে বাঙ্গালি মানসে চিরস্থায়ী হাসির ফল্গুধারা বইয়ে দেন।

পিতা চন্দ্রশেখর বসুর আরও তিন পুত্র ছিল। রাজশেখরের অগ্রজ শশীশেখর, অনুজ কৃষ্ণশেখর ও গিরীন্দ্র শেখর। কৃষ্ণনগরের কাছে উলাগ্রামের রাজশেখর শৈশব থেকেই ছিলেন অত্যন্ত কৌতূহলী ও কার্যকারণ সম্পর্কে উৎসুক। তাঁর জীবনী থেকে জানা যায়, 'মা যখন তার হাতে খেলনা দিতেন, টিনের ইঞ্জিন, রবারের বাঁশি, স্প্রিং-এর লাট্টু, একঘণ্টার মধ্যেই রাজশেখর লোহা, পাথর ও হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে দেখতো ভেতরে কী আছে? কেন বাজে, কেন ঘোরে?'

এই শৈশব কৌতূহলই তাঁর ভবিষ্যতের কৃতী ছাত্র হওয়ার পথ সুগম করে দেয়। প্রথমে প্রেসিডেন্সি পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ণ শাস্ত্রে ১৯০০ সালে তিনি এমএসসি পরীক্ষায় প্রথম হন।

সেই অবিভক্ত বাঙ্গলায় স্নাতক হলেই মিলে যেত চাকরি। কৃতী ছাত্র আর এমএ। এমএসসি-দের তো কথাই নেই। কলেজে পড়ানোর কথা রাজশেখর কখনো মনেও আনেননি। তাঁর আবাল্য বিজ্ঞানমনস্কতা কোনো গভীর গবেষণামূলক কাজের দিকেই আকৃষ্ট থাকত। তাই তাঁর অধীত বিদ্যার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো কোম্পানির নামের সঙ্গে যুক্ত তৎকালীন বাঙ্গালি ঐতিহ্যের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়িক উদ্যোগ বেঙ্গল কেমিক্যাল ফার্মাসিউটিক্যাল-এর চাকরির হাতছানি তিনি এড়াতে পারেননি। এমএসসি পাশের পর আইনের পাঠ সম্পূর্ণ করে তিনি ১৯০৩ সালেই এখানকার কেমিস্ট পদে নিযুক্ত হন।

সকলেই জানেন, এই প্রতিষ্ঠানের তৎকালীন কর্ণধার ছিলেন ভারতসেরা বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর কার্তিক বসু ও ড: রায়ের নেকনজরে পড়তে কর্তব্যনিষ্ঠ রাজশেখরের দেরি হয়নি। ভাবলে অবাক হতে হবে, তিনি এমনই অতুলনীয় কর্তব্যনিষ্ঠার অধিকারী ছিলেন যে মাত্র তিন বছর যেতে না যেতেই কর্তৃপক্ষ ১৯০৬ সালে তাঁর হাতে সংস্থার সর্বময় কর্তৃত্ব সঁপে দেন। সেই থেকে ১৯৩২ সালে অবসর নেওয়ার সময় পর্যন্ত তিনি কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে আসীন ছিলেন। অবসরের পরেও তাঁর পরামর্শ পেতে সংস্থা তাঁকে আমৃত্যু (১৯৬০) প্রধান উপদেষ্টার পদে আসীন রেখেছিল। বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বেও রাজশেখর কর্তৃক পরিমার্জিত ও নবীকৃত (এখানেই তাঁর গবেষক মন সচেতন হয়ে উঠত) ফেনল, ন্যাপথলিন, কালমেঘ, ক্যাম্থারাইডিন মাথার তেল, বাঙ্গালির বদহজমের মহৌষধ জোয়ানের আরক আর স্বর্গের সিঁড়ি ভাঙার পথে অগুরু সুগন্ধি ছিল প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। রাজশেখরের যে দ্বৈত সত্তা তার প্রতি তিনি কখনও অমর্যাদা করেননি। তাঁর হাসির গল্পগুলি পড়লে তাঁর যে ছবি ভেসে ওঠে সেই লঘুতার সঙ্গে তাঁর কর্মক্ষেত্রের পরিচালকের রূপের ছিল আমূল পার্থক্য। একেই পরিভাষায় বলে detachment বা বিযুক্তি। পরশুরাম তাঁর তুমুল হাস্যরসাক্রান্ত লেখাগুলির কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেও নিজেকে রেখেছিলেন আশ্চর্য রকম বিযুক্ত। সেক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্র আর ব্যক্তি জীবনকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা তো ছিল তাঁর পক্ষে প্রকৃতি ধর্ম। প্রমথনাথ বিশীর লেখায় পাওয়া যায়, যখন তাঁকে ব্যক্তিগত কাজে রাজশেখরের সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের অফিসে যেতে হয়েছিল, ''নির্দিষ্ট সময়ে সৌম্যমূর্তি প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন। গায়ে সাদা খদ্দরের গলাবন্ধ কোট, পরনে খদ্দরের ধুতি (এ পোশাক ছাড়া তাঁকে কখনও অন্য পোশাকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না)। হাতে কাগজের ফাইল, গম্ভীর প্রসন্ন মুখ... কাজের কথা হয়ে যাবার পর আমি যেমন আমাদের বেশিরভাগ লোকেরই অভ্যাস— তাঁকে দু'একটা বাড়ির খবরের কথা জিজ্ঞেস করেছিলুম। কিছু মাত্র দ্বিধা না করে তিনি তখনই বলে দিলেন— ওসব কথা তো আপিসের নয়, আপিসের সময় নষ্ট না করে বাড়িতে জিজ্ঞেস করবেন— এই বলে নিজের কাজে মন দিলেন'' (কথা সাহিত্য রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা, ১৩৬০)।

তাঁর এই চরিত্রলক্ষণ তাঁর পরিধেয়র মতোই আজ বাঙ্গালি জীবন ও চরিত্র থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। তবে আনন্দের কথা, তাঁর গুরু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রও পরে তাঁর নিজ হাতে পরিমার্জিত বাঙ্গালি জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতোভাবে জড়িত সামগ্রীর সম্ভারগুলি আজ সারা ভারতে পুনরায় সমাদৃত হচ্ছে। তাঁর কর্মধন্য প্রতিষ্ঠান বিগত কয়েক বছর ধরে অজস্র ঘাত-প্রতিঘাত সামলে এই বিজ্ঞাপনের আগ্রাসনের বাজারে তাদের নিত্য ব্যবহার্য বস্তুগুলিকে আবার জনপ্রিয় করে তুলে প্রতিষ্ঠানকে লাভের মুখ দেখাচ্ছে। রাজশেখরের প্রতি এও এক ধরনের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

যাই হোক, এটি রাজশেখরের পুঁথিগত শিক্ষা, ব্যক্তি চরিত্রের গঠন ও অননুকরণীয় কর্ম প্রতিভার পরিচয়। কিন্তু এটি তো তাঁর চরিত্রের সর্বাপেক্ষা অবহেলিত ও তুলনামূলকভাবে গুরুত্বহীন দিক। তিনি তো নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর স্বজাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণে। কী করে সঠিক অর্থ মেনে বিদ্যাচর্চা করা যাবে— অভিধান রচনা করতে হবে। ভারতের খনিজ দ্রব্যের সন্ধানে নেমে পড়েছিলেন। সে প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে। তাঁর চরিত্রের দিকে নজর করলে দেখা যায়, রাজশেখর ছিলেন সর্বার্থেই এক বহুমুখী প্রতিভা। ফলে বহুমুখী প্রতিভাধরদের এক ধরনের বিপদের সম্ভাবনা থেকে যায়। বিভিন্ন দিক থেকে আকর্ষণ আসে। বহু ধরনের সৃষ্টির পথ তাঁদের প্রলুব্ধ করতে পারে। রাজশেখর তথা পরশুরাম এমনই এক সব্যসাচী ব্যক্তিত্ব। এক হাতে তিনি বিলিয়েছেন— অনাবিল রসভাণ্ডার, অন্যহাতে সৃষ্টি করেছেন মননশীল গল্প। অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ, অভিধান, কী নয়?

১৯২২ সালে 'গড্ডলিকা' নিয়ে তাঁর প্রথম আবির্ভাব। এই গল্পের বিষয়বস্তু বাঙ্গালি পাঠকের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে অসামান্য কৌতুক। গল্পের ভাষা সাধু চলিতের আশ্চর্য সংমিশ্রণ। তবে এটা নিশ্চিত যে, কিছুটা শিক্ষা দীক্ষা ও রসবোধ না থাকলে এ গল্পের অন্দরমহল অনাস্বাদিতই থেকে যাবে। রাজশেখর বসু তাঁর বেঙ্গল কেমিক্যালের চাকরি, আইন বিদ্যা সর্বোপরি দুর্লভ রসবোধ ও অব্যর্থ শব্দ প্রয়োগে প্রথম অবির্ভাবেই মাত করেছেন। আজীবন কলকাতাবাসী হওয়ায় তাঁর লেখায় ছিল একেবারে নতুন এক আর্বান আমেজ।

গড্ডলিকার প্রথম গল্প 'শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড', আদতে

পরশপাথর গল্পের সত্যজিৎ-কৃত চলচ্চিত্রায়ণ।

কোম্পানি আইনের মাধ্যমে সুচতুরভাবে লোক ঠকানোর গল্প। ঠকাতে গেলে যা কিছু ভড়ং অর্থাৎ উপকরণ লাগে লেখক তা সফলভাবে এখানে উপস্থিত করেছেন। মানুষকে প্রলোভিত করতে একটি কোম্পানি তার ঘোষণাপত্র জারি করছে। 'ধর্মই হিন্দুগণের প্রাণস্বরূপ। ধর্মকে বাদ দিয়া এ জাতির কোনো কর্ম সম্পন্ন হয় না। অনেকে বলেন— ধর্মের ফল পরলোকে লভ্য। ইহা আংশিক সত্য মাত্র, বস্তুত ধর্মবৃত্তির উপযুক্ত প্রয়োগে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ উপকার হইতে পারে। সদ্য চতুর্বর্গ লাভের উপায়স্বরূপ এই বিরাট ব্যাপারে দেশবাসীকে আহ্বান করা হইতেছে।'

আমাদের বাণিজ্যিক পরিমণ্ডলে এখনো যেমন ফর্জি কোম্পানি লোকের টাকা লুঠ করে, ঠিক সেভাবেই পরশুরাম নিজস্ব ব্যঙ্গচ্ছলে কোম্পানির সম্ভাব্য আয়ের রাস্তার বর্ণনা দিচ্ছেন। প্রথমে বলা হিন্দুধর্মের সূত্রেই এই কোম্পানি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে মন্দির নির্মাণ করবে। এই মন্দির থেকে সংস্থা কীভাবে লাভের মুখ দেখবে তার সবিস্তার পরিকল্পনা 'যাত্রীগণের নিকট হইতে দর্শনী ও প্রণামী আদায় হইবে, দোকান হাট বাজার অতিথিশালা মহাপ্রসাদ বিক্রয় প্রভৃতি হইতে প্রচুর আয় হইবে। এতদভিন্ন by-product recovery-র ব্যবস্থা থাকিবে (রাজশেখরের রসায়ন বিদ্যা)। মায়ের সেবার ফুল হইতে সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত হইবে এবং প্রসাদি বিল্বপত্র মাদুলিতে ভরিয়া বিক্রিত হইবে। চরণামৃতও বোতলে প্যাক করা হইবে। বলির জন্য নিহত ছাগল সমূহের চর্ম ট্যান করিয়া উৎকৃষ্ট কিড-স্কিন প্রস্তুত হইবে এবং বহুমূল্যে বিলাতে চালান যাইবে। হাড় হইতে বোতাম হইবে। কিছুই ফেলা যাইবে না।' কল্পনার এমন অভিনবত্ব বাংলা সাহিত্যে আর দৃষ্ট নয়।

রাজশেখরের এই স্বয়ংসম্পূর্ণ upstream ও downstream সংস্থা সংবলিত মন্দির তৈরির ব্যবসার প্রস্তাব কী মসৃণ কৌশলে জনমানসে পরিবেশিত হচ্ছে। মাতৃভাষা হিন্দির সঙ্গে অবাঙ্গালি সম্প্রদায়ের মিশ্রিত বাংলায় আজও যে হাসির উদ্রেক হয় তার অব্যর্থ প্রয়োগ জানতেন রাজশেখর। তিনি এই মানুষগুলিকে নিত্য ডালহৌসির অফিস পাড়ায় বা নিজের অফিসে যাতায়াত করতে দেখেছেন। গল্পেরই একটি চরিত্রের নাম গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া। তাঁর সংলাপ 'অটলবাবু আপনি দো চার অংরেজী কিতাব পড়িয়ে হামাকে ধরম কী শিখলাবেন। বঙ্গালি ধরম জানে না হামার জাত রুপয়া ভি কামায় হিসাবসে, পুন (পুণ্য) ভি করে হিসাবেসে। রবীন্দরনাথ ভি লিখছেন। বৈরাগ্য সাধন মুক্তি সো হমার নঁহি।' প্রত্যেকটি অক্ষর লক্ষ্য করলে একটি ক্রূর মাড়োয়াড়ির অবয়ব চোখের সামনে দেখা যায়।

রাজশেখরের সংলাপ লেখা ও চরিত্র নির্মাণে একটা অব্যর্থ সিনেমাটিক সংকেত থেকে যেত। সত্যজিৎ সেই ৬০ বছর আগে এই অবাঙ্গালি সংলাপ ব্যবহারের শীর্ষে পৌঁছেছিলেন রাজশেখরের 'পরশপাথর' নিয়ে ছবি করে। সেখানে পাথর হাতাতে মাড়োয়ারি গঙ্গাপদ বসুর চূড়ান্ত অর্থলোলুপ সংলাপ বড় অংশ জুড়ে ছিল।

'কাঠি দিয়া ঘাঁটিতেছে' — বিরিঞ্চিবাবা।

কিংবা আরও পরে বিরিঞ্চিবাবার সীমাহীন গুল ভিত্তিক 'কাপুরুষ মহাপুরুষ'-এর চলচ্চিত্রায়ন। এখানে অনায়াসে বিরিঞ্চি তার অনাদিকালের জ্ঞানভাণ্ডার নিয়ে অক্লেশে ভেঙে দিচ্ছে ইতিহাসের পাঁচিল। নিবারণের প্রশ্নের উত্তরে বিরিঞ্চি বলছে, 'কোথায় যেন দেখেছি তোমায় নেপালে? নাঃ মুরশিদাবাদে। তোমার মনে থাকার কথা নয়। জগৎশেঠের কুটিতে, তার মায়ের শ্রাদ্ধের দিন। অনেক লোক ছিল রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, নবাবের সেপাইশালার খান খানান মহব্বৎ জং, সুতোনুটির আমিরচাঁদ হিস্ট্রিতে যাকে বলে উমিচাঁদ। তুমি শেঠজীর খাজাঞ্চী ছিলে, তোমার নাম ছিল— রোস— মতিরাম।' এই পর্বে তিনি মোটামুটি ২৫০ বছর অতিক্রম করেছিলেন অবলীলায়। এবার বিরিঞ্চি বললেন, 'একবার মহাপ্রলয়ের পর বৈবস্বত (মনু) আমায় বললে— নীললোহিত কল্পে কী? না শ্বেতবরাহ কল্প সবে শুরু হয়েছে, বৈবস্বত বললে মানুষ তো সৃষ্টি করলুম কিন্তু ব্যাটারা দাঁড়াবে কোথা, খাবে কী? চারদিকে জল থৈথৈ করছে। আমি বললুম, ভয় কী বিবু, আমি আছি। সূর্যবিজ্ঞান আমার মুঠোর মধ্যে, সূর্যের তেজ বাড়িয়ে দিলুম, চোঁ করে জল শুকিয়ে গেল, বসুন্ধরা ধনধান্যে ভরে উঠল। চন্দ্র-সূর্য চালাবার ভার আমার ওপরই কিনা।' ওঃ।

এখানে লক্ষণীয়, 'চোঁ' শব্দটি। বিরিঞ্চি যত প্রাগৈতিহাসিক ব্যক্তিত্বই হোক না কেন সে তার নিছক বাঙ্গালি পরিচয় কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারেনি। পরের বাক্যটি অমলিন কৌতুক। কিন্তু আদি কল্পারম্ভের যে উল্লেখ পরশুরাম করেছেন তা গভীর অধ্যয়নলব্ধ এবং পৌরাণিকভাবে প্রামাণিক। তাঁর বিচিত্র বিষয়ে আগ্রহ তাঁকে বহু বিষয়ে নিবিড় পাঠে আকর্ষিত করেছিল। কিন্তু সাহিত্যের জগতে বহু ক্ষেত্রে যে কথা চলে আসে যে ব্যঙ্গরচনায় একবার খ্যাতি হয়ে গেলে লেখকের একটি মানসমূর্তি পাঠকের মনে গাঁথা হয়ে যায়। তাঁর অন্যান্য বহু কীর্তিই সেই মূর্তির আস্তরণে চলে যায়। গড্ডলিকা কজ্জলীর পরিশীলিত প্রহসনগুলি পাঠে অমৃতলাল বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পরশুরামকে প্রশংসায় ভরিয়ে দেন। প্রমথ বিশী লিখেছেন, 'গড্ডলিকা কজ্জলীর ভাষা দেখে সকলে চমকে গেল। এমন পরিচ্ছন্ন বাহুল্য বর্জিত সুপ্রযুক্ত ভাষা বড় দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর ভাষারীতিকে এড়িয়ে সাধুভাষার এই পদক্ষেপ সত্যিই বিস্ময়জনক। বস্তুত, পড়বার সময় খেয়াল থাকে না এ ভাষা সাধু কী কথ্য, পরে হিসেবে দেখা যায় সাধু ভাষা।'

বাংলা সাহিত্যে এই চমৎকারিত্বের পথিকৃৎ রাজশেখর। যেখানে পাঠককে তাঁর ভাষার সাবলীলতায় তিনি কখনো মূল পাঠ থেকে, বিষয় থেকে মনোযোগ ফিরিয়ে ভাষার ছ্যুতমার্গে ফাঁসিয়ে দেন না। রাজশেখর নিজেকে তৈরি করেছিলেন তিলে তিলে অন্তরালে। তাঁর প্রথম গ্রন্থ গড্ডলিকা তাঁর ৪২ বছর বয়সে প্রকাশ পায়। যে সময়কে সাহিত্যক্ষেত্রে অনেকেই তখন পশ্চাদপসরণের পর্ব হিসাবে ভাবত।

১৯২২ সালের পরের বছরগুলি কখনো পরশুরাম হিসেবে কখনো রাজশেখর হিসেবে তিনি অতি দ্রুত খ্যাতির শিখরে চড়েছেন। তাহলে কী তাঁর আগে বাংলা কৌতুক সাহিত্যের তেমন চল ছিল না। এমনটা ঠিক নয়। পরশুরামের গড্ডলিকা ও কজ্জলীর লেখাগুলি তো মূলত প্রহসনধর্মী। সেখানে হাসিকে ব্যবচ্ছেদ করলে কিন্তু সমাজের প্রতি প্রচ্ছন্ন তিরস্কারই উঠে আসবে। যেমন বিরিঞ্চি বাবার মানুষের ধর্মীয় দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ভক্তকে ঠকানো। সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডে সেই ১০০ বছর আগেও অর্থনৈতিক দুর্নীতির উন্মোচন। 'চিকিৎসা বিভ্রাটে'র বিষয়টি তো আজও প্রাসঙ্গিক। পরশুরামের ভাষা, পরিশীলিত উপস্থাপনা ও বিষয় নির্ধারণ বাঙ্গালিকে মোহিত করে দেয়। আগের ব্যঙ্গ রচনাগুলি ম্যাড়মেড়ে হয়ে পড়ে। আজকাল মানুষের অসুস্থতার ক্ষেত্রে ডাক্তার নির্বাচন, হসপিটাল পরিষেবার সঠিক হদিশ পাওয়া একটা আলোচ্য বিষয়। এরই সঙ্গে যোগ হয়েছে রোগীর ওপর ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলির দৌরাত্ম্য। হাস্যরসের প্রধান উপকরণ মানব জীবনের বৈসাদৃশ্য সংবলিত পরিস্থিতির যথাযথ উপস্থাপন। তাঁর চিকিৎসা সংকট গল্পটির কিছুটা উদ্ধৃতি তাঁর বিতরিত হাস্যরসের অনবদ্য উদাহরণ।

আদি উত্তর কলকাতার বাসিন্দা নন্দবাবু তৎকালীন হগ মার্কেট

'হ্যাঁচোড় প্যাঁচোড় করে'— চিকিৎসা সঙ্কট।

থেকে বাড়ি ফেরার পথে ধুতির খুঁট জড়িয়ে ট্রাম থেকে পড়ে যান। বাড়িটি যথারীতি হরিহর ছত্রের মেলা। মাঝবয়সী নন্দ বিপত্নীক। পিসিকে নিয়ে পৈতৃক আবাসে থাকেন। তাঁর আঘাত কিন্তু আদৌ গুরুতর নয়। সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ব নিরুদ্বেগ নিপাট ভদ্র বাঙ্গালি সমাজের একটি শান্ত ছবি বারবার রাজশেখরের লেখায় ঘুরে ফিরে এসেছে। গল্পের পরিবেশ সৃষ্টিতে বৈঠকি আড্ডার একটা বড় ভূমিকা বারবার দেখা গেছে। এক্ষেত্রে ১৪ নং পার্সীবাগান লেনে তাঁদের বাড়ির বৈঠকখানার জমজমাট আড্ডার প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। রাজশেখর স্বভাব মিতবাক হলেও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন আড্ডাধারীদের। নন্দবাবুর বৈঠকখানা এমনই গুলজার হয়ে আছে। সেই সদ্য বিকেল হয়েছে কী হয়নি ষষ্ঠীবাবুর মাথায় বালা ক্লাভা টুপি, গলায় দাড়ি ও তার ওপর মাফলার। তিনি আশ্চর্য মতামত দিলেন, 'বাপ, এত শীতে অবেলায় কখনো ট্রামে চড়ে! শরীর অসাড় হলে আছাড় খেতেই হবে। নন্দর শরীর একটু গরম রাখা দরকার।' বুঝুন! চিকিৎসা সংক্রান্ত তীব্র বাদানুবাদের পর ডাক্তার তফাদার এম. ডি. এমআরএএস-কে দেখানো স্থির হইল। তফাদার আরও কয়েকদিন নজর রাখা সাপেক্ষে cerebral tumour with strangulated ganglia ডায়গনোস করলেন। সঙ্গে বললেন, ট্রিফাইন করে মাথার খুলি ফুটো করে অস্ত্রপচার করতে হবে, আর ঘাড় চিরে নার্ভের জট ছাড়াতে হবে। শর্ট সার্কিট হয়ে গেছে। নন্দ শুধু বলল, বাঁচব তো? ডাক্তারের সান্নিধ্যে রুগী আতঙ্কিত। তফাদার নিপাট বাঙ্গালিকে খাদ্য হিসেবে দিলেন এগ ফ্লিপ, বোনম্যারো স্যুপ, চিকেন স্টু বিকেলের দিকে বার্গাণ্ডি খাওয়ার বিধান। সঙ্গে দিনরাত বরফ জল।"

পরবর্তী পরামর্শ অনুযায়ী নন্দ হোমিওপ্যাথ নেপাল সন্দর্শণে গেল। এখানে পরিবেশ আরও রহস্যময়, 'চারিদিকে স্তূপাকার বই সাজানো। বইয়ের দেওয়ালের মধ্যে গল্পে বর্ণিত শেয়ালের মতো মাটিতে বসিয়া আছেন বৃদ্ধ নেপালবাবু। মুখে গড়গড়ার নল। ঘরটি ধোঁয়ায় ঝাপসা হইয়া গিয়াছে।'

নন্দের ব্যারামটা কী আন্দাজ করছেন প্রশ্নে নেপাল বলিলেন, 'তা জেনে তোমার চারটে হাত বেরোবে নাকি! যদি বলি তোমার পেটে ডিফারেনসিয়াল ক্যালকুলাস হয়েছে কিছু বুঝবে?' আরও এক প্রস্থ বিচিত্র পথ্যের আদেশনামা নিয়ে নন্দ ফেরত আসে। এরপর কবরেজি থেকে তৎকালীন দিনে চলিত মুসলমানি হাকিমি চিকিৎসার অসামান্য মজাদার পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে নন্দের চিকিৎসার বন্ধুর পথ শেষ হয়।

এই পর্বে পরশুরাম বেআব্রু করে দেন ডাক্তারদের রুগীর প্রতি অবহেলার ধারাবাহিক রূপ। তাঁর অতি বিখ্যাত মহাবিদ্যা, লম্বকর্ণ, ভুশণ্ডীর মাঠে, বিরিঞ্চিবাবা, কচি সংবাদ, উলটপুরাণ প্রভৃতি প্রতিটি লেখাতেই নিছক ক্ষণিক হাস্যরস বিতরণেই ইতি ঘটেনি। তিনি প্রতিটি গল্প ও প্রহসনের মধ্যেই সমাজের বেখাপ্পা দিকগুলির প্রতি আঙুল তুলেছেন। তাঁর ব্যঙ্গই মধুর তিরস্কারধর্মী।

পরশুরামের পূর্বসুরী ত্রৈলক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মূলত গ্রামীণ পরিবেশভিত্তিক হাসির গল্প বহু লিখেছেন। যার মধ্যে 'ডমরু চরিত' বিখ্যাত। যেখানে মানুষ বাঘের পাকস্থলীতে বসেও তার অনুভূতির কথা প্রকাশ করছে। এমন অতি স্থূল হাস্যরস পরিবেশনের চেষ্টাও রয়েছে। তিনি নিজেই লিখে গেছেন, 'ভালরূপ লেখাপড়া জানি না, শাস্ত্র জানি না, জানি কেবল এই যে সত্য ও পরোপকার ইহাই ধর্ম।'

হাসির গল্পের ঈর্ষণীয় সাফল্য ও জনপ্রিয়তা পরশুরামকে

পরিতৃপ্ত করতে পারেনি। স্বজাতির উপকারই ছিল তাঁর জীবনের উদ্দিষ্ট।

অফিসের চাকরিতে স্বদেশি দ্রব্যের বেশি বেশি আধুনিকীকরণ ও তার বাজারে সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে নিত্য নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা যাকে 'রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্ট' বলা হয়, রাজশেখর তাতে সদা সচেষ্ট থাকতেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বিজয়কেতু বসুর লেখা থেকে বেঙ্গল কেমিক্যালে সুগন্ধী এসেন্স তৈরি করার ক্ষেত্রে রাজশেখরের একেবারে নিজস্ব পদ্ধতির কথা জানা যায়। এমন আধুনিক বিদেশি সুগন্ধির দিশি রূপান্তরকার কিন্তু সাহিত্যিক গজেন্দ্রনাথ মিত্রের কথায়, 'লোকে বলে খাঁটি বাঙ্গালিয়ানা। আমি বলি 'ব্রিটিশ স্বাদেশিকতা' থাকায় বিদ্যাসাগর চাদর গায়ে চটি ফটফটিয়ে লাটসাহেবের কাছে যেতে পেরেছেন। ব্রিটিশ স্বাদেশিকতা ছিল বলেই এই অজস্র ফাউন্টেন পেনের যুগে রাজশেখর বসু আমৃত্যু লিখে গেছেন নিজের হাতে কাটা খাগের কলমে।'

এই স্বদেশিয়ানা ভাব থেকেই তিনি সর্বদা চেয়েছেন মধ্যবিত্ত বাঙ্গালি ছেলেরা স্বাধীন ব্যবসা করুক। মধ্যবিত্ত শ্রমবিমুখ বাঙ্গালি সদা আশঙ্কিত থাকে ব্যবসায় যোগ দিলে তার সংস্কৃতি ও সুকুমার বৃত্তি সঙ্কুচিত হবে। রাজশেখর সামগ্রিক ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের উচ্চশিখরে থেকেও তাঁর সমগ্র জীবনের মাধ্যমে সাহিত্য সংস্কৃতির পথে বহুবিধ আলোকবর্তিকার দ্যুতিতে সেই আশঙ্কাকে মিথ্যে করে দিয়ে গেছেন। রাজশেখর বিশ্বাস করেছেন পুরুষাকার ও নিষ্ঠায়।

১৯৩০ সালে বিপুল পরিশ্রমে সম্পূর্ণ নিজস্ব ভাবনায় বের করেছেন বাংলা অভিধান চলন্তিকা। স্বদেশ ভাবনায় জারিত কুটির শিল্পের প্রসার বাড়াতে বিশ্বভারতী প্রকাশ করে তাঁর 'কুটির শিল্প' (১৯৪৪)। খনিজ দ্রব্যের উত্তোলন ও তার পরিশোধনের ক্ষেত্রে ব্যবসার যে বিপুল সম্ভাবনা ছিল তাই নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন 'ভারতের খনিজ'। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পূর্বাঞ্চল ও বিহারের অধিকাংশ কয়লা, অভ্র বা তামার খনির ব্যবসায় বাঙ্গালির বিপুল প্রাধান্য ছিল। গল্পে ছোটদের নিয়ে তেমন বিষয়বস্তু না থাকলেও তাদের জন্য হিতোপদেশের গল্প ধারাবাহিকভাবে 'মৌচাক' পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। বাল্মীকি রামায়ণ ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত মহাভারতের অত্যন্ত সহজ অনুবাদ করেন। গ্রন্থে মূল গ্রন্থের স্থান, ব্যক্তি, অস্ত্রাদির বিশদ বিবরণ পর্যন্ত তিনি দিয়ে দেন। ফলে তাঁর গ্রন্থগুলি একাধারে মানে বইয়েরও কাজ করত। হাসির গল্প ছাড়া তিনি অন্যান্য বহু অত্যন্ত মনীষাপ্রসূত গল্প লিখে গেছেন। গল্পকল্প, ধুস্তুরী, মায়া, কৃষ্ণকলি প্রভৃতি তাঁর বহু বিচিত্র স্বাদের গল্প গ্রন্থের কয়েকটি মাত্র। সমাজের নানা অসঙ্গতিকে দূর করার মনোজ্ঞ পরামর্শ সেখানে বিদ্যমান। । তবে এর মধ্যে 'গা মানুষ জাতির কথায়' রাজশেখর যে উদ্ভাবনী মনীষার স্বাক্ষর রেখেছেন, তার ক'টি পঙক্তি তুলে ধরছি। সমগ্র বিশ্বে দেশে দেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে যে দীর্ঘস্থায়ী এক অশান্তি ও সামরিক বিস্ফোরণের আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে, তা থেকে নিস্তার পেতে রাজশেখরের বৈজ্ঞানিক লিখছেন, 'প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে আমার আবিষ্কৃত বিশ্বব্যাপক শান্তিস্থাপক বোমা তার প্রভাবে সর্বত্র শান্তি বিরাজ করবে। এই বোমা থেকে যে আকস্মিক রশ্মি নির্গত হয় তা cosmic রশ্মির চেয়ে হাজার গুণ সূক্ষ্ম। তার স্পর্শে চিত্তশুদ্ধি, কাম ক্রোধ লোভাদির উচ্ছেদ এবং আত্মার বন্ধনমুক্তি হয়।' এমন মৌলিক ভাবনা এমন লঘুচালে পরিবেশন বিরল। রাজশেখরের নিরলস বিদ্যানুরাগ, দেশহিতৈষণা ও সাহিত্য চর্চায় মুগ্ধ হয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অন্যতম সদস্য করে নিয়ে যান। পরিভাষা কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে ১৯৩৪-এ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৪০ সালে তাঁকে বিখ্যাত 'জগত্তারিণী পদক' ও ১৯৪৫ সালে 'সরোজিনী পদক' দানে সম্মানিত করে। মৃত্যুর মাত্র তিন বছর আগে ১৯৫৭ সালে তাঁকে ডি'লিট উপাধি দেওয়ায় তিনি বিশেষ খুশি হতে পারেননি। চিরকালীন সোজা সাপটা রাজশেখর বন্ধু কুমারেশ ঘোষকে লেখেন, '৭৭ বছর পেরিয়ে উপাধি লাভে কিছুমাত্র আনন্দের কারণ নেই। আর ডাক্তার উপাধি তো গড়াগড়ি যাচ্ছে।' (যষ্ঠিমধু, রাজশেখর সংখ্যা)

অত্যন্ত দেরিতে হলেও ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে রবীন্দ্র পুরস্কার দেয়। ১৯৫৬ সালে রাজশেখর পদ্মভূষণ উপাধি পান। ১৯৫৮ সালে অসাধারণ 'আনন্দবাঈ' গল্পের জন্য তিনি অকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত হন।

অনেক ক্ষেত্রেই রাজশেখরকে নিরিশ্বরবাদী বা হিন্দুধর্মবিমুখ এমন একটা তকমা দেওয়া হয়। সে বিষয়ে তিনি তাঁর সৃষ্ট এক চরিত্র সাধু 'জাবালির' জবানিতে বলেছেন, 'আমি নাস্তিক কি আস্তিক তাহা আমি নিজেই জানি না। দেবতাগণকে আমি নিষ্কৃতি দিয়াছি। আমার তুচ্ছ অভাব অভিযোগ জানাইয়া তাঁদের বিব্রত করি না। বিধাতা যে সামান্য বুদ্ধি দিয়াছেন তাহারই বলে কোনো প্রকারে কাজ চালাইয়া লই। আমার মার্গ যত্রতত্র, আমার শাস্ত্র অনিত্য, পৌরুষেয়, পরিবর্তন সহ।'

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মতো সংবেদনশীল বিষয় তিনি এড়িয়ে যাননি। 'একজন আরবি, পারসিক বা মিশরি মুসলমান স্বদেশের প্রাক ইসলাম সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে দ্বিধা করে না। তবে ভারতীয় মুসলমানরাই বা কেন রামায়ণ মহাভারত, বেদ উপনিষদকে দূরে সরিয়ে রাখবে? ... ওই সমস্ত দেশের প্রাক ইসলাম ধর্মগুলি মৃত, তাই তাদের চর্চাও নিরাপদ। অন্যদিকে ভারতীয় ইসলামের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুত্ব এখনও জীবন্ত ও যথেষ্ট শক্তিশালী, তাই মুসলমান হয়ত আকর্ষণ বা অনুপ্রবেশের ভয়ে একটু দূরে থাকতে চায়। এ ভয় অমূলক। আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু

যৌবনে রাজশেখর

প্রাচীন সংস্কৃতি বা ঐতিহ্য অন্ধভাবে গ্রহণ করে না, যা যুগোপযোগী তাই বেছে নেয়। আধুনিক, শিক্ষিত মুসলমানও তাই করবে। যদি তার বাছার পদ্ধতি একটু অন্যরকমও হয়। কিন্তু আদান-প্রদান একতরফা হলে চলবে না।'

বাস্তবে মাতৃ-পিতৃ বিয়োগ হলে আমরা কী আজও সদা গৃহে আবদ্ধ হয়ে থাকি? দেবতার উদ্দেশে পশুবলি তো অনেকাংশেই রদ হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ বাড়িতে উপনয়ন হলে ছেলেটি কি এখনও তিনদিন অন্য বর্ণের মুখ দর্শন করে না? কালপ্রবাহ কুপ্রথাকে গ্রাস করে নেয়। এমন উদাহরণ ভুরি ভুরি।

রাজশেখর অনুধাবন করেছেন কালের গতি। তির্যক অবলোকন ও অভ্রান্ত শ্লেষের লেখনী ব্যবহারে সমাজকে আবর্জনামুক্ত করতে চেয়েছেন এই আধুনিক পরশুরাম। তাঁর ব্যঙ্গ রচনা সমেত বিস্তর লেখালিখিতে বিকল্পের নানা সংকেত ছড়িয়ে আছে। তবুও দক্ষিণেশ্বরে মূল আরাধ্যা মা কালী ছাড়া আশপাশে যেমন আরও বহু দেব-দেবীর অধিষ্ঠান, পরশুরামের বহুবিধ লিখনের মধ্যে তার ব্যঙ্গাত্মক রচনাগুলিই অগ্রগণ্য।

তাই, প্রকৃতির সঙ্গে নিত্য গৃহস্থালির যে অমোঘ যোগসূত্র বা দৈনন্দিনতার সঙ্গে চিরন্তনের যে অনন্ত দেওয়া-নেওয়া তারই অনিবার্যতার পদসঞ্চার শোনান প্রকৃতি প্রেমিক পরশুরাম। বর্ষা অবসানে তাঁর নিজস্ব শরতের আগমনী এমনই — 'চৌরঙ্গিতে তিনটা সবুজ পোকার অগ্রদূত ধরা পড়িয়াছে। খোলা আকাশ ছিঁড়িয়া ক্রমশ নীল রং বাহির হইতেছে। রৌদ্রে কাঁসার রং ধরিয়াছে, গৃহিণী নির্ভয়ে লেপ কাঁথা শুকাইতেছেন। শেষরাত্রে একটু ঘনীভূত হইয়া শুইতে হয়। টাকায় একগণ্ডা রোগা রোগা ফুলকপির বাচ্চা বিকাইতেছে। পটোল চড়িতেছে, আলু নামিতেছে। স্থলে জলে মরুৎ ব্যোমে দেহে মনে শরৎ আত্মপ্রকাশ করিতেছে।"

সূত্র :

১। পরশুরাম গ্রন্থাবলী, আনন্দ

২। কজ্জলী - এম সি সরকার

৩। যষ্ঠিমধু - কুমারেশ ঘোষ

৪। প্রমথনাথ বিশী, পরশুরাম গ্রন্থাবলীর ভূমিকা।

With Best Compliments from :-

ALL INDIA CONFEDERATION OF SMALL & MICRO-INDUSTRIES ASSOCIATIONS

LGF, 10/6,A, Nehru Enclave, Kalkaji Extension,
New Delhi - 110019
Tel. : 011-26210104, Mobile : 09811661134
Email : aicosmia@yahoo.co.in

SOCKS FOR STYLE DOWN TO YOUR FEET

Quality Products

B. K. International (P) Ltd.

Badli Gaon

DELHI-110 042

Phone : 2785-7039, 27857067 I Fax No.: 2785 7066

G. B. Auto Industries (Regd.)

Leading Mfr : Exporters & Largest Suppliers of

Rickshaw Hub, B. B. Shells (Bi-cycle Parts) & All Type of Lastings

C-84, Focal Point, Phase-V

Dhandari Kalan

Ludhiana - 141 010

Office : 0161-2671700, 2671600, 2677500

Fax : 0161-2671500,

M : 094172-71500, 098772891700

E-mail : gbskg@yahoo.in

gbautoind@yahoo.co.in

Web : www.gbautoindustries.com

With Best

Compliments from :-

AURO MECHANICALS

An ISO 9001 : 2000 Certified Firm

Mfrs. & Expoters of Hardware Nuts & Bolts, Hi-Tensile Fasteners

Auto Parts, Sheet Metal Components

B-20, Bhagwan Mahavir Industrial Complex, Backside Focal Point Sheds

Ludhiana - 141010

Tel. 0161-4610141

M.: 9814000141

চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারতের অবদান

কল্যাণ চৌবে

শূন্য আবিষ্কারের দ্বারা গণিত শাস্ত্রে আর্যভূমি ভারতবর্ষের কী অবদান ছিল এবং এর ফলে পৃথিবীতে যে কী বিশাল পরিবর্তন হয়েছে সেকথা আজ সকলেই স্বীকার করে। ঠিক তেমনই আয়ুর্বেদের মাধ্যমে পৃথিবীর চিকিৎসা বিজ্ঞানে ভারতের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। আজ দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের জন্মভূমি, কর্মভূমি ভারতবর্ষকে তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে গণ্য করা হয়। অথচ বর্তমানে প্রথম বিশ্ব হিসেবে পাশ্চাত্যের যে দেশগুলিকে বোঝায়, দুই-তিন হাজার বছর পূর্বে তারা যখন সবে গাছের গুঁড়ি গড়িয়ে যাওয়া দেখে চাকা আবিষ্কার করছে, সেই সময় আমাদের পূর্বপুরুষরা জ্যোতিষ শাস্ত্র, উদ্ভিদ বিদ্যা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। বর্বর বখতিয়ার খিলজি অথবা হিংস্র মুঘল জঙ্গি সম্রাটদের অত্যাচারে যদি অজস্র মন্দির, হিন্দু দেবস্থান, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাখা তথ্যগুলি ধ্বংস করা না হতো তাহলে আজ অবশ্যই আমাদের প্রিয় ভারতবর্ষকে তৃতীয় বিশ্বের দেশ বলে ডাকার স্পর্ধা কারোর হতো না। এই উপলক্ষ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কয়েকজন স্রষ্টার নাম এখানে উল্লেখ করা অবশ্যই প্রাসঙ্গিক হবে—

শুশ্রুত :— মহর্ষি শুশ্রুতকে চিকিৎসা বিদ্যার জনক বলা হয়। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, দেবরাজ ইন্দ্র মর্ত্যবাসীকে ব্যাধিগ্রস্ত দেখে কাতর হয়ে দেব চিকিৎসক ধন্বন্তরিকে পৃথিবীতে জন্ম নিতে বলেন। দেবরাজের নির্দেশে ধন্বন্তরি কাশীধামে কাশীরাজের গৃহে পুত্র রূপে জন্ম লাভ করেন। তাঁর নাম হয় দিবোদাস। শুশ্রুতের পিতা বিশ্বামিত্র ধ্যান যোগে বিষয়টি জানতে পেরে শুশ্রুতকে চিকিৎসা শাস্ত্রে শিক্ষা লাভের জন্য দিবোদাসের কাছে পাঠান। ধন্বন্তরির কাছে শিক্ষা লাভ করে শুশ্রুত চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যার নাম 'শুশ্রুত সংহিতা'। চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রাচীনতম এই গ্রন্থে চিকিৎসা বিদ্যাকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১) সূত্র স্থান, ২) শরীর স্থান, ৩) চিকিৎসা স্থান এবং ৪) কল্পস্থান। এই চারটি বিষয় বিচার করেই রোগের লক্ষণ, রোগের কারণ, চিকিৎসার উপকরণ, পদ্ধতি ও ভেষজ পদার্থের গুণাগুণ ও মানবদেহ সম্পর্কিত নানা তথ্য পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষভাবে বলা আছে। এই গ্রন্থে আয়ুর্বেদের উৎপত্তি বিশেষভাবে বর্ণিত আছে।

আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে, মহর্ষি শুশ্রুত আনুমানিক দশম শতাব্দীতে কাশী নগরীতে বসবাস করতেন এবং চিকিৎসক হিসেবে সুখ্যাতি লাভ করেন। তিনিই পৃথিবীর প্রথম শল্য চিকিৎসক যিনি ভাঙা হাড় জুড়তে পারতেন। তাঁর গ্রন্থে শল্য চিকিৎসার শতাধিক পদ্ধতির বর্ণনা রয়েছে। প্রাচীন বারাণসীর গঙ্গার তীর থেকে চিকিৎসক শুশ্রুতের চিকিৎসা বিজ্ঞান সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। পৃথিবীর নানা প্রান্তে যারা আয়ুর্বেদ পাঠ করেন, তাঁদের কাছে শুশ্রুত সংহিতা আবশ্যিক পাঠ্য হিসাবে পরিচিত। শারীরিক চিকিৎসার সঙ্গে মানসিক সম্পর্কের বিষয়টাও বিশেষভাবে উল্লেখিত আছে এই গ্রন্থে। যেমন রোগী ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে চিকিৎসকের আচার ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত। মনস্তাত্ত্বিক কারণেও রোগীর দ্রুত আরোগ্য লাভের সম্ভাবনার প্রতি দীর্ঘ আলোকপাত করা হয়েছে।

বর্তমান যুগে যখন হাসপাতালে চিকিৎসক নিগ্রহের বিষয়টি প্রায়শই সংবাদের শিরোনাম হয় তখন শুশ্রুত সংহিতার কথা মনে পড়ে।

চরক :— চিকিৎসা বিজ্ঞানের আর এক ভারতীয় স্রষ্টার নাম হলো চরক। ঐতিহাসিকরা মনে করেন আনুমানিক তিন'শ শতকে চরক জন্মগ্রহণ করেন। সনাতন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুসারে ভগবান বিষ্ণু যখন মৎস্য অবতার রূপে আবির্ভূত হন, তখন অনন্তদেব অথর্ব বেদের অন্তর্গত আয়ুর্বেদ বিদ্যা লাভ করেন। রোগক্লিষ্ট পৃথিবীর মানুষের কষ্ট উপশমের জন্য তিনি ছদ্মবেশে অর্থাৎ 'চর' রূপে পৃথিবীতে আবিভূত হন। তাই তার নাম 'চরক'। মুনিপুত্র রূপে মঠ-ধামে আবিভূত চরক মানুষের চিকিৎসা করতেন। তাঁর রচিত 'চরক সংহিতা' চিকিৎসা শাস্ত্রের এক অমূল্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর পূর্ববর্তী বিভিন্ন বৈদিক চিকিৎসকদের জ্ঞান ও তার নিজের অভিজ্ঞতাকে একত্রিত করে। বলা যেতে পারে, বৈদিক যুগের যাবতীয় চিকিৎসা বিদ্যাকে তিনি তাঁর গ্রন্থে সংযুক্ত করেন।

চরক সংহিতা আটটি ভাগে বিভক্ত— (১) সূত্রস্থান (২) নিদানস্থান (৩) বিমানস্থান (৪) শরীরস্থান (৫) ইন্দ্রিয়স্থান (৬) চিকিৎসাস্থান (৭) কল্পস্থান (৮) সিদ্ধিস্থান।

চরক হৃদপিণ্ডকে বলেছিলেন মানবদেহের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। ১৩টি পথে যা শরীরের সঙ্গে যুক্ত থাকে। মানবদেহের ৩৬০টি অস্থির কথাও বলেন তিনি। চরকই প্রথম চিকিৎসক, যিনি মানবদেহের পরিপাক, বিপাক ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার কথা বলেন। মানবদেহের কার্যকারিতার ফলে তিনটি 'দোষের' কথা উল্লেখ করেন। তা হলো— বাত, পিত্ত ও কফ। তিনি বলেন, প্রধানত এই তিনটি জিনিসের ফলেই মানুষের শরীর অসুস্থ হয় এবং তা ধীরে ধীরে কঠিন রোগের জন্ম দেয়। সে কারণে শরীর থেকে এই তিনটি ব্যাধিকে দূর করা প্রয়োজন। সুস্থ জীবনযাপনের জন্য চরক একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছিলেন মানুষকে। তা হলো, মানব শরীরে রোগ হলে চিকিৎসা করার আগে চেষ্টা করা উচিত যেন রোগের প্রকোপে না পড়তে হয়। অর্থাৎ 'প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যন কিওর।' এই সাবধানতা অবলম্বনের জন্য তিনি ব্যাভিচারহীন ধার্মিক জীবনযাত্রা, পরিমিত নিরামিশ আহার, সংযত জীবন ও সুরা পান থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন। শরীর সুস্থ রাখার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় নিদ্রা ও যোগব্যায়াম চর্চার কথাও বলেন। রোগ থেকে শরীরকে দূরে রাখার জন্য যে আধুনিক 'টিকা' বা প্রতিষেধক গ্রহণ করা হয় তার ভাবনা কিন্তু লুকিয়ে ছিল মহর্ষি চরকের এই চিন্তাধারার মধ্যেই।

পতঞ্জলি :— মহর্ষি চরক যে যোগাভ্যাসের কথা বলেছিলেন, সে বিষয়ে বলতে আর এক মহাঋষির নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। তিনি পতঞ্জলি। শরীর সুস্থ রাখা এবং রোগ দূর করার জন্য তিনি যোগাভ্যাস সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ রচনা করেন। বৈদিক যুগে আর্যাবর্তের ঋষিরা নিয়মিত যোগাভ্যাস করতেন। যে কারণে রোগের প্রকোপ থেকে মুক্ত হয়ে তারা কয়েকশো বছর পর্যন্ত জীবনধারণ করতে পারতেন। হিন্দু ধর্মের সঙ্গে যোগদর্শন

মহর্ষি শুশ্রুত

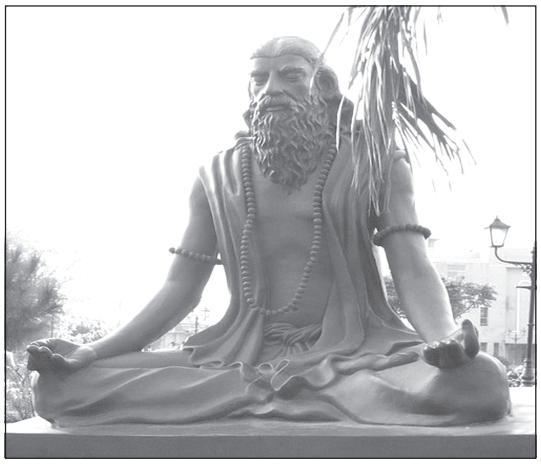

মহর্ষি চরক

ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হিন্দু যোগদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রগ্রন্থ 'যোগসূত্র', সংকলক ছিলেন পতঞ্জলি। পানিনির বিখ্যাত 'অষ্টাধ্যায়ী'র ওপর ভিত্তি করে ঋষি পতঞ্জলি 'মহাভাষ্য' গ্রন্থ রচনা করেন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের ওপরেও তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ঐতিহাসিকদের অনুমান, শুশ্রুত ও চরকের মধ্যবর্তী সময়ে ছিল পতঞ্জলির কার্যকাল। অষ্টম শতাব্দীর রচনাতে আমরা সে সময় আর এক পতঞ্জলিকে পাই, যিনি চরক সংহিতার উপর ভিত্তি করে চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়ক 'চরক বর্তিকা' নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন।

মহর্ষি পতঞ্জলির 'যোগসূত্র' গ্রন্থে ১৬৯টি যোগসূত্র আছে। মধ্যযুগ পর্যন্ত এই গ্রন্থটি অন্তত ৪০টি ভাষাতে অনুবাদিত হয়েছিল সংস্কৃত ভাষা থেকে। 'পতঞ্জলি' নামকরণের পিছনে পুরাণে উল্লেখিত একটি গল্প আছে। এক যোগিনী পুত্র সন্তানের কামনায় সূর্যদেবের তপস্যা করছিলেন দুটি হাত উন্মুক্ত করে ভিক্ষা চাইবার ভঙ্গিতে। হঠাৎ যোগিনীর মনে হয়, তার হাতে কী যেন একটা এসে পড়ল। চোখ খুলে তিনি দেখেন, তার হাতের মধ্যে একটি নাগশিশু। যে গাছের তলায় বসে তিনি তপস্যা করছিলেন হয়তো সেই গাছের ডাল থেকে পড়েছে। দেবতার দান মনে করে যোগিনী তাকে বলেন, 'তোমাকে আমি পালন করব'। তিনি কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সেই নাগ শিশু মানব শিশুর রূপ ধারণ করে। যোগিনীর উন্মুক্ত হস্ত বা অঞ্জলিতে তার পতন হয়েছে বলে যোগিনী তার পুত্রের নাম রাখেন পতঞ্জলি। পরবর্তীকালে সেই শিশু 'যোগসূত্র'র রচয়িতা মহর্ষি পতঞ্জলি নামে পরিচিত হন। ভারতীয় যোগশাস্ত্রের সম্পূর্ণ রূপ হলো ভাগবৎ গীতা। বশিষ্ঠ মুনি, যাজ্ঞবল্ক ও পতঞ্জলির যোগসূত্র। যার পূজারি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তক্ষশিলা নগরীর গৌরবোজ্জল অধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে মহর্ষি পতঞ্জলির নাম। তিনি একাধারে ছিলেন ভারতীয় যোগ দর্শনের প্রবর্তক, ব্যাকরণবিদ, দার্শনিক ও চিকিৎসা শাস্ত্রে পণ্ডিত।

বৈদিক যুগে আরও অনেক ঋষির রচিত চিকিৎসা শাস্ত্র সংক্রান্ত অমূল্য গ্রন্থ ছিল। ছিলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানে পণ্ডিত আরও অনেক ঋষি, চিকিৎসক। যেমন নাগার্জুন। শুশ্রুতের কিছু পূর্বে ছিলেন নাগার্জুন। চরক তার সংহিতা রচনা করার সময় নাগার্জুনের গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছিলেন। এছাড়া ছিলেন আত্রেয়, অগ্নিবেশ সহ আর কিছু চিকিৎসাবিদ গ্রন্থ রচয়িতা। প্রাচীন সংস্কৃক্ত পুঁথিতে যাদের উল্লেখ আছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের নানাদিক সম্বন্ধে জ্ঞানের দীপ জ্বেলেছিলেন তাঁরা। তাঁরা কেউ শিখিয়ে ছিলেন শরীর অসাড় করে যন্ত্রণাহীন শল্য চিকিৎসার পদ্ধতি। আবার কেউ শিখিয়ে ছিলেন কীভাবে রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে হয় তার বিদ্যা। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অধিকাংশ শিক্ষার সূচনাই এই সব মুনি-ঋষিদের দ্বারাই হয়েছে। এমনকী ঋষি শুশ্রুতের গ্রন্থে শব-ব্যবচ্ছেদের (পোস্ট মর্টেম) কথাও রয়েছে। শুশ্রুত সংহিতা মূল গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল সংস্কৃত ভাষায়। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে 'চরক সংহিতা' অনুবাদ করা হয় আরবি ভাষাতে। বইয়ের নামকরণ করা হয় 'কিতাব শুশ্রুত এ হিন্দ' বা 'কিতাব এ শুশ্রুত'। বই দুটি এরপর এশিয়া থেকে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। ভারতে আসা প্রাচীন ইউরোপিয়ানরাও নিজ নিজ দেশে বহন করে নিয়ে যান মহাঋষি শুশ্রুত, মহাঋষি চরক, মহাঋষি পতঞ্জলির চিকিৎসা বিজ্ঞানকে। আর তার আলোকেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ইউরোপের চিকিৎসা শাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্রের নিগূঢ় বিদ্যার সঙ্গে পরিচিত হয় ইউরোপ, আমেরিকা সহ অন্যান্য দেশ। মহাঋষি শুশ্রুতের ভেষজ চিকিৎসা বিদ্যা, মহাঋষি চরকের শল্যবিদ্যা, মহাঋষি পতঞ্জলির যোগ বিদ্যাই পৃথিবীর যাবতীয় চিকিৎসা বিদ্যার মূল উৎস। যা বিকশিত হয়েছিল পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে সনাতন হিন্দু ধর্মকে অবলম্বন করে।

আজ আয়ুর্বেদ নিয়ে নানান বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কাজ করছেন, খুঁজে চলেছেন বিভিন্ন ঔষধি বৃক্ষ বা মেডিসিন প্ল্যান্টের কার্যকারিতা। কিন্তু আজ থেকে দু-হাজার বছর আগে বৈদিক ঋষিরা শতাধিক ঔষধি গাছ বা মেডিসিন প্ল্যান্টের নাম জানতেন। নির্দিষ্ট ভাবে তাদের গুণাবলীও জানতেন। ভাবা যায়!

(লেখক ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক)

মহর্ষি নাগার্জুন

মহর্ষি পতঞ্জলি

ARYA TOURIST LODGE

Just 5 Minute walk from N.D. Rly. Station

Only 1 km. from Connaught Place

Homely Atmosphare

Day & Night Taxi Facilities

8526, Ara Kashan Road
Ram Nagar,
New Delhi - 110055

Phones : 23622767, 23623398, 23618232

STD : 23530775, 23533398,23618232
Cont : 9811044543

E-mail : arya_tourist_lodge@yahoo.co.in
Fax : 91-11-23636380

With Best Compliments from -

Redox Pharmachem Pvt. Ltd.

Office : C-46, Defence colony
New Delhi - 110 024
India

SAHARA®

Air Coolers, Storage Water Heaters, Exhaust Fans, Ceilling Fans, Fresh Air Fans, Cooler Kit, Washing Machines, Heat Convectors

VIKAS ENGINEERS

Manufacturers of :
SAHARA Electrical Appliances
D-377/378, Sector-10, NOIDA-201301
Ph.:0120-2520297, 2558594
Telefax : 0120-2526961
Website : www.saharaappliancesindia.com

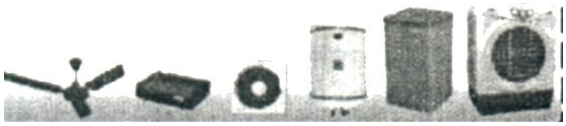

011-32306597
011-30306592

SRE

SNEH RAMAN ELECTRICALS PVT. LTD.

E-12, Sector - XI, Noida -201 301,
Distt. Gautam Budh Nagar (U.P.)

Ph. : 91-0120-3090400, 91-0120-3090401,

Manufacturer :

Power Transformers ● Furnace Transformers ● Voltage Stabilizer-Manual/Servo ● D.C. Drive ● Control Panels HT/LT/Metering ● Distribution ● Automatic Starters upto 500 H.P. ● Turn Key Projects ● Electrical-Mechanical ● OrderSupplier● Traders (Heavy Electrical Repair's)

Regd. Office : W.Z. 3227, Mohindra Park, Shakur Basti, Rani Bagh, Delhi

অমরত্ব

সিদ্ধার্থ সিংহ

সেই কোন ছোটবেলায় গল্পটা শুনেছিল নির্মল। একটা মানুষের অমর হওয়ার গল্প। মানুষটা যদি সত্যিই অমর হয়ে থাকেন, তা হলে তো তাঁর এখনও বেঁচে থাকার কথা। কিন্তু তিনি কোথায়! তাঁর কাছে গিয়ে সে জেনে নেবে, কী করে অমর হওয়া যায়।

কিন্তু না। হাজার চেষ্টা করেও সে তাঁর খোঁজ পায়নি। যতদূর জেনেছে, ওই লোকটাই প্রথম এবং ওই লোকটাই শেষ। তাঁর আগেও কেউ অমর হয়নি, তাঁর পরেও না। অর্থাৎ উনি একা একাই অমর হওয়ার কৌশলটা বের করেছিলেন। তিনি যদি পারেন, তবে সে কেন পারবে না! কিন্তু কোথা থেকে হাঁটা শুরু করবে সে!

ইতিমধ্যেই সমস্ত জ্যোতিষী তার চষা হয়ে গেছে। কেউ ওর কথা শুনে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকেছেন, কেউ হেসে উঠেছেন, কেউ আবার ভেবেছেন, ছেলেটা নির্ঘাত কোনো পাগল। অমর হওয়ার সত্যিই যদি কোনো রাস্তা থাকত, তাহলে কি তাঁরা অমর হওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তেন না!

নির্মলের মনে হলো, জ্যোতিষীরা যখন বলতে পারছেন না, তখন নিশ্চয়ই কোনো মন্ত্রতন্ত্র

আছে! যেটা উচ্চারণ করলেই অমর হওয়া যায়। ও একের পর এক কিনতে শুরু করল তন্ত্রমন্ত্রের বই। দিনরাত এক করে পড়তে লাগল। পড়তে পড়তে ও পেল কয়েকটা টোটকা। সূর্য ওঠার আগে সমপরিমাণ স্বর্ণচূর্ণ, পিপুলচূর্ণ আর কালো গোরুর চোনা ভালো করে মিশিয়ে লেই করে, সেই লেই মুখে মেখে যার সামনে গিয়ে দাঁড়ানো যাবে, মুহূর্তের মধ্যে সে সম্মোহিত হয়ে যাবে। পাওয়া গেল এমন মন্ত্র, কারও মুখ মনে মনে কল্পনা করে, সেই মন্ত্র মাহেন্দ্রক্ষণে একশো আটবার জপ করলেই সে যতই অপছন্দ করুক না কেন, তারপর থেকেই সে তাকে পাবার জন্য পাগল হয়ে উঠবে। তার পিছু পিছু ঘুরবে। শত্রু হলেও ভক্ত হয়ে যাবে। পাওয়া গেল এমন মন্ত্রও, যে মন্ত্র মাঘী পূর্ণিমার মধ্যরাতে স্নান টান করে নতুন বস্ত্র পরে ধূপ ধুনো জ্বেলে সহস্র একবার জপ করলেই মানুষ তো কোন ছার, সমস্ত জীবকুল, দৈত্যকুল এবং ঈশ্বরকুলও বশীভূত হয়ে যাবে।

কিন্তু এসব তো সে চায় না। তাই ওগুলো কীভাবে করতে হয় বা করলেও আদৌ কোনো ফল পাওয়া যায় কিনা, সেটা পরীক্ষা করে দেখেনি। সে চায় অমর হওয়ার চাবিকাঠি। কিন্তু না। তন্নতন্ন করে খুঁজেও ওইসব বইয়ে সেরকম কিছুই পেল না সে। তবে কী প্রাচীন কোনো গ্রন্থে পাওয়া যেতে পারে এর হদিশ!

মনে হতেই নির্মল ছুটল চোদ্দ পুরুষ ধরে তন্ত্রসাধনা করা সিদ্ধপুরুষ শ্যামাকান্ত তর্কালঙ্কারের বাড়ি। কিন্তু সেখানে গিয়ে ধুলোয় ঢাকা পাহাড় প্রমাণ বই ঘেঁটেও কোনো লাভ হলো না। খোঁজখবর করে হাজির হলো, দীর্ঘদিন তালা বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা, নষ্ট হতে বসা তন্ত্রগ্রন্থের একমাত্র সংগ্রহশালায়। আঁশ বেরিয়ে যাওয়া, তুলো তুলো কাগজের এক একটা পাতা আলতো আলতো করে উল্টিয়েও সন্ধান পেল না তার, যেটা সে হন্যে হয়ে খুঁজছে। একদিন শুনল, পুকুরের মাটি কাটতে টাকতে কোথায় নাকি পাওয়া গেছে একটা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। তার মধ্যেই মিলেছে কতগুলো পোড়া মাটির বাসনপত্র, মূর্তি আর লোহার চেয়েও মজবুত মাটির একটা সিন্দুক। সেই সিন্দুকের ভেতরে পাওয়া গেছে একগাদা তালপাতার পুঁথি। কিন্তু ওগুলো যে কোন যুগের বোঝা যাচ্ছে না। বিশেষজ্ঞের দল রওনা হয়ে গেছে।

পুঁথি! তালপাতার পুঁথি! তাও আবার পুরনো দিনের! খবর পাওয়ামাত্র সে ছুটে গেল সেখানে। কিন্তু ওইসব পুঁথি যে কোন হরফে লেখা, সেটাই উদ্ধার করতে পারল না বিশেষজ্ঞরা। পণ্ডিতেরা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। ফলে ও হাল ছেড়ে দিল।

হঠাৎ একদিন খবরের কাগজের এক কোণে ছোট্ট একটা খবরে চোখ আটকে গেল তার। কোথাকার এক কবিরাজ নাকি কী একটা ওষুধ বের করেছেন। সেই ওষুধ টানা সাতদিন খেলেই আর চিন্তা নেই, মৃত্যুর জন্য হাঁসফাঁস করা যন্ত্রণাক্লিষ্ট কর্কট রোগীও একদম সুস্থ হয়ে উঠেছেন। দূরদূরান্ত থেকে লোক ছুটে আসছে। প্রতিদিন সকাল থেকে লাইন পড়ে যাচ্ছে তাঁর বাড়ির সামনে।

খবরটা পড়ে নির্মল ভাবতে লাগল, সত্যি, আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্র এক সময় কত উন্নত ছিল। তখনকার চিকিৎসকরা প্রায় মরা মানুষকে বাঁচিয়ে দিতে পারতেন। প্রায় কেন? মরা মানুষকেও তো বাঁচিয়েছেন বহুবার। মনে নেই? শক্তিশেলে ঘায়েল হয়ে লক্ষ্মণ তখন মরো মরো, পাশেই ছিলেন বানর রাজবৈদ্য সুষেণ। তিনি বলেছিলেন, মৃতসঞ্জীবনী গাছের কথা। কোথায় পাওয়া যাবে, তাও বলে দিয়েছিলেন। সেই মতো এক লাফে সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল হনুমান। কিন্তু কোন গাছটা যে মৃতসঞ্জীবনী, বুঝতে না পেরে পুরো গন্ধমাদন পাহাড়টাকেই তুলে এনেছিল সে। সুষেণ তখন ওই গাছের ক'টা পাতা ছিঁড়ে, হাতের তালুতে ডলে ক্ষতস্থানে লাগাতেই আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছিলেন লক্ষ্মণ।

যে শাস্ত্র মরা মানুষকে বাঁচিয়ে দিতে পারে, সে শাস্ত্র কি জীবিত মানুষকে অমরত্ব দিতে পারে না! নিশ্চয়ই পারে। এই বিশ্বাস থেকেই সে আবার পড়তে শুরু করল চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রাচীন গ্রন্থ চরক সংহিতা, সুশ্রুত সংহিতা, অথর্ব বেদ। অথর্ব বেদ পড়তে পড়তে তো তার চক্ষু চড়কগাছ। আয়ুর্বেদে তখন নাক, কান, গলা, শিশুচিকিৎসা, আকুপাংচার, শল্যচিকিৎসা, এমনকী মনোচিকিৎসারও ব্যবস্থা ছিল। এই জন্যই বুঝি আয়ুর্বেদকে বাংলা করলে দাঁড়ায় জীবন-জ্ঞান। জীবন-জ্ঞানই তো। আয়ু মানে যদি লাইফ হয়, আর বেদ মানে নলেজ, তার বাংলা তো জীবন-জ্ঞানই হবে, তাই নয় কী? উৎসাহিত হয়ে সে খুঁজতে লাগল স্বর্গের চিকিৎসক অশ্বিনী ভ্রাতৃদ্বয়, মগধের রাজা অজাতশত্রুর রাজবৈদ্য জীবক আর ধন্বন্তরীর মতো পণ্ডিত চিকিৎসকেরা কোনো ভূর্জপত্র বা তালপাতায় কিছু লিখে রেখে গেছেন কি না। হয়তো লিখে রেখে গেছেন। কিন্তু শত চেষ্টা করেও ও সেটা খুঁজে পেল না।

সেসময় অনেক চিকিৎসকই অনেক যুগান্তকারী ওষুধ আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু অনেকেই সেগুলো লিপিবদ্ধ করে যাননি। যেমন প্রশান্ত খাস্তগির। বেশ কয়েক দশক আগে এ দেশে এক মহামারীর চেহারা নেয় ঢেপু জ্বর। সেই জ্বরে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হতে

লাগল। ঠিক তখনই ওই রোগ নিরাময়ের একটা মোক্ষম ওষুধ তৈরি করে ফেললেন এই দেশেরই এক চিকিৎসক— প্রশান্ত খাস্তগির। শুনেছি, তাঁর নামে নাকি একটা রাস্তাও হয়েছে কলকাতায়। তিনি নিজেই সেই ওষুধ বানাতেন। নিজের হাতেই রোগীদের দিতেন। কিন্তু কী কী দিয়ে বানাতেন, আর তার অনুপাতই বা কী, সেটা নাকি কাউকেই বলে যাননি তিনি। লিখেও রেখে যাননি কোথাও।

হয়তো অমর হওয়ার ওষুধও কেউ আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু এই প্রশান্ত খাস্তগিরের মতো তিনিও হয়তো তা লিখে রেখে যাননি। কিংবা লিখে রেখে গেছেন এমন জায়গায়, যেখানে এখনও মানুষের নাগাল পৌঁছায়নি। যে দিন পৌঁছবে, সে দিন হয়তো মাটির সিন্দুকে পাওয়া তালপাতার পুঁথিগুলোর মতোই সেটা যে কোন হরফে লেখা, সেটাই বুঝতে পারবে না কেউ। নাঃ, চিকিৎসাশাস্ত্রের কোনো বইতেই পাওয়া গেল না তেমন কিছু।

কিন্তু অমর শব্দটা যখন আছে, তখন সেটা পাওয়ার নিশ্চয়ই কোনো না কোনো একটা রাস্তা তো থাকবেই। সেটা তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। কিন্তু কোথায় খুঁজবে সে? কার কাছে। কোনো সাধু সন্তদের কাছে! হ্যাঁ, তাঁদের কাছে পাওয়া গেলেও যেতে পারে। একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী?

নির্মল শুনেছে, তারাপীঠ নাকি খুব জাগ্রত। সেখানে প্রচুর লোক সাধনা করেন। তাহলে কি সেখানে ও একবার যাবে! গেলে হয়তো পাওয়াও যেতে পারে তেমন কোনো সাধু, যিনি ওকে বলে দিতে পারেন, অমর হওয়ার কোনো কৌশল। মনে হতেই বাক্সপ্যাঁটরা বেঁধে বেরিয়ে পড়ল নির্মল।

তারাপীঠে পা রাখতেই শিহরিত হলো সে। এখানেই তো সাধনা করেছিলেন বামাখ্যাপা! ভক্তিতে মন গদগদ করে উঠল। পুজোটুজো দিয়ে শ্মশানের দিকে হাঁটা দিল সে। দূর থেকেই দেখতে পেল, অজস্র ঝুরিটুরি নামা বিশাল একটা অশ্বত্থগাছের তলায় একজন বসে আছেন। মাথায় একগাদা জটাজুটো। কে উনি! তাঁকে কেমন যেন চেনা চেনা লাগল তার। কিন্তু উনি যে কে, কিছুতেই মনে করতে পারল না। গুটিগুটি তাঁর কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। চারপাশ ভালো করে দেখে নিয়ে, খুব আস্তে আস্তে বলল, 'বাবা, আমার একটা জিজ্ঞাসা আছে...'

— বল বেটা।

— বলছি, আপনি কি বলতে পারবেন, কী করলে অমর হওয়া যায়?

উনি আকাশের দিকে মুখ তুললেন। — সব তাঁর ইচ্ছে। তার পরেই গান ধরলেন— কারে দাও মা ব্রহ্মপদ / কারে

করো অধোগামী / সকলই তোমারই ইচ্ছা / ইচ্ছাময়ী তারা তুমি / তোমার কর্ম তুমি করো মা/ লোকে বলে করি আমি... জয় মা তারা, জয় মা, জয় মা... কাজ কর, কাজ কর... বলতে বলতে চোখ বুজলেন তিনি।

কাজ কর! সে কি কাজ করে না! প্রচুর কাজ করে। তবে, তার এখন সবচেয়ে বড়ো কাজ, কী করলে অমর হওয়া যায়, তার সন্ধান করা। যেভাবেই হোক, যার কাছ থেকেই হোক এটা তাকে জানতেই হবে।

নির্মল উঠতে গিয়ে দেখে, তার পেছনে একজন ভদ্রলোক, সঙ্গে একজন ভদ্রমহিলা আর দুটো বাচ্চা। ঠিক বাচ্চা নয়, একটা বালক আর একটা বালিকা। দেখে মনে হয়, এই ভদ্রলোকেরই বউ ছেলেমেয়ে। এরা যে কখন এসে দাঁড়িয়েছে ও টের পায়নি। ও উঠতেই ভদ্রলোক বললেন, কী বলছেন বাবা?

— বলছেন, জয় মা তারা।

— ও।

ভদ্রলোক কথা বলতেই, ও কেমন যেন একটা ভরসা পেল। দুম করে জিজ্ঞেস করে বসল, আচ্ছা দাদা, সবথেকে বড়ো সাধু কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারেন?

— সবথেকে বড়ো সাধু! কে ছোট কে বড়ো, এ বিচার কে করবে? তবে, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আপনি যে ধরনের সাধু খুঁজছেন, সেরকম সাধু এখানে পাবেন না। হিমালয়ে হয়তো পেতে পারেন। শুনেছি, বড়ো বড়ো সাধুরা নাকি হিমালয়ের গুহায় যুগ যুগ ধরে সাধনা করেন।

— হিমালয়ে!

— না, আপনাকে হিমালয়ে যেতে বলছি না। কাছাকাছির মধ্যে কামরূপ কামাখ্যাতেও যেতে পারেন। ওখানে নাকি অনেক বড়ো বড়ো সাধু আছেন।

— কামরূপ কামাখ্যায়!

মনে মনে নির্মল ভাবল, শুধু কামরূপ কামাখ্যায় কেন? সামান্য একটা খুন, জালিয়াতি বা বিস্ফোরণের কিনারা করতে সিআইডি বা ভিজিলেন্সের লোকেরা যদি চীন, জাপান, আমেরিকা যেতে পারেন, তো কীভাবে অমর হওয়া যায়, এটা জানার জন্য কী সে হিমালয়ে যেতে পারবে না! পারবে। পারবে! নিশ্চয়ই পারবে। তবে, হাতের কাছে যখন কামরূপ কামাখ্যা রয়েছে সেখানেই আগে ঢুঁ মারা যাক।

নির্মল গিয়ে পৌঁছল কামরূপ কামাখ্যায়। এটা নাকি তন্ত্র সাধনার সাধনপীঠ। অনেক বড়ো বড়ো সাধুরা এখান থেকেই সিদ্ধ হয়েছেন। যাঁরা সিদ্ধ হয়েছেন তাঁদের কাউকে কী সে পাবে না! নিশ্চয়ই পাবে।

পেল শেষ পর্যন্ত। তিনি নাকি ত্রিকালদর্শী। সব দেখতে পান। ইহকাল পরকাল, সব। এমন কোনো প্রশ্ন নেই, যার উত্তর তাঁর অজানা। নির্মল তাঁর চরণে গিয়ে পড়ল। তিনি তখন চোখ বুজে ধ্যানে মগ্ন। তাঁর সামনে কতগুলো ফলমূল, বাতাসা, মঠ, সন্দেশ। ফলগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। গন্ধ বেরোচ্ছে। মঠ আর বাতাসাগুলো খেয়ে খেয়ে পিঁপড়েরা ফোঁপরা করে দিয়েছে। গিজগিজ করছে পিঁপড়ে।

নির্মল হঠাৎ দেখল, পিঁপড়েগুলো হুড়োহুড়ি করছে। তার উপস্থিতি টের পেয়ে কি ওরা চলে যাচ্ছে? কোথায় যাচ্ছে ওরা! দেখতে গিয়ে দেখে, পিঁপড়েগুলো সার বেঁধে ওই ত্রিকালদর্শীর পা বেয়ে, এক চিলতে পোশাক পেরিয়ে, গা বেয়ে উঠে, ঠোঁটের ভিতর দিয়ে নাকের ভিতর দিয়ে কানের ভিতর দিয়ে কোথায় যেন মিলিয়ে যাচ্ছে! সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই শুনতে পেল, কে যেন তাকে বলছেন— বাবা এখন ধ্যানে বসেছেন...

কে বললেন কথাটা! ডান দিকে ঘাড় ঘোরাতেই নির্মল দেখল, পাশেই একজন সাধু দাঁড়িয়ে আছেন। অমনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল সে। জিজ্ঞেস করল, বাবা কখন উঠবেন?

উনি বললেন, কয়েক মিনিট হতে পারে, কয়েক সপ্তাহ হতে পারে, কয়েক মাসও হতে পারে। আবার কয়েক বছরও হতে পারে। এমনকী কয়েক যুগ হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই...

— সে কী!

— হ্যাঁ, বাবা যখন ধ্যানে বসেন, কখন উঠবেন কেউ বলতে পারে না।

— কিন্তু আমি যে অনেক দূর থেকে এসেছি...

— কী ব্যাপার বলুন।

— না, মানে, আমার একটা প্রশ্ন ছিল।

— আমাদেরও প্রচুর প্রশ্ন থাকে। উনি ধ্যানে থাকলে ওনার সামনে বসে মনে মনে সেই প্রশ্ন করি। উত্তরও পেয়ে যাই।

— তাই!

— হ্যাঁ। আপনি করে দেখুন। আপনিও আপনার সব প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন।

— সত্যি?

— পৃথিবীর কিছুই সত্য নয়। সবই অনিত্য। করেই দেখুন না... বলেই উনি হাঁটা দিলেন। নির্মল ওঁর কথা মতো সেই ত্রিকালদর্শীর সামনে আবার হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। মনে মনে জানতে চাইল— কী করে অমর হওয়া যায় বাবা?

সব চুপচাপ। কিছুক্ষণ পরে আবার একই প্রশ্ন করল সে— বলো না বাবা, কী করে অমর হওয়া যায়?

টুঁ শব্দটি নেই। অনেকক্ষণ কেটে গেল। ফের মনে মনে বলল সে— বলো বাবা, কী করে অমর হওয়া যায়?

কোনো উত্তর নেই। হাঁটু টনটন করছে। হৃদ্‌পিণ্ডের শব্দ শোনা যাচ্ছে,

ধক্ ধক্ ধক্...

উনি যে বললেন, ওনার সামনে বলে মনে মনে প্রশ্ন করলেই উত্তর পাওয়া যায়। কই, কোনো উত্তর তো পেলাম না। তাহলে কী উনি এমনি এমনি বললেন। মিথ্যে মিথ্যে। অবশ্য উনি বলেছেন, উত্তর পাওয়া যায়। কিন্তু প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই যে পাওয়া যায়, ওটা কিন্তু একবারও বলেননি। তবে কী পরে পাবো! দেখা যাক। না হলে তো হিমালয় আছেই। এর পরেই গো টু হিমালয়।

ফেরার জন্য ট্রেনে উঠে বসল নির্মল। ট্রেন চলছে। তার সিট পড়েছে মাঝের বাঙ্কে। সে বুঝতে পারছে, এই খোপে সেই কেবল আলাদা। বাকিরা সব একই পরিবারের। এমনকী ওদিকের জানালার মুখোমুখি দুটো সিটের, একটায় বসে যে বাচ্চা ছেলেটা বই পড়ছে, আর তার সামনেরটায় হেলান দিয়ে বসে যে মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোকটি চোখ বন্ধ করে ঢুলছেন, তাঁরাও এদেরই সঙ্গে। দিনের বেলা, তাই সিট নামানো হয়নি। নীচের সিটের একধারে বসে আছে সে। জানালার দিকে চোখ।

— অমর, কমলালেবু খাবি?

'অমর' শব্দটা শুনেই ফিরে তাকাল নির্মল। দেখল, সামনের সিটের ভদ্রমহিলার কোলের উপরে কতগুলো কমলালেবু। উনি একটু ঝুঁকে ওইদিকের জানালার সিটে বই পড়তে থাকা বাচ্চা ছেলেটাকে উদ্দেশ্য করে আবার একই কথা বললেন। ছেলেটি এতই মগ্ন হয়ে বই পড়ছিল যে, প্রথমবারটা শুনতেই পায়নি। এবার শুনতে পেল। বলল, দাও। বলেই, বইটা বন্ধ করে, সিটের উপরে রেখে এগিয়ে এল সে। কাছে আসতেই ভদ্রমহিলা তার হাতে দুটো কমলালেবু দিলেন। আড়চোখে নির্মলকে দেখিয়ে বললেন, আঙ্কেলকে একটা দাও।

নির্মল বলল, না, না, থাক।

— থাক কেন? খান না। ভদ্রমহিলা বলতেই ছেলেটার বাড়িয়ে দেওয়া হাত থেকে একটা কমলালেবু নিল নির্মল। মৃদু স্বরে ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম অমর?

— হ্যাঁ।

— কোথায় থাকো?

— কলকাতায়।

— কোন ক্লাসে পড়ো?

— সেভেনে।

— কোন স্কুলে?

— নব নালন্দায়।

— একটু আগে দেখছিলাম, তুমি একটা বই পড়ছিলে, স্কুলের বই?

— না, না। গল্পের বই।

— ও, আচ্ছা। আচ্ছা, তোমার নাম

তো অমর, তুমি কী জানো, কী করে অমর হওয়া যায়?

— হ্যাঁ। মাথা কাত করল ছেলেটা।

— জানো? বেশ মজা পেল নির্মল। যে প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য সে হিল্লি-দিল্লি চষে বেড়াচ্ছে। কেউ বলতে পারছে না। সাধু সন্তরা পর্যন্ত ফেল পড়ে যাচ্ছে। আর এইটুকুন একটা ছেলে, সে বলে কিনা সে জানে কী করে অমর হওয়া যায়।

নির্মল তাকে বলল, বলো তো কী করে?

— কাজের মাধ্যমে।

— কাজের মাধ্যমে?

— হ্যাঁ। ওই যে বইটা পড়ছিলাম না... সেখানেও তো রয়েছে, নৌকো ডোবার পরে সবাইকে একে একে বাঁচিয়ে শেষে এই গল্পের নায়ক জলের তোড়ে নিজেই তলিয়ে গেল জলে। নিজের জীবন দিয়ে সে অমর হয়ে রইল।

— জীবন দিয়ে অমর!

— না, না। জীবন দিয়ে না। নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে লোকেদের বাঁচিয়ে তাঁদের মধ্যেই সে বেঁচে রইল। ভালো কাজ করলে সেই কাজের মধ্যে দিয়েই লোক বেঁচে থাকে। জানেন না? যেমন শাজাহান। শাজাহান তো এখন নেই। কিন্তু তাজমহল গড়ার জন্য তিনি কিন্তু অমর হয়ে আছেন। যেমন রবীন্দ্রনাথ, তিনি তাঁর লেখার মধ্যে দিয়েই অমর হয়ে আছেন। যেমন রামকৃষ্ণ, তিনি সবার ঘরে ঘরে আছেন। সবার মনে মনে আছেন। এটাই তো অমর হওয়া...

— এটা অমর হওয়া!

— হ্যাঁ। মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকে না। কিন্তু বেঁচে থাকতেই পারে। তার কাজের জন্য। কাজই মানুষকে অমর করে রাখে।

কাজ! এই জন্যই কী তারাপীঠের ওই সন্ন্যাসী তাকে বলেছিলেন, কাজ কর, কাজ কর! কাজের মধ্যে দিয়েই মানুষ বেঁচে থাকে! অমর হয়ে যায়! কামরূপ কামাখ্যার ওই সাধু তাকে ঠিকই বলেছিলেন, ওনার সামনে বসে মনে মনে প্রশ্ন করে দেখুন, ঠিক উত্তর পেয়ে যাবেন। ও পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে না পেলেও, পেয়েছে। ওর আর হিমালয়ে যাবার দরকার নেই।

এখন ওকে কাজ করতে হবে। সত্যিকারের কাজ। যে কাজের মধ্যে দিয়ে ও অমর হয়ে উঠবে। মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকবে সবার মনে, সবার হৃদয়ে। কিন্তু কী করবে সে! কী! ভাবতে ভাবতে জানালার দিকে মুখ করে বাইরের দিকে তাকাল সে। চোখের সামনে থেকে সরে সরে যাচ্ছে, গাছ বাড়ি মাঠ গরু ছাগল ল্যাম্পপোস্ট... কিন্তু ওর চোখে কিছুই পড়ছে না। ও শুধু তাকিয়ে আছে। তাকিয়েই আছে! কী করা যায়! কী করা যায়! কী! ■

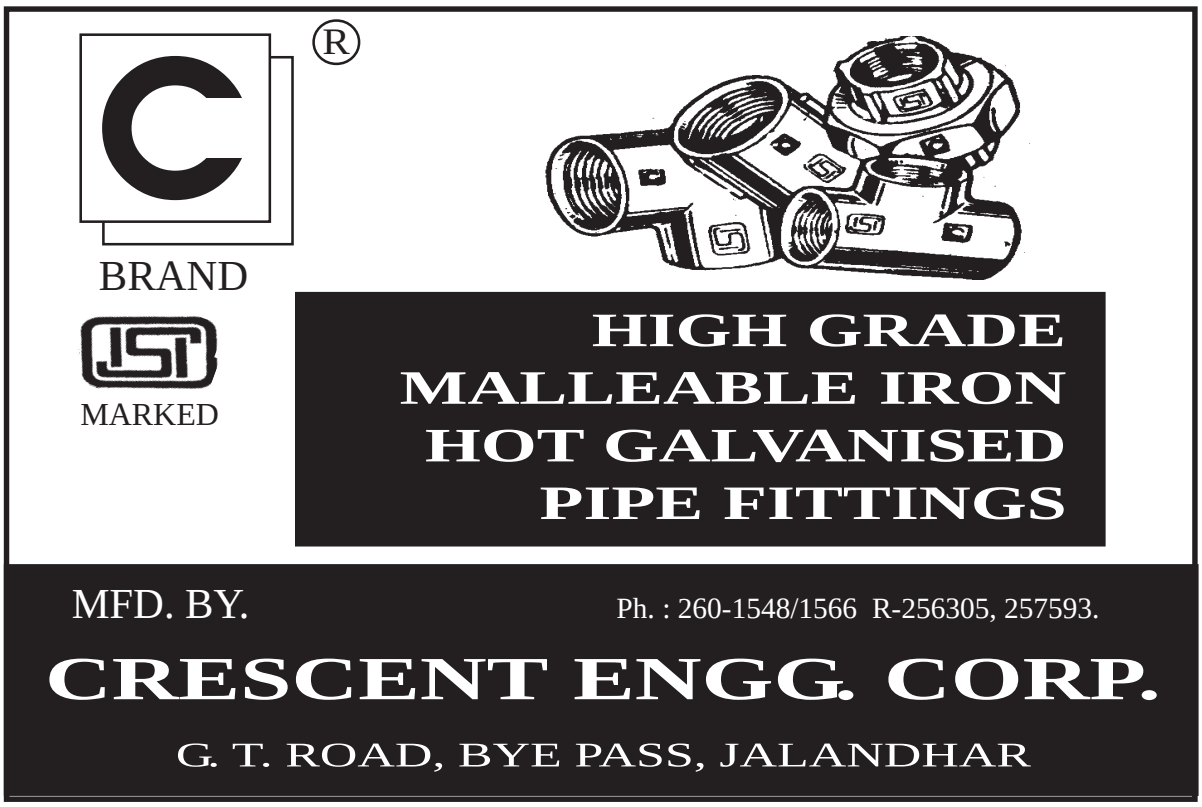

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রেখাঙ্কন শিরোমিতিবিদ্যার প্রয়োগ ও প্রভাব

অর্ণব নাগ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নতুন দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিলেত থেকে ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ২৯ ভাদ্র 'ভাই জ্যোতিদাদা' সম্বোধনে এক পত্রে লেখেন:

''আপনার ছবির খাতা আমি Rothenstein-কে দেখিয়েছি। তিনি এখানকার একজন খুব বিখ্যাত artist; তিনি দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেছেন। তিনি আমাকে বল্লেন, আমি তোমাকে বলছি, তোমার দাদা তোমাদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রী। আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর ড্রয়িং যাঁরা করেন, তাঁদের সঙ্গেই ওঁর তুলনা হতে পারে। এতদিন যে, আমাদের দেশে এ ছবির কোনো সমাদর হয়নি, এর মতো এমন অদ্ভুত ঘটনা কিছু হতে পারে না। most marvellous, most magnificent — এই তাঁর মত। তিনি বলেছেন, এখানকার সবচেয়ে বিখ্যাত art critic কে তিনি এই ছবি দেখাবেন, এবং এর একটা ছোট সমালোচনা তিনি নিজে লিখবেন। Portfolio-র আকারে একটা selection তোমাদের করা উচিত।... যেটা যথার্থ আপনার নিজের জিনিস এবং যাতে আপনার শক্তি এমন আশ্চর্যরূপে প্রকাশ পেয়েছে, সেটাকে লুপ্ত হতে দেওয়া উচিত হয় না। আপনার এ ছবি এখানে যাঁরাই দেখেছেন, সকলেই খুব প্রশংসা করেছেন। রোটেনস্টাইন খুব একজন গুণজ্ঞ লোক, এঁর মতে, আপনার চিত্রশক্তি একেবারেই প্রথমশ্রেণীর গুণীর উপযুক্ত, এ কথাটা চাপা রাখলে চলবে না''।[১]

নাহ! কথাটা শেষ পর্যন্ত মোটেও চাপা থাকেনি। চিত্রগুণী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সমাদর সমকাল ও উত্তরকালে হয়েছে। কিন্তু এই প্রশ্ন আমাদের ভাবাবে যে উইলিয়ম রঁদেনস্টাইনের মতো সমকালীন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ও চিত্রসমালোচক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকার মধ্যে এমন কী দেখেছিলেন যা তাঁকে এতটা উচ্ছ্বসিত করেছিল? তার আগে বলা দরকার, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অঙ্কনের বিষয়টি, যেটি ছিল মানব-মুখের প্রতিকৃতি। কবির কাছেই বিলেতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কন দেখেন রঁদেনস্টাইন। তাঁর কাছেই শুধু এনিয়ে নিজের বিস্ময় বিমুগ্ধতা প্রকাশ করে থেমে থাকেননি তিনি, ১৯১২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর হ্যাম্পস্টেড থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে লেখা এক পত্রে রঁদেনস্টাইন তাঁর রেখাঙ্কনের সংবেদনশীলতা ও চরিত্রায়নের তাৎপর্যতার সপ্রশংস উল্লেখ করেন:

I know of few drawings which show at the same time so much sensitiveness of line and sincerity in characterisation, and there is a beauty and nobility in the expression you give to your sitters which it whold be difficult to match[২]।

এরই ফলশ্রুতিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা প্রতিকৃতির একটি অ্যালবামের প্রকাশ ঘটল কলকাতায় নয় অবশ্য; খোদ বিলেতে।[৩] এহেন অ্যালবামের একটি সুন্দর ভূমিকা লিখলেন রঁদেনস্টাইন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্যতম জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষের বঙ্গানুবাদের সাহায্য নিয়ে সেই ভূমিকার একটি বিশেষ অংশ আমাদের দেখে নেওয়া দরকার:

> নিজের অনুরাগ বশতঃ ও আনন্দলাভার্থ তিনি বহুদিন হইতে আত্মীয় ও বন্ধুগণের চিত্র অঙ্কিত করিয়া আসিতেছেন, এবং সখের চিত্রকরগণের নিকট আমরা যে একাগ্রতা ও যথার্থতা আশা করিয়া থাকি অথচ প্রায়ই দেখিতে পাই না, সেই গুণগুলি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিত্রে প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। অঙ্কিত মুখগুলিতে এমন একটি আকৃতির সচেতনভাব আছে যাহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না।[৪]

সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেই আবার ফেরা যাক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অঙ্কিত প্রতিকৃতির রেখায় কীসের সন্ধান পেয়েছিলেন রঁদেনস্টাইন, যা তাঁকে আপ্লুত করেছিল এবং স্বদেশবাসীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেই বলি, রঁদেনস্টাইন সেদিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিত্রগুলি প্রকাশের উদ্যোগ না নিলে, চিত্রশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এতটা সমাদৃত হতেন কিনা, তা নিয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

আমাদের গভীর কৌতুহলের সেই প্রশ্নটির উত্তর হল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রেখায় ফুটে উঠেছিল ফ্রেনোলজি বা শিরোমিতিবিদ্যার প্রয়োগ, রঁদেনস্টাইন যার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন

সংবেদনশীলতা।

আধুনিককালে শিরোমিতিবিদ্যা (Phrenology)-কে বিজ্ঞানীরা ছদ্মবিজ্ঞান বা সিউডো-সায়েন্স বলে মনে করেন।[৫] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল শিরোমিতিবিদ্যা হলো 'মস্তিষ্কতত্ত্বের ওপর স্থাপিত এক প্রকার মনোবিজ্ঞান-তন্ত্র বিশেষ'[৬] মোট কথা মস্তিষ্কের গঠন-তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে মানব প্রকৃতির অনুধাবন-ই হলো শিরোমিতিবিদ্যার মূল কথা। তবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জানতেন তিনি যে শিরোমিতিবিদ্যা-চর্চার উদ্যোগ করেছেন তা তখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। তাই বিশিষ্ট দার্শনিক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন: 'আচ্ছা, ফ্রেনলজিতে তোমার কী খুব বিশ্বাস? ফ্রেনলজির সব কথাই কি ঠিক?' তখন অকপটে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বীকার করেছিলেন : 'আমি ফ্রেনলজিস্টদের সব কথা বিশ্বাস করি নে,— তবে মোটামুটি কতকটা মেলে— এই মাত্র।'[৭]

লালন ফকিরের স্কেচ : শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

তবে পুরোপুরি বিশ্বাস না করলেও শিরোমিতিবিদ্যা নিয়ে তাঁর চর্চার অন্ত ছিল না। সাময়িক-পত্রে এ সংক্রান্ত বহু প্রবন্ধের রচয়িতা তিনি, যেগুলি পরে তাঁর প্রবন্ধ সংকলন 'প্রবন্ধ মঞ্জরী'তে সংকলিত হয়েছে। যাই হোক, বিভিন্ন মানুষের প্রতিকৃতি নির্মাণের সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর শিরোমিতি বিদ্যাচর্চার ফলিত প্রয়োগ করেছিলেন, যে কারণে রঁদেনস্টাইনের বিবৃতি অনুযায়ী চিত্র রেখাঙ্কনের সংবেদনশীলতা আমরা দেখতে পাই। 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি'র অনুলেখক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য :

> দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'ভারতী'র সম্পাদকতা ছাড়িয়া দিবার কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথ ছেলেদের জন্য 'বালক' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত করেন। ইহাতে তখন জ্যোতিবাবু physiognomy (মুখসামুদ্রিক) ও phrenology (শিরসামুদ্রিক) বিষয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। 'বালকে' প্রতিকৃতিসহ শিরসামুদ্রিক অনুসারে স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর মহাশয়, রাজনারায়ণবাবু প্রভৃতি মহাত্মাগণের চরিত্র-সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবু ও রাজনারায়ণবাবুর ছবি জ্যোতিবাবুর স্বহস্তাঙ্কিত পেন্‌সিল স্কেচ হইতেই মুদ্রিত হইয়াছিল।[৮]

১২৯২ বঙ্গাব্দে বালক পত্রিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যে 'মুখ চেনা' প্রবন্ধটি তিন কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল, তাতেই সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে বাঙ্গলার নবজাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার রাজনারায়ণ বসুর মস্তিষ্কের গঠনতন্ত্রের তুলনামূলক আলোচনা করেন তিনি। যেমন 'উভয়ের উৎকৃষ্ট কপাল'-এর মধ্যে 'রাজনারায়ণবাবুর উপরিভাগের কপাল নিম্নভাগের কপাল অপেক্ষা বেশি ভরাট। এই জন্য বিজ্ঞান অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞানের দিকে রাজনারায়ণবাবুর বেশি ঝোঁক'। অন্যদিকে 'বঙ্কিমবাবুর উপরিভাগের কপাল উচ্চ ও প্রশস্ত। ইহাতে বিশ্লেষণ শক্তি, সমালোচন শক্তি ও হাস্যরস প্রকাশ পায়। আবার ইঁহার নীচের দিককার কপাল বেশ উঁচু— ইহাতে ছোট খাট জিনিস খুব ইঁহার নজরে পড়ে। তত্ত্বজ্ঞান অপেক্ষা বিজ্ঞানের দিকে ইহার বেশি ঝোঁক প্রকাশ পায়।' এরকমভাবেই মস্তিষ্কের গঠনতত্ত্ব বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে বঙ্কিম ও রাজনারায়ণের মানসিক প্রবণতা, সেই অনুসারী কর্ম ও লেখনী-প্রতিভার বিষয়ে আলোকপাতের চেষ্টা করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।[৯]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম জীবনীকার সুশীল রায় রবীন্দ্রভারতী চিত্রশালায় সংরক্ষিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্রের যে কালানুক্রমিক তালিকা দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় ১৮৭০ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত অজস্র প্রতিকৃতি এঁকেছেন তিনি। এই সিকি শতাব্দীরও বেশি সময় অন্তত হাজার দুয়েক প্রতিকৃতির রেখাঙ্কন করেছেন তিনি, তুলি-রং বা কালি-কলমের সাহায্য ব্যতিরেকে শুধুমাত্র পেনসিলের সাহায্যে। তাঁর এই ধরনের আঁকা প্রতিকৃতিতে যে শিরোমিতিবিদ্যার সুস্পষ্ট প্রতিফলন রয়েছে তা বোঝা যায় এই পেনসিল-স্কেচের সৌজন্যেই। কারণ, তুলি-রঙ বা কালি-কলমের চেয়ে একমাত্র পেনসিলের মাধ্যমেই মস্তিষ্কের রেখাগুলিকে ব্যাপকতর স্পষ্ট করে তোলা সম্ভব। তাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রতিটি চিত্ররেখাঙ্কনই বিশেষত্বের দাবি রাখে।

সমকালীন সুবিখ্যাত মনীষী থেকে নগণ্য ব্যক্তি, সকলেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবির খাতায় সমাদরে ঠাঁই পেয়েছেন। মন্মথনাথ ঘোষের ভাষায়:

> জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রীতিমত পরিচিত অপরিচিত সকল ব্যক্তির মুখের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার খাতায় অসংখ্য ব্যক্তির প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে। রাজা মহারাজা হইতে পাখাটানা কুলীও তাঁহার খাতায় সসম্মানে স্থান পাইয়াছে। এই চিত্রগুলির একটু বিশেষত্ব আছে।[১০]

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুলিখিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতি'র সুবাদে আমাদের জানা আছে যে, হিন্দু স্কুলে পড়বার সময় বালক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর মেজদাদা, এদেশের অন্যতম প্রথম ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভেন্ট সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মণিরামপুরে

জনৈক চীনা রাজমিস্ত্রি : শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী : শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

লর্ড সত্যপ্রসন্ন সিংহের কাকা প্রতাপনারায়ণ সিংহের আমন্ত্রণে গিয়ে নেহাত ছেলেমানুষী খেয়ালবশে এঁকে ফেলেন প্রতাপনারায়ণের একটি পেনসিল স্কেচ এবং তা তৎক্ষণাৎ প্রশংসাও লাভ করে। ফলে উৎসাহিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর সুবিশাল যৌথ পরিবারের নানা জনের মুখচিত্র ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য সে সবই বাতিল খসড়া কাজের কাগজে; তাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বালক বয়সের আঁকা ছবিগুলি কোনোভাবেই সংরক্ষণ করা যায়নি।

তবে এরই মধ্যে সবচেয়ে কৌতুকোদ্দীপক ঘটনা হল, হিন্দু স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়বার সময় ক্লাসে বসেই শিক্ষক জয়গোপাল শেঠের প্রতিকৃতি আঁকা। যে মাস্টারমশাই দেখতে মোটেও সুশ্রী ছিলেন না, বরং কিছুটা কিম্ভুতকিমাকারই ছিলেন। তবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এতটাই নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন জয়গোপাল শেঠের চিত্র, যে শিক্ষকরাও বিষয়টিতে যথেষ্ট আমোদ উপভোগ করেছিলেন। সুতরাং প্রতিকৃতি চিত্রাঙ্কনের প্রতিভা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আবাল্য, আকৈশোর। পরবর্তী সময়ে শিরোমিতিবিদ্যার প্রভাব তাঁর আঁকা মুখ-প্রতিকৃতিগুলিকে বিশেষত্ব দিয়েছিল, সর্বগুণান্বিত করেছিল। তবে প্রথাগত চিত্রাঙ্কন বিদ্যায় শিক্ষা তাঁর হয়নি, এনিয়ে মনে তাঁর খেদ ছিলই। ছোটবেলায় বাতিল কাগজে আঁকা ছবিগুলি চিরতরে হারানোর মধ্যে কেশবচন্দ্র সেনের প্রতিকৃতিটি না পাওয়ার বেদনা তাঁর মনে বহুদিন ছিল।[১১] আর আফশোস ছিল সমকালে দেখা বহু মানুষের প্রতিকৃতি তাঁর ছবির খাতায় ধরা থাকলেও বাদ পড়ে গিয়েছেন বাংলার বাঘ-খ্যাত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর আঁকার খাতাগুলি জীবনসায়াহ্নে দিয়ে যান জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িরই আরেক কৃতী সন্তান তথা সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। সেই সূত্রে অবন ঠাকুর করেছিলেন চিত্রকর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি অনবদ্য মূল্যায়ণ, স্মৃতিচারণাও বটে :

> ''কয়েক বছরের কথা— রাঁচীতে আর একবার তাঁর কাছ পেয়েছিলাম— তাঁর (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ) প্রথম প্রশ্ন হল— তোমার ছবির কাজ কেমন চলছে। তারপর নিজের আঁকা ছবির খাতা আমার হাতে দিয়ে বললেন, দেখ। এই ছবির সমস্ত খাতা মৃত্যুকালে আমাদের তিনি দিয়ে গেছেন, নতুন 'কাকামশায়ের শেষদান'— এই কথাটি লিখে। এই ছবির খাতায় জানা-অজানা ছোট বড় আত্মীয় পর কারু ছবি তুলে রাখতে তিনি ভোলেননি। তিনি দুঃখ করে বলতেন— আমার ছবির খাতায় সবাই ধরা পড়েছেন— কেবল একমাত্র আশু মুখুয্যে মশায়কে আমি ধরেও ছেড়ে দিয়েইলি— এই বড় আফ্‌শোষ হয়। এই ছবির খাতা উল্টে পাল্টে দেখতে দেখতে আমার সেদিন মনে হল কই আমরাও তো ছবি আঁকি। কিন্তু ছেলে বুড়ো আপনার পর ইতর ভদ্র সুন্দর অসুন্দর নির্ব্বিচারে এমন করে মানুষের মুখকে যত্নের সঙ্গে দেখা এবং আঁকা আমাদের দ্বারা তো হয় না, আমরা মুখ বাছি! কিন্তু এই একটি মানুষ তিনি কত বড় চিত্রকর হবার সাধনা করেছিলেন যে সব মুখ তাঁর চোখে সুন্দর হয়ে উঠলো, কি চোখে তিনি দেখতেন যে বিধাতার সৃষ্টি সবই তাঁর কাছে সুন্দর ঠেকলো কোন মুখ অসুন্দর রইলো না। রূপ বিদ্যার সাধনা পরিপূর্ণ না করলে তো মানুষ এমন দৃষ্টি পায় না।''[১২]

তাঁর রেখার বিশেষ ভাবটির পেছনে যে কোনো নির্দিষ্ট বীক্ষা রয়েছে তা বোঝা যায় তাঁর এ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রবন্ধগুলি পড়লে। তাঁর দুটি প্রবন্ধের কথা ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়া 'মনোবৃত্তির সঙ্গে মস্তিষ্কের সম্বন্ধ', 'আধুনিক মস্তিষ্কতত্ত্ব ও

ফ্রেনলজি', 'লোক চেনা' ইত্যাদি প্রবন্ধগুলিতেও[১৩] রেখা-চর্চায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শিরোমিতিবিদ্যার বীক্ষণের সুস্পষ্টতর প্রভাব অবশ্যই চোখে পড়ে। 'মানসী' পত্রিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা বীরবল-খ্যাত প্রমথ চৌধুরীর 'পেনসিল স্কেচ'-এর পরিচয় দিতে গিয়ে 'জনৈক শিল্পসেবী' অনন্যসাধারণ লেখনীতে 'রেখাচিত্রশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ'-এর রেখাঙ্কনে ফ্রেনোলজি-চর্চার কথাই সাড়ম্বরে উল্লেখ করেছিলেন। সেই অনুপম ভাষ্য :

> ''শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রেখাঙ্কনশিল্পী। তাঁহার রেখায় প্রাণ আছে। সে প্রাণ তাঁহার রেখাঙ্কিত বিষয়সম্ভূত নহে। রেখারই সরু মোটা লম্বা সোজা দাগের মধ্যে। সে দাগের প্রত্যেক অংশের তাৎপর্য আছে, প্রয়োগের দিক আছে, স্থিতি এবং ব্যপ্তি আছে— সে দাগের আরও শক্তি আছে— যা মনোযোগ আকর্ষণ করে, — কেবলমাত্র সে রেখার প্রতি নহে; রেখার মধ্যে যে সীমাহীনতা আছে, তাহারও প্রতি।
>
> ক'দিন পূর্ব্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মস্তিষ্কতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন এবং সেই সূত্রেই মানবমুখের এই রেখাচিত্র অঙ্কন করিতে আরম্ভ করেন। বর্ত্তমান লেখক যখন বালক ছিল তখন 'বালকে' প্রকাশিত 'মুখচেনা' শীর্ষক প্রবন্ধগুলি এবং তৎসংশ্লিষ্ট ছবির আশায় মাসান্তে বহুবার ডাক-দপ্তরে আনাগোনা করিত। যাঁহারা সে সকল প্রবন্ধ এবং ছবি দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একটি সামান্য রেখা দ্বারা কি অসামান্য ভাব ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। 'বালকে' প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্রখানিতে তাঁহার ভ্রু, অক্ষিপল্লব ও তারকা কেবলমাত্র কয়েকটি রেখার সমষ্টি কিন্তু ঐ রেখা কয়টি সেই মহামনস্বী পুরুষের কি অলোকসামান্য শ্রদ্ধা রশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে।''[১৪]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই ধরনের রেখাঙ্কনের ফলে আমাদের উপরি লাভ এমন কিছু সমকালীন খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বের চিত্র, যা তিনি না আঁকলে আর আমাদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব হতো না। প্রখ্যাত রবীন্দ্র-গবেষক প্রশান্ত কুমার পাল এমন তিনজনের কথা উল্লেখ করেছেন— যেমন, লালন ফকির, কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী, ব্যবহারজীবী নরসিংহ দত্ত।[১৫] আমরা এই তালিকায় হিন্দুমেলা খ্যাত নবগোপাল মিত্রের নামও সংযুক্ত করতে পারি। যোগেশচন্দ্র বাগল বহু পরে তাঁর 'ভারতের মুক্তিসন্ধানী' বইতে নবগোপালের বংশধরদের থেকে প্রাপ্ত একটি ছবি দিয়েছেন। নবগোপাল মিত্রের এখনও পর্যন্ত একমাত্র এটিই লভ্য ছবি। যদিও রবীন্দ্রভারতী সংগ্রহশালায় ১৮৭৩ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রেখায় ফুটে ওঠা নবগোপালের একটি চিত্র রয়েছে, যা এখনও পর্যন্ত অব্যবহৃত। ফলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রেখাচিত্রে সমকালও প্রতিবিম্বিত হয়। বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত তাঁর 'জীবনস্মৃতি'র সম্পাদনায় প্রশান্ত পাল উল্লেখ করেছেন :

> জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মূল স্কেচগুলি দেখলে বোঝা যায়, তাদের মধ্যে অনেকগুলির মাথার অংশ অজস্র রেখায় বিভক্ত। বোঝা যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শিরোমিতি বিদ্যার প্রয়োগক্ষেত্র হিসাবে স্কেচগুলিকে ব্যবহৃত করেছেন।[১৬]

অন্যদিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনীকার সুশীল কুমার দে-র মন্তব্য : ''জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিত্রসাধনা হচ্ছে রূপবিদ্যার সাধনা। সব জিনিসের মধ্যেই তিনি সুন্দরের সাক্ষাৎ পেয়েছেন, এই জন্য তিনি মুখ বাছেননি — রাজা-মহারাজা থেকে আরম্ভ করে একজন সামান্য পাঙ্খাপুলারের চিত্রও তিনি অঙ্কন করেছেন।[১৭]

পরিশেষে এটাই বলার, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অনুবাদ কর্মে, সাহিত্য-সৃষ্টি, নাটক-রচনার মতো সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যেমন সমকালেই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, রদেঁনস্টাইনের চোখে পড়ার আগে তাঁর চিত্রশৈলী ততটা প্রচারের সুযোগ পায়নি। পরে অবশ্য এই খেদ পুষিয়ে নেওয়ার যথেষ্ট অবকাশ আমরা পেয়েছি মূলত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর 'পেনসিল-স্কেচ' প্রকাশিত হওয়ার সুবাদে। কিন্তু এর পেছনে শিরোমিতিচর্চার প্রয়োগের যে উপযোগিতা রয়েছে তাও অবিস্মরণীয় ও স্মর্তব্যও বটে।

উল্লেখপঞ্জি:

১) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর : মন্মথনাথ ঘোষ। কলকাতা, ১৯২৭। পৃঃ ১৩৯। ২) তদেব, পৃঃ ১৪০। ৩) বইটির আখ্যাপত্র নিম্নরূপ:

Twenty-five Collotypes
from the Original Drawings by
Jyotirindra Nath Tagore
Hammersmith
Made & Printed by
Emery Walker Limited
1914

৪) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর : মন্মথনাথ ঘোষ। পৃঃ ১৪৩। ৫) Pseudoscience and the Paranormal : T. Hines. New York, America. pp.200. ৬) প্রবন্ধ মঞ্জরী : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। কলকাতা, ১৯০৫ খ্রি.। পৃঃ ৫৩৭। প্রবন্ধের শিরোনাম 'শিরোমিতি-বিদ্যা'। ৭) বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি : সম্পাদনা প্রশান্তকুমার পাল। সুবর্ণরেখা, ২০০০। পৃঃ৫৮। ৮) তদেব। ৯) প্রবন্ধ-মঞ্জরী, পৃঃ ৪৬২-৪৬৩। প্রবন্ধ-শিরোনাম : মুখচেনা। ১০) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর : মন্মথনাথ ঘোষ। পৃঃ ১৩৮। ১১) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি। পৃঃ ১৫-১৬। ১২) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বঙ্গবাণী, আষাঢ়, ১৩৩২। পৃঃ ৫৭৬। ১৩) প্রবন্ধগুলি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-মঞ্জরী (কলকাতা, ১৯০৫) গ্রন্থে সংকলিত। ১৪) রেখাচিত্রশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ : জনৈক শিল্পসেবী। মানসী, বৈশাখ, ১৩২০। পৃঃ ২১৩-১৪। ১৫) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি। প্রশান্তকুমার পাল প্রদত্ত টীকা। পৃঃ ১২৬। ১৬) তদেব, পৃঃ ১২৬। ১৭) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ : সুশীল রায়। জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৬৩। পৃঃ ১৯১-১৯২।

বঙ্কিমচন্দ্র

রমেশচন্দ্র দত্ত

জাতীয়তাবাদী বঙ্কিমচন্দ্র ও দুই জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক

সুদীপ বসু

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হিন্দু-পুনরুত্থানবাদের দার্শনিক পিতা এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মহাঋত্বিক। কয়েকটি বিষয়ে তিনি এখনও পর্যন্ত প্রথম অথবা প্রধান। তিনি বাঙ্গলার প্রথম ঔপন্যাসিক এবং অনেকের মতে প্রধান ঐতিহাসিক। দ্বিধাহীনভাবে বলা যায়, তিনি শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক। 'ধর্মতত্ত্ব'-এর লেখক হিসাবে সংগঠিত ধর্ম ও দর্শনচিন্তার ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তার 'কৃষ্ণচরিত্র'এর মধ্যে ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও শাস্ত্রজ্ঞানের যে সমাবেশ ও সমন্বয় ঘটেছে, তার তুল্য পাওয়া যাবে না। সাম্যবাদী চিন্তাও তিনি বাঙ্গলায় বৃহৎ আকারে এনেছেন। পত্রিকা-সম্পাদক হিসাবে এখনও তাঁকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করতে হয়। আর স্বাধীনতা আন্দোলনকালে তাঁর সাহিত্য ও সংগীত বাঙ্গলা ও ভারতের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার সমান কৃতিত্ব অন্য কোনো সাহিত্যিক দাবি করতে পারেন না।

স্বভাবতই বঙ্কিমচন্দ্র স্বাধীনতার আগে বাঙ্গলা ও ভারতে প্রচুর প্রশস্তি পেয়েছেন। তুলনায় নিন্দার পরিমাণ কমই। স্বাধীনতার পরের চিত্র বিপরীত। প্রশস্তি কমেছে যথেষ্ট পরিমাণে। কারণ আমাদের এখন স্বাধীনতা সংগ্রাম করতে হচ্ছে না। আর প্রভূত পরিমাণে বেড়েছে নিন্দা। শোনা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিক হিসাবে কিছুই নন। তিনি কেবল গালগল্পের রোম্যান্স লিখে অপরিণত মনের পাঠক ভুলিয়েছেন। তিনি সংকীর্ণ হিন্দু-পুনরুত্থানবাদী। তিনি প্রগতির ঢেউ আটকানো মূঢ় ঐরাবত ইত্যাদি। সত্যিই কি তিনি তাই? অতি বিশ্লেষণের অতিকথনে ঘুরপাক না খেয়ে কেউ যদি অভিজ্ঞতা, অন্তর্দৃষ্টি ও মর্মভেদী কল্পনার শক্তিতে মানবজীবনের দারুণ বাসনা ও প্রদাহ, মানবভাগ্যের উত্থান-পতনের রহস্য উন্মোচন করেন— তিনি কি নিছক রোমান্সের লেখক হয়ে যাবেন? ছোট বাঙালি আঁকলেই বড়ো লেখক আর বড়ো বাঙালি বা ভারতীয় আঁকলে ছোট লেখক? কিংবা অত্যাচারী হিন্দু বা ইংরেজ শাসকের ছবি আঁকলেই কেউ সত্যবাদী? আর অত্যাচারী মুসলমানের ছবি আঁকলেই তিনি সাম্প্রদায়িক? এই ব্যাখ্যা খুবই সুবিধাজনক রাজনৈতিক সরলীকরণ নয় কি? হিন্দু পুনরুত্থানবাদী হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের কোন ঐতিহাসিক বা প্রাগৈতিহাসিক যুগে ফেরত পাঠাতে চেয়েছিলেন তা কি স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে? পুরনো যুগের গৌরবগাথা স্মরণ করালে কিংবা সেই যুগের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে গ্রহণ করতে বললেই তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল বলা হবে কেন? যদি কেউ নিজের ঈশ্বরবিশ্বাসের কথা বলেন, তাহলে তিনিও কি প্রতিক্রিয়াশীল?

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যজীবন মোটামুটি ত্রিশ বছরের। এই কালব্যাপ্তি অবশ্যই বেশি নয়। কিন্তু তাঁর মানসবিবর্তনের ধারাপথ এর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। ফলে প্রশ্ন এটাই— মৌলিক সাহিত্যচর্চার পথ ত্যাগ করে তিনি মননশীল প্রবন্ধ রচনা কেন শুরু করলেন? কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র নিজের সম্পূর্ণ মনকে উপন্যাসের মধ্যে মেলে ধরতে পারেননি। সেটা সম্ভবও ছিল না। কেননা দেশ ও জাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা তাঁকে অবিরাম পীড়িত করত। ফলে বঙ্কিম-প্রতিভা উপন্যাসের উপল উপকূল ত্যাগ করে নেমে এসেছে হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্তের জগতে। হাহাকার করে উঠেছে বাঙ্গালির কেন ইতিহাস নেই, এই বেদনায়। অনুভব করেছে জাতীয় জীবনের পূনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা। এইখানে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাবন্ধিক সত্তার সঙ্গে মিলে গেছে তাঁর শেষ পর্বের ঔপন্যাসিক সত্তা। এই মিলনস্থলে নির্মিত হয়েছে তাঁর জাতীয়তাবোধ।

বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠেছে তাঁর দীর্ঘকালের বৌদ্ধিক অনুশীলনের ফলে। এর দুটি অভিমুখ আমরা লক্ষ্য করি। প্রথমত, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জাতীয় জীবনের আদর্শ পুরুষরূপে উপস্থাপনার প্রয়াস। দ্বিতীয়ত, হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা। বৃন্দাবনের কৃষ্ণের পরিবর্তে মহাভারতের কৃষ্ণকে বঙ্কিমচন্দ্র নির্বাচন করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছেন, কৃষ্ণের জীবন ও কর্ম চারটি বৃত্তির পূর্ণাঙ্গ অনুশীলনে নির্মিত (শারীরিক, কার্যকারিণী, জ্ঞানার্জনী ও চিত্তরঞ্জিনী)। এই চার বৃত্তির পূর্ণ অনুশীলন না হলে পূর্ণ মানব হওয়া সম্ভব নয়। সন্ন্যাসজীবনে যেহেতু চার বৃত্তির পুরো অনুশীলন সম্ভব নয়, তাই বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর কয়েকটি উপন্যাসে এই অপূর্ণ অনুশীলনের উল্লেখ পাই, যার ফলে মানবজীবন ধ্বংস হয়ে গেছে (যেমন, 'চন্দ্রশেখর' কিংবা 'কপালকুণ্ডলা')।

অন্যদিকে এই চার বৃত্তির পূর্ণ অনুশীলক ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সামনে রেখে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুরাষ্ট্র পুনর্গঠন করতে চেয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের মতো সুমহান চরিত্রের নেতৃত্বে গড়ে উঠবে আগামী ভারতবর্ষ— হয়তো এটাই বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা ছিল। তবে যেহেতু তাঁর সামনে বাঙ্গালি পাঠক উপস্থিত, তাই বাঙ্গলাদেশের পতনের ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এর বিপরীত প্রেক্ষায় আছে দেশের অভ্যুদয়ের কাহিনি। 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম' উপন্যাসে তাঁর এই প্রয়াস স্পষ্টই ধরা পড়ে। সেইসঙ্গে 'ভারতকলঙ্ক— ভারতবর্ষ পরাধীন কেন?' ইত্যাদি প্রবন্ধের কথাও বলতে হয়।

বঙ্কিম-শতবার্ষিকীতে প্রদত্ত ভাষণে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার সেকথা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন— 'অর্ধশতাব্দীর অধিককাল হইল বঙ্কিমচন্দ্র অস্তমিত হইয়াছেন। তিনি যে শুধু বন্দেমাতরম্ সংগীতই রচনা করিয়াছেন তাহা নয়, তিনি আমাদের জাতীয় জীবন পরিচালনার পথও দেখাইয়াছেন। তিনি আমাদের সংহত, শিক্ষিত এবং বলশালী হওয়ার জন্য বলিয়াছেন। তিনি মনে করিতেন, যে জাতি দুর্বল সে কখনো স্বাধীনতা পাইতে পারে না এবং স্বাধীনতা রক্ষা করিতেও পারে না।'[১]

কিন্তু আগেই বলেছি যে, বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্রবোধ সহসা জাগ্রত ব্যাপার নয়। তা বঙ্কিম-প্রতিভার ক্রমবিকাশের ফল। বিষয়টি এইভাবে যদুনাথ সরকার ব্যাখ্যা করেন—

> 'বঙ্কিমের প্রতিভার ক্রমবিকাশের ফলে তাঁহার শেষ উপন্যাসগুলিতে যে অমৃতরস পাই, দুর্গেশনন্দিনীতে তাহা পাই না; এই অমৃতরসের উৎস তাঁহার হৃদয়ে। ইহা ভগবদগীতার দান; স্বদেশ-প্রেম ও ধর্ম্মে মতি এই উভয়ের অপূর্ব মিলন সংঘটন করিয়া, তাঁহার প্রতিভায় ও তাঁহার হৃদয়ে এক নূতন মিশ্র পদার্থের আকার ধারণ করিয়াছে। তাঁহার গভীর ও বিস্তৃত ইংরাজী শিক্ষার উপর ভগবদগীতার প্রভাবের এই ফল। এই জন্য আমরা তাঁহার পরিপক্ক বয়সের উপন্যাসগুলিতে পাই এমন একটি উপকরণ যাহা তাঁহার যৌবনের গল্পগুলিতে নাই। সেটিকে আদর্শবাদ না বলিয়া উর্ধপ্রবাহিনী ভাবধারা বলিলে সহজ হইবে, অর্থাৎ ইংরাজী কথায়

idealizing element। 'দুর্গেশনন্দিনী', 'বিষবৃক্ষ' খুব সুন্দর গল্প, কিন্তু গল্পমাত্র। 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' গল্প বটে, কিন্তু উপন্যাসের অধিক, এগুলি গল্পের ভিতর দিয়া আস্তে আস্তে অদৃশ্যে নিঃশব্দে পাঠকের চিত্তকে দেবলোকে লইয়া যায়, এই মহাকাব্যগুলি সত্য সত্যই প্রমাণ করে যে স্বর্গে ও মর্ত্যে সম্বন্ধ আছে।' বঙ্গমাতার অপার করুণায় তাঁহার অন্য অনেক বরপুত্র অমর গল্প লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেগুলিতে এরূপ কল্পনার মন্দাকিনীপ্রবাহ নাই, তাঁহারা 'ত্রিস্রোতসং বহতি ন গগনং প্রতিষ্ঠাং'। কিন্তু বঙ্কিমের শেষ বয়সের উপন্যাসগুলি এই অলৌকিক কার্য্য, এই সাহিত্যিক যাদুগরী করে।

সপরিবারে যদুনাথ সরকার

> ... মনোরম গল্পের ভিতর দিয়া, আমাদের পরিচিত সংসারের কাহিনীর ছবির ভিতর দিয়া, দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত একটা অপরিচিত লোকে, একটা চরমপ্রায় অমানুষিক নৈতিক আদর্শে যে পৌঁছান যায় এবং সেই কাল্পনিক দেবলোকে আমাদের চিত্তের চিরবসতি যে লাভ করিতে হইবে, এই সত্য বঙ্কিমের শেষ উপন্যাসগুলির প্রতিপাদ্য বিষয় এবং সেই প্রয়াসে যে তিনি সফল হইয়াছেন, তাহার সাক্ষী লক্ষ লক্ষ পাঠকের হৃদয়। ... 'রাজমোহন্‌স্ ওয়াইফে'র সৃষ্টিকর্ত্তা অন্তিমে একেবারে স্বদেশী হইয়া গিয়াছেন।[২]

অন্যদিকে রমেশচন্দ্র দত্তের মতো ঐতিহাসিকও বাংলায় জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির পিছনে বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকার উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, 'বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরচনায় ... একদিকে যেমন দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত হইয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি তাহা হিন্দুদের পৃথক জাতীয়তা ভাবে ইন্ধন যোগাইতেছিল।' প্রসঙ্গত বিপিনচন্দ্র পালের আত্মজীবনী উদ্ধার করে রমেশচন্দ্র বলেছেন, 'দুর্গেশনন্দিনী' বিপিনচন্দ্রের মনে 'প্রথম দেশপ্রেম' জাগ্রত করে।

রমেশচন্দ্র বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'ভারতকলঙ্ক— ভারতবর্ষ পরাধীন কেন?' এই প্রবন্ধের উপর। রমেশচন্দ্রের বিবেচনায় এই প্রবন্ধে 'হিন্দু জাতির প্রতিষ্ঠা ও মঙ্গল সম্বন্ধে তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) যে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা বাঙ্গলা দেশে হিন্দুদের জাতীয়তাভাবের উদ্বোধনের মূল দার্শনিক তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ১৮৭২ সালে বা তাহার পূর্বে এই বিষয়ে আর কেহ এইভাবে চিন্তা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।' রমেশচন্দ্র আলোচ্য প্রসঙ্গের ইতি টেনেছেন এইভাবে— বঙ্কিমচন্দ্রের এই জাতীয় রচনাগুলি 'বাঙ্গলায় জাতীয়তাভাবের এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনায় যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল এবং যে জাতীয়তা শতকের প্রথমে বাংলার সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল তাহা প্রসার (লাভ) করিয়া রাজপুতানা, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ লইয়া মহাদেশ ভারতবর্ষের জাতীয় ঐক্যের দিকে বাঙ্গালীর দৃষ্টি ফিরাইয়াছিল— ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই।'[৩]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবোধের ভিত্তিতে নির্মিত আধুনিক ভারতের জাতীয়তাবাদ। এবিষয়ে দুই জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার ও রমেশচন্দ্র মজুমদারের ধারণা স্বচ্ছ ছিল। তাঁরা দেখতে চেয়েছেন, জাতীয়তাবাদ কোনো জাতির দীর্ঘকালীন জাতীয় সত্তার অনুশীলনের ফল। বঙ্কিম-প্রতিভার বিকাশ ও পরিণতি সেদিকেই ইঙ্গিত করে।

তথ্যসূত্র— ১। আনন্দবাজার, ৪ জুলাই ১৯৪৯, আকর— বঙ্কিম প্রতিভার ক্রমবিকাশ, যদুনাথ সরকার, 'যদুনাথ সরকার রচনা সম্ভার' গ্রন্থভুক্ত', সংকলন ও সম্পাদনা নিখিলেশ গুহ ও রাজনারায়ণ পাল, এম সি সরকার অ্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১২, পৃষ্ঠা ৭৫৬।

২। বঙ্কিম-প্রতিভার ক্রমবিকাশ, যদুনাথ সরকার, 'যদুনাথ সরকার রচনা সম্ভার' গ্রন্থভুক্ত', সংকলন ও সম্পাদনা নিখিলেশ গুহ ও রাজনারায়ণ পাল, এম সি সরকার অ্যান্ড প্রাইবেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১২, পৃষ্ঠা ৫১২-৫১৪।

৩। দেশাত্মবোধ ও রাজনীতিক আন্দোলন', দ্বিতীয় খণ্ড, রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলাদেশের ইতিহাস (আধুনিক যুগ)' গ্রন্থভুক্ত, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, লেনিন সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০১৩, পঞ্চম সংস্করণ, ২০০১, পৃষ্ঠা ৫৩৪-৫৩৮।

AN ISO 9001:2008 CERTIFIED CO.

KOHINOOR INDIA PVT. LTD.

IS No. : 2414:2005

(A GOVERNMENT RECOGNISED ONE STAR EXPORT HOUSE)

Off. : +91-181-5230052, 5230057, 5230060, 5230075 Fax : +91-181- 5230014
Email : info@kohinooronline.com Website : www.kohinooronline.com

With Best Compliments from :-

R K Global

NSE | BSE | MCX | NCDEX | MCX SX | NSDL

R K Global

With Best Compliments from :-

Banwarilal Associates Pvt. Ltd.

B-17, Ashok Nagar
Ghaziabad
Uttar Pradesh
Pin - 201001

তৃতীয় পানিপথ

গোপাল চক্রবর্তী

শয়নকক্ষে যাওয়ার আগে কিছুক্ষণ জপধ্যান করা পেশোয়া বাজীরাওয়ের দীর্ঘদিনের অভ্যাস। সেদিনও জপধ্যান শেষে পেশোয়া শয়নকক্ষে যাবেন এমন সময় দ্বাররক্ষী অভিবাদন করে দাঁড়াল। পেশোয়া জিজ্ঞাসা করলেন—

— কিছু খবর আছে?

— সেনাপতি ইব্রাহিম কার্দি সাক্ষাৎপ্রার্থী

— মন্ত্রণাকক্ষে বসাও।

Phone : 2573 0416
2572 4419

BIKANERVALA

10181-82, Chowk Gurdwara Road
Karolbagh
NEW DELHI-110005

Our Speciality

PISTA LAUJ & BADAM KATLI,
BENGALI SWEETS & NAMKEENS

ANOOPAM

METAL INDUSTRIES

ISO 9001-2000 Certified

An ISO 9001 : 2015 Certified Company

Manufacters & Exporters of :

CYCLE PARTS & AIMEX BRAND ALLEN BOLTS-NUTS, GRUB SCREW & TURNING PARTS

B-6, Textile Colony, Industrial Area A, Ludhiana - 141 003 (India)
Tel. (O) : 0161-2226591, 2222326, 4652326
e-mail : anoopam_met@hotmail.com, www.anoopammetal.com

দ্বাররক্ষী আবার অভিবাদন করে চলে গেল। চিন্তার ভাঁজ পড়লো পেশোয়ার ললাটে। এতরাতে কার্দির আগমনের কারণ কী? মারাঠা সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে মুসলমান হলেও কার্দি পেশোয়ার বিশেষ বিশ্বাসভাজন। অবশ্য একদিনে কার্দি পেশোয়ার বিশ্বাসভাজন হননি। এর জন্য অনেক পরীক্ষা দিতে হয়েছে তাকে। আফগান সৈনিক ইব্রাহিম কার্দি দিল্লির বাদশাহী ফৌজে কর্মরত ছিলেন। মোগল গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে পদচ্যুত হয়ে অনেক সতীর্থের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের পথে পা বাড়ান। বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহম্মদনগরের মতো মুসলমান রাজ্যগুলিতেও আশানুরূপ কাজ না পেয়ে কার্দি একাকী যাত্রা করলো হিন্দুরাজ্য মহারাষ্ট্রের দিকে। ততদিনে কার্দির সঙ্গী সাথীরা অনেকেই ছোট ছোট জায়গিরদারদের অধীনে কর্মরত হয়েছে। কেউ বা পেশা হিসাবে দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করেছে। একদিন সশস্ত্র কার্দি একাকী চলেছেন এক নির্জন পাহাড়ি পথে পুণার উদ্দেশে। তার আগে যাচ্ছিল অশ্বশকটে এক ক্ষুদ্র তীর্থযাত্রীর দল। অদূরেই সেই দলটি আক্রান্ত হলো দস্যুদের দ্বারা, দলটির সঙ্গে যে ক'জন রক্ষী ছিল দস্যুরা ছিল তাদের তুলনায় বেশি। দস্যুরা সহজেই তাদের কাবু করে লুঠতরাজ আরম্ভ করে। তীর্থযাত্রীরা অভিজাত, দস্যুরা স্থানীয় উপজাতি। কার্দি আড়াল থেকে সব দেখেছিলেন। হঠাৎ অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন দস্যুদের উপর। ক্ষিপ্র হস্তে অসি চালনা করে অল্প সময়ের মধ্যে দস্যুদের বিতাড়িত করেন। তীর্থযাত্রীদের যিনি দলপতি, তিনি এই বিদেশি যুবকের রণকৌশলে চমৎকৃত হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন— তোমাকে দেখে বিদেশি বলে মনে হচ্ছে। তুমি কে? এখানে আগমনের হেতু কী?

কার্দি অকপটে তার পরিচয় এবং পুণা যাত্রার উদ্দেশ্য দলপতির কাছে ব্যক্ত করল। সব শুনে দলপতি বললেন— — আমিও পুণায় যাচ্ছি, পুণায় থাকি, তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে। সম্ভব হলে পেশোয়ার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ করিয়ে দেব।

কার্দি পুণায় এলেন তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে। কার্দি তখনও জানেন না যাঁর সঙ্গে, যাঁর আহ্বানে পুণায় এসেছেন, তিনি স্বয়ং পেশোয়ার বালাজী বাজীরাও। মারাঠা সাম্রাজ্যে পেশোয়া বালাজী বাজীরাও এক নতুন চিন্তাধারার নেতা ছিলেন। শিবাজী থেকে পিতা প্রথম বাজীরাও পর্যন্ত মারাঠা বাহিনীতে জাতীয় সৈন্যবাহিনী গঠনের যে আদর্শ অনুসরণ করা হয়েছিল, তা তিনি পরিত্যাগ করেন। এত দিন মারাঠা সৈন্যবাহিনী ছিল সম্পূর্ণরূপে মারাঠাদের নিয়ে গঠিত। বালাজী বাজীরাও সামরিক শক্তি ও দক্ষতা বাড়াবার জন্য সেনাবাহিনীতে বহু বেতনভুক অ-মারাঠী সৈন্য ও বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করেন। নিজ গুণে কার্দিও মারাঠা সেনাবাহিনীতে প্রথমে দু'হাজার এবং পরে দশ হাজার সৈন্যের সেনাপত্য লাভ করে। শুধু সামরিক দক্ষতা নয়, কার্দি পেশোয়ার অন্যতম বিশ্বাসভাজনও ছিল। হঠাৎ পেশোয়ারের চিন্তাজাল ছিন্ন হয়, স্মরণ হয় সেনাধ্যক্ষ কার্দি মন্ত্রণাকক্ষে অপেক্ষা করছে। মন্ত্রণাকক্ষের দিকে পা বাড়ালেন পেশোয়া।

পেশোয়াকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করলো কার্দি। পেশোয়া তাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। কার্দি বলল— মহামান্য পেশোয়জী একটা বিশেষ বার্তা নিয়ে আসতে হলো। আমরা আহমেদ শাহ আবদালির পুত্র তৈমুরকে পঞ্জাব থেকে বিতাড়িত করে পঞ্জাব দখল করেছি। তাই ক্রুদ্ধ আহমদ শা এক বিশাল আফগান বাহিনী নিয়ে পঞ্জাব অতিক্রম করে এগিয়ে আসছে।

— চিন্তার বিষয়। তাদের সৈন্য সংখ্যা কত?

— সৈন্য সংখ্যা লক্ষাধিক, কিন্তু উদ্বেগের কারণ হলো তাদের সঙ্গে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে গোলা-বারুদ, কামান, বন্দুক। যা আমাদের বাহিনীর নেই।

অত্যন্ত উদ্বিগ্ন দেখাল পোশায়াকে, কার্দির সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই। এই পরিস্থিতিতে কী তাঁর কর্তব্য। কার্দিকে বিশ্রাম কক্ষে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে পেশোয়া ফিরে গেলেন শয়নকক্ষে। বিপদ আসন্ন, এই পরিস্থিতিতে কী করণীয়, এমন বন্ধু কে আছে যে পাশে দাঁড়াবে? এই তো সেদিন তিনি মহীশূরের কিয়দংশ দখল করলেন? সদাশিব রাওয়ের নেতৃত্বে মারাঠারা উদ্‌গরের যুদ্ধে নিজামকে পরাজিত করে বিজাপুর, ঔরঙ্গাবাদ ও বিদরের কিছু অংশ এবং দৌলতাবাদ দুর্গটি অধিকার করেন। রাজপুতানায় এবং গঙ্গা-যমুনার দোয়াবেও মারাঠা প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। দিল্লির বাদশাহরা পর্যন্ত মারাঠাদের যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে। কিন্তু এইবার...। আফগান আবদালির সঙ্গে লক্ষাধিক সুশিক্ষিত সেনা, বন্দুক, গোলা বারুদ। মারাঠাদের সামরিক শক্তি যথেষ্ট, কিন্তু বন্দুক আর গোলাবারুদ নেই। আফগান ইব্রাহিম কার্দি অনেকবার গোলন্দাজ বাহিনী গড়ার প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু হবে হবে করেও তা হয়ে ওঠেনি। এই আসন্ন আক্রমণে মারাঠাদের হাতে গোলাবারুদ থাকলে আর চিন্তার কিছু ছিল না। পারসিক আর আফগানরা ইউরোপ থেকে বারুদ আমদানি করে গোলন্দাজ বাহিনী তৈরি করেছে। তাই যুদ্ধে তারা অপ্রতিহত। এই প্রচণ্ড শীতের রাতেও পেশোয়ার কপালে দেখা গেল বিন্দু বিন্দু ঘাম।

পরদিন প্রাতে পেশোয়া কার্দির সঙ্গে একপ্রস্থ আলোচনার পর মন্ত্রণাসভায় আহ্বান করলেন প্রধান সেনাপতি সদাশিবরাও সহ অন্যান্য সেনাপতিদের। পেশোয়ার জ্যেষ্ঠপুত্র মাত্র সতেরো

With Best
Compliments from :-

Tel. : 0161-2555011
0161-2555111
Fax : 0161-2555163
Mob. : 98147-00163
98140-20479

BRM TOWER
Loha Mandi, Miller Ganj, Ludhiana-141 003.

ROHIT GUPTA
YASHPAUL GUPTA

Loha Mandi, Miller Ganj,
Ludhiana - 141 003

With Best Compliments from :-

UNISPARES

Manufacturers & Exporters

B-131, Face II, Noida, Dist. G. B. Nagar- 201 305

Uttar Pradesh, India

Mobile : 91-9810535620, Phone : 91-120-4219223, 4375262

Fax : 91-120-4274676

E-mail : pschauhan@unispare.com

www.unispares.com

বছরের বিশ্বাসরাও সদ্য এক ক্ষুদ্র বাহিনীর সেনাপতি পদে নিযুক্ত হয়েছে। পেশোয়া তাকেও ডেকে পাঠালেন। মারাঠা সেনানায়করা আহম্মদ শাহ আবদালিকে প্রতিরোধ করার জন্য সানন্দে স্বীকৃত হলো। কালবিলম্ব না করে পেশোয়া সৈন্য সমাবেশের আদেশ দিলেন। সেনাপতি গণপত রাও আপত্তি করলেন সম্যক অবগত না হয়ে শুধুমাত্র কার্দির একটা অনুমানের উপর ভিত্তি করে এতবড় সিদ্ধান্ত নেওয়া কি উচিত হবে? সেনাধ্যক্ষদের কয়েকজন তার সঙ্গে সহমত পোষণ করল। পেশোয়া তাকালেন ইব্রাহিম কার্দির দিকে। কার্দি উঠে দাঁড়িয়ে বলল—

— মহানুভব পেশোয়া, মান্যবর সেনাধ্যক্ষগণ, এই মহারাষ্ট্র আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, কাজ দিয়েছে, মর্যাদা দিয়েছে, সম্মান দিয়েছে, মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সামর্থ্য দিয়েছে। একজন মারাঠার মহারাষ্ট্রের প্রতি যতটা শ্রদ্ধা,

লেভেল ক্রসিং ব্যবহারকারীদের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ

- রেল লাইনের কাছাকাছি থাকার সময়ে কখনোই মোবাইল ফোন/ইয়ারফোন ব্যবহার করবেন না।
- লেভেল ক্রসিং গেটে কখনো তাড়াহুড়ো করবেন না এবং আগত ট্রেনের সময়ে লাইন পারাপার করবেন না।
- লেভেল ক্রসিং গেট বন্ধ থাকলে আপনার গাড়ি থামান।
- গেট বন্ধ থাকলে জোর করে লাইন পারাপার করবেন না।

উন্নয়নমূলক উদ্যোগ

পূর্ব রেলওয়ে আরও বেশি সুরক্ষার জন্য রোড ওভারব্রিজ/ রোড আন্ডারব্রিজ নির্মাণ করে সকল লেভেল ক্রসিং গেট অপসারণের জন্য সর্বোত্তম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মনে রাখবেন

জোর করে বন্ধ লেভেল ক্রসিং গেট পার হওয়া রেলওয়ে আইনের অধীনে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

দায়িত্ববান নাগরিক হোন

পূর্ব রেলওয়ে

জাতির সেবায়

ভালোবাসা, কর্তব্য আমারও তার চেয়ে কম নয়। মহারাষ্ট্র জননীর নামে শপথ করে বলছি, ঘোর বিপদ আসন্ন। আজ সব ভেদাভেদ ভুলে মারাঠা জাতির একমাত্র কর্তব্য এই শত্রুর মোকাবিলা করা। বিপদ আসন্ন।

সেনানায়কগণ একযোগে বলে উঠল— সাধু, সাধু।

মন্ত্রণাকক্ষ থেকে বেরিয়ে সেনানায়কগণ আপন আপন শিবিরে ফিরে গেল। ইব্রাহিম কার্দিও এগিয়ে গেলেন অশ্বের দিকে। অশ্বারোহণের পূর্বে তার সামনে এসে দাঁড়াল এক বৃদ্ধ ভিক্ষুক। রায়পুরে, পুণায় এইরকম ভিক্ষুক প্রায়ই দেখা যায়। শীতকাল, তাই গায়ে কম্বল ভিক্ষুকের। কম্বলের ভিতর থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ কার্দির হাতে দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল ভিক্ষুক। কার্দি ভাঁজ করা কাগজটি খুলল। পশ্তু ভাষায় লেখা একটি পত্র। একটি ছত্র মাত্র লেখা—

'গোদাবরীর ঘাটের পাশে পীরবাবার মাজারের পিছনে সন্ধ্যায় এসো।'

হস্তাক্ষর দেখে কার্দি বুঝতে পারে, পত্রটি মায়মুনা বেগমের লেখা। কিন্তু মায়মুনা এখানে এলো কোথা থেকে? মায়মুনাকে পিত্রালয়ে রেখে কার্দি কর্মের সন্ধানে বেরিয়েছিলেন। মাঝখানে কয়েকটি বছর কেটে গেছে। কার্দি কাফের মারাঠাদের অধীনে কর্মগ্রহণ করেছে শুনে মায়মুনা তাকে চিরদিনের মতো ত্যাগ করেছে। কার্দি দিল্লিতে গিয়েও মায়মুনাকে ফেরাতে পারেননি। মায়মুনার জেদ কার্দি কাফেরের কর্মত্যাগ করলে তবে সে কার্দির সঙ্গে সংসার করবে, নচেৎ নয়। কার্দি রাজি হননি, তার দুঃসময়ে এই পেশোয়া তাকে সসম্মানে সেনাপত্যে নিযুক্ত করেছেন। মারাঠারা তাকে স্নেহে মমতায় আপন করে নিয়েছে। তবে গণপতরাওয়ের মতো ধর্মান্ধ বিরোধী যে একেবারে নেই, তা নয়। এখন মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। মায়মুনা বেগম এই পুণায় কী করে এলো, কেন এলো, সে জবাব তখনই পাওয়া যাবে। কার্দি যখন মোগল বাহিনীতে কর্মরত, তখন আফগান হিং ব্যবসায়ী খোদা বক্সের কন্যা মায়মুনার সঙ্গে তার শাদি হয়। শাদির কিছুদিন পরেই কার্দি কর্মচ্যুত হয়। খোদা বক্স জামাতাকে হিঙের ব্যবসায় টানার চেষ্টা করে বিফল হয়।

আজীবন যুদ্ধ ব্যবসায়ী কার্দি হিঙের ব্যবসা প্রত্যাখ্যান করে অজানার উদ্দেশ্যে পা বাড়ায়। কর্মপ্রাপ্তির পর পেশোয়ার অনুমতি নিয়ে দিল্লি আসে কার্দি মায়মুনাকে পুণায় নিয়ে যাবার জন্য। মায়মুনা তখন কার্দিকে কাফেরের অন্নভোজী বলে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। আজ সেই মায়মুনা বেগম হঠাৎ পুণায়!

শীতের সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি নেমেছে। গোদাবরীর ঘাটের পাশে পীরবাবার মাজারের পেছনে দাঁড়িয়েছিল সশস্ত্র ইব্রাহিম কার্দি। মায়মুনা বেগমের পত্র পাওয়ার পর থেকে তার মনে স্বস্তি নেই। কেন এলো মায়মুনা, যে একদিন স্বেচ্ছায় তাকে ত্যাগ করেছিল। মায়মুনার সঙ্গে মাত্র দু-বছর সংসার করেছিল কার্দি। তার মধ্যেই একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাদের। দুটি বিশেষ গুণ ছিল মায়মুনার। এক ভালো খানা পাকাতে পারত। আর অপূর্ব কণ্ঠ ছিল, ভালো গান গাইতে পারত। রুবাব বাজাতে পারত। সেই দু-বছরের সংসার যেন স্বপ্নের মতো মনে হয় কার্দির। কার্দির শ্বশুর খোদা বক্স লোকটা ছিল ধর্মান্ধ। গান, বাজনা পছন্দ করত না। কারণ, গান-বাজনা ইসলাম বিরোধী। তবুও মায়মুনা লুকিয়ে গান করত, রুবাব বাজাত। এর মধ্যেও মায়মুনা পিতার একটা গুণ পেয়েছিল ধর্মান্ধতা। যার ফলে হিন্দু মারাঠাদের সেনাদলে কাজ নিয়েছে বলে স্বামীকে ত্যাগ করতেও মায়মুনা দ্বিধা করেনি। হিঙের বেওসাদার খোদা বক্স তাতে মদত দিয়েছিল।

হঠাৎ একটা তানজাম্ এসে দাঁড়াল কার্দির পাশে। তানজাম-এর পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এলো একটা মুখ, কার্দি দেখল সেই মুখ মায়মুনার।

মায়মুনা বলল— যদি আমার প্রতি এখনও প্যার-মহব্বত থাকে তবে তানজামের পেছন পেছন এসো।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো কার্দি তানজামকে অনুসরণ করে মৃদুগতিতে অশ্বচালনা করল। তানজাম নগর অতিক্রম করে প্রবেশ করল বাঈজী পল্লিতে। ঘরে ঘরে জ্বলছে বাহারি আলো, আতর আর অম্বুরি তামাকের গন্ধে ম-ম করছে শীতের সন্ধ্যার বাতাস। এক দো-মহলা বাড়ির সামনে তানজাম রাখা হলো। তানজাম থেকে নমে এলো মায়মুনা, পোশাকে, অলংকারে ঝলমল করছে। মৃদু স্বরে আহ্বান করল কার্দিকে।

— এসো।

অশ্বটি এক অশোক গাছের সঙ্গে বেঁধে মন্ত্রমুগ্ধের মতো মায়মুনাকে অনুসরণ করল কার্দি। কয়েকটি ঘর পেরিয়ে এক সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করল মায়মুনা, পেছনে কার্দি। মায়মুনা বলল

— বসো।

এক নরম মখমলের আসনে উপবেশন করল কার্দি। একটা হালকা পোশাক পরে কাছে এসে বসলো মায়মুনা। আগের থেকে সে আরও বেশি সুন্দরী হয়েছে।

— কী মনে আছে আমাকে, না একেবারে ভুলে গেছো?

— তোমাকে কোনোদিন ভুলতে পারি? তুমি আমাকে স্বেচ্ছায় দূরে ঠেলে দিয়েছ, কিন্তু আমার মনে তুমি চিরজাগ্রত। আমার দিমাগ বলছিল তুমি একদিন ইয়াদ করবে, তোমার কাছে ডাকবে আমাকে।

— তোমাকে বিদায় দিয়ে দিনের পর

With Best Compliments
from
P. C. CHANDRA
JEWELLERS
A jewel of jewels
pcchandraindia.com | amazon |
GET IT ON Google Play
Download Now
Follow us on /pcchandrajewellersindia
+918010700400 (Except Sunday)
OUR SHOWROOMS
Bowbazar | Gariahat | Chowringhee | Ultadanga | Golpark | Barasat | Behala | Arambagh
Balurghat | Bankura | Cooch Behar | Katwa | Krishnanagar | Malda | Purulia | Siliguri
Siuri | Tamluk | Agartala
ALL THE BELOW MENTIONED SHOWROOMS WILL REMAIN OPEN ON SUNDAYS
Hatibagan | New Town | Howrah | Serampore | Chandannagar | Sodepur | Habra | Kanchrapara
Baruipur | Barrackpore | Asansol Berhampore | Burdwan | Durgapur | Midnapore | Raiganj | Delhi
Bengaluru (Ulsoor & Koramangala) | Bhubaneswar | Jamshedpur | Noida | Mumbai | Ranchi

দিন আমি কী যন্ত্রণায় কাটিয়েছি, তোমাকে সমঝাতে পারবো না। কত খুঁজেছি তোমাকে সারা হিন্দুস্থানে। আব্বা হুজুরের ইন্তেকাল হয়েছে। আয়ুধে হাবেলি কিনেছি। তুমি চলো আমার সঙ্গে, আয়ুধে আমার শূন্য হাবেলিতে। আব্বাহুজুর আমাকে অনেক বাদশাহী মোহর দিয়ে গেছে, যা গুণে শেষ করা যাবে না। তুমি সে সবের মালিক হও, আমি তোমার কাছে এসেছি তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিও না।

— তুমি এখানে আমার কাছে থাকো। পেশোয়াকে বললে এখানে হাবেলির ব্যবস্থা করে দেবেন।

— না, জানে মন, কাফের মারাঠাদের কোনো সাহায্য আমি নেবো না। তুমি আমার সঙ্গে আয়ুধে চলো। নবাব সুজা-উদ্-দৌলাকে বলে আমি তোমাকে সেনাপতির পদ পাইয়ে দেব। নবাব সাহেব আমাকে যথেষ্ট খাতির করেন।

একটা
গোপন কথা বলি
আফগান আমির আহম্মদ শা
আবদালি হিন্দুস্থান আক্রমণ করতে
আসছে, তাঁকে মদত করবে আয়ুধের

নবাব সুজা-উদ্-দৌলা আর রোহিলা নবাব নজীব উদ-দৌলা। এই যুদ্ধে মারাঠারা শেষ। তোমার মতো বীর সাহসী ইমানদার যোদ্ধার কদর নবাব সুজা করবেন। তুমি চলো।

— মায়মুনা বেগম, আমার দুর্দিনে মারাঠারা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, নৌকরি দিয়েছে, মর্যাদা দিয়েছে, এই দুর্দিনে তাদের ছেড়ে যাওয়া বেইমানি, এই বেইমানি আমি করতে পারবো না।

— কাফেরদের সঙ্গে কিসের ইমানদারি? চলো, তুমি মুসলমানদের জন্য যুদ্ধ করবে আয়ুধের নবাবের পক্ষে।

— না, মায়মুনা না, ইমান আমি ভাঙ্গতে পারব না।

— আমার জন্যও না?

— না, হিন্দুস্থানের বাদশাহী পদের জন্যও না।

— তবে তুমি বন্দি থাকো এই হাবেলিতে।

মায়মুনা হাততালি দিতেই জনা চারেক হাব্সি খোজা এসে কার্দিকে কবজা করার চেষ্টা করে। তড়িৎ গতিতে তরবারি কোষমুক্ত করে হাব্সি চারজনকে কোণঠাসা করে দ্রুত কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসে কার্দি। কিন্তু কোথায় অশ্ব? যে গাছের সঙ্গে অশ্ব বাঁধা ছিল সেখানে নেই। ততক্ষণে খোজা চারজন সশস্ত্র হয়ে কার্দিকে তাড়া করেছে। কার্দিও তখন প্রাণপণে ছুটে চলেছে, রাস্তার ধারে একটা টাঙ্গার আড্ডা, গাড়োয়ানরা এক জায়গায় বসে মজলিশ করছে। কার্দি, একটা টাঙ্গায় চড়ে বসে ক্ষিপ্র হাতে টাঙ্গা হাঁকিয়ে দিল। গাড়োয়ানরা টের পেয়ে হৈ-হুল্লো করে উঠল। টাঙ্গা তখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। নগরের মাঝামাঝি এসে কার্দি রাস্তার পাশে টাঙ্গাটি দাঁড় করিয়ে নেমে এল। পেছনে কারও দেখা নেই। না খোজাদের না গাড়োয়ানদের। নিশ্চিন্ত হয়ে কার্দি পা বাড়াল পেশোয়া বালাজী বাজিরাওয়ের প্রাসাদের দিকে। প্রাসাদদ্বারে রক্ষীরা পথ আটকালো। কার্দি পাঞ্জা দেখাতে রক্ষীরা সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিল। আবার সেই মন্ত্রণা কক্ষ। পেশোয়া জিজ্ঞাসা করলেন—

— কী সংবাদ ইব্রাহিম তোমাকে এত বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে কেন?

— মহামান্য পেশোয়াজী, সে অনেক কথা। আমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি পেশ করছি। আহম্মদ শাহ আবদালি একা নয়, হিন্দুস্থানের দুই নবাব, আয়ুধের নবাব সুজা-উদ-দৌলা এবং রোহিলার নবাব নজীব-উদ্-দৌলা আবদালিকে সবরকম সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

ইব্রাহিম তোমাকে আমি নিজের থেকেও বেশি বিশ্বাস করি। তবুও জানতে কৌতূহল হয়। এই সংবাদ তুমি কোথায় পেলে?

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর ইব্রাহিম কার্দি মাথা তুলে বলল—

— মহামান্য পেশোয়া। আমার বেগম মায়মুনার কাছে। সে আমার খোঁজে পুণায় এসেছে। আমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎও হয়েছে। সে আয়ুধের নবাব সুজা-উদ্-দৌলার আশ্রিতা। আমাকে আয়ুধে নিয়ে গিয়ে সেনাপত্যের প্রস্তাব দিয়েছিল। আমি গ্রহণ করিনি, তখন সে আমাকে বন্দি করতে চেয়েছিল। আমি পালিয়ে এসেছি।

— সে কোথায় আছে এখন?

— মহাত্মন, সে এখন পুণার শেষ প্রান্তে বাঈজী মহল্লায়।

— ইব্রাহিম কার্দি। নিজের জীবন বিপন্ন করে তুমি একদিন আমাকে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলে। তুমি মারাঠা বাহিনীকে আধুনিক যুদ্ধে পারদর্শী করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছ। দু-একজন ধর্মান্ধ স্বার্থান্বেষী ছাড়া সমগ্র মারাঠা জাতি তোমাকে বন্ধু মনে করে। আমি তোমাকে কিছু উপহার দিতে চাই। এই উপহার গ্রহণ করতে তুমি আপত্তি করো না।

— মহাত্মন, সেই উপহার যদি আমার ইমান আর পৌরুষের পরিপন্থী না হয় তবে তা আমার শিরোধার্য।

— আমি তোমার স্ত্রী, সংসার ফিরিয়ে দিতে চাই ইব্রাহিম। তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করো। আমি তোমাকে আলাদা হাবেলি দিচ্ছি।

— গোস্তাকি মাফ করবেন মহাত্মন। আমি নিজেই সেই প্রস্তাব তাকে দিয়েছিলাম, কিন্তু সে তাতে রাজি নয়। সে আমাকে আয়ুধে নিয়ে গিয়ে নবাব সুজা-উদ্-দৌলার সেনাপতি করবে।

— ইব্রাহিম! তুমি মারাঠা বাহিনীর সম্পদ। আগামী যুদ্ধে মারাঠা বাহিনী তোমার মুখ চেয়ে আছে। তবুও আমি বলছি, তোমার সুখ, শান্তি, পরিবারের কল্যাণের জন্য তুমি তোমার স্ত্রীর প্রস্তাবে রাজি হও। স্ত্রীর সঙ্গে চলে যাও আযোধ্যায়। সেনাপতি হও, সুখী হও। আমি তোমাকে অযোধ্যায় যাবার অনুমতি দিলাম। আর যাবার সব ব্যবস্থাও আমি করে দেবো। যাও, চলে যাও।

— গোস্তাকি মাফ করবেন মহাত্মন। আপনার এই প্রস্তাব আমি মানতে পারলাম না। নিজের স্বার্থে, নিজের সুখ শান্তির জন্য, আমার অসময়ের আশ্রয়দাতা, অন্নদাতা, মর্যাদাদাতা মারাঠা জাতির আসন্ন বিপদের সময় পালিয়ে যাবো, এতবড় বেইমান এই আফগান ইব্রাহিম কার্দি নয়। জয়-পরাজয় যাই হোক, আমি মারাঠা জতির হয়ে স্বজাতি আফগানদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো।

— ধন্য, ইব্রাহিম তুমি ধন্য।

— আমাকে আরেকবার বাঈজী মহল্লায় যাবার অনুমতি দেবেন মহাত্মন? আমাকে আটকানোর জন্য ওরা আমার অশ্ব চুরি করেছে। বাধ্য হয়ে আমি টাঙ্গার আড্ডা থেকে একটা টাঙ্গা চুরি করে পালিয়ে আসি। সেই টাঙ্গা ফেরত দিয়ে

আমার অশ্বটি উদ্ধার করতে হবে।

— যাও, তবে একা নয়, সৈন্য নিয়ে যাও।

ইব্রাহিম কুর্নিশ করে মন্ত্রণা কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল তখন মধ্যরাত্রি।

আবদালির বাহিনীর ক্রমশ এগিয়ে আসছে, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলা আর রোহিলার নবাব নজীব উদ্ দৌলা। পাণিপথের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে শিবির স্থাপন করেছে মারাঠারাও। কার্দির চেষ্টায় সামান্য গোলা-বারুদও জোগাড় হয়েছে। এক ক্ষুদ্র গোলন্দাজ বাহিনীও তৈরি হয়েছে। পেশোয়া বালাজী বাজীরাও আশপাশের হিন্দু রাজাদের কাছে সাহায্যের আবেদন করে দূত পাঠিয়েছেন। দূত পাঠিয়েছেন রাজপুত ও জাঠ সর্দারদের কাছেও। মারাঠা দলপতি রঘুজী ভোঁসলে তার বাহিনী নিয়ে এই যুদ্ধে যোগদান করবেন কিনা সন্দেহ। ইব্রাহিম কার্দির চেষ্টার বিরাম নেই। আফগান যোদ্ধাদের প্রতিহত করার কৌশল অনবরত শিখিয়ে যাচ্ছে অধীনস্থ সেনাদের। সামান্য গোলাবারুদের সঙ্গে গুটিকয়েক কামানও জোগাড় হয়েছে। কিন্তু গোলন্দাজিতে পারঙ্গম একমাত্র কার্দি, উৎসাহী কয়েকজন মারাঠী সেনাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। পেশোয়া ছাড়াও প্রধান সেনাপতি সদাশিব রাও ভাও কার্দির তৎপরতায় খুব খুশি। পেশোয়ার পুত্র নবীন সেনাধ্যক্ষ বিশ্বাস রাও কার্দির একান্ত অনুগত।

অবশেষে এল সেই দিন, ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি। বিশাল আফগান বাহিনী নিয়ে আহম্মদ শাহ আবদালি পানিপথের প্রান্তরে ঝাঁপিয়ে পড়ল মারাঠাদের উপর। সঙ্গে অযোধ্যা আর রোহিলার নবাবের বাহিনী। মারাঠাদের পক্ষ থেকেও প্রাণান্তকর প্রতিরোধ করা হলো। কিন্তু আফগান বাহিনীর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের মুখে মারাঠা বাহিনী বেশিক্ষণ টিকতে পারল না। কার্দির সংগৃহীত গোলাবারুদ নিমেষেই শেষ হয়ে গেল। শুধুমাত্র বর্শা আর তলোয়ার নিয়ে এই অসম যুদ্ধে অল্প সময়ের মধ্যে মারাঠাবাহিনী বিধ্বস্ত হলো। প্রধান সেনাপতি সদাশিবরাও, পেশোয়ার পুত্র বিশ্বাস রাও সহ বাইশজন প্রথম শ্রেণীর সেনাপতি রণক্ষেত্রে প্রাণ হারান। পুণায় পেশোয়ার কাছে এই দুঃসংবাদ যে ক্ষুদ্র বার্তাটিতে পাঠানো হলো তা হল— 'দুটি মুক্তা নষ্ট হয়েছে, বাইশটি সোনার মোহর খোয়া গেছে, আর সোনা রূপা কত যে ক্ষয় হয়েছে তা গণ্য করা অসম্ভব।' মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে লক্ষাধিক মারাঠা সৈন্য প্রাণ হারায়। ইব্রাহিম কার্দি গুরুতর আহত হয়ে আফগান বাহিনীর হাতে বন্দি হয়। সুজা-উদ-দৌলার নির্দেশে তাকে পাণিপথ প্রান্তরে মায়মুনা বেগমের শিবিরে পাঠানো হয়। পথিমধ্যে এক আফগান সৈনিক কার্দিকে পঞ্জাব যুদ্ধে তাঁর ভ্রাতৃহন্তা বলে সনাক্ত করে এবং প্রচণ্ড আক্রোশে তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করে। ইব্রাহিম কার্দির প্রাণহীন দেহ মায়মুনার কাছে পাঠানো হয়। অনেক প্রত্যাশায় অপেক্ষা করছিল মায়মুনা, স্বামীকে সুস্থ করে চলে যাবে অনেক দূরে, যেখানে যুদ্ধ নেই, রক্তপাত নেই, তার কৃতকর্মের জন্য মাফ চেয়ে নেবে কসম এর কাছে। দিলওয়ালা আদমি ইব্রাহিম তাকে নিশ্চয় আর দূরে সরিয়ে দেবে না। মায়মুনার সামনে রাখা হলো কসমের নিথর দেহ। মায়মুনার মুখে ভাষা নেই। চোখে জল নেই। দীর্ঘ প্রত্যাশার এই করুণ পরিণতিতে পাষাণ হয়ে গেল মায়মুনা। ■

With Best Compliments from :-

A

WELL WISHER

With Best Compliments from :-

RAJKUMAR KARWA

Managing Director

SANAUTO ENGINEERS (INDIA) PVT. LTD.

Manufacturers of

ENGINEERING COMPONENTS

AEROSPACE, OIL & GAS, AUTOMOTIVE

789, Industrial Estate, Sector - 69

Faridabad - 121 004, Haryana

Tel. : 91 129-2241379 - 2240310

Website : www.sanauto.com

E-mail : info@sanauto.com